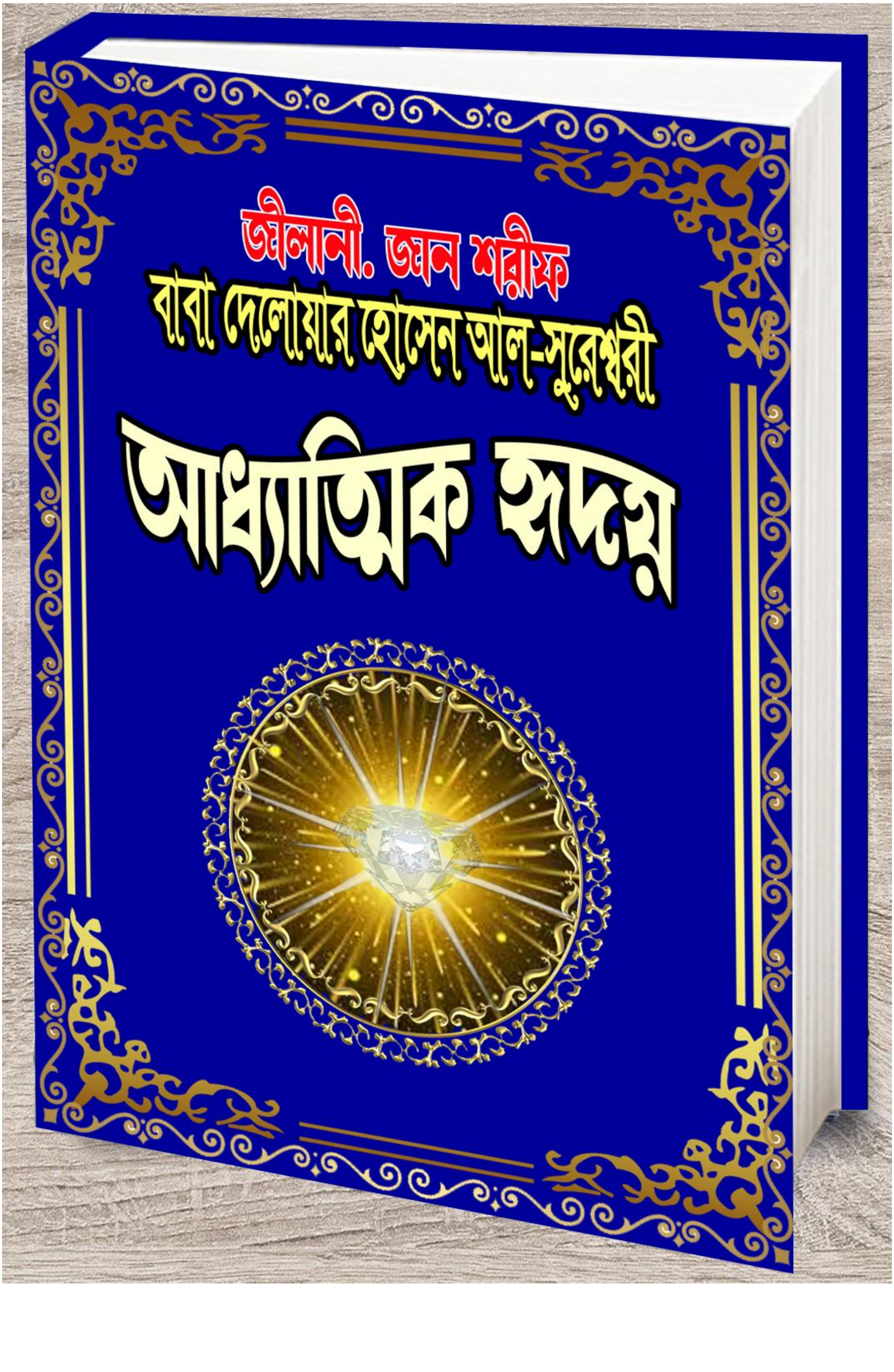
জীলানী. জমন শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী
আধ্যাত্মিক হৃদয়

প্রকাশক : দরবার শরীফ
পক্ষে মোঃ আক্তারুজ্জামান (বাবু)
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৫১০০৫৯

স্বত্ব : মুক্ত

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২১ ইং

প্রথম প্রকাশ : পরিবর্ধন ও পরিমার্জন নতুন সংযোজন
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : সুজন

বর্ণবিন্যাস : সুজন

মুদ্রণ : মমিন অফসেট প্রেস, রাজা হাজী মার্কেট, পাবনা।

মূল্য : ৪৩০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী
কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
Web: www.babadeloyer.com
YouTube Baba Deloyer

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

আওলাদে মুর্শিদ
শাহ সুফি বাবা বেদম ওয়ারেছী
আল-জাহাঙ্গীরী আল-সুরেশ্বীর
পবিত্র হস্ত মুবারকে উৎসর্গ করিলাম।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রিত অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবে না। কারণ এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতী সত্ত্বার অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোন সাময়িকীতে এই বই এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোন কারো নামে ধারাবাহিক ভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোন দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইতে পরিবেন।

আলোচ্য বিষয়গুলো যে ভাবে সাজানো হয়েছে :-

(আলোচনার বিষয় সমূহ) (পৃষ্ঠা নং)

০১। পূর্বাপর ০৮
০২। ধর্ম ১১
০৩। ধর্মের মূল বিষয় কলেমা ১৯
০৪। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দর্শনে ২০
০৫। আসমানী কিতাব ১০৪ খানার পূর্ণ বিবরণ ২৪
০৬। সূরা ফাতিহার আলোকে কিছু কথা ২৫
০৭। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা ৭৩
০৮। দুইটি আয়াতের উপর আলোচনা ৮৬
০৯। সালাত বা নামাজ ৯৫
১০। সালাত বা নামাজের গুরুত্বের কারণ ৯৫
১১। প্রকার ভেদে সালাত বা নামাজ ৯৭
১২। সময় নির্ধারণী সালাত বা নামাজের উল্লেখ ৯৭
১২। লৌকিকতা বিবর্জিত সমাজ আহ্বান ৯৯
১৩। রোজা বা সিয়াম ১১৭
১৪। একত্ত্ববাদের বিষয়ে আলোচনা ১২১
১৫। হায়াতে ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী ১৭৯
১৬। চূড়ান্ত স্থায়ীত্ত্বের ভাবধারা নিয়ে আলোচনা ১৮৬
১৭। সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা ২০০
১৮। নির্যাতনের বর্ণনা ২১৬
১৯। আপন অনুভূতি ২১৬
২০। পীর বা গুরু বিষয়ে আলোচনা ২১৭
২১। লেখকের কিছু কথা (আধ্যাত্মিক প্রদীপ্ত হতে) ২২০
২২। রেবা (সুদ) কি? ২২১

২৩। সূরা ইয়াসিনের ৬টি আয়াতের উপর আলোচনা উচ্চারণ এবং অর্থ ২২৮
২৪। ইয়াসিন ২২৯
২৫। কোরআনুল মাজিদ সাত (৭) হরফে নাজেল হওয়া ২৩৩
২৬। বিজ্ঞানময় কোরআন ২৪০
২৭। মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) রসূলগণের মধ্য হইতে ২৪২
২৮। মুস্তাকিম বা সত্য সঠিক পথ ২৪৪
২৯। আল্লাহ্র রহিম নাম বা লকব ২৫৪
৩০। হেদায়েতের বাণী গ্রহণ করা বা না করা ২৫৬
৩১। কোরআনুল মাজিদ ২৫৮
৩২। কোরআন সম্পর্কে কিছু কথা ২৬০
৩৩। কোরআনের নাম নিয়ে কিছু কথা ২৬৫
৩৪। লকব ২৭০
৩৫। সিরাজাম মুনিরা ২৭২
৩৬। মেরাজ ২৭৭
৩৭। স্রষ্টার প্রতিনিধিগণের কিছু মোজেজা ও কারামত ২৮৭
৩৮। মোরাকাবা মোশাহেদা ৩১২
৩৯। জঙ্গীবাদের উত্থান ৩১৭
৪০। মন ৩১৯
৪১। চাঁদ ৩২০
৪২। সাক্ষাত ৩২৪
৪৩। দরবেশী কোরআন ৩২৪
৪৪। কবর ৩২৫
৪৫। মূলের বিষয়ে আহ্বান ৩২৯
৪৬। ইয়া ইমাম হুসায়েন তুমপার লাখো সালাম ৩৩০
৪৭। রবিউল আওয়াল উপলক্ষে উচ্ছ্বাস ৩৩১
৪৮। পাখালা ৩৩৩
৪৯। সাধন ৩৩৪
৫০। প্রেমোদগম ৩৩৫

৫১। নামা ৩৩৬
৫২। হু প্রকাশ ৩৩৭
৫৩। চক্ষুদান ৩৩৯
৫৪। দর্পণ ৩৪০
৫৫। তকদির ৩৪১
৫৬। শিকড় ৩৪২
৫৭। প্রার্থনা ৩৪৪
৫৮। স্বভাবে সুরত ৩৪৫
৫৯। আত্মপ্রত্যয় ৩৪৭
৬০। মুমুক্ষা ৩৪৯
৬১। বাস্তবতা ৩৫১
৬২। মারফতি ৩৫২
৬৩। মহরম ৩৫৩
৬৪। কয়েকটি গান ৩৫৫
৬৫। শাহ সুফি মজিদ আল-সুরেশ্বরীর রচনাবলী ৩৫৮
৬৬। মোঃ ওবায়দুল-এর একটি রচনা ৩৬১
৬৭। মোঃ আনিসুজ্জামান (আনিস)-এর একটি রচনা ৩৬২
৬৮। আরাফাত শাহ্’র রচনাবলী ৩৬৩
৬৯। মোঃ আঃ গাফ্ফার বিশ্বাস-এর একটি ভূমিকা ৩৬৫
“আধ্যাত্মিক বিধান” পুস্তক হতে
৭০। হাদিস ৩৬৬
৭১। বাণী চিরন্তনী ৩৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

পূর্বাপর

আধ্যাত্মিক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো মূলকে লাভ করার বিষয়ে নিয়ম-নীতির সঠিক ধারণা বা বিধি-বিধান, যে নিয়ম-নীতিগুলো পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ইহা একই ধারাতে চলমান একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু কালের বিবর্তনের ধারাতে ইহা বারবার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়ে মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে বস্তুত মূল লাভের অন্তরায় হিসাবে। এরই প্রেক্ষাপটে মূলকে অর্জনকারীগণ প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে লিখনির মাধ্যমে কিছুটা ধারণা দিতে চেষ্টা চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। উদাহরণ হিসাবে আল্লাহ্‌পাক সূরা ওয়াকিয়া ৭৯ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে :- "লা ইয়ামাস্‌সুহু ইল্‌লাল মুতাহ্‌হারুন"। অর্থ :- পবিত্রগণ ব্যতীত ইহাকে (অন্য কেহ) স্পর্শ করিতে পারে না" । কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব বাণী প্রকৃত পবিত্র এবং চলমান পবিত্রতার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। বিবেকের উপলব্ধিই প্রকৃত বিষয়ের দিকে অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। আরও একটু উল্লেখ করতে চাই তা হলো সূরা নেছা-এর ১৫০ - ১৫১ (মিলিত) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "আল্লাহ্ এবং রসূলের মধ্যে পৃথককারী পরিপূর্ণ কাফের"। এবং "একনিষ্ঠতার ঈমানকে দৃঢ় রক্ষাকারীকে শীঘ্রই সুসংবাদ প্রদান করার কথা উল্লেখ রয়েছে"। তাহলে চলমান বাস্তবতার আঙ্গিকে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশনামা এবং চলমান ধর্মীয় পালনতব্য নিয়ম-নীতিগুলো জ্ঞানীদের জন্য উপস্থাপন হৃদয়ের অবাঞ্চিত কালিমাকে দূরে ঠেলে প্রকৃত আলোর উন্মেষ দ্বারা হৃদয় আলোকিত করানোর একটু ধারণা মাত্র। ইসলাম হইল ফিৎরাতী ধর্মীয় ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক বা আল্লাহ্‌র স্বভাব ধর্ম বলে বিবেচিত। শুধুমাত্র মানুষ এর ব্যতিক্রম (জ্বীন জাতির কথা এড়িয়ে গেলাম)। তাই

মানুষ তার স্বভাবকে নিজ কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ফিৎরাতী অর্জন করতে পারলেই প্রকৃত ধর্মের স্বাদ এবং সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য স্বার্থকতা লাভ করে। আল্লাহ্‌পাক কোরআনুল মাজিদের সূরা রুম-এর ৩০ নাম্বার আয়াতে বলেন :- "ফাআকেম্ ওয়াজ্‌হাকা লীদ্‌দীনে হানীফান্"। অর্থাৎ "সুতরাং তুমি তোমার মুখমন্ডলকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর"।

আধ্যাত্মিক হৃদয় বইটিতে ধর্মের প্রাথমিক ধাপগুলোকে চলমান ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু বিষয় চলমান প্রক্রিয়াতে কার্যকারিতা না থাকার কারণে মূল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং জ্ঞানীদের উপমাসহ কোরআন হাদিসের আঙ্গিকে উপস্থাপনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। যেন প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অনুধাবন করতে পাঠক বাবা-মায়েরা সচেষ্ট হয়। সমসাময়িক নীতি আর আনুষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যে মানুষকে বেঁধে যান্ত্রিক মানুষে রূপান্তর মানবতা বিপন্ন সহ ধর্মের খোলসকে ছিন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি। এরই ধারাবাহিকতায় হয়ত অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন, জ্বালা-যন্ত্রণা, পোহানোর অবস্থা তৈরী করতে পারে। এগুলো মুখ বুজে সহ্য করে হলেও কিছু মানুষের কাছে আমাদের উপস্থাপন প্রকৃত দিশা লাভে সচেষ্ট হলেই কেবল উক্ত পরিশ্রমের স্বার্থকতা পাবে।

বস্তুবাদের জঞ্জাল মানব মস্তিষ্কে এমন ভাবে চেপে বসেছে যা চলমান ব্যবস্থা থেকে মানব-মানবীকে উত্তরণ জরুরী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক সূরা আর-রহ্‌মান-এর ৩৩ নাম্বার আয়াত বলেন :- "ইয়া মাশারাল জিন্‌নি ওয়াল্ ইন্‌সি ইনিস্ তাত্‌তাতুম আন্ তান্‌ফুজু মিন আখতারি সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দি ফান্‌ফুজ; লা তান্‌ফুজুনা ইল্‌লা বিসুলতান"। অর্থ :- "ওহে জ্বীন এবং মানুষের সম্প্রদায়, যদি তোমরা পার যে তোমরা বাহির হও আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সীমা (হইতে), সুতরাং তোমরা বাহির হইয়া যাও। মহাশক্তির অনুমতি ছাড়া তোমরা বাহির হইতে পারিবে না"। অর্থাৎ মানব-মানবীকে প্রকৃত মুক্ততা অর্জন হওয়াই যে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ইহা আজকের জামানার মানুষ ভুলতে বসেছে। সৃষ্টি এবং স্রষ্টার দ্বৈত অস্তিত্বের মিথ্যা ধারণার মূল উৎস মানুষিক দ্বন্দ। তাই সকল দ্বন্দের অবসান কল্পে মানুষ আধ্যাত্মিকতার নীতি আদর্শগুলো হৃদয়ে ধারণ করে প্রকৃত ধর্মীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে তৈরী করতে সচেষ্ট হবে, মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির

মূল উদ্দেশ্য সফল হবে। এজন্য যে বিষয়গুলো (ফেতনা) Confusion তৈরী করে, তার সঠিক ধারণা গুলো আলোচ্য বইটিতে সারমর্ম হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যাহা পাঠক বাবা-মায়েদের প্রকৃত বিধানের দিকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করবে। অবশ্য গুরুবাদ ব্যতীত কোন কর্মই পরিপূর্ণতা দানে অক্ষম বৈকি! কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা এবং মতকে আলোচ্য পুস্তকটিতে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। যাহা পাঠক বাবা-মায়েদেরকে একটি নতুন দিগন্তের দিশা দিতে চেষ্টা করবে। সকল মানব-মানবীকে প্রকৃত বিধান অনুসরণ করবার নিবেদন। ভুল ত্রুটি মার্জনীয় দৃষ্টিতে দেখবার আহ্বান রেখে সকল পাঠক বাবা-মায়েদের শুভেচ্ছাসহ মঙ্গল কামনায়,

বাবা দেলোয়ার

জানুয়ারি, ২০২১ ইং

ধর্ম

ধর্মের সংজ্ঞা লিখতে বুঝি মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক যে বিধান বা নিয়ম তিনি আরোপ করেছেন তাহা পূর্ণভাবে মানিয়া জীবনকে পরিচালনা করার পর সম্পাদনতব্য করা। গোত্র, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও (পাপ বা মন্দ) (নেক বা পূর্ণ) বিষয়ক বিশ্বাস এবং ইহলৌকিক শান্তি এবং পরলৌকিক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত আচার-আচরণ উপাসনা পদ্ধতি এবং সাংসারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় সহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্পর্কিত কার্যাবলী। এরপরও সৎকর্ম, পূণ্যকর্ম, সদাচার, কর্তব্যকর্ম, স্বভাব প্রকৃতি, প্রত্যেক জীব বা বস্তুর নিজস্ব গুণ পূর্ণ বা ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পূণ্যের বিচারকর্তা, পালনকর্তা সহ বিশ্ব বিধাতা কর্তৃক মানুষ মানুষত্বের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান আইন রীতি, সাধনার পথ, ও সতীত্ব ও রাশিচক্রের লগ্ন থেকে প্রাপ্ত স্থানসহ যাবতীয় কর্ম-কান্ড পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করন। পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার জন্য এতটুকো উল্লেখ করিলাম। এবার সৃষ্টিতে যে বিধানে সমাসীন তার নাম ইসলাম। আরবিতে দ্বীন অর্থ ধর্ম, ইয়াম অর্থ কাল বা সময়। এই কাল বা সময় মহান সৃষ্টি কর্তার একটি রহস্যময় লীলা যা সৃষ্টিতে সমাসীন হয়ে পূর্ণভাবে সম্পাদন করা। এখন প্রশ্ন জাগে ইসলাম ধর্ম কি নির্দেশ করেছে? এর জবাব “কোরআন” ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইংরেজীতে বলে Code of life কোরআনকে পূর্ণভাবে অবলম্বন করে জীবনকে গড়তে পারলে ইসলামের পূর্ণতা সম্পন্ন হয়। এটাকি সহজ কোন বিষয় তাই এর সুবিন্যস্তভাবে ভাবকে অলংকৃত করে যে মহা মানবটি আদর্শ স্থাপন করেছে তিঁনি নবী যার নিকট অহি মারফত এই কিতাব নাজেল হয়। তাঁর জীবন শুরু থেকে পরদা গ্রহণ পর্যন্ত সময় বা কালকে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে নবুয়তী লাভ পর্যন্ত “৪০” চল্লিশ বছর বয়স তিনি কি নিয়ম নীতিতে জীবনকে গড়েছেন যা দ্বারা তিনি নবুয়তী লাভ করতে পারেন। বিশ্ব বিধাতার মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন বা এই লাভ করার আদর্শ স্থাপন করে গোটা দুনিয়াকে বুঝায়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কার্যত এই নীতি বা ধারা সৃষ্টি রাজ্যে জ্ঞান লাভের পর থেকে ধর্মকে অনুসন্ধান করে এই পথ বা মতের কোন মিল বা সংগতি ধর্মীয় আচরণ বা শিক্ষা নীতিতে পূর্ণতার প্রতিফলন চোখে পরে না, যা পরে তা হলো রূপান্তর বাদ বা কিছু অংশ বিশেষ পালনীয় এবং ভিন্ন মত সংযোজিত হয়ে ধর্মের বড়াইকে বাড়িয়ে এমন এক জটিল আকার ধারণ করে মানব সভ্যতাকে ধর্ম থেকে বিতাড়িত করার বা মূল ধারা থেকে দূরে সরায়ে ব্যক্তি মতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে ধর্মের যে দৃষ্টান্ত সাজানো হয়েছে তা অবলম্বন

করে এক জন মানব-মানবী কিভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করবে তা প্রশ্ন বিদ্ধ করে।

এজন্য মূল দর্শনের কিছুটা আকার বা ইঙ্গিত দেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে মত প্রকাশ করি। রসূল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত ধর্মীয় নীতি কি তার বর্ণনাঃ- রসূল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত ধর্ম ছিল ২ (দুইটি) মূল বিষয় :-

প্রথম বা (এক) :- মূলনীতি এটাকে আরবিতে অসুলে দ্বীন অন্য ভাষায় বলে Fundamantal অর্থ এর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না অথবা ইহা অবশ্যই পালনতব্য করতে সম্মত হলে "রসূলের ধর্মের বিধানকে মেনে নেওয়া বুঝায়।

(১) তৌহিদ অর্থ – অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ।

(২) আদল অর্থ – আল্লাহ্ সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক।

(৩) নবুয়্যত অর্থ – আল্লাহ্ হতে অহি প্রাপ্ত একজন হেদায়েত দানকারী ব্যক্তি।

(৪) ইমামত অর্থ – খোদাই শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ মনোনীত যোগ্য নেতৃত্ব।

(৫) আখেরাত অর্থ – পারত্রিক মুক্তি প্রাপ্ত অবস্থা অর্থাৎ এক কথায় জান্নাতের বিশ্বাস।

এই উল্লেখিত পাঁচটি মূল নীতি কোন প্রকার গাফেল না হয় এ জন্য মন, দেহ, জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ মান্যতার স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করতে হয়। এক কথায় পূর্ণ মেনে নেওয়া।

দ্বিতীয় বা (দুই) :-আমল নীতি আরবিতে কারা বা ফ্রয়েদ্বীন অন্য ভাষায় Institutional অর্থ আয়ত্ত করা বা পালন করে ফল লাভ করার জন্য নির্দেশনার আমল বলা যেতে পারে।

(১) সালাত অর্থ – নামাজ (মেজাজী - হাকিকী),

(২) সিয়াম অর্থ – রোজা (মেজাজী - হাকিকী),

(৩) জাকাত অর্থ – সম্পদের কর বা আমিত্বের উৎর্স

(৪) হজ্ব অর্থ – বাৎসরিক আনুষ্ঠানিক ব্রতী বা দিল কাবার হজ্জ,

(৫) খুমস অর্থ – নির্ধারিত আয় থেকে প্রতিদিনের কর প্রদান শতকরা ৫ পাঁচ ভাগ,

(৬) জেহাদ অর্থ – ধর্মের জন্য যুদ্ধ

বিষয়গুলো সদরউদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ)-এর লেখা হতে অবগত।

মোট ১১ (এগারটি) বিষয় বা নীতিতে ধর্মের দীক্ষা রসূল (সাঃ) (আঃ) দিয়েছেন অথচ বাস্তবতা কি?

৫ (পাঁচটি) স্তম্ভ (১) কলেমা (২) নামাজ (৩) রোজা (৪) হজ্ব (৫) যাকাত। গরীব এর জন্য হজ্ব ও জাকাত বাদ এভাবে রূপান্তরবাদ থেকে কালক্রমে ধীরে ধীরে ধর্মের ফেকরা এত বেশি দাঁড়িয়েছে যে বর্তমান শত ছাড়িয়ে যাবে ইসলামের ফেকরা বা দল।

তাই মূল ধারার ধর্মীয় বিধান পেতে কি করণীয় জ্ঞানীদের ভাবধারার জন্য এই লিখনী টুকো দাঁড় করিয়ে বিবেকের জিজ্ঞাসায় প্রশ্ন রাখা হলো।

অথচ সূরা ইয়াসিন ২১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন :- “আত্তাবিউ আন্ লা ইয়াস্য়ালুকুম্ আজ্রান্ ওয়া হুম্ মুহ্তাদুন্”। অর্থ :- তোমরা অনুসরণ করো, যে তোমাদের কাছে মজুরী চায় না এবং তাঁহারা হেদায়েত পাইয়াছে।

উক্ত আয়াত দ্বারা কোরআন কত সুন্দর ভাবে জানিয়ে দিল যেন বুঝতে কষ্ট না হয়। অথচ আজকের আলেম নামের জ্ঞানীদের শিক্ষা নীতির ধর্মীয় যে কলা কৌশল এই আয়াতের মান্যতা প্রশ্ন বিদ্ধ করে। এই ভাবধারার সমাধান টুকো কোথায়? কে এই সদোত্তরগুলো মানব-মানবীকে জানাবে? কোরআন সম্পর্কে ভিন্ন একটু ভাবনা রাখতে চাই তা হলো– রসূল (সাঃ) (আঃ) ওফাত বা পরদা গ্রহণের পর এই কোরআন সংকলিত হয় যা বর্তমান সাজানো অবয়বগুলোর ভিন্নতা চোখে পড়ে। এর কোন সদুত্তর না পেয়ে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি টুকো জানানোর প্রয়াস রাখি। দুনিয়ার জ্ঞানীগুণি হয়তো একদিন এর সদুত্তর দেবে।

প্রথমেই বলতে চাই কোরআনুল মাজিদের দুই নং (দ্বিতীয়) সূরা বাকারা এর অর্থ গাভী।

আয়াত :- (১) আলিফ-লাম-মীম।

(২) জালিকাল্ কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল্লিল্ মুত্তাকিন।

(১) মোকাত্তাআতে্র আয়াত (২) শাশ্বত কিতাব (৩) হেদায়েত দানে মুত্তাকী।

অন্যান্য বিষয় : বৌ তালাক এর আয়াতগুলো পঠিতব্য কালাম পাকের যে বর্ণনার মধ্যে স্থান করে আছে তা সাজানোকৃত সূরাটিতে মূল বক্তব্যের ধারাকে অমিলের ধারাতে অনুসরণ করে। জ্ঞানীদের কাছে এই বিষয়টা ভেবে সিদ্ধান্ত জানানোর আবেদন রইল। গবেষণার নিরীক্ষণে বিষয়টা জ্ঞাত করে সবার জন্য প্রকাশ করলাম। ভ্রান্তি থাকলে হয়ত-বা একদিন জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ধরা পরবে। এরপরও ছোট নামাজ শিক্ষার বইসহ বিভিন্ন আলেমগণ কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ বলেন কিন্তু বর্ণনাকৃত আয়াত ৬২৩৬ বাকী আয়াতগুলোর বিষয় কি ছিল বা নাই বা প্রথম গণনা ঠিক নয় এত ভিন্নতা এর সঠিক জবাবগুলো কার কাছে মিলবে ?

কোরআনের পাঁচ (৫) নাম্বার সূরা মায়েদা'র ৬৭ এবং ৪ নাম্বার আয়াত তুলে ধরা হলো :- আয়াত নাম্বার (৬৭) :- "ইয়া আইউহার রসূল বাল্লেগ মা উনজিলা ইলাইকামির রাব্বেকা আন্তা আলীউন মাওলাল মোমেনীন অ ইনলাম তাফআল ফালা বাল লাগতা রেসালাহাতাহু। আল্লাহু ইয়া সেমুফা মিনান নাস"। অর্থ– হে রসূল (সাঃ) (আঃ) আপনার রব হইতে যাহা নাজেল করা হইয়াছে তাহা পৌছাইয়া দিন। আর যদি তাহা না করেন তাহা হইলে তাঁহার (আল্লাহ্‌র) রেসালাত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল না। আল্লাহ্ আপনাকে মানব মণ্ডলী হইতে লইয়া আসিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের দলকে হেদায়েত করেন না।

এবং আয়াত নাম্বার (৪) :- "আল ইয়াওমা ইয়া এশা আল্‌লাজিনা কাফারু মিন দ্বীনাকুম ফালা তামসশাওহুম অখশাওনী আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম অ আতমামতু আলাইকুম নেয়ামাতী ওয়া রাজিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা। অর্থ– আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে আর ভয় করিওনা, ভয় কর আমাকে আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের পরিপূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের দ্বীন ইসলামের উপর আমি রাজি হইলাম।

উক্ত আয়াত দুইটি কোরআনপাকের সর্বশেষ নাজেলকৃত আয়াত যা গাদীরে খুম এর বর্ণনায় শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) প্রকাশ করেছেন। এভাবে কোরআন পাক নিয়ে গবেষণা যে সকল জ্ঞানী গণ করে থাকেন। তাদের কাছে সমাধান টুকো জানতে পারলে মানব-মানবীগণ হয়ত ভ্রান্তি গুলো সংবরণ করে সত্য সুন্দর ধর্মীয় জাগরণ ভাবধারাতে কোরআন পাকের আলোকে জীবন গড়তে কোন প্রকার সমস্যা ধর্মীয়

অনুভূতিতে বাঁধাগ্রস্থ না হয়। তারই পূর্ণাঙ্গ বিধানটুকো যদি কেহ সাজিয়ে দেন তাহলে হয়তো একদিন এই ইসলাম বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে পূর্ণতা লাভে মানব-মানবী সচেষ্ট হবে। কোরআনুল মাজিদ এমন এক কিতাব যা দ্বারা ধর্মের পূর্ণতাকে সঠিক নিয়মে পালনতব্য করার যে পদ্ধতিগত অবয়ব দাঁড় করিয়েছে তাহা সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অবনত মস্তিস্কে মেনে নিতে বাধ্য করে ইহা এমনই শ্বাশত বা চিরন্তন কিতাব বলে সকলের কাছে গৃহিত হয়েছে। তাই এর বাইরে বলব না এরই আলোকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক যে জগত সমূহের সর্ব সাধারণের জন্য নীতি নির্ধারণী যে নিয়মের বিধান তা কখনই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিল পরে না এ জন্য সমাজ সংসার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত সকল স্তরের বাইরে এই বিধান স্থান করে আছে। একটু দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন ভাবখানী দ্বারা যদি চিন্তা করা যায় তবে তা সবার চোখে কিছুটা ইশারা বা ইঙ্গিত বহন করবে। কারণ জগতের সকল প্রচার মাধ্যম সহ ধর্মীয় যত প্রকার জাগতিক জ্ঞানী-গুণীগণ ধর্মের নির্দেশনা মানব-মানবীদের দিয়ে থাকেন এদেরই প্রচার তব্য নিয়ম বা বিধানগুলি মানব সমাজে স্থান করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কোন প্রচার প্রসার বা ধরবার চিহ্নটুকু পাওয়া যায় না। তারপরও কি এমন অর্জন যা দ্বারা ধর্মের সর্বোচ্চ মূলধারণার অর্জনটুকু অর্জিত হয়ে থাকে এটা কোন নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা তা হয়তবা কালের অবগাহনে স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিনিধির আগমন দ্বারা এই বিধানের মহামানবগণ একদিন গোটা দুনিয়াকে বুঝায়ে দিতে সচেষ্ট হবে। হাদীছে কুদসী ও মেশকাত শরীফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-“খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি”।

অর্থ :- আদমকে আমি (আল্লাহ্) নিজ সুরতে সৃষ্টি করি। কিন্তু হাওয়াকে সৃষ্টি কিভাবে করেন তার বর্ণনাকৃত আয়াত চোখে মেলেনি। তাই সুরতের ধারাগুলো কি?

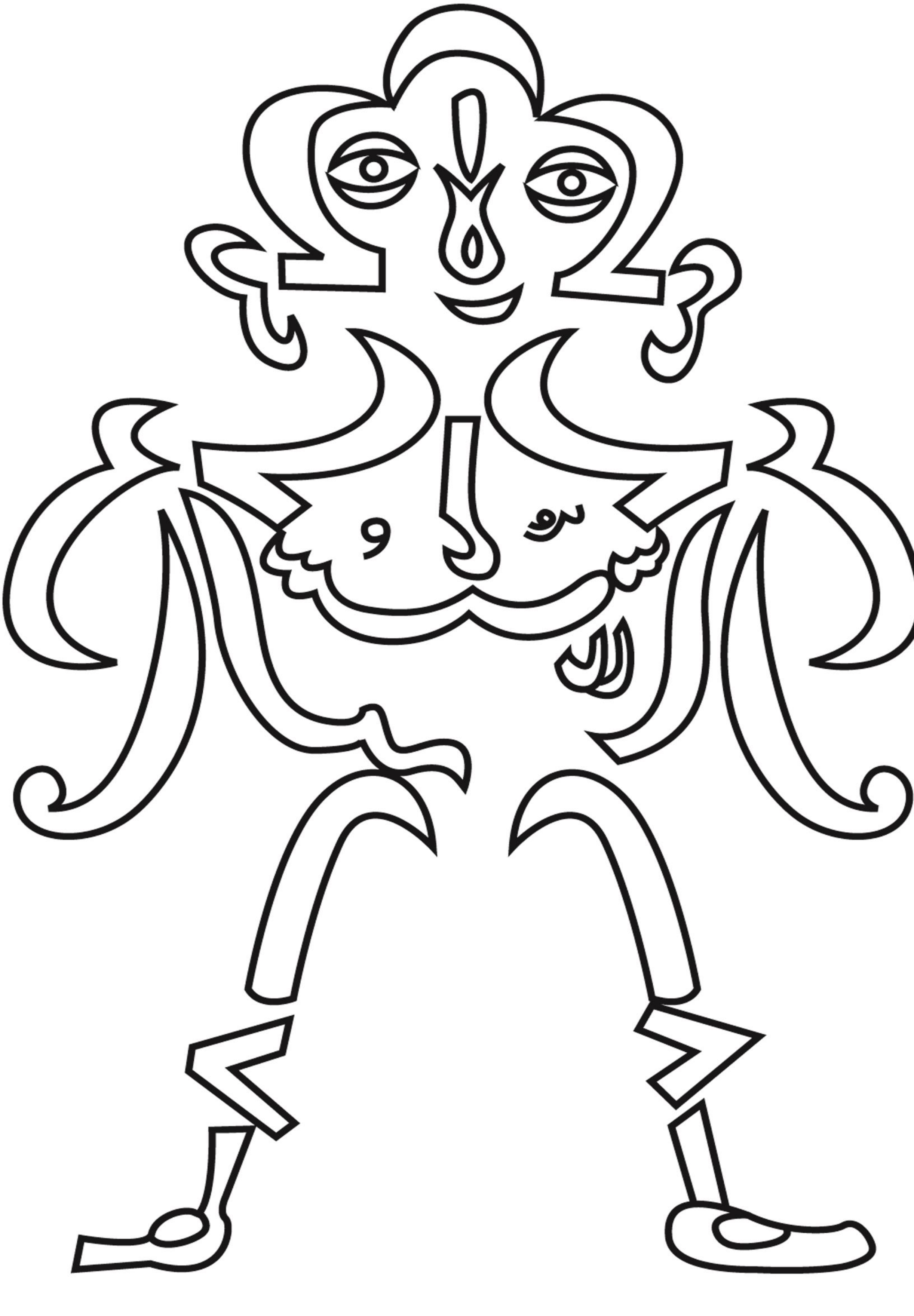

কালাম পাকের ভাব ধারা দ্বারা কোন কোন সাধকগণ এর একটি সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল করতে মত প্রকাশ করেন তখন দেখা যায় ধর্মীয় দর্শনে ফতুয়া নামের খর্গ তার ঘাড়ে চাপানো হয় এমন কি জীবন পর্যন্ত দিয়েও এর সুরাহা মেলেনি। সেখানে কোরআনে সূরা বনি ইসরাঈল-এর ৮৫ নাম্মার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলছেন "কুলুর রুহ মিন্ আমরী রাব্বী"। অর্থ:- "আত্মা আমার রবেরই আদেশ হতে আগত"। অপর সূরা সিজদাহ'র ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহপাক বলেন :- "সূম্মা সাওওয়াগহু ওয়ানাফাকা ফিহি মিররুহিহি"। অর্থ পরিপূর্ণ আকৃতি দেন এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) আত্মা (রুহ) তার (মানুষের) মাঝে ফুৎকার করেন।

হাদিসঃ- রুহ আমার রবেরই আদেশ, নির্দেশ এবং কাজ।

মন্তব্য : আল্লাহ্ এই মানুষের মধ্যে ফানা হয় বা বিকশিত হয়। এই বিকশিত বা প্রকাশিত রূপ কি এই বিষয়ে সৃষ্টিতে কর্তৃত্ব বহন করে মানুষকে বুঝানো বা জানানোর প্রক্রিয়া বা কৌশল সাধকগণ, ওলিগণ একটি মাধ্যম নামের বিশেষণ অবয়ব ব্যবহার করে থাকেন এই চিত্র কালামপাকের অবয়ব যা দ্বারা মূল দর্শনের কর্তৃত্বের করণতব্য সকল কার্য সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবধারাকে সুনিপুণভাবে সাজিয়ে সঠিক গতি ধারার কার্য যা ঐশী বা আধ্যাত্মিক বলয় দ্বারা কর্মসম্পাদন তব্য করে সাধকদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর কার্যকে ত্বরান্বিত করে থাকে। কেননা এই মূল ধারার বিধানকে বুঝাতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টা জরুরী তা হলো নফ্স এবং রুহ (জীব-আত্মা) ও (পরম আত্মা) এ বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান লাভ জরুরী। কোন প্রকার ভ্রান্তি বা অমূলক বিষয়ে জ্ঞাত হলে তা দ্বারা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করি। কারণ সূক্ষ্মতা এমনই সূক্ষ্ম বিষয় কি? উদাহারণ হিসাবে উপস্থাপন করি সৃষ্টি জগতে আঁশ জাতীয় কোন উপকরণ যদি ভ্রান্তি থাকে তবুও তা ভিন্নতার দিকে নিয়ে যাবে।

নফ্সকে সৃষ্টির অন্তরভূক্ত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, আইন বিভাজনকৃত বৈশিষ্ট্য বলে।

সংজ্ঞা, দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, অনুভব ও অনুভূতিকে নফ্স বলে। এই নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করে রুহ দ্বারা পরিচালনা করার প্রত্যয় থেকে সফলতা পর্যন্ত পৌঁছানো ধর্মের মূল কাজ হিসাবে বিবেচনা করি। রুহকে স্বয়ং আল্লাহ্‌র আদেশ বলে। কালামপাকে রুহ সম্পর্কে অনেক সৌন্দর্যময় অর্থের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেমন ওয়াহেদ, নূরানী মাখলুক,

সৃষ্টির বহির্ভূত স্রষ্টা, ইহার মৃত্যু নাই অর্থাৎ আমরণ। সৃজনী শক্তি, সৃষ্টি, নির্মাণ, রচনা, রক্তের কণিকা ইত্যাদি সংজ্ঞা মোহাম্মদী নূরের একটি বিকাশের অবতরণকে রুহ বলে। উহা সৃজনী শক্তির অধিকারী যেমন সূরা বাকারা ৮৭ নং আয়াত :- "ঈসাকে রুহুল কুদ্দস দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে"। অন্য আয়াতে রুহুল কুদ্দুস-স্থান পবিত্রকারী রুহ, অন্য আয়াতে- রুহুল কুদ্দুস দ্বারা মমিনকে শক্তিশালী করি। কোরআন রুহ বিষয়ে ১৭ বার বিভিন্নভাবে ঘোষণা করেছে। এই রুহই বীজ রূপে সকল মানব-মানবীর মাঝে অবস্থান করে, ইহাকে জাগ্রত করাই সাধকের জন্য মূল কাজ, ইহাই ধর্মীয় দর্শনের মূল বিষয় বলে মত প্রকাশ করি। আর ইসলামে যত মতভেদ এটা উত্তরণ করে মূলধারায় পৌঁছানো দুরূহ। এ জন্য অনেক সময় নিকটের আশেকানদের বলে থাকি সামনে নতুন ধর্ম আসলে তোমরা গ্রহণ করিও দেল মাদেল ধর্ম, বাবা গোবাল মা তুবা নন–সামনে আবির্ভাব বিষয়ে ধর্মের ভবিষ্যৎ বাণীটুকো বলি।

ধর্মের মূল বিষয় কলেমা

এই কলেমা সম্পর্কে আক্ষরিক আলোচনা ধর্মের মূল স্বীকৃত গ্রহণ বা শিকার করা বা গ্রহণ করা। এই কলেমা আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত পুরুষগণ কিভাবে লাভ করেছেন ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্র সহিত জাগ্রত স্বত্বার উপযুক্ততা নিরূপন যা আল্লাহ্ কর্তৃক স্বীকৃত সনদ দান করবার পর আল্লাহ্র মনোনীত প্রতিনিধি হন। জাগতিক কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ইহা পাওয়া সম্ভব নয়। যুগে যুগে কালে কালে ধর্মদ্রষ্টার প্রতিনিধিগণ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এবং সর্বশেষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) একান্ত সাধনার মাধ্যমে হেরা গুহায় ১৫ বছরের অধিক সময় ব্যয় করেছেন। এজন্য আনুষ্ঠানিকতা ভিন্ন হতে পারে। কিন্ত মূলের ধারা যা মোরাকাবা মোশাহেদা এক ও অভিন্ন।

ধর্মের মূল সংবিধানকে কেতাব বলা হয়। ইসলাম ধর্ম মতে আসমানী বা এশী ব্যবস্থার মাধ্যমে স্রষ্টার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া হলো কেতাব যা কলেমা প্রাপ্তির থেকে সূচনা এজন্য বহু সাধকগণ বলেছেন জীবন্ত দেহই কিতাব। অর্থ কলেমার সৃজনী ঘটলে দেহের চৈতন্য ঘটে, ঐ দেহ তখন মুবারকে রূপান্তর হয়। ইহা বিশ্ব বিধাতার এক অমোঘ লীলা। তাই মোরাকাবা মোশাহেদা এবং কলেমার পূর্ণতা ধর্মের সু-নির্দিষ্ট ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। তাই

ধর্মের সঠিক বিষয় অনুধাবন করতে হলে উল্লেখিত বিষয়ের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা অনুমেয় নয় উক্ত ব্যবস্থাই সক্রিয় বলে বিবেচিত করলাম যদিও ইহা লেখনীর মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব নয় তবে একটু ধারণা দিতে চেষ্টা করা।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দর্শনে

মূল আলোকপাত পূর্ণ কলেমা

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ)”। অর্থ :- আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ।

গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে বা ভাবলে সকল নবী রসূলের উপর নির্ধারিত কলেমার **১ম** অংশ অবিচল এবং দ্বিতীয় অংশ তাঁহার নাম সংযোজিত হয়েছে।

উদাহরণঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদম সফীউল্লাহ”

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুছা কলিমুল্লাহ” ইত্যাদি।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” ইহা অবিচল এই অংশের ভাবধারা কি সে বিষয়ে জ্ঞাত করি।

বাক্যটিকে পৃথক করে বসানো হয় (ইহা আধ্যাত্মিক)।

লা + ইলাহা + ইল্লা + আল্লাহ্ + হু

অর্থ : নাই + উপাস্য + ব্যতীত + আল্লাহ্ + সে

প্রশ্ন থাকে ৫টি ভাগে কেন ? :- রসূল (সাঃ) (আঃ) এক চাদরে তিঁনি, আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান ও হুসায়েন একত্রে পরিবার ঘোষণা দিয়েছেন।

ইহা সুফি মতে পাক পাঞ্জাতন হিসাবে পরিচিত বা জ্ঞাত। এ জন্য জাতের মূল ধারা ৫ এর বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হইল। ধারাবাহিকভাবে যত নবী ও পয়গাম্বরগণ এসেছেন তাঁদের কলেমার মূল অংশ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” একই থাকে। এজন্য কলেমাকে ইসলামের জীবন বলি এবং কেতাব ও অন্যান্য গ্রন্থ সকল কিছুকে ইসলামের শরীর বলে লিখলাম তাই জীবন এবং শরীর একত্রিত করলে পূর্ণতা ঘটে। এই কলেমার অধিক গবেষণা প্রয়োজন। ধর্ম কলেমার অধিক যে বিভাজন ধর্ম মতে শুরু হয়েছে, ইহা

থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম জনতাকে আরও অধিক কলেমার উপর গবেষণার জন্য উদাত্ত আহ্বান রইল। মূলের ধারা সর্বদাই অক্ষুন্ন থাকে। যারা মূল বিষয় থেকে গাফেল শিখানো বুলি পাঠে ধর্মকে বুঝতে চেষ্টা করে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করে না এদের দ্বারাই শান্তির ধর্ম অশান্তিতে রূপ নিতে চলেছে।

প্রথম :- বিভাজনকৃত কলেমা অর্থ

লা - ইলাহা - ইল্লা - আল্লাহ্ - হু

অর্থঃ নাই - উপাস্য - ব্যতীত - আল্লাহ্ - সে।

দ্বিতীয় :- নামাজ-হাকিকী ও মেজাজীতব্য নির্ধারণকৃত

মাগরিব - আসর - যোহর - ফজর - এশা।

দায়েমী এবং অন্যান্য সালাত একান্তভাবে পীরের নিকটে জানতে হবে যা হাকিকী।

তৃতীয় :- ফেরেশতাগণ প্রসিদ্ধ

ইসরাফিল (আঃ), আযাজিল (আঃ), (ফেরেশতা নয়), মিকাঈল (আঃ) জিব্রাঈল (আঃ), আজরাইল (আঃ), হুকুম পালনে সদা কর্মে নিমগ্ন।

৪র্থ ঃ রাহা বা পথের নির্দেশ

মারেফাত, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, ওহেদানিয়াত।

এখানে পথ বলতে স্তর উঁচু নিচু। অর্জন বিষয়ে পরিজ্ঞাত হতে পারবে।

পঞ্চম ঃ জাতের চিহ্ন শরীরে

কান – চক্ষু – নাক – মুখ – আলজিহ্বা

ইহা জাতের বা মূলের ৫ ভাগে দেখানো হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ :- মোকাম

লাহুত – নাসুত – মুলকুত – জবরুত – হাহুত

জাতের মূল নিশানার সঙ্গে সমন্বয় করে মিল করলে বুঝতে সহজ হয়।

সপ্তম ঃ নফ্‌স

মুৎমায়িন্না – আম্মারা – লাউয়ামা – মুলহেমার – রহমানিয়া।

মানব-মানবীর – রূপান্তরিত অবস্থা বা আত্মিক – উন্নত অবস্থা।

অষ্টম ঃ আত্মা

ইনসানী – হাওয়ানী – নাবাদী – জামাদী – কুদ্মী।

কুদ্মীতে পৌঁছানো আত্মা পরম সম হয়ে থাকে।

নবম :- নফ্‌স ও আত্মার রং বা বর্ণ (Colour)

সবুজ – হলুদ – লাল – জরুদ – ছফেদ।

দশম :- রুহ যা স্বয়ং প্রভু

নাজেলকৃত – শক্তিশালী – ফুৎকার – নিক্ষেপ – ওহি

৫ ৩ ২ ২ ৫ *(ওহি, আদেশ, দাঁড়ানো, উরুজ, পাঠানো)*

কোরআন মতে গাণিতিক সংখ্যা উল্লেখ রইল।

মূলের বিষয়ে রুহ বিভাজন নয়।

এগার তম :- অজুদ বা রহস্যের ভাণ্ডার

ওহেদাল অজুদ – মোনকেনাল অজুদ – মোমতানাল অজুদ – আরেফেল অজুদ – ওরাউল ওরা অজুদ।

ইহা ব্যক্তিজন এর ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

বার তম :- ঈমান বা একিন এর স্তর

হাক্কোল একিন – বেলগায়েব একিন – এলমুল একিন – আয়নাল একিন – হুয়াল একিন।

ঈমানের স্তরভেদে নাম করণ হয়ে থাকে। অনুশীলন ব্যতীত জানা অসম্ভব।

তের তম :- আত্ম সমর্পন

ফানাফিল্লাহ – সফরদার ওয়াতেন – ফানাফিসসেখ – ফানাফিস রসুল – বাকা বিল্লাহ।

চৌদ্দ তম :- কলেমার নাম

কলেমা তামজিদ – কলেমা তৈয়ব – কলেমা শাহাদত – কলেমা তৌহিদ, ঈমানে মুফাজ্জাল।

পনের তম :- পাক পাঞ্জাতনের নাম

আলী (আঃ) – মা ফাতেমা (আঃ) – হাসান (আঃ) – হোসাইন (আঃ) – রসূল (সাঃ) (আঃ)।

ষোল তম :- বিভাজনকৃত কলেমা অর্থ

ছিররী – রুহী – কালবী – জলী – খফী।

উপরোক্ত বিন্যাস গত ভাবধারা প্রতিটি ভাগে মিল করলে বুঝতে সহজ হবে। মহানবী (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেছেন, "কলেমা তাহকিক ব্যতীত পাঠ করলে ফাসেক হইবে।" তাই তাহকিক কি এটা বুঝতে হলে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী গুনী, ওলি পীর ফকিরদের কাছ থেকে জানতে হবে। নিজে পীরের অনুসারী তাই লিখনীতে পীরের কাছে জানতে নির্দেশনা রাখি।

পরিশেষে প্রবিত্র কলেমাতে সবাই পূর্ণতার অবগাহনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে চেষ্টা করিবেন এটাই প্রত্যাশা। থাকবেনা ধর্মের কোন দলাদলি, আর বিভাজন প্রক্রিয়া। সবাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মূল ধারা এক সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়ে তাঁরই সান্নিধ্যে মিলন মেলার বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হব।

আসামানী কিতাব ১০৪ খানার পূর্ণ বিবরণ

আসামানী কিতাব মোট (১০৪) একশত চার খানা। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ (৪) চার খানা বাকী ১০০ খানা পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিলকৃত কেতাবকে সহিফা বলা হয়।

১০৪ খানা কিতাবের পূর্ণ বিবরণ :-

- হযরত আদম (আঃ) এর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়।
- হযরত শিষ (আঃ) এর উপর ৫০ খানা সহিফা নাজিল হয়।
- হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর উপর ৩০ খানা সহিফা নাজিল হয়।
- হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়।

প্রসিদ্ধ কিতাব ৪ খানা

- হযরত মুসা (আঃ) এর উপর ১ খানা তাওরাত কিতাব নাজিল হয়।
- হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর ১ খানা জাবুর কিতাব নাজিল হয়।
- হযরত ইশা (আঃ) এর উপর ১ খানা ইঞ্জিল কিতাব নাজিল হয়।
- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) এর উপর ১ খানা কোরআনুল মাজিদ নাজিল হয়।

বিশেষ কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ রইল যেমন :-

- হযরত নুহ (আঃ) এর উপর কেতাব নাই কিন্তু বোনকে বিবাহ নিষিদ্ধ তখন থেকে।
- আদম (আঃ) থেকে পশুকুল সৃষ্টি।
- ইদ্রিস (আঃ) থেকে লেখা-পড়া বস্ত্র পরিধান ব্যবস্থা শুরু।
- ইব্রাহীম (আঃ) থেকে খাৎনা, ইজার পিন্ধা ও রুটি খাওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলোর উৎপত্তি।

এখন কথা হলো অনেক কিছু সমন্বয় হয়ে থাকলে তার শ্রেষ্টতা নিরূপন হয়। এভাবেই প্রসিদ্ধ নিরূপন। কারণ হলো মূল স্বত্বা এক হইতে প্রকাশ আর বিকাশ, কলেমা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটু ধারণা লিখনীতে উল্লেখ রইল।

সুরা ফাতিহার আলোকে কিছু কথা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।

অর্থ :- আল্লাহর নামে শুরু, (আর-রহ্‌মান) যিনি দয়াল দাতা

এবং (আর-রহিম) যিনি দয়ালু।

১) আল্‌ হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

অর্থ :- সকল প্রসংশা সেই মহান রব্বুল আলামিনের যিনি মৌন জগতের রব।

২) আর-রহ্‌মানির রহিম।

অর্থ :- তিঁনি পরম দয়ালদাতা এবং তিঁনি দয়ালু।

৩) মালেকে ইয়াওমিদ্দিন।

অর্থ :- তিঁনি বিচার দিবসের মালিক (ধর্মের কালের রাজা) ।

৪) ইয়্যাকানাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন।

অর্থ :- আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি

এবং তোমারই (মাস্তানী) সাহায্য চাই।

৫) ইহ্‌দিনাস সেরাতাল্‌ মুস্তাকিম।

অর্থ :- আমাদেরকে দান কর সঠিক পথ (সেরাতাল মুস্তাকিম)।

৬) সেরাতাল্লাজিনা আন্‌আমতা আলাইহিম ।

অর্থ :- তাঁহাদের পথ যাহাদের উপর তোমার নিয়ামত দান (প্রাপ্ত) করা হইয়াছে।

৭) গাইরিল মাগ্‌দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্‌ দোয়াল্লীন।

অর্থ :- যাহারা তোমার নিকট পথভ্রষ্ঠ নয় এবং বিপথগামীও নহে।

শব্দ সংজ্ঞা :-

আল আমদ	=	প্রতিষ্ঠিত প্রসংশা বা বিশেষ প্রসংশা।
রব	=	লালন-পালনকারী।
আল-আলামিন	=	বিশেষ জগত সমূহ (মনোজগত সমূহ)।
রাব্বুল আলামিন	=	জ্ঞানীগণের রব।
আর-রহ্মান	=	দয়াল দাতা।
আর-রহিম	=	দয়ালু।
দ্বীন	=	ধর্ম।
নাস্তাঈন	=	মাস্তানী সাহায্য চাই (মাস্তান বা ঐশী প্রেমে দিওয়ানা বা মত্ত, প্রেম পাগল)
মুস্তাকিম	=	ধীরতা, সরলতা, দৃঢ়তা, শুদ্ধতাপ্রাপ্ত (মুস্তাকিম)।
সেরাতাল মুস্তাকিম	=	এক কথায় মমিন।

শুরুতেই বলে রাখি কোরআন বলছে :- "লা ইক্রাহা ফি দ্বীন" অর্থ হলো নাই কোন জবরদস্তি (বল প্রয়োগ) ধর্মে। তাহলে ধর্ম একটি পূর্ণ স্বাধীন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত, স্বীয় জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ ব্যবস্থা। এখানে এজন্য কেহ আল্লাহ্কে মানতেও পারে, নাও মানতে পারে। যদি সে আল্লাহ্কে না মানে তাহলে সে নাস্তিক অর্থাৎ আল্লাহ্ থেকে বিদূরিত একটি ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে পরিচালিত করে। কেন ? একটি মানব যখন দুনিয়াতে পদার্পন করে, দুনিয়াতে পদার্পন করবার পরে তার একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে সে যা কিছু করবে তার উপর তার বিচার ব্যবস্থা বা পরকালীন পাথেয় নির্ধারিত থাকে। অর্থ হলো এমন যে, সে যদি আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে পুরষ্কার লাভ করবে, আর আল্লাহ্র নির্দেশ যদি সে অমান্য করে তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তিতে সমাসীন হবে। তাহলে দুইটা জিনিস, কেন ? তাহলে এই মানবকে দুনিয়াতে যে সময়টা দেওয়া হয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এই সময়ের স্বাধীনতা আল্লাহ্ নিশ্চিত করেছে। যদি এই স্বাধীনতা না থাকে তাহলে বিচার ব্যবস্থা আর থাকে না, কেন ?

দুনিয়াতে বিচার ব্যবস্থা তো হয়েই গেল। এজন্য আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে স্বীয় স্বাধীন সত্ত্বার উপর ছেড়ে দিয়েছে আর তাঁর নির্দেশ বাক্য দিয়েছে, যদি সে প্রভুর নির্দেশ পালন করে তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে সে পুরষ্কার প্রাপ্ত হবে।

তো আরাফার ময়দানে ইমাম হুসায়েন (আঃ) যে ভাষণ দান করেছেন সেটাতে বলা হয়েছে যে, "নির্দিষ্ট প্রশংসা দাফন করবার কেহ নেই"। এই আয়াতে কালাম এজন্য শুরু করেছি যে, সূরা ফাতিহাতে বলা হলো যে :- "সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামিনের যিনি মৌন জগতের রব। এখন মৌন জগতের রবের যে প্রশংসা, আরাফার ময়দানে ইমাম হুসায়েন (আঃ) বর্ণনা করলেন যে, "নির্দিষ্ট প্রশংসা দাফন করবার কেহ নেই"। তাহলে এই নির্দিষ্ট বিষয়টা কি বা কেমন হতে পারে ? প্রথমেই বলা হলো আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত সৃষ্টি রাজ্যের যা কিছু আছে, জাত বলি, সেফাত বলি। জাত অর্থ মূল আর সেফাত অর্থ গুণ। এই দু'য়ের বিকাশময় ধারা হলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্তায়নকৃত জাড়নো একটি ব্যবস্থা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই নিজস্বতার গুণ দিয়ে সে পরিচালিত হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণেই সে গুণান্বিত এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতাতেই সে ক্ষমতা প্রাপ্ত। যদিও আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা এভাবে বলেছেন যে, একটি ধূলিকণাও যদি পৃথক করা হয়, আল্লাহ্ সত্ত্বার গুণ থেকে আলাদা করা হয়, যদিও গুণবাচক বিষয় হলো পৃথকীকরণ একটি ব্যবস্থা। তো আল্লাহ্ সত্ত্বার গুণকে যদি পৃথক করা হয় তাহলে এমন দাঁড়ায় যে, একটি ধূলিকণা বলবে যে, আল্লাহ্ আমার মত আমি, তোমার সঙ্গে আমার কোন সংযোগ নেই, তোমার কর্তৃত্ত্বের অনুকরণ-অনুসরণ ব্যবস্থার দিকে আমি ধাবিত হবো না। কারণ আমি আমার মত, তুমি যত বড় হও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, আমি ধূলিকণা আমি আমার মত গুণবাচক ব্যবস্থা নিয়ে আমি আমার মত পৃথক থাকবো। তাহলে সৃষ্টি রাজ্যের সকল কিছুর মালিক যে আল্লাহ্, এই অর্থের থেকে বিভাজনকৃত ব্যবস্থার দিকে পরিগণিত হয়। এজন্য বলা হয়েছে :- "আলহামদু" অর্থ সকল কিছু। তাঁর সৃষ্টি রাজ্য থেকে শুরু করে তার বাহিরে এবং তার ভিতরে আরও যদি কোন কিছু থেকে থাকে!

সকল কিছু একত্রিতকরণ করে একটি শব্দকে সমন্বয় সাধন করছে কোরআনুল মাজিদ। অর্থ হলো "আলহামদু" অর্থাৎ সকল কিছু একত্রিত সমন্বয় সাধনকে এখানে বোঝানো হয়েছে। কোন কিছুই পৃথক নেই, তাহলে পৃথক কি ?

এখন ভাববাদীতে গবেষণালব্ধ থিসিস বা কালচার করে, তাদের এই কালচার হলো এমন যে, "সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি মৌন জগতের রব। অর্থাৎ এই মানুষের মনকে এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সে স্রষ্টামুখীও হতে পারে আবার স্রষ্টা থেকে বিভাজনকৃত ব্যবস্থার মধ্যেও সে পরিগণিত হতে পারে। তাই এই পরিগণিত ব্যবস্থার জন্য যখন মানুষ দ্বীন থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন একটি হাদিসে রয়েছে যে, "এলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম বা মুসলমানের উপর ফরজ"। এখন এলম শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান এবং দ্বীন শব্দের অর্থ হলো ধর্ম। তাহলে ধর্মের জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রতিটি মানুষের জন্য নির্দেশনামা জারী করা হয়েছে, এটা রসূলপাক (সাঃ) (আঃ)-এর হাদিস। তাহলে এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে আমরা চিরচারিত যে ব্যবস্থায়ন জন্ম লাভের পর থেকে দেখে আসছি সেটা দুইটি অবস্থার উপর, এক হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিগণিত হচ্ছে এবং আমরা যে পথের অনুসারী, এটাকে যদিও ফকিরি বলি, এটা হলো একটি মানুষ তার দেহ কাঠামোর মধ্যে পূর্ণ চৈতন্যের একটি লব্ধ জ্ঞান, যাকে এলমে লাদুনীর জ্ঞান হাসিলের জন্য অনুশীলন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়। কারণ, কারণ হলো এই ব্যবস্থাটা এসেছে যুগে-যুগে, কালে-কালে যত নবী-রসূলগণ বা ধর্মের অবতার মহাপুরুষগণ দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন সবাই এলমে লাদুনীর জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হবার পরে মানুষকে সুশিক্ষা দান করেছেন। কারণ তাদের সময়ে এরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা জারীয়া ছিল না। তাহলে মূল শিক্ষাকে, যারা এই সমস্ত পথের অনুসারী হয়, তারা এই মূলকে লাভ করবার জন্য মূলের ধারাতে পরিগমন হবার জন্য সুশৃঙ্খল একটি নীতিতে একটি মানবের কাছে আত্মসমর্পণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিগণিত হয়ে এই ধারার জ্ঞানকে হাসিল করে বা এই শিক্ষায় সুশিক্ষা লাভ করে। এই বিষয়ে হাবীব বর্ণনা করলেন যে :- "আমি তোমাদের জন্য দুইটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি, এক হলো কিতাবাল্লাহি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত কিতাব কোরআনুল মাজিদকে নির্দেশ করা হয়েছে) আর দুই হলো আহলে বায়াত। তাই এই আহলে বায়াত হলো আরেকটি স্তর। তাহলে আহলে বায়াতকৃত ব্যবস্থা প্রতিটি

মানুষের জন্য। রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর এই হাদিসখানা যদি অবলোকন করি, এই হাদিসখানাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য অনেক কৌশল এবং অনেক চক্রান্ত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা এই হাদিসখানা পেয়ে থাকি, এখানে ভাববাদী বাদ দিলে এরকম পাওয়া যায় যে, দুইটি জিনিসের নির্দেশ করছে, এক হলো কিতাবাল্লাহি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোরআন কিতাব আর দুই হলো আহলে সুন্নত। তাহলে সুন্নত আর হলো আহলে বায়াত, রূপান্তর হয়ে গেল।

এখন কথা হলো রূপান্তরবাদে আমরা যেটাই পেয়ে থাকি, প্রথমে যেহেতু কিতাবাল্লাহি অর্থাৎ কোরআনকে তো সবাই স্বীকৃতি সনদ হিসাবে মেনে নিয়েছি, তাহলে পবিত্র কোরআনুল মাজিদে এই আহলে বায়াতের যে অনুসারী হতে হবে বা অছিলা অন্বেষণ করতে হবে, এই ধরনের নির্দেশনামা যে সকল আয়াতে কারিমাতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলে সেগুলো থেকে এই প্রচলিত অনুবাদ উল্টা-পাল্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন ? এই আহলে বায়াতকে স্বীকৃতি দিলে আর মূল ধারার এই ব্যবস্থায়নের বিরোধিতা করা যায় না। এই অপকৌশল থেকে মানুষকে বিদূরিত করবার জন্য যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টা সৃষ্টির শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত ইহা বেগবান ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। শুধুমাত্র যারা প্রকৃত আহলে বায়াতের অনুসারী হবার পর এই এলমে লাদুনী জ্ঞান হাসিল করতে পেরেছে, তাঁদের কাছে এই ধোঁয়া আর কুয়াশা থাকে না। কারণ তাঁহারা পরিষ্কার একটি ব্যবস্থায়ন জারী করে ইহার দর্শনবাদকে হাসিল করে এর ফায়সালাটা উদ্ধার করতে পারে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) থেকে প্রদত্ত খেলাফতি যে মসনদ, সেটা মওলা আলী (আঃ)-এর উপর অর্পণ করা হয়। এই অর্পণকৃত ব্যবস্থায় ঈদে গাদিরে খুম হিসাবে স্বীকৃতি সনদ পেয়েছে। পবিত্র কোরআনুল মাজিদে সর্বশেষ নাজেলকৃত দুইটি আয়াত হলো সূরা মায়েদার (৬৭ নং) এবং (৪ নং) এই কালাম দ্বারা প্রমাণ বা সত্যায়িত ব্যবস্থা জারী হয়েছে। ইহা কোরআনুল মাজিদের সর্বশেষ নাজেলকৃত আয়াত। আর এই আয়াতেই রসূল (সাঃ) (আঃ) থেকে যেহেতু কোরআনুল মাজিদের আয়াত নাজেল হয়েছে সেই সময়, এজন্য আমি বলে থাকি যে আল্লাহ্ এবং রসূল প্রণীত খেলাফতি ব্যবস্থা হলো মওলা আলী (আঃ)-এর উপর অর্পণ করা হলো। এটা সম্পর্কে বিস্তারিত

জানতে হলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিতশী (আঃ) রচিত “মওলার অভিষেক ও ইসলাম ধর্মের মতভেদের কারণ” এই পুস্তকটিতে বিস্তারিত দেখতে পারেন। তাহলে এভাবে বেলায়েতকৃত ব্যবস্থা জারী হলো। বেশির ভাগ নবী-রসূলগণ দুনিয়াতে থেকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের পর বিদায় হবার পূর্বে এই খেলাফতি ব্যবস্থাগুলো একজনের উপর অর্পণ করে তিঁনি দুনিয়া থেকে পর্দা গ্রহণ করেন। তাই যেহেতু মহানবী (সাঃ) (আঃ) খাতামুন নবুয়্যত বা তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না তাই এই আহলে বায়াতকৃত ব্যবস্থাকে তরান্বিত করতে মওলা আলী (আঃ)-এর উপর এই ভার অর্পণ করা হয় এবং এই অর্পনের সময় উক্ত মজলিসে সোয়ালক্ষ সাহাবা মওলা আলী (আঃ)-এর কাছে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর উপস্থিতিতে আবার নতুন করে মুরিদ হন। এই মুরিদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) দেখিয়ে গেলেন। এই ব্যবস্থাটাকে ভূলণ্ঠিত করবার জন্য উমাইয়া, আব্বাসীয়াদের যে মতাদর্শের অনুবাদ, তাফসীরের কোরআন, হাদিস, জয়ী, ছয়ী বিভিন্ন রকম ফেকরাবাজীতে আজকে ধর্মের দল আর গোত্রে শুধু বিভাজনকৃত ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মকে খন্ড-খন্ড করে রূপান্তর করা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আহলে বায়াত হলো মূল ধারার একটি অনুপ্রাণিত ব্যবস্থা।

আজকে বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর স্মরণীয়তব্য করে রাখার জন্য যে আনুষ্ঠানিকতা, এটা ঢাকবার জন্য বিভিন্ন অপকৌশলের হাদিস প্রণীত হয়েছে এবং বর্ণনা হয়েছে যার মূলধারা হলো, যেন বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর শাহাদতে কারবালা মানুষের কাছে স্মরণীয় না হয়ে থাকে। ইহা ভূলুণ্ঠিত করবার জন্য বহু জয়ী হাদিস রচিত হয়ে সেটাকে সহি হাদিস হিসাবে পরিচালিত করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যেমন :- একটি হাদিসে জেনে থাকবেন যে বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ)-এর তওবা কবুল হয়েছিল এই ১০ই মহররম। জাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার জ্ঞান যদি আপনার মধ্যে থেকে থাকে (লাদুনীর জ্ঞান যদি নাও থাকে) তাহলে একটু বিচারিক জ্ঞান দ্বারা ভাবুন না! আমি একটু ধরিয়ে দেই সেটা হলো এমন যে, বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) অন্য কেউ অর্থাৎ হাবিল ও কাবিলের জন্মই হয় নি, তাঁরা জান্নাতে ভুল করবার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়, ইহা ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ প্রায় সবাই জানেন। তাহলে সেখানে কে ছিল বা কে লিখে রেখেছিল

যে সেই দিবসটি ১০ই মহররম ? কারণ আরবি মাসের গণনা শুরু হয়েছে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর হিজরত কালীন অবস্থা থেকে। অর্থাৎ হিজরী সন প্রবর্তিত হয়েছে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর হিজরত কালীন সন থেকে। ইহার পূর্বে তো আরবি সনের রচনাই হয় নি, তাহলে মহররম কোথা থেকে আসে ? বুঝতে পারছেন তো ? তাহলে এটা কেন ? বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ)-এর তওবা কবুল হলে এটা খুশির ঘটনার প্রকাশ ঘটে যায়। তাহলে এই মানব মন্ডলী বা মসলিমগণ যেন কারবালাকে অনুসরণ করে সেই মূলধারার অবয়বকে তাদের মনে প্রাণে লালন করতে না পারে, ইহাকে ভূলণ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে এই হাদিসখানা রচিত। আরও শুনে থাকবেন আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন এই ১০ই মহররম। তাহলে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হলো হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) এবং তাঁর হিযরত কালীন সময় থেকে আরবি সনের গণনা শুরু হয়েছিল, তাহলে আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন কে লিখে রেখেছিল বা গণনা কে করেছিল ? যখন হিজরী সনের প্রবর্তনই হয় নি। কি ধোঁকা আর কুয়াশা ? কেন ? আড়াই হাজার নবীর জন্মদিন আর সেখানে কেবল এক ইমাম হুসায়েন পোড়াকপাইল্যা কারবালার প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেছে, তাঁকে স্মরণের কি প্রয়োজন ? এত বড় বড় খুশির আনন্দ থাকেতে ? কারণ হলো জন্মদিনের আনুষ্ঠানিকতায় সবাই আনন্দ উপভোগ করে, না কি বেদনায় অশ্রু ফেলে ? কারণ জন্মদিনে সবাই স্বভাবত আনন্দই করে। তাহলে ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর এই বেদনাদায়ক ঘটনাকে ভূলন্ঠিত বা ঢেকে দেবার অপকৌশল। নূহ নবীর কিস্তি জুটি পর্বতে ভিড়ে ছিল এই ১০ই মহরম। তখনও কিন্তু আরবি মাসের গণনা চালু বা শুরু হয় নি।

ইউনুস (আঃ)-কে মাছের পেট থেকে মুক্ত বা বাহির হয়ে পুনরায় স্থলে প্রেরণ করা হলো, এটাও এই ১০ই মহরম। এভাবে বিভিন্ন অপকৌশল আর চক্রান্তের মাধ্যমে এই ১০ই মহরমকে মানবমন্ডলীর মস্তিষ্ক থেকে বা এই ধারাকে ভূলুণ্ঠিত করবার অনেক অপচেষ্টা উমাইয়া-আব্বাসীয়রা করে গেছে। কিন্তু ইমাম হুসায়েন (আঃ) তাঁর আরাফার ময়দানে যে ভাষণ শুরু করেছিলেন সেখানে তিঁনি বর্ণনা করেছেন :- “নির্দিষ্ট প্রশংসা দাফন করবার কেহ নেই”। তাহলে নির্দিষ্ট প্রশংসা কি ? একমাত্র যদি কোন মানব আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দুনিয়াতে কার্য করে তাহলে তাঁর সহায়, তাঁর উদ্ধারকৃত ব্যবস্থা, তাঁর মূলের কার্যের পরিগমনকৃত যে ভাবধরা, সেটা আল্লাহ্ স্বীকৃতি সনদ হয়ে থাকবে। তাই

আল্লাহ্ যার হেফাজতনামা বহন করে, সেটা কখনও ভূলুণ্ঠিত হয় না। এজন্য বাবা হুসায়েন (আঃ) বর্ণনা করেছেন :- "নির্দিষ্ট প্রশংসা দাফন করবার কেহ নেই"। আমি বাবা হুসায়েন (আঃ)-এর আরাফার ময়দানের শেষের দিকের কিছু বাণীর কয়েকটি অংশ পাঠক বাবা-মায়েদেরকে একটু বিস্তারিত বলবো। কারণ এই বেদনাদায়ক ঘটনা প্রবাহ প্রায় কমবেশি সবাই জেনে থাকবেন।

কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসায়েন (আঃ) যখন তাবু গাড়ে, এরপর ইয়াজিদের সৈন্য বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে অর্থাৎ এক কথায় গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর বহরে বা দলে ছিল মোট মাত্র ৭৪ জন সদস্য। অর্থাৎ বাবা হুসায়েন (আঃ)-এর বহরে যত আওলাদগণ ১২ ইমাম ১৪ মাসুমসহ, সোহদানে কারবালায় ৭৪ জন সবাই শহীদ হন ও শাহাদত বরণ করেন। কোলের শিশু থেকে শুরু করে সবাই, আর বাকী দুইশ'র অধিক তাদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। এভাবে মূলধারার ধর্মীয় গ্রন্থ্ শেষ হয়ে গেল। সর্বশেষ যখন ইমাম হুসায়েন (আঃ) কোন ভাবেই যুদ্ধে রাজী হয় না কিন্তু তারাও ছেড়ে দেয় না। এমন একটি পর্যায়ে যুদ্ধ বা তাঁদের তাবু থেকে যখন অন্যান্য সদস্যদের কাফেলা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আর যুদ্ধের বিকল্প থাকে না।

এই যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ইমাম হুসায়েন (আঃ) ইয়াজিদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে :- "তোমাদের মধ্যে কি একজনও মুসলমান নেই ? কারণ ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর দলে ছিল মাত্র ৩০৯ জন আর ইয়াজিদের বাহিনীর দলে ছিল ২২ হাজার সৈন্য। বড় বিস্ময় হলো এই ২২ হাজার কিন্তু কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বা অন্য কোন ধর্মের বা জাতির নয়, সবাই মুসলিম। ইয়াজিদের তাবুতেও আজান হয়, নামাজ হয়। আবার হুসায়েন (আঃ)-এর তাবুতেও আজান হয়, নামাজ হয়। তাহলে বাবা হুসায়েন (আঃ) বর্ণনা করলেন যে :- "তোমাদের মধ্যে কি একজনও মুসলমান নেই ? তোমরা কাল বিচার দিবসে আল্লাহ্র কাছে কি জবাব দিবে ? কেন, কি উদ্দেশ্যে তোমরা আমাকে কতল করতে চাও ? সবাই মাথা নিচু করে ছিল। তাহলে মুসলমান কি ? মুসলিমের আদর্শটা কি ? ইহাই বাবা হুসায়েন (আঃ) এই কারবালার প্রান্তরে জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেলেন যে, সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যটুকু এমন হয়। আসল মুসলিম হলে এমন হবে, তাঁর আদর্শ এই মূলধারার ভাবধারাতে এভাবে সে নিজের জীবনটা জলাঞ্জলি দিয়ে প্রামাণ

করে যাবে। আসলের কর্তৃত্ব এভাবে থাকবে আর যারা নকল মুসলিম তারা ঐ ভাবে থাকবে।

ইবনে জিয়াদ যিনি এই ২২ হাজার সোলজারের সেনাপতির মূল দায়িত্ব বহন করছিল। তো বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ)-কে কতল করতে যখন বিঘ্নতা ঘটে, তখন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে। ইবেন জিয়াদ বলেন "তোমরা তারাতারি মাথা কেঁটে নিয়ে আসো, আসরের নামাজের সময় চলে যাচ্ছে"। তারা কোন ধরনের নামাজী ? তাই প্রকৃত নামাজকে অনুশীলন করতে হলে বাবা হুসায়েন (আঃ)-এর আদর্শে নিজেকে দন্ডায়মান কর। সালাত বা নামাজ বিষয়ে আল্লাহ্পাক কোরআনে বর্ণনা করছে যে, :- "নিশ্চয় নামাজ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। তুমি যদি মন্দ থেকে দূরীভূত না হও, তাহলে তোমার নামাজ কোন ফলে আসে না। তাই যারা এরকম এলমে লাদুনী প্রাপ্ত বা যারা মূল ধারার অনুসারী হয়, তাঁদের কাছে এই ধোঁকা চলে না।

সত্য সবসময় প্রজ্জ্বলনকৃত হয়ে থাকে, সত্যের উদ্ভাসন হবেই হবে, সত্য কখনও ভূলুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু সত্য উদ্ভাসন করতে কষ্ট যন্ত্রণা থাকে। তাই যারা কষ্টকে লালন করেছে তাদের কষ্ট আর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিনানিপাত চলমান। সেই ধারাতেই সফলতার জাগরণ ঘটেছে। এভাবে বাবা হুসায়েন (আঃ) আসল আর নকলের পার্থক্যটুকু দেখিয়ে গেলেন। কার্য যখন সম্পন্ন হলো, তাঁর মাথা থেকে দেহ পৃথক করা হয়ে গেল, তখন ইয়াজিদ বাহিনীর ৩৬০ জন আলেম ফতুয়া দিয়েছিল যে, ইমাম হুসায়েন (আঃ)-কে কতল করা উত্তম হয়েছে। পাঠক বাবা-মায়েরা, ধর্ম কোথায় থাকে ? কি থেকে ধর্মের রূপান্তরিত হয় ? তো শাহাদতে কারবালা থেকে যদি ৩৬০ জন আলেমের বয়ানে ইমাম হুসায়েন (আঃ)-কে কতল করা উত্তম হয়, সেই ইয়াজিদ প্রণীত জীবন বিধান মুসলিম সমাজে এখনও বিলুপ্ত হয় নি, এটা উক্ত সমাজের মাঝে এখনও প্রজ্জ্বলন হয়ে আছে। তাই এটাকে ধরতে হলে আর জানতে হলে হুসায়েনী (আঃ)-এর আদর্শের উপর নিজেকে দন্ডায়মান করতে হবে। যেখানে রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন যে :- "হুসায়েন মিন্নি, ওয়া আনা মিনাল হুসায়েন" অর্থ "হুসায়েন আমা হতে আর আমি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} হুসায়েন হতে", হুসায়েন (আঃ) সম্পর্কে রসূলের (সাঃ) (আঃ) এমন

বয়ান। রসূল (সাঃ) (আঃ) থেকে হুসায়েন, জাতের মূল ধারার পাঁচ জন দেহধারী নূরময় মহামানব, আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ), মওলা আলী (আঃ), মা ফাতেমা (আঃ), বাবা হাসান (আঃ) ও বাবা হুসায়েন (আঃ) এই পাঁচ জনকে পাক পাঞ্জাতন বলা হয়, ধর্মের মূল খুঁটি বলা হয়। রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন যে :- "হুসায়েন মিন্নি, ওয়া আনা মিনাল হুসায়েন" অর্থ "হুসায়েন আমা হতে আর আমি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} হুসায়েন হতে"। রসূল (সাঃ) (আঃ) হতে হুসায়েন এটা সহজেই অনুমেয় বা সবার সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায়, ইহাতে কোন ব্যতিক্রম হয় না যে আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) (আঃ) তাঁর দৌহিত্র হিসাবে হুসায়েন (আঃ)-এর আবির্ভাব বা আগমন ঘটেছিল। কিন্তু হুসায়েন (আঃ) থেকে রসূল (সাঃ) (আঃ) এই কথাটি বুঝতে হলে ভাববাদী বা আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা ব্যতীত বুঝা সম্ভব নয়, পাঠক বাবা-মায়েরা সাধরণ জাগতিক ভাবে কি বুঝা যাবে ? কারণ জাগতিক ভাবে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আগমন হুসায়েন (আঃ)-এর পূর্বে এবং হুসায়েন (আঃ) রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর পরে আবির্ভাব ঘটেছে। তাহলে এখানে জন্মান্তরবাদ এসে যায়।

এই কথা বুঝবার জন্য আমরা সাউথ এশিয়ান সাব কন্টোনেন্ট বলে থাকি যে, দক্ষিণ এশিয়ার যে ধর্মের প্রবর্তক তিঁনি হলেন, হাজা হাবীবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ) অর্থাৎ তিঁনি হুসায়েনী বংশ থেকে এসেছেন। খাজা বাবা বলেছেন যে :- "আমি গঞ্জে মুকফির পর্দা উত্তোলন করে দেখতে পেলাম যে, রসূল (সাঃ) (আঃ) থেকে হুসায়েন আরও এক ধাপ উপরে"। তাই খাজা বাবার এই কথাটি শুনলে উপলব্ধি করতাম যে, রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর এই বাণীটির স্বার্থকতা, নইলে এটা বুঝিনা বলে চুপ থাকতাম। তাহলে খাজা বাবা গঞ্জে মুখফির পর্দা উত্তোলন করে দেখতে পেলেন যে, রসূল (সাঃ) (আঃ) থেকে হুসায়েন (আঃ) আরও এক ধাপ উপরে, তাহলে এই হাদিসখানা বুঝা সম্ভব। খাজা বাবা আরও বর্ণনা করেছেন :- "কারবালার প্রান্তরে আমি মঈনউদ্দিন যদি আঙ্গুলের একটি ইশারা করতাম, তাহলে পানির নহর বয়ে যেত"।

যারা অজ্ঞ এবং মূর্খ্য তারা মনে করে যে, কারবালার প্রান্তরে পানির জন্য ছটফট করেছে, কিন্তু না। বাবা হুসায়েন (আঃ) সত্য আর মিথ্যার প্রভেদটাকে উঁচু করে ধরে রাখবার

জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাহলে খাজা বাবা আরও বর্ণনা করেছেন যে :- "কারবালার প্রান্তরে আমি মঈনউদ্দিন যদি আঙ্গুলের একটি ইশারা করতাম, তাহলে পানির নহর বয়ে যেত"। এটা খাজা বাবার বাণীতে রয়েছে। তাহলে খাজা বাবা উক্ত সময়ে সেদিন ওখানে ছিল এটা পরিষ্কার তাঁর কথাতে বুঝা যায়, পাঠক বাবা-মায়েরা বুঝতে পারছেন তো ? এভাবে আধ্যাত্মিকতার সৃজন হয়। প্রতিনিধির থেকে প্রতিনিধির সমর্পণ জ্ঞাপনকৃত ব্যবস্থা জারী হয়। তাই ১২ ইমাম, ১৪ মাসুম, সোহদানে কারবালায় সবার জীবন চলে গেছে। ইয়াজিদের কাছে শুধু যদি তার নির্দেশনামাটুকু মেনে নিত, তাহলে আর কিছু লাগত না (সান-সৌকত, জালুয়াতে খুব সুন্দরভাবে থাকতে পারতেন)। কিন্তু শুধু নিজের জীবন দেন নি, তাঁর ঔরসজাত যত আওলাদগণ ছিলেন, সবাইকে তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, এমন ধারাবাহিকতায়ও এই মিথ্যার কাছে সত্যের কখনও পরাভূত হয় নি। সব যদি চলেও যায় তবুও এই ইয়াজিদের কাছে আত্মসমর্পণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এটাই দেখিয়ে গেলেন। এইভাবে সত্য আর মিথ্যার তফাৎ হয়ে থাকে। তাই আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন হলে এমন হয়। তাই সত্যের প্রজ্জলনকৃত শিখা যদি কারও মধ্যে এই হুসায়েনী (আঃ) আদর্শ প্রচলিত ব্যবস্থায় জাগরণকৃত না হয়, তাহলে প্রকৃত মুসলমান নির্দিষ্ট ফেকরাবাজীর চক্করে পড়ে ঈমানহারা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। কারণ আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেছেন :- "আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ ফেকরায় বিভাজন হবে, তার মধ্যে ৭২ ফেকরাই হবে জাহান্নামী আর একমাত্র ফেকরা থাকবে আমার অনুসারী "। তাহলে সেটা কোন দল ? প্রত্যেকেই প্রতিটি দলের যারা নেতৃত্ত্ব স্থানে বা ইমামগণ রয়েছে সবাই দাবী করে আমরাই সঠিক। তাহলে পরকালীন জিন্দিগির জন্যই তো ধর্ম পালন করা, তাহলে সেই ধর্মের অনুপ্রাণীত ব্যবস্থার সত্যায়িত একটি ব্যবস্থা পত্র যদি দুনিয়ার জিন্দিগি থেকে জেনে না যাওয়া যায়, তাহলে কোথায় পাবেন ? এখন ৭২ জন প্রত্যেকটি দলের ইমাম নিযুক্ত করে যদি দাঁড় করানো হয়, আমার আর আপনার যে সীমিত একটি গন্ডির জ্ঞান, এই জ্ঞান দ্বারা তাদের কাছ থেকে সত্য ধর্ম কিভাবে আদায় করব ?

তাই যে রাস্তার অনুশীলন করি, এই রাস্তাতে সকল কিছুর অবয়ব যদি নাও হয়, একটু ধোঁয়া আকারেও যদি অদৃশ্যবাদের কিছু দেখা যায়, তাহলে মনে করি যে এখানে আগুনের প্রজ্জ্বলনকৃত ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেখান থেকেই ধোঁয়ার উদয় হয়। আগুন ছাড়া

ধোঁয়া হয় না। তাই এই ধোঁয়াও যদি কেউ একটু দেখতে পারেন, তাহলে এই দুনিয়া থেকে ফায়সালাটুকু হয়ে গেল যে, আপনি সত্য পথে আছেন। তাই এই অনুপ্রাণীত ব্যবস্থার দিকে নিয়োজিত হউন। আর তা যদি না হন, দুনিয়ার সীমিত ভোগ-লালসা আর এই সম্পদের যে মোহে পড়ে আমরা নিজেদেরকে এই ধর্মের মূল চালিকা শক্তি বা ধর্মের নির্দেশনামা বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সকল প্রতিনিধিগণ এসেছেন তাঁরা মূল ধারার এই শিক্ষাটুকুই দিয়ে গিয়েছেন যে, ধর্মের প্রতি নিজেদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গিত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়েই প্রকৃত আল্লাহ্‌র অন্বেষণ করতে হয়। আর আমরা এই দুনিয়াদারীর সকল কিছু ঠিক রেখে নিজের স্বার্থ থেকে শুরু করে ভোগ-লালসা চরিতার্থ করে ধর্মকে ঠিক রাখি। তাহলে তাঁদের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের কোন মিল হয় না। আজকে দেখবেন একটু খেয়াল করলে, সেটা হলো রসূল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত ধর্মীয় ব্যবস্থা যখন প্রচারতব্যের দিকে তিঁনি পরিচালিত করলেন, তখন তাঁকে সবাই নাজেহাল করেছিল। তাই এই ওলিত্ত্বের ধারায় বা মূল ধারার কথা, কার্যক্রম ধর্মের বিষয়েই। তো এই ধর্মের বিষয়ে যখন মানুষকে সুশিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, তখনই তিঁনি নাজেহাল হচ্ছেন। তাহলে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর মূলধারার আদর্শের সঙ্গে এখনও কনোস্ট্যান্ট নীতিতে আছে। আর যারা ইয়াজীদি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তারা সম্মান, শ্রদ্ধা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে উন্নত হচ্ছে, তাদের কোন বন্ধন নেই। তাহলে এটাও বুঝবেন সত্য-মিথ্যার একটি প্রভেদকৃত ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে চালু রয়েছে। একটু বিস্তারিত ভাবেই আলোচনাটুকু আপনাদের মাঝে রাখি সেটা এমন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) ২৫ বছর জিন্দিগি পর্যন্ত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত এগুলো ছিল না। তাহলে তাঁর আদর্শের মধ্যে কি ছিল ? একমাত্র আমল নীতি ছিল, সেটা হলো নিজেকে আলামিন খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। অর্থাৎ সত্যবাদীতার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ২৫ বছর জিন্দিগির সময়কাল পর্যন্ত তিঁনি দ্বিতীয় কোন আমল নীতি দেখান নি। রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণীত উম্মত বলে যদি আমরা দাবি করি, তাহলে এই আদর্শ কি আমাদের না ? আমাদের কি সত্যবাদিতার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে না ?

তাহলে আমরা নিজেদের সন্তানদেরকে এই আদর্শের উপর অনুপ্রাণীত করি না। এটা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আদর্শ মনে রাখবেন, এই প্রথম আদর্শ আলামিন অর্থাৎ তিঁনি

বিশ্বাসীরও বিশ্বাসী। এই খেতাবে ভূষিত হবার পর ২৫ বছর বয়সে তিঁনি মা খাদিজাতুল কোবরাকে বিবাহ সম্পন্ন করলেন। এই বিবাহের পর তিঁনি জাবালে নূর পর্বত বা হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, আরবিতে বলা হয় মোরাকাবা মোশাহেদাতে লিপ্ত ছিলেন। তাফসীর কারকগণ লিখেছেন যে, মা খাদিজাতুল কোবরা জাবালে নূর পর্বতে রসূল পাকের (সাঃ) (আঃ)-এর খাদ্য পৌঁছানোর জন্য তার পা মুবারক এমন ব্যথা-বেদনা ও এমন ফুলাফুলে উঠেছে তবুও তিনি পিছু পা হন নি। স্বামীর এই কর্মকান্ডে কখনও বিঘ্নতা সৃষ্টি করেন নি। তাহলে জাবালে নূর পর্বত অর্থাৎ হেরা পর্বতের গুহায় তিঁনি ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে কি পেলেন ? তিঁনি সেখানে জিব্রাঈল আমিনের সাক্ষাত পেলেন এটা নগদ, এখানে বাকী ছিল না। নবুয়্যতি এই কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু প্রবির্তিত হয় জাবালে নূর পর্বত বা হেরা পর্বতের গুহায়, এটাও নগদ। এর সঙ্গে মহান আল্লাহ্পাকের সনদ হয় মোহাম্মদুর রসূল্লাল্লাহ সংযোজন হলে কলেমার পূর্ণতা হয়। তাহলে এই ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন তিঁনি সেখানে কিভাবে নিজের আত্মাকে উন্মেচিত করতে হয়, কিভাবে সত্যের উন্মেষ দর্শনবাদে জারীয়া হয় সেটার অনুশীলন করলেন। আজকের জামানায় আমরা যেখানে পরিচালিত হচ্ছি, সমাজ-সংসারে এরকম যদি কোন মানব তার আপন বিবিকে ছেড়ে এইভাবে আল্লাহ্র অন্বেষণে পরিগণিত হয়, তাহলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা কি মেনে নেবে ? ইহা আপনাদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা, এ সদুত্তর আপনারাই ভাল দিতে পারবেন। তাহলে এই মূলধারায় এভাবে সত্যের যখন প্রজ্জ্বলন হলো, এই প্রজ্জ্বলকৃত নবুয়্যতি ধারা নিয়ে যখন তিঁনি দ্বীনের দাওয়াতের জন্য বের হলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই জাহেলিয়াতের যুগে যারা তাঁকে আলামিন খেতাবে ভূষিত করেছিলেন, এই তারাই বর্ণনা করলেন যে দেখ, আব্দুল্লাহ্র বেটা মোহাম্মদ এতকাল পরে পাগল হলেন। পাঠক বাবা-মায়েরা বুঝতে পারছেন তো বিষয়টা এমন। তারপর কি হলো ? এই জ্বালা-যন্ত্রণা, লাঞ্চনা-বঞ্চনার প্রপাগান্ডা তাঁর উপর জারী হলো। তিঁনি বললেন যে, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল তোমরা কলেমা গ্রহণ কর, কেউ তো কলেমা গ্রহণ করলই না বরং উল্টো তাঁকে লাঞ্চনা-বঞ্চনা করতে থাকলো। স্বয়ং এই দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তায়েফের ময়দানে তাঁর দন্ত মুবারক আঘাতে শাহাদত বরণ করলেন, বুঝতে পারছেন তো সত্য বলতে গেলে এমন হয় ? তাই এই সত্যের প্রচার আর প্রসার হতে গেলে এমনই হচ্ছে। আজকের জামানায় যত

সালেক, মাজ্জুব থেকে শুরু করে পীর, আওলিয়া, বুজুর্গান যাঁরা এই মূলধারার একীন নিয়ে কার্য করছেন তাঁরাও এভাবে নাজেহাল হচ্ছেন। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিবেকের চৈতন্য দিয়ে অবলোকন করেন, তাহলে আপনারাও এর সদুত্তর নিজের কাছে পেয়ে যাবেন। তাই প্রকৃত আদর্শ মূলধারা কখনও ভূলণ্ঠিত হয় না আর ইহা পরিবর্তন হয় না। যুগের পরিবর্তনের সাথে আচার-আচরণ, আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু মূলের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই মূলধারা অনুশীলনকৃত ব্যবস্থা এভাবেই জারীয়া রয়েছে।

তাহলে নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর দুই নীতি বা দুইটি আমল নীতি ছিল, প্রথম হলো আলামিন বা সত্যবাদীতার রূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা (পাঠক বাবা মায়েরা ইহা দেখানো না, ইহা নিজেকে নিজের ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা)। দ্বিতীয় হলো নিজেকে চেনা। এই আমাকে চিনলে স্বয়ং আল্লাহ্কে চেনা হয়। এই অনুশীলন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি মানব পূর্ণতা পায়। এই পূর্ণতা পেলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ধর্মের শিক্ষা দেওয়া জন্য। এই নির্দেশনামা যাঁহারা পেয়েছেন, তাঁহারাই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষক। এই তাদের কাছে আহলে বায়াত বলতে যা বুঝানো হয় যে, তাঁদের কাছে অছিলা গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ বায়াত হতে হয়। এই বায়াত হবার পর তিঁনি আপনাকে যে ভাবে অনুপ্রাণীত করে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থাপত্র দেবেন, সেটাই হলো ধর্মের মূল নির্দেশনামা। তাই এই আহলে বায়াতের মূলধারা বাবা হুসায়েন (আঃ)-এর স্মরণে যেহেতু আমাদের এই আলোকপাত। এটার পূর্ণতার অবগাহনে এই আলোচনাগুলো পাঠক বাবা-মায়েরা ভুলবেন না, নিজেরে বিবেক দ্বারা এগুলো একটু যাচাই-বাছাই করবেন যে, আসলে এই ঘটনা প্রবাহগুলো আছে কি না ? যদি থেকে থাকে তাহলে এই ধারায় অনুপ্রাণীত হয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করবেন। ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর শাহাদতের দিনকে স্মরণ করে রাখার জন্য আমরা তকবীর দেই "নারায়ে হায়দারী, ইয়া আলী, ইয়া আলী"। যখন "ইয়া হুসায়েন" তকবীর দেওয়া হয় তখন শাহ হাস্তে হুসায়েন (৩বার), বাদশাহ হাস্তে হুসায়েন (৩বার) ইমাম হুসায়েন (৩বার) জিন্দাবাদ (৩বার)। ইহা বলার অর্থ কি ? এর অর্থ হলো জাতের মূলধারা আজ ভূলণ্ঠিত হবার একটি অপপ্রয়াস বা চেষ্টা চলছে। যেহেতু আমরা আহলে বায়াতের, তাই আহলে বায়াতের মূলধারাকে স্মরণ এবং বরণ করে রাখার জন্য ক্ষুদ্র

পরিসরে হলেও একটু চেষ্টা করি। যদি ক্ষুদ্র পরিসরে নাও হয় তবে দিবসটি স্মরণতব্য করে রাখার জন্য আপনারা অন্তত একটা ভিক্ষুককে একটা টাকা বা কিছু অর্থ দান করেন তবুও তো সেটা স্মরণীয় করে রাখা হলো, অন্তত এভাবে মনের মাঝে শাহাদতে কারবালা বাবা হুসায়েন (আঃ)-কে স্মরণতব্য করে রাখার চেষ্টা করবেন।

ভাববাদী বিচারিক বিশ্লেষণ সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ করা হয়েছে যে :- "আর-রহ্মানির রহিম"। অর্থ :- যিনি দয়াল দাতা ও দয়ালু। তাহলে দয়াল দাতা কি ? অর্থাৎ সৃষ্টি রাজ্যে মানব-মানবীসহ ১৮ হাজার মাখলুক বিচরণ করছে। তাহলে ১৮ হাজার মাখলুকের মধ্যে সবার রুটি-রিযিক, চলা-বলা থেকে শুরু যা কিছু তার প্রয়োজন বা সে যা প্রাপ্তি হবে, এই প্রাপ্তিটা তার তকদির বা ভাগ্যে নির্ধারণ করা। অর্থাৎ সে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টা, এই সময়কে বলা হয় ইয়াম। পরবর্তী আয়াতে ইয়াম আছে তাহলে এই ইয়াম হলো সময়। তাহলে এই সময়টা হলো যে, এই সময়ের মধ্যে সে জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানের সময়টা তাঁর যত কার্যাবলী, তার যত প্রাপ্তি, তার যত উচ্ছাস, সে যা কিছু করবে, খাবে, পড়বে এই সকল কিছুর দান বরাদ্দ করেন যে আল্লাহ্পাক! সেই আল্লাহ্র নাম হলো রহ্মান। তাহলে রহ্মানের দান হলো সার্বজনীন অর্থাৎ এটা বিচ্ছরণ হয় না। এটাকে আড়াল করা হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টি রাজ্যে আমি একটা মানব, আমাকে মানবকূলে সৃষ্টিতে সমাসীন করা হয়েছে আর সমসীন হয়ে থাকলে আমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজন সমূহ আমার তকদিরে নির্ধারিত।

তাহলে আমার তকদিরে যদি নির্ধারণকৃত থাকে, তাহলে দুনিয়াতে আমাকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে ? একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করবার উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে দাসত্বের উদ্দেশ্যে যদি আমাকে সৃষ্টি করা হয় কিন্তু আবার এখানে আমাকে একটু ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে। আমি স্রষ্টাকে মানতেও পারি আবার নাও মানতে পারি। এই স্বাধীনতাটাই হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবকূলকে দান করা হয়েছে। কেন ? সে আল্লাহ্র নির্দেশনা পালন করলেও করতে পারে আবার নাও করতে পারে। যদি সে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে তাহলে সে আল্লাহ্র কাছে পুরষ্কৃত হবে, আর যদি তাঁর নির্দেশ অমান্য করে তাহলে আল্লাহ্র কোর্টে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাহলে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করবার ফলে এই দান বা বরাদ্দ আল্লাহ্পাক বান্দার থেকে ছিনিয়ে নেয়

না। অর্থাৎ জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানের মাঝামাঝি যে সময়, সেই সময়ে বরাদ্দকৃত যে দান সেই দানটাই হলো আল্লাহ্‌র রহম্‌ান নামের দান। তাহলে সৃষ্টি রাজ্যে যত মাখলুক রয়েছে সবাইকে মহান আল্লাহ্‌পাক খাওয়ায়, চলায়-বলায়, রাখেন, হেফাজত করেন, এই যে প্রক্রিয়া রাখা আছে সবগুলোই হলো রহ্‌মানের দান।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদে রহ্‌মানের যত বর্ণনা রয়েছে, সকল বর্ণনাতে আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ নিদর্শনাবলী এভাবে বর্ণানা করা হয়েছে যে, তোমরা রহ্‌মান সম্পর্কে যদি ওয়াকিবহাল হও, তাহলে আল্লাহ্‌র কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে ? চন্দ্র-সূর্য থেকে শুরু করে খাবার-দাবার, বৃক্ষরাজী, তরুলতা, জীব-বৈচিত্র, প্রাণী সবাইকে উপমা দিয়ে আল্লাহ্‌পাক তাঁর আয়াতে কালাম অবশ্য সূরা আর-রহ্‌মানে ইহা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "তুমি আল্লাহ্‌র কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?"। যেহেতু এই রহ্‌মান নামে একটি সূরাই নাজেল হয়েছে, ইহাতে বারংবার বলা হয়েছে যে, তুমি আল্লাহ্‌র অর্থাৎ এই সূরার মধ্যে বেশি বলা হয়েছে যে :- "ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্‌বিকু মা তুকাজ্‌জিবান" অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্ররাজী থেকে শুরু করে যা কিছু সৃষ্টিতে রয়েছে বারবার তাদেরকে দেখানো হয়েছে এবং এই নিদর্শনাবলী মানুষকে বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, ইহাই রহ্‌মানের দান। অর্থাৎ রহ্‌মান কনোস্ট্যান্ট দান, ইহা খন্ডন হয় না, সরানো যায় না, আড়াল বা আবডাল করা যায় না।

তাহলে আমরা রহ্‌মানের দান নিয়ে দুনিয়াতে বিচরণ করছি। তাহলে আয়াতে কালামে আল্লাহ্‌পাক বলছে "আর-রহ্‌মানির রহিম" অর্থাৎ এই রহ্‌মানের দান তোমার এই কৃতজ্ঞতাবোধ অর্থাৎ তুমি যদি শুকরানা আদায় কর, তাহলে এই শুকরানা আদায়ের পর থেকে স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য গোচরকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যদি নিজেকে পরিচালিত করো, স্রষ্টার নির্দেশনামা অনুযায়ী যদি তুমি চলো, তাহলেই তোমাকে একটি বিশেষ অবয়বে দান করা হবে, সেটা "আর-রহিমের" বা রহিমের সনদকৃত দান। অর্থাৎ এই "রহিম" হলো সৃষ্টি রাজ্যে মানুষ এবং জ্বীন এই দুইটি জাতিকেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাহলে এই যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, এই স্বাধীনতার উপরেই তার পরীক্ষার মানদন্ড রয়েছে। তাহলে এই স্বাধীনতার বিষয়ে যে পূর্ণ অবগাহন রাখা রয়েছে, তাহলে

সেই স্বাধীনতা তুমি কোন খাতে ব্যবহার করলে ? যদি তুমি মওলার খাতে ব্যবহার করো তাহলে তুমি পুরষ্কৃত হবে, আর যদি মওলা খাত থেকে তুমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখো অর্থাৎ মওলা থেকে বিমুখ হও, তাহলে তুমি রহিমের দান পাবে না। কেন ? এই রহিমের দান আল্লাহ্‌র ওলিরা বা ভাববাদী বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, ইহা ক্ষমার পরের দান। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌পাক যদি কোন মানব বা জ্বীনকূলকে ক্ষমা করে দেন, তখনই তিঁনি হন "গাফুরুর রহিম"। অর্থাৎ গাফুরুর রহ্‌মান সমগ্র কোরআনুল মাজিদের কোথাও নেই। ইহার অর্থ কি ? অর্থাৎ ইহাই হলো বিশেষ দান বা বিশেষ একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমরা যে গুরুবাদী ব্যবস্থা বা পীরতন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিগমন করছি সেটা কি ?

একমাত্র আল্লাহ্‌র উপসনায় কিভাবে যাওয়া যায়, সেটারই জন্য নিজেদের একটি প্রচেষ্টা রয়েছে। এই প্রচেষ্টা কি চিরকাল থাকবে বা কোন ফল/পূর্ণতা দাঁড়াবে না ? সেটা হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তার সকল কর্মকান্ডের একটি চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। যে পর্যায়ে পৌঁছালে মহান স্রষ্টা তার দিকে আগয়ান হয়। এই আগয়ানকৃত ব্যবস্থায় তার স্বীকৃত সনদ হয় যে, আমি এযাবৎকাল ধরে যে তপস্যা করছি, আমার যে মোরাকাবা মোশাহেদা আমল নীতিগুলো রয়েছে, সেই আমল নীতি হয়তো আজকে মওলার দরবারে গৃহিত হয়েছে, যার জন্য তাঁর থেকে এই আগমন রাশির একটি শুভ সংবাদ তাকে প্রেরণ করা হচ্ছে বা তাকে দান করা হচ্ছে, যে আগমন রাশি হলো পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত করবার ফায়সালা। ইহা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর জীবনাদর্শের উপরই আমাদের এই ধর্মের স্ট্রাকটার বা মানদন্ড দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর জীবদ্দশায় এমন হয়েছে কি না ? সেটা খুঁজে দেখতে হবে। তাহলে তিঁনি ২৫ বছর থেকে নবুয়্যত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত জাবলে নূর পর্বতে বা হেরা পর্বতে গুহায় তিঁনি ধ্যান মগ্ন ছিলেন, ইহা একটানা নয়, সময়ে সময়ে। তাহলে এই আগমন রাশির আগমন করলো বা নগদের ধারাগুলো হলো কোথায় ?

এই জাবালে নূর বা হেরা পর্বতের গুহায়। অর্থাৎ রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আকিদায় যখন পূর্ণতার স্বীকৃতি সনদ মওলার পক্ষ থেকে জারী করা হলো, তখনই জিব্রাঈল আমিনের একটি মাধ্যমকৃত ব্যবস্থায় গ্রহণকৃত মানদন্ড দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে এই সংবাদ বা বার্তা পৌঁছে দেওয়া হলো। তাহলে ইহা কি ? ইহাই সেই গাফুরুর রহিম রহিম নামের যে

অবয়ব অর্থাৎ ক্ষমার পরের চূড়ান্ত একটি ফায়সালার দান, ইহা বিশেষ একটি প্রক্রিয়া। *{(রসূল (সাঃ) (আঃ) জীবদ্দশায় কোন ভুল করেন নি, তাই ক্ষমার বিষয় আসে না কিন্তু ইহা তাঁহার উম্মত বা অনুসারীগণকে শিক্ষা দেবার জন্যই করেছেন, কারণ তিঁনি আগে থেকেই নবী")}*। অর্থাৎ সবকিছু সাধারণ বা বিশেষ নয়। রহ্মানের দান হলো হলো সর্ব সাধারণের জন্য প্রযোজ্য বা সকলেই সেই দান পাবে, কিন্তু এই রহিমের দানটি হলো বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার দান। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার দানকে পেতে হলে আপনাকে অনুশীলনগামী ব্যবস্থায়, ইহাই আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) জাবালে নূর পর্বত বা হেরা পর্বতের গুহায় দেখিয়ে গেলেন।

তাহলে এই রহিমের দান পেতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে এই নিজের চৈতন্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। কেন ? কারণ নিজের চৈতন্যবোধ যদি জাগে, তাহলে মওলার পক্ষ থেকে সরাসরি হোক বা অছিলার মাধ্যমে হোক - আপনাকে সনদ করা হবে অর্থাৎ এখানে দর্শনবাদ এসে যায়। কারণ দেখা বা দর্শনের একটি অবয়ব জারী হয় যে, মওলার পক্ষ থেকে গৃহিত হয়েছে এর একটি ফায়সালা। তাহলে উক্ত দানটিকে বলা হয়েছে রহিমের দান অর্থাৎ সৃষ্টি রাজ্যে এই মানবকূলকে প্রেরণ করা হয়েছে যা ভাববাদী বিচারিক বিশ্লেষণে বলা হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্য এই মানবকূলকে (জ্বীন জাতির কথা বাদ দিলাম) প্রেরণ করা হয়েছে। তাহলে যে মওলার দাসত্ব আমি করি, তাহলে সেটার কি কোন ফায়সালা নেই ? এই স্বীকৃতি সনদ হলো রাসুল (সাঃ) (আঃ)-এর জীবনাদর্শে এভাবে যদি তরান্বিত গতিতে বাস্তবায়নের রূপ পায়, তাহলেই এটার ফায়সালা হয়ে যায়। এই ফায়সালা যদি হলো সাধকের মনে তখন উদ্বেলিত হয়। যদি মওলার পক্ষ থেকে সে প্রতিনিধিত্ব পায়, তবেই সে ধর্মের প্রবক্তা হয় অর্থাৎ ধর্মের শিক্ষাটা সে দিতে পারে। এই শিক্ষাটাই ভাববদী ব্যবস্থায় উন্মোচন করা হয়। আজকের জামানায় পুঠিতব্য বা গ্রন্থ্যগত বিদ্যার শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে একটি বন্ধনকৃত জ্ঞানের আবদ্ধে রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। যারা ভাববাদী বিষয়াদী নিয়ে মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত, তাদের বিড়ম্বনা আর বিশৃঙ্খলার জ্ঞানের মানদন্ড দিয়ে নাজেহাল করার অপকৌশল সর্ব সমাজেই বিরাজিত।

তাই এই অবস্থার মাঝেও যদি কেউ মওলার দিকে রজ্জু হয়ে যায়, তাকে যে সেই পথ থেকে দূরীভূত করা যায় না, সেটাই সাধকগণ বারবার প্রমাণ করেছেন এবং এইভাবে সত্যায়িত সনদ হলে এই রহিমের দানটা সে প্রাপ্ত হবে। তাহলে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে কালামে বলা হয়েছে :- "সকল প্রসংশা সেই মহান রব্বুল আলামিনের যিনি মৌন জগতের রব"। তাহলে এই মৌন জগতে যাকে রব বলে লালন-পালন করছি এবং এর পরের আয়াতেই বলা হলো :- "আর-রহ্মানির রহিম" অর্থ তিঁনি দয়ালদাতা এবং তিঁনি পরম দয়ালু। এই পরম দয়ালু অর্থাৎ তাঁর যে দান, এই দানের একটি বিশেষণের জালুয়া। জালুয়াটা কেমন ? যেমন কোন প্রদীপ বা লাইটের আলোর সামনে দাঁড়ালে সেই আলোর ফোকাসটা আপনাদের দেহে বা মুখ নিঃসৃত অবয়বে জারী হয়ে যায়। এটা একটি বিজলীর মতো রূপ বা বৈচিত্রের একটি ভাবধারাকে ত্বরান্বিত করে আরও সৌন্দর্য এবং মাধুর্যময় করে ফুটিয়ে তুলছে। নিঃসন্দেহে মহান রাব্বুল আলামিনের যে মূলধারার দান, সেই দান যদি রহিমের দান হয়, তাহলে তাঁর মধ্যে একটি প্রজ্জ্বলন শিখা এমন ভাবে দৃশ্যায়মান হয়, যে তাঁর কাছে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ অর্থাৎ ইহা অটোমেটিক্যাল পদ্ধতিগত ভাবেই সেটা জারী হয়ে যায়। এভাবে মওলার স্বীকৃতি সনদ হলে এই "আর-রহিম" অর্থাৎ তিঁনি পরম দয়ালু। তাহলে দয়ালদাতা হলো "আর-রহ্মান" ইহা সার্বজনীন বা কনোস্ট্যান্ট এবং "আর-রহিম" হলো "পরম দয়ালু" অর্থাৎ এই দয়ালুটাই হলো ক্ষমার পরের দান। অর্থাৎ সাধক যখন তাঁর অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই আগমন রাশি অর্থাৎ সেটা ফেরেস্তা মন্ডলীই হোক আর আল্লাহ্র প্রকৃত মূল নিশানাই হোক, তিঁনিই তার ভিতরে প্রজ্জ্বলনকৃত শিখায় জাগরিত হয়ে যায়, নিজের সত্ত্বাকে নিজে জাগরণ করতে পারে, সেই মূলধারার অবয়বটাই হলো এই পূর্ণতার রহিমের একটি দানের অংশ। এভাবেই "আর-রহ্মান" এবং "আর-রহিম" ইহার মূলধারা ত্বরান্বিত হয়।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে যে :- "মালেকে ইয়াওমিদ্দিন"। (স্বাভাবিক) অর্থ হলো তিঁনি বিচার দিবসের মালিক। তাহলে ইয়াম শব্দের অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট কাল। প্রতিটি মানুষ তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু এই দুইয়ের মাঝখানে যে সময়টা পায়, এই সময়কেই বলা হয়েছে ইয়াম। ইহা হলো ভাববাদীর কথা। আর জাগতিক ভাবে এক কথায় বলা হয়েছে যে, তিঁনি বিচার দিবেসের মালিক। তাহলে এখানে অনুবাদের পার্থক্য আমরা সচরাচর

যে বিষয়টা দেখে থাকি, সেটা হলো যে ভাববাদী চিন্তা-চেতনার মানুষের বয়ান আর স্বাভাবিক জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির বয়ানের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অনেক জ্ঞানীগণ বর্ণনা করেছেন যে, শরীয়তে যে বিষয় বা মানদন্ড মানুষকে জানান দেওয়া হয়েছে "এলমে তাসাউফ"-এ সেই মানদন্ড একটু ব্যতিক্রম বা ভিন্নতার অবগাহন হতেই পারে। তাই ভিন্নতার অবগাহনে সিক্ত না হয়ে মূলধারাতে ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। এজন্য এই ইয়াম হলো জন্ম এবং মৃত্যু এই দু'য়ের মাঝখানের সময়টাকে বলা হয়েছে "ইয়াম"। তাহলে জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানে আমাদেরকে একটি সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে কি করতে হবে ? এই সময়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলী পালন করতে হবে।

তাহলে আল্লাহ্‌র যে নির্দেশনা আমরা পালন করবো, এই নির্দেশনা আজকে ত্বরান্বিত গতিতে বিভাজনকৃত ব্যবস্থার মধ্যে অবলোকন হয়েছে। ইহা আমরা সচরাচর স্বাভাবিক জ্ঞানে বুঝতে পারি না বা পারছি না, আমাদের কাছে হিমশিম হয়ে গেছে। কেন ? আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন :- "আমার উম্মতের মধ্যে মোট ৭৩ ফেকরা বা কাতারে বিভাজন হবে, তার মধ্যে একমাত্র কাতার আমার অনুসারী হবে বা থাকবে, তাহারাই আমার উম্মত বলে স্বীকৃতি সনদ পাবে। আর বাকী ৭২ ফেকরা বা দল হবে জাহান্নামী। এখন বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরাও তো কোন না কোন মাজহাব বা কোন দলের অনুসারী। তাহলে আমাদের দল যে পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত হয়েছে বা ইহা যে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, ইহার ফায়সালা কি ? এই ফায়সালা হলো যে, একটি মানব তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টা পায়, এই সময়ের মধ্যে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে তাকে প্রজ্জ্বলনকৃত শিখায় একটি অবয়বে জারী করতে হবে। তার ভিতরে জাগাতে হবে, যে মানদন্ড দ্বারা তিনি নিজের কাছে এই ফায়সালাটা পেয়ে যাবেন যে, আমি যে দলে অবস্থান করছি আমার দলটা সঠিক। এই সঠিকের ফায়সালাটা কি ?

তাই ভাববাদী যে সকল অনুশীলন দেওয়া হয়, এই অনুশীলনের মাধ্যমে বন্ধ চোখের দৃষ্টিতে দেখা যায়। তো এখন নিরাকার আল্লাহ্‌ আর আকার আল্লাহ্‌র দুইটি রূপ। তাহলে যারা ভাববাদী অনুশীলনগামী মোরাকাবা মোশাহেদা করে, তারা জেনে থাকে যে আল্লাহ্‌র আকার আছে কিন্তু ইহা গোপন। কেন ? সূরা হুজরাতে সম্ভবত আল্লাহ্‌ নির্দেশ করেছেন যে, আমার আকারের বয়ান তোমরা করো না। তাহলে নিরাকার রূপী আর থাকে না। এজন্য এই ভাববাদী ব্যবস্থার মানুষের সাথে জাগতিক মানুষের একটি দ্বীমত থাকে।

কিন্তু আসলে এখানে দ্বীমত পোষণের কোন কারণ নেই। আলাহ্‌র হাবীব (সাঃ) (আঃ) ইহার ফায়সালা করে দিয়ে বলেছেন :- “মান আরাফা নফ্‌সাহু, ফাকাদ আরাফা রব্বাহু” অর্থাৎ যে নিজেকে চিনলো, সে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে চিনলো। তাই আমি যদি আমাকে চিনতে পারি, তাহলে তো বাইরের কাউকে দেখার মত অবয়ব আমার প্রয়োজন পড়ে না বা কারও কাছ থেকে শোনারও প্রয়োজন পড়ে না। তাই গুরুবাদী বা ভাববাদী যে সকল অনুশীলন থাকে, ইহা হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুশীলন ব্যবস্থা, ইহা সার্বজনীন নয়। কিন্তু পুস্তকে পাঠকগণের নিকট যে আলোকপাত করছি ইহা সার্বজনীন আলোচনা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অনুশীলনগামী ব্যবস্থা থাকে হলো ভাববাদী ব্যবস্থার উপর আত্মকেন্দ্রিক অনুশীলন।

অর্থাৎ নিজেকে কিভাকে চিনবো, নিজেকে কিভাবে জাগাবো ? এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে, তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়টার মধ্যে তুমি যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশনামা বাস্তবায়ন কর, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাকে পুরষ্কৃত করা হবে। আর যদি ইহা না কর, ইহা অমান্য কর, তাহলে আপনি শাস্তিতে সমাসীন হবেন। তাহলে এই শাস্তি এবং পুরষ্কার উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে আমার শাস্তির ফায়সালা এবং আমার পুরষ্কারের যে অবয়ব, ইহা দুনিয়া থেকে যদি কেহ দেখে যেতে না পারে, তাহলে সে পরকালীন জিন্দিগিতে বোবা আর কানা উঠবে, পাঠক বাবা-মায়েরা বুঝতে পারছেন তো ? এজন্য বহু সাধকগণ এভাবে বলছে যে, “এসব দেখি কাঁনার হাট বাজার”। কেন ? নিজেকে যিনি জাগাতে পারেন নি, তিনি কিভাবে অন্যকে দেখানোর বিষয়ে ফায়সালা দেয় ? আজকের জামানায় ধর্মীয় শিক্ষাটা এজন্য ভাববাদী ব্যবস্থার সঙ্গে একটু মতানৈক্য হয়ে যায়। তাই ৭২ ফেকরা বা কাতারের মধ্যে ১ কাতার যদি প্রকৃত অনুসারী, তাহলে এটা দেখার বা নগদের ধারার অনুশীলন হবে। এজন্য আমি অনেক সময় বলে থাকি যে এই দেখার অনুশীলন যেখানে পাবেন, সেটার উপর আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কারণ রসূল (সাঃ) (আঃ)-কে যদি আপনি দুনিয়ার জিন্দিগিতে জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন, তাহলে আপনার ফায়সালা উম্মতের সার্টিফাই, এটা অনন্তকাল অর্থাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আপনার এই ফায়সালাকে কেহ নড়াতে পারবে না, ইহা চিরস্থায়ী জারীয়া হয়ে যাবে। তাহলে এই দেখার অনুশীলন যারা দেয়, সেই মতবাদকে লুফে নেবেন। সেটা অনুশীলন করে আপনি দেখবেন যে, তাদের দেখার অনুশীলনটা বাস্তবায়ন কি না বা এটা পাওয়া যায় কি না ? তাই জগতে যত

ওলিগণ রয়েছে সবাই একটি কথাই বলছে যে, বাবা আহলে বায়াতে তুমি দাখিল হও। অর্থাৎ তুমি একটি অছিলার অন্বেষণ করো। আল্লাহ্‌পাক কোরআনুল মাজিদে বিভিন্ন আয়াতে এই অছিলার নির্দেশনামা জারী করেছেন। তাহলে আজকের জামানায় দুনিয়াতে অনেকেই এই পীর, ফকির, ওলি বা অছিলা ধরাকে অমান্য করে। তাহলে ইহা কোরআনের মানদন্ড বা মূলধারার মানদন্ডকে অস্বীকার করা হয়। কেন ? কারণ আহলে বায়াত ব্যতীত এই মূলধারার চৈতন্য ধারাতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই যেহেতু সম্ভব নয়, এজন্য সবাইকে নির্দেশ করি যে, আপনার যাহাকে পছন্দ হয় একটি মনোনিত ব্যক্তিকে নির্ণয় করে তাঁর কাছে অছিলাটা সম্পন্ন করবেন।

অর্থাৎ আহলে বায়াতকে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন যে আমার বংশ অর্থাৎ মোহাম্মদী সত্ত্বার গুণের বংশকে বলা হয় আহলে বায়াত। তাহলে মোহাম্মদী সত্ত্বাকে জাগাতে হলে বা মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)-কে পেতে হলে প্রথমে আহলে বায়াতে আপনাকে দাখিল হতে হবে। যাকে আপনার পছন্দ হয় বা যার দ্বারা আপনার কার্য সিদ্ধি হয় এমন একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করবেন। প্রতিটি মানুষের একটি স্বাধীন সত্ত্বার পৃথক জ্ঞান দ্বারা দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, সবার জ্ঞানসীমা সমান নেই, তাই সবাই এক জায়গায় একজনের কাছে সমাসীন হতেও পারবে না। ইহাই বাস্তবতা আর এই আহলে বায়াতে অর্থাৎ আমার নিজস্ব মত হলো যে, আমি এ পর্যন্ত যতটুকু জেনেছি, এই ভাবধারাতে কোন ফাঁকি নেই। অর্থাৎ এটার চৈতন্যবোধ যাহার জাগরিত হয়, তিঁনি সবকিছু দেখতে পারেন। অনেক আল্লাহ্‌র ওলিগণ ইহাও বর্ণানা করেছেন যে :- “লা শাইখ ইল্লা ইবলিস” অর্থ যার পীর নাই তার পীর হলো শয়তান। তাই এজন্য যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ে আমরা খুব একটা পারদর্শী না আর ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের কোন শিক্ষাও নাই। আমরা কি শিখেছি ? আহলে বায়াতে দাখিল হবার পর একটি মানবকে আত্মার অনুশীলগামী ব্যবস্থার দিকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই ধারার কিছু কথা আমরা জেনেছি বা কিছু আমল নীতির বিষয়ে জানতে পেরেছি। এগুলো পালন করলে একটি মানুষ কিভাবে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়, এই আত্মার অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে পরিগমন করার জন্য এই এজাজত দিয়েছেন আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা কাবা। তাই এই দায়ভার গায়ের উপর রয়েছে, তাই এই দায় এড়াতে বা পালন করবার উদ্দেশ্যে পুস্তকটিতে তুলে ধরা। আজকে হয়ত সমাজে মিশেছি ভ্রাতৃত্ত্ববোধের বন্ধন নিয়ে সুন্দর, সহনশীল, মাধুর্যময় আচরণের মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে থাকা যায় ইহা চেষ্টা করি। যারা

ধর্মে অনুপ্রাণীত মূল নিশানা বা প্রকৃত সত্যের সন্ধান মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব এভাবে মওলা যাকে দেবে, যার মাধ্যম দিয়ে প্রচার করাবে, ইহা প্রতিটি মানুষের কর্ণগোচর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ইহা বেলায়েতী একটি পদ্ধতির ধারা অনুযায়ী এইভাবে তিলতিল করে গড়াচ্ছে। প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যের বাণীগুলো পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি দায়িত্ব পড়েছে।

এ বিষয়ে আরেকটু ভিন্নতার আলোকপাত রাখবো - সেটা হলো :- রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর দ্বীন প্রচারের সময়ে বায়তুল মাল গঠন করেছিলেন। এই বাইতুল মালের পাহাড়ার দায়িত্ব ছিল আবু হুরায়রার (রহঃ) উপর। এই আবু হুরায়রা বাইতুল মাল পাহাড়া দিতেন। একদিন রাতের বেলা এক ব্যক্তি এসে বায়তুল মাল থেকে কিছু খাদ্য সামগ্রী মাল-ছামানা সে একটি চাদরে উঠায় এবং এরপর তা নিয়ে যেতে উদ্ধত হয়। আবু হুরায়রা (রহঃ) তাকে ধরে ফেলেন এবং উক্ত ব্যক্তি বললেন আমি খুবই অভাবী, অভাবের তাড়নায় আমার গৃহে খাবার নেই, এটা নেই, ওটা নেই এভাবে বলতে থাকে। কিন্তু আবু হুরায়রা কোন কথা না শুনে বললেন আমি তোমাকে ছাড়ব না, তোমাকে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবে। লোকটি পুনরায় বলতে থাকে আমি খুব অভাবগ্রস্থ, আমার পরিবার না খেয়ে আছে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আবু হুরায়রার দয়া হয় এবং তিনি উক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন। পরের দিন আবু হুরায়রার সঙ্গে যখন রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর সাক্ষাত হলো তখন রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন যে, আবু হুরায়রা তুমি রাতে যে চোরকে ধৃত করলে, আসামীকে ধরলে, তার কি ব্যবস্থা করলে ? তিনি বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তিনি অভাবের কথা শুনিয়ে আমার মনটাকে নরম করে ফেলেছিল, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ্‌র হাবীব বললেন যে, উনি আবার আসবেন এবং পরবর্তী রাতে দেখা গেল উনি আবার এসেছেন। পুনরায় আসার পরে এই বায়তুল মাল থেকে উনি মাল-সামগ্রী চুরি করে আবার চলে যেতে রওনা হয়, আবু হুরায়রা তাকে ধরে বললেন যে, পূর্বে তুমি বলেছ যে আর আসবে না কিন্তু তুমি আবার এসেছো তাই তোমাকে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর কাছে ধরে নিয়ে যাবো। পুনরায় আবার লোকটি বলে উঠল আমি খুব অভাবগ্রস্থ, আমার পরিবার না খেয়ে আছে, দয়া করে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আবু হুরায়রা একথা শুনে পুনরায় দয়া হলে তাকে ছেড়ে দেয়। পরের দিন আবু হুরায়রার সঙ্গে যখন রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আবার সাক্ষাত হলো, তখন রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন যে, আবু হুরায়রা তুমি রাতে যে আসামীকে

ধরলে, তার কি হলো ? তিনি বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে অভাবের কথা এমন ধারায় কাকুতি-মিনতি করে বললেন যে, তাকে আমি আর ধরে রাখতে পারি নি। আল্লাহ্‌র হাবীব রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন যে, উক্ত ব্যক্তি আবার আসবেন, তাহলে তৃতীয় দিন আবু হুরায়রা আবার পাহাড়ায় দায়িত্বরত আছেন আর ঐ ব্যক্তি আবার এসে মাল-ছামানাগুলো চাদরে উঠাচ্ছেন তখনই আবু হুরায়রা গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। আবু হুরায়রা বলল, তুমি তো আর আসবে না বলেছিলে কিন্তু আবার এসেছো। সুতরাং আজকে আর তোমাকে ছাড়া হবে না, তোমাকে নিয়েই যাবো রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর কাছে। ঐ ব্যক্তি বলে উঠল, শেষবারের মত আমাকে আর একবার সুযোগ দাও, আমি তোমাকে সুন্দর একটি গোপন আমল শিখিয়ে দিব, যে আমলের দ্বারা তুমি অনেক কিছু জানতে পারবে আর তোমার সৌন্দর্যবর্ধন হবে। আবু হুরায়রার দয়া হয়েছে যে, দু'দিন তো অভাবের কথায় ছেড়ে দিয়েছি, এটাই শেষ। এরপর উক্ত ব্যক্তি আবু হুরায়রাকে বললেন যে, আপনি রাত্রে ঘুমানোর সময় যদি আয়াতুর কুরসী পড়ে ঘুমান, তাহলে দিবস পর্যন্ত আপনার পাহাড়ায় ফেরেস্তা মন্ডলী নিয়োজিত থাকবে, আপনার বিপদ-আপদ ঘটতে পারবে না।

পরবর্তী দিবসে যখন আবু হুরায়রার সঙ্গে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আবার সাক্ষাত হয়, তখন রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন যে, আবু হুরায়রা তুমি রাতে যে আসামীকে ধরলে, তার কি হলো ? তিনি বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমি তাকে ধরেছি এবং ধরবার পড়ে তিনি কাকুতি মিনতি তো করেছেই এবং আমাকে একটি গোপন আমল শিখিয়ে দিয়েছে, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তখন আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) (আঃ) বললেন, আবু হুরায়রা ঐ ব্যক্তি দু'দিন মিথ্যা কথা বলেছে কিন্তু তোমাকে যে আমলটা শিখিয়েছে এই আমলের বিষয়ে সে মিথ্যা বলে নি কিন্তু তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে চিনো ? তখন আবু হুরায়রা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমি তো তাকে চিনি না, তখন আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) (আঃ) বললেন, উনিই ছিলেন শয়তান। এই হাদিস খানা আলোকপাত করবার মূল কারণ হলো শয়তান আসলো ভিন্ন কিছু নয়, শয়তান মানব আকৃতিতে, ইহা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর হাদিস থেকে প্রমাণিত। ইহা ব্যতিক্রম একটি হাদিস না ? শয়তান যে মানব আকারে এই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে, তাহলে এই মানুষই আমরা এই স্রষ্টার একান্তবর্তী এবং মানুষই আবার এই মন্দ সত্ত্বা বা শয়তান। পাঠক বাবা-মায়েরা বিষয়টা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন! তাহলে ইহা বুঝবো কি দিয়ে ?

এর প্রচ্ছায়া কি ? তাই যাকে অনুসরণ করা হয়, তাঁর এই অনুসরণগামী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজের আত্মার উন্মেষ ঘটলে তাহলেই এই ধোঁকার হাত থেকে বাঁচা যাবে, তাছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই।

তাই বলা হয়েছে যে, "মালেকে ইয়াওমিদ্দিন"। অর্থাৎ ইয়াম হলো জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানের সময়টা আর দ্বীন শব্দের অর্থ হলো ধর্ম। তাহলে আমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টিতে সমাসীন করে একটি ধর্ম বা বিধান দিয়েছে ? প্রতিটি মানব সত্ত্বা থেকে শুরু করে সৃষ্টিরাজ্যের যত মাখুলক রয়েছে সবারই একটি ধর্ম রয়েছে। বুঝতে পারছেন তো পাঠক বাবা-মায়েরা। অর্থাৎ সেই ধর্ম হলো তার মূল নিশানা, সেই ধর্মের চালিকা শক্তি অনুযায়ী সে পরিচালিত হয়। তাই এই ধর্মের মূল নিশানাতে যদি আপনার পদচারণা হয়, আপনার অনুশীলনগামী ব্যবস্থা থাকে, তাহলে আপনি সঠিকের উপর দন্ডায়মান হতে পারবেন। আর ধর্মে মূল শিখরে যদি আপনার অবস্থান না থাকে, তাহলে আপনি ধর্ম থেকে গাফেল হবেন, আর গাফেল হলে পরকালীন জিন্দিগিতে শাস্তিতে সমাসীন হতে হবে। তাই জগতে যত পীর মাশায়েখগণ আজও পর্যন্ত দুনিয়াতে পদার্পন করছে, তাঁদের সবারই একই আকিদা আর সেটা হলো আহলে বায়াতে অনুসারী হবার জন্যই নির্দেশনামা বলে যাচ্ছে। আমরা ইহাও দেখতে পাই যে, এক শ্রেণী বলে বেড়ায় যে আহলে বায়াতে দাখিল হতে হবে না, বাবা-মা-ই বড় পীর এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর নির্দেশনামার কিছু আমল করলে তুমি পরকালে জান্নাত পাবে।

যদি এখন এই শ্রেণীর লোকের কথা মেনে নেই, তাহলে সকল ওলিরা কি মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে ? অর্থাৎ বাংলার বুকে সকল ওলিরা এবং বড় পীর সাহেব সহ গোটা দুনিয়াতে যত ওলির আবির্ভাব হয়েছে, সকলেই একজন কামেল পীরের ভক্ত বা অনুসারী হয়েছে। তাহলে পীরের অনুসারী হতে যারা নিষেধ করে তারা ঠিক, না কি পীরতন্ত্রে যারা রয়েছে তারা ঠিক। দুইটা ঠিক হবে না যে কোন একটা ঠিক, ইহা পাঠক বাবা-মায়েরদের বিবেকের আদালতে ছেড়ে দিলাম।

তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা ঠিক হবে। আজকের যে আমলের আকিদা আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) ভবিষ্যত বাণী তে এগুলো অনেকেই বলে গেছেন, সেটা হলো যে আমার উম্মতের মধ্যে ঈমানের লেশ থাকবে না কিন্তু তাদের কথা এত জ্ঞানী হবে যে

নবীর মত তাদের বয়ান থাকবে এবং তাদের উপাসনার কেন্দ্র গুলো থাকবে এমন সাজসজ্জা বিশিষ্ট যা দেখে মানুষ মোহিত হয়ে যাবে, এভাবে অনেক বর্ণনা দেওয়া রয়েছে। তাহলে তাদের আচরণ কি হবে ? তাদের আখলাক কি হবে ? তাদের মূল নিশানা কেমন হবে ? সকল কিছুই তো বয়ানে রয়েছে। তাহলে এগুলোর নিরীক্ষান্তে এই দ্বীন বা ধর্মের মূল চালিকা শক্তি হলো নিজের কাছে।

প্রত্যেক মানুষ আমরা পৃথিবীতে অবস্থান করছি সবারই পৃথক সত্ত্বার জ্ঞান রয়েছে, যা পাঠক বাবা-মায়েরা হয়ত বুঝতে পেরেছেন। আমাদের যে পৃথকীকরণ, নিজের কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ ইহা তো অন্তত বুঝি, না কি বলেন ? এখন ক্ষুধা লাগলে সবারই খাওয়ার একটি উচ্ছ্বাস জাগে' তাই নয় কি ? তাহলে ইহা যদি বুঝে থাকি তাহলে ধর্মের বিষয়ে আমরা অন্যের দারস্ত হই কিন্তু দর্শনের দিকে যাই না (বেশির ভাগ)। নিজের ফায়সালাটা নিজেকেই করতে হবে। কারণ পরকালীন জিন্দিগিতে বলা হয়েছে যে, কেউ কারো সাথী নয়। কারণ আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে। আজকে যদি আমার নিজের মোহ চরিতার্থ বিষয়িক কোন আলোকপাত পুস্তকে করে থাকি, তাহলে ইহার জন্য পরকালীন জিন্দিগিতে আমি শাস্তিতে সমাসীন হবো। তাহলে এই শাস্তির থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে। আর যদি আপনাদের জ্ঞানের চৈতন্যবোধ, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, দিয়ে বা বিচারিক বিশ্লেষণ দিয়ে নিজের কাছে এগুলো ভাববেন। কারণ আপনার ধর্মের অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় আপনি কি করেন, ইহা শুধু আপনি জানতে পারেন। কারণ আল্লাহ্পাক কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে :- "লোক দেখানো বন্দেগী যারা করে, তারা মুসল্লী নয়"। সেই সকল মুসল্লীদের জন্য আমার বড় আক্ষেপ ও আফসোস হয়। তাহলে এই লোক দেখানো বন্দেগীতে মহান স্রষ্টা সমাসীন না। আল্লাহ্পাক সূরা মমিনে ৬০ নাম্বার আয়াতে বলেছেন :- "ওয়া কালা রব্বুকুম, উদ্উনী আস্তাজেবলাকুম"। অর্থাৎ "তুমি আমাকে একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে"। এখন আমরা যারা আস্তিক বা মুসলমান সবাই তো স্রষ্টার নামই নেই বা তাঁকে ডেকে থাকি কিন্তু তিঁনি তো ডাকের সাড়া বা জবাব দিচ্ছেন না। তাহলে আল্লাহ্পাক তার কালামপাকে বললেন, তুমি আমাকে একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তাহলে এত ডাকার পরেও জবাব পাই না, এর কারণ কি ? কোরআন নিঃসন্দেহে শ্বাসত সত্য কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নেই বা বিন্দুমাত্র ভুল নেই, সন্দেহ থাকলে ঈমানহারা হয়ে যাবেন।

তাহলে কোরআন এই ফায়সালা দিচ্ছে যে, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে)। তাহলে এই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেন জবাব পাই না ? এই জবাবটা পেতে হলে আপনাকে এই দ্বীন বা ধর্মের যে নিয়ম বা সংবিধান রয়েছে, সেই সংবিধানের উপর এই নিজেকে সাড়ে তিন হাত বডির উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি মানবের মধ্যে তিনটি বিষয় বা সত্ত্বা নিহিত রয়েছে। সেগুলো হলো :- ১. নফ্‌স বা আমিত্ব সত্ত্বা, ২. শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা এবং ৩. রুহ বা স্বয়ং আল্লাহ্‌ সত্ত্বা। এই তিনটি সত্ত্বার একত্রে মিলনে আমি, তাহলে আমি একা নয়, পাঠক বাবা-মায়েরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমি আসলে একা নয়। তাই যারা আল্লাহ্‌ থেকে বিমুখ অর্থাৎ স্রষ্টার দ্বীন থেকে, দ্বীনের মালিক থেকে বা ধর্মের মালিক যিনি তাঁর থেকে বিমুখ, এই ধর্মের নিয়ম কাঠামো থেকে বিভাজিত একটি প্রক্রিয়াতে থাকলে আমরা আমিত্ত্ব ও শয়তানি সত্ত্বার সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া থাকি অর্থাৎ নফ্‌স এবং মন্দ সত্ত্বা একত্রিত হয়ে সে শয়তানের রূপ হয়, তাই এই মানবই শয়তানের রূপে কুকর্ম করে। শয়তান বাহিরে কোথাও নেই (রূপক ভাবে মক্কায় রয়েছে)। আবার যিনি এই শয়তানকে দেহ থেকে দূরীভূত করে রুহ (স্বয়ং আল্লাহ্‌) সত্ত্বাকে নফ্‌সের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে ফেলতে পারে, তখনই ঐ মানব মওলা সত্ত্বার হয়ে যায়। তখনই সে একা হতে পারে এবং সে স্রষ্টাকে ডাকলে মহান স্রষ্টা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, তখনই সে বুঝতে পারে। তাহলে এই কোরআন একটি আবডাল বা আবরণকৃত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে মানুষকে বুঝার জন্য দেওয়া হয়েছে।

আজকে ভাববাদীরা যদি এই ফায়সালাগুলো এভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে না দিত, তাহলে আমরা ইহা কিভাবে বুঝতাম ? বুঝতে পারছেন তো পাঠক বাবা-মায়েরা ? এজন্য জগতে দুইটি শ্রেণী বৈষম্যেরই প্রয়োজন রয়েছে। এক শ্রেণী আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য বর্ধন করে মানুষের সৌন্দর্যের ভ্রাতৃত্বের একটি প্রমাণ দেয় এবং ভাববাদী হলো, তাঁরা একজন মানবকে কিভাবে প্রকৃত মানুষ করা যায়, সেই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে ত্বরান্বিত করে - সেই দিক নির্দেশনা মানবকূলকে বুঝিয়ে থাকেন। তাহলে উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। তাই ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাহলে এই সকল কিছু পালনতব্য বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে যেন ধর্মের কালের যিনি রাজা এবং তাঁর ধর্মই যেন আমরা পালন করে দুনিয়ার জিন্দিগিতে আমাকে বা আপনাকে এই সামান্য একটু সময় দেওয়া হয়েছে, যে সময়টা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এই সময়ে কি

দেওয়া হয়েছে ? এই ধর্ম দেওয়া হয়েছে। তাহলে ধর্ম কালের রাজা এই ধর্মটা দিয়েছেন। কারণ এই ধর্মের অবলম্বনে যদি এই সময়টা আমি বা আপনি ব্যয় করি, তাহলে পরকালীন জিন্দিগিতে তাঁর পুরষ্কার রয়েছে বা পাবে। আর যদি ইহা থেকে বিমুখ বা গাফেল হই, তাহলে পরকালীন জিন্দিগিতে শাস্তিতে সমাসীন হতে হবে। এইতো অনন্ত কালের শাস্তি, যন্ত্রণা আর হলো পূর্ণতা। তাই এই পূর্ণতার অবগাহনে যারা সিক্ত হয়, তাঁরা হলো এই জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে নিজেকে মুক্ত করে। আত্মার মুক্তি হলে এই ফায়সালা দুনিয়া থেকে দেখে যাওয়া যায়, ইহাই ফকিরি অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় ত্বরান্বিত গতিতে এই মানুষদের বুঝানো হয়। এর কারণ হলো ভোগে মুক্তি নেই, ত্যাগেই হলো প্রকৃত মুক্তি। অর্থাৎ আমি যে পুরষ্কার পাবো ইহাও ভোগ অর্থাৎ সুখের ভোগ, সুখের সময়ে অনেক কিছু মনে থাকে না।

আপনি দেখবেন আপনার সংসারে যদি সুখ থাকে, তাহলে সুখের মুর্ছনায় অনেক সময় আল্লাহ্‌র নাম বা স্মরণের কথা আপনি ভুলে যান, ইহা আমারও জীবনে ঘটেছে বা ইহা আমার জাগতিক প্রাকটিক্যাল দর্শন। আর যদি দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আপনার জীবনে আসলে তাহলে আপনি স্রষ্টাকে ডাকেন বা স্মরণ করেন, ইহা দিয়ে মওলা আপনার জাগরণ ঘটায়, তাই ইহাকে অবাঞ্চিত বিষয় হিসাবে ভাববেন না। কারণ সাধারণত সুখে আপনি স্রষ্টার কথা ভুলে যান, আর দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আপনাকে ত্বরান্বিতভাবে স্রষ্টামুখী করে বা জাগরণ করে। আল্লাহ্‌পাক কোরআনের সূরা ইনশিকাকের ৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন :- হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তাঁর সাক্ষাত ঘটবে"। অর্থাৎ দুঃখের পর রয়েছে সুখ"। তাই দুঃখ যদি আপনার তকদিরে থেকে থাকে, ইহাকে মন্দ জানবেন না। ইহার প্রতি আপনি কাতর বা ভেঙ্গে না পড়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ঝড়ের সময় যে গাছটি বাতাসের সঙ্গে তাল মিলাতে পারে, সে গাছটি ভাঙ্গে না। সব ঝড় আপনার জীবনে ক্ষতি করতে আসে না, কিছু কিছু ঝড় আসে আপনার প্রাপ্তিকে সহজ করে দিতে। যেমন ঝড় থেমে যাবার পর আমরা সুন্দর ঝলমলে রঙিন পৃথিবী দেখে থাকি যা পূর্বে থেকে আরও সৌন্দর্য ও মাধুর্যময়। তাই দুঃখ হয়তো কোন কল্যাণের জন্য মওলার পক্ষ থেকে আর্বিভূত হয়, এভাবে মনে সবসময় পজিটিভ ভাববেন। কারণ মওলা আলী (আঃ) বলেছেন :- "যারা আহলে বায়াতে সমাসীন থাকবে, তাদের সদা-সর্বদা দুঃখ-যন্ত্রণা, নিপীড়ন, উৎগীরণ, যাতনা, রোগ-শোক এগুলো বহন করতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে"।

তাহলে এই আহলে বায়াতকৃত ব্যবস্থায় মওলার যে মূলধারা, সেটা হলো প্রজ্জ্বলনকৃত একটি ধারা। এখানে দেখা যায় অর্থাৎ ফাঁকি-ঝুঁকি নেই। তাই রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর সেই অমীয় বাণী ৭৩ ফেকরা বা কাতার যে বিভাজনকৃত ব্যবস্থার ফায়সালা, আমরা আজ গোলক ধাঁধায় পড়েছি। কারণ আজকের জামানাতে যত দল আর মতের সৃষ্টি হয়েছে, সবাই বলছে যে আমরাই ঠিক, আমরাই একমাত্র রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর অনুসারী স্বয়ং আমি নিজেও বলছি। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি ? আমি যে ইহা বললাম, আমার দেওয়া আমলনীতিগুলো আপনি যদি এনালাইসিস বা অনুশীলন করেন এবং করবার পর যদি আপনার ভিতরে প্রজ্জ্বলনকৃত একটি ধারা বয় অর্থাৎ বন্ধ চোখের দৃষ্টিতে যদি কিছু দেখতে পারেন, তাহলেই তো আপনার বিশ্বাস বা একীন আমার কথার প্রতি পূর্ণ হবে, না কি বলেন পাঠক বাবা-মায়েরা ? আর যদি ইহা না থাকে, শুধু কথা বলি কিন্তু কার্যকারিতা নেই, এগুলো বলার মত অনেক লোক রয়েছে।

তাই কথার মালা দিয়ে এই ধর্মের পূর্ণতা পাওয়া যাবে না। তাই ফকিরি অনুশীলন হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুশীলন ইহা ভাল করে মনে রাখবেন এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক। সবার জন্য এক রকম আমল নাও হতে পারে। কেন ? কারণ সবার বহন করার মত শক্তি এবং জ্ঞান এক নয়, এই কারণে যে সকল পীর, ফকির বা ওলি মাশায়েখগণের কাছে অনেক ভক্ত বা অনুসারী থাকে কিন্তু সবার আমলনীতি এক রকম থাকে না। কারণ পীর ভক্তের বা অনুসারীর জ্ঞানের পরিমাপ করে তাকে নির্ধারণকৃত একটি আমলের উপর পরিচালনা করতেই চেষ্টা করেন। এভাবেই আমল নীতিগুলো দেওয়া হয়। তাই এই মূলধারার বিষয় হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে ত্বরান্বিত করেন। একটি মানুষ যেন শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বাকে বিদূরীত করে মওলা সত্ত্বা অর্থাৎ রুহের সৃজনকৃত অবয়বে নিজেকে নির্মিত করতে পারে, এই ফায়সালা দুনিয়াতে করবার অনুশীলনই করে থাকে ফকিরি বা এই পীরতন্ত্র আহলে বায়াতে অনুশীলন। তাই এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে আমরা যেন সবাই মনোনিবেশ করতে পারি। ধর্মকালের রাজা ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই এই নির্দেশনামা সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তাই প্রথম তিনটি আয়াতে তাঁর এই প্রশংসা সূচক বাক্য এবং তাঁর যে নামের দুইটি রূপ রহ্মান ও রহিম এবং সে যে ধর্ম কালের রাজা, সেই ধর্মের উপর আমাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুপ্রাণীত করছে। সকল প্রশংসাই তাঁর, এই সকল প্রশংসাই বা অনুশীলনগামী, যাই কিছু করি না কেন মূল উদ্দেশ্য থাকবে তাঁর

প্রতি। এই সকল আলোকপাতের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো একমাত্র তাঁর উপাসনা বা তাঁর দাসত্ব। তিঁনি ভিন্ন অন্য কোন প্রশংসা নাই, অন্য কোন কথাই থাকে না। তাহলে সবকিছুর মূলে এই একটি কথাতে সমাসীন হয় আর তা হলো, একমাত্র দাসত্বের উদ্দেশ্যেই আমাকে বা আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই দাসত্ব ভিন্ন কোন দাসত্ব নয়, ইহা হলো আল্লাহ্‌রই দাসত্ব। তাই আল্লাহ্‌র দাসত্ব যেন পূর্ণতা পায়, এজন্য আমরা সেদিকে একটু চেষ্টা করব। সীমিত সময়ের মধ্যেও অন্তত যে সকল মোরাকাবা মোশাহেদা রয়েছে, এগুলো এনালাইসিস বা প্রাকটিক্যাল করলে এই মানুষ বুঝতে পারবে।

জীবনে আমরা বেশির ভাগ মানুষই অনেক সময় পাই, তার মধ্যে নিজের জন্য চারমাস, একবছর এরকম একটি মোরাকাবার মাধ্যমে যদি ব্যক্তিগত একটি উন্মেষ ঘটানো যায়, তাহলে নিজের চোখের চৈতন্য দ্বারা অনেক কিছু দেখা যায়। এই দেখা অর্থ আপনি কামেল তা নয় কিন্তু আপনার ঈমানের পূর্ণতার একটি অবগাহনে সিক্ত হবেন। এই সিক্ত হলে আপনি যে সঠিক গাইডেন্সের উপর নিজেকে দন্ডায়মান করেছেন, এটাই আপনার বিশ্বাস বা একীন এবং ইহাই আপনার মনোরাজ্যে শান্তি। তাই ভাববাদীরা বলছে যে, সকল প্রসংশা সেই মহান রব্বুল আলামিনের যিনি মৌন জগতের রব।

তাই আমি মনে-মনে যদি স্রষ্টাকে মানি ইহা বলার প্রয়োজন পড়ে না বা দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না। আমারটা আমার কাছেই উপলব্ধি থাকে, আমার কাছেই ইহার ফায়সালা থাকে। তাই আমরা যেন সঠিক আকিদার উপর চলতে পারি এবং বলতে পারি। আর পাঠক বাবা-মায়েদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ করবো, যারা এখনও আহলে বায়াতে দাখিল হন নি, তারা একজন কামেল পীর বা গুরুকে নির্ণয় করে তাঁর কাছে মুরিদ হবেন। যেহেতু আমরা এই পথের অনুসরণ করি, তাই এই পথের নির্দেশনামাটা বলে দিয়ে থাকি (আমি নিজে) দায়িত্বরত হবার জন্য। এই পথেই প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে। যেহেতু জগতের সকল ওলিগণের রাস্তাই হলো যে, এই আহলে বায়াতে দাখিল হওয়া। পাঠক বাবা-মায়েরা তাই ওলিদের পথকে আমরা সত্য বা এ্যকুরেটভাবে মেনে নিয়েছি বা গ্রহণ করেছি, এজন্য ওলিদের কথা বলি। আর যে শ্রেণী বৈষম্য বলছে যে ওলি ধরতে হবে না, ওটা তাদের বিশ্বাস আর একীন, তারা তাদেরটা করবে। তাহলে আমাদের বয়ান থাকে হলো ওলিদেরমুখী করা, ওলিদের

নির্দেশনামাগুলো এরকম। তাই যারা শয়তানি সত্ত্বাকে বিদূরীত করে মওলা সত্ত্বাকে ত্বরান্বিত করছে, তাঁরা দুনিয়ার জিন্দিগিতে প্রমাণ দিয়ে গেছেন, তাঁরা রেখে গেছেন। যেমন আবু মুসা ইবনে মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন :- "আনাল হক" অর্থাৎ আমিই সত্য বা আমিই পরম সত্ত্বা। বুঝতে পারছেন তো পাঠক বাবা-মায়েরা ?

তাই আজকের জামানাতেও আপনি যদি এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় নিজেকে ত্বরান্বিত করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন। তাহলে ইহা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আদর্শের মধ্যে আছে। কারণ আমরা জেনেছি যে রসূল (সাঃ) (আঃ) হেরা পর্বতের গুহায় যে আত্ম অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় লিপ্ত ছিলেন, এই আদর্শ বা আমল নীতি থেকে মানুষকে সরানো হয়েছে বা আড়াল করা হয়েছে। যার কারণে এই সত্য অবলুপ্তির দিকে চলে গিয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র ওলিরা ইহাকে রজ্জু করে ধরে রাখছে বা রেখেছেন। তাই এই হেরার সাধন-ভজনের মাধ্যমেই এই আত্মার উন্মেষ ঘটে, এই মূলধারা এভাবে জাগরিত হয়। তাই আমরা যেন সঠিক সত্য আকিদার উপর নিজেদেরকে দন্ডায়মান করতে পারি সবাই সেই প্রচেষ্টা করবেন।

৪) ইয়্যাকানাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন। অর্থ :- আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই (মোস্তানী) সাহায্য চাই। ৫) ইহ্‌দিনাস সেরাতাল্‌ মুস্তাকিম। অর্থ :- আমাদেরকে দান কর সঠিক পথ (সেরাতাল মুস্তাকিম)। ৬) সেরাতাল্লাজিনা আন্‌আমতা আলাইহিম। অর্থ :- তাঁহাদের পথ যাহাদের উপর তোমার নেয়ামত দান (প্রাপ্ত) করা হইয়াছে। ৭) গাইরিল মাগ্‌দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্‌ দোয়াল্লীন। অর্থ :- যাহারা তোমার নিকট পথভ্রষ্ঠ নয় এবং বিপথগামীও নহে।

তাহলে কোরআনুল মাজিদের সূরা ফাতিহার চতুর্থ নাম্বার আয়াতে বলা হলো :- "ইয়্যাকানাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন। অর্থ :- আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই (মোস্তানী) সাহায্য চাই। এখন এই কথার তারতম্য যদি আমরা একটু ব্যাপকভাবে বুঝতে যাই তাহলে এই বিষয়টা বুঝতে সহজ হবে। যেমন :- সবাই আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবাদত বা উপসনা করে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাই। তাহলে এই উপাসনা যদি আল্লাহ্‌র কাছে গৃহিত হয়, তাহলে সেই উপাসনাটা এই আয়াতে কালামের স্বার্থকতা। যেহেতু বিভিন্ন ওলিয়ে কেরামগণ তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে বা কিতাবস্ত

করেছেন যে, সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কোরআন অর্থাৎ কোরআনুল মাজিদের মা বলা হয়। কোন কোন ওলিগণ ইহাও বর্ণনা করেছেন যে, সমগ্র কোরআনের মানদন্ডকে একত্রিত করে সারাংশ হিসাবে যে সূরাটা দাঁড় করানো হয়েছে, সেই সূরাটির নাম হলো ফাতিহা। অর্থাৎ সমগ্র কোরআনের মূল বাণীকে সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে ইহা সার্বজনীন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সূরার দুইটি অংশ, প্রথম অংশ খোদাতাআলার বিশিষ্ট প্রশংসা এবং তাঁর নামে যে রূপের বর্ণনা এবং উনি যে দ্বীনের মালিক এই বিষয়গুলো আলোকপাত ছিলো। তাহলে আজকে বলা হচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তাঁরই এবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাই এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করি। আসলে মূলত আমরা যে আল্লাহ্‌র এবাদত করি, এই আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রমাণটা কি ?

আয়াতে কালামে কোরআনুল মাজিদের সূরা মমিনের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "ওয়া কালা রব্বুকুম উদউনী আস্তা জেবলাকুম" অর্থ হলো তুমি একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তো আমি যদি তাঁরই এবাদত করি তাহলে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে সূরা মমিনে ইহা বলা হয়েছে। যদি ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব না পাই, তাহলে আমি যে একা হতে পারলাম না। আমি যে একমাত্র তাঁরই এবাদত করি, কিভাবে একমাত্র তাঁর এবাদত করতে হবে ? তাহলে এই বিষয়টা পরিষ্কার করতে আমরা ভাববাদী বিচারীক কিছু বিশ্লেষণ টানব।

এই দেহের মধ্যে একটি মানুষ, সেই মানুষের মধ্যে তিনটি অবয়ব জারীকৃত রয়েছে। প্রথম হলো নফ্‌স, এই নফ্‌স সত্ত্বাটাই হলো আমি সত্ত্বা। দ্বিতীয় হলো আমার সঙ্গে শয়তান রয়েছে। শয়তান, খান্নাস, ইবলিশ, মরদুদ এই চারটি নামের বিশেষণে আমরা যাকে শয়তান বা মন্দ বলি, এই মন্দ সত্ত্বাও আমারই মধ্যে বিরাজিত। আর একটি হলো মওলা সত্ত্বা অর্থাৎ আল্লাহ্ সত্ত্বা রুহ রূপে আমার মধ্যে বিরাজিত। তাহলে একা হতে হলে একটি মানুষের একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা বা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করতে হলে এই মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে হবে নচেৎ একা হয় না বা আল্লাহ্‌র এবাদত হয় না। যার কারণে সবাই এবাদত-বন্দেগীই করে কিন্তু এবাদতের পূর্ণতা ফলে না।

তাই সাধকগণ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধনার কার্য দ্বারা এগুলোকে ত্বরান্বিত করে একটি মানদন্ড দাঁড় করছে, যাতে মানবগণ এই সাধকদের অর্থাৎ সংবিধানটুকু বা সাধকদের ফর্মুলাটুকু যদি দ্রুতগামী একটি ব্যবস্থার দিকে নিতে চায়, তাহলে এটার উপর অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সময় মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে প্রচেষ্টাগামী পথে অনুশীলন করলে এটার ফলটা পূর্ণতা পাবে। এভাবে বলা হয়েছে যে মন্দ সত্ত্বাকে নিজের দেহ ভান্ড থেকে দূরীভূত করলে থাকে দুইটি সত্ত্বা অর্থাৎ আমি সত্ত্বা এবং আল্লাহ্ সত্ত্বা। এই দুইটি সত্ত্বা একত্রিত হলে এই আল্লাহ্‌র এবাদত হয়। অর্থাৎ আমরা যে বলছি বা সূরা ফাতিহাতেও বলা হয়েছে যে একমাত্র তোমারই এবাদত করি। এই “একমাত্র” নির্দিষ্ট করতে হলে এই মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে হবে, নচেৎ আরেকটি ফর্মূলা রয়েছে, সেটা হলো রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে:- “প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন করে শয়তান নিহিত রয়েছে। তাহলে এক সাহাবা প্রশ্ন করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাহলে কি আপনার সঙ্গেও!” এইটা বলতেই হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) আর দেরী না করে বললেন যে, হ্যাঁ আমার সঙ্গে একজন শয়তান ছিলো, তাকে আমি মুসলিম বানিয়ে ফেলেছি। পাঠক বাবা-মায়েরা বুঝতে পারছেন তো, তাহলে এই মুসলিম করতে হলে যে মন্দ সত্ত্বা আছে, এটা জাগরিত করতে, এটাকে ধরতে হবে, এটাকে দেখতে হবে, এটাকে বের করতে হবে, না হলে তাকে কিভাবে মুসলিম করবো ? মুসলিমের শর্ত হলো এই কলেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূল্লাল্লাহ” (সাঃ) (আঃ)। অর্থাৎ আমরা যে কলেমার দ্বারা মুসলিম অনুপ্রাণীত হই বা আমরা এই কলেমা পড়ি।

আমার সঙ্গে পূণ্য সত্ত্বা আছে, সেটাতো আমার কাছে অজানা-অদেখা অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি অদেখা বিশ্বাস, কিন্তু সেটার তো জাগরণ নেই। তাহলে আমি যে সত্ত্বা, আমার ভিতর থেকে কে কথা বলে ? বা আমার ভিতর থেকে তো কেউ একজন শ্বাস- প্রশ্বাস নিচ্ছে, তাহলে এই সত্ত্বাটা হলো মওলা দ্বারা পরিচালিত হয় যা আমার অজানা রয়েছে। তাহলে আমি সত্ত্বাকে এই পূর্ণতার দিকে নিতে হলে অদেখা সকল কিছুতে বিশ্বাস আনতে হবে। ইহাকে যদিও একীনের ধারাতে বলে, ইহা অদৃশ্যবাদ বা বেল গায়েব। একীন অর্থাৎ অদেখা একীন, এই দেখার কোন মূল্য নেই। তাদের দেখাটা যদি আরেক রকম হয়ে থাকে, আর এই অদেখাটার বর্ণনা শুনছি এক রকম আর দেখা বা দর্শনবাদ

যদি হয়ে যায় আরেক রকম তখন এখানে কন্ট্রাডিকশন হবে বা বিপরীত একটি সাংঘর্ষিক ব্যবস্থা জারী হতে থাকবে। এজন্য অদেখা ঈমান আনবার পরে, সেই ঈমানকে মজবুত বা দৃঢ়করণ করতে দেখার পদ্ধতিতে বা অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় যেতে হবে। তাহলে এই শয়তান বা মন্দ সত্ত্বাকে মুসলিম করতে হলে তাকে কলেমা পাঠ করিয়ে মুসলিম করতে হবে। তাহলে কলেমা পাঠ করেই যে মুসলিম হবে ইহারও তো একটা সারকথা রয়েছে।

ভাববাদী বা দর্শনবাদে যারা, তাঁরা বলছে যে কলেমা স্রষ্টার থেকে প্রণীত হয়। কোন সাধক যদি তাঁর সাধনালব্ধ ক্রিয়া-কলাপের কার্যাবলী দ্বারা সে নিজেকে অনুপ্রাণীত বা ত্বরান্বিত করতে পারে, তাহলে স্রষ্টা রাজীখুশি হলে তার কাছে এই কালামপাক বা কলেমা জারীকৃত হয়, অর্থাৎ তাঁকে দায়িত্ব বা এজাজত দেওয়া হয়। রসূল (সাঃ) (আঃ) নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত এগুলোর দাওয়াত দেন নি। তিঁনি কিসের দাওয়াত দিয়েছেন ? কলেমার দাওয়াত দিয়েছেন। অর্থাৎ এই কলেমা হলো সৃষ্টি ধারার মূল। তাহলে এই সৃষ্টির মূলকে একত্রিত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা বা দাসত্ব করতে হবে, এই দাসত্ব করতে হলে ওলি বা সুফিদের মতে বলা হয়েছে যে, এই মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বাকে মানব দেহ থেকে দূরীভূত করতে হয় বা তাকে কলেমা পড়িয়ে মুসলিম করতে হয়। এই তাকে দূরীভূত করলে বা কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করলে তখন স্রষ্টা সত্ত্বা জাগরিত হয়। তখন থেকেই বান্দার সকল কার্য সালাত বলে গণ্য হয়। আর এই অনুশীলনগামী পথে যিনি থাকেন, তিনিও এক ধরনের সালাতে লিপ্ত থাকেন যাকে বলা হয় দায়েমী বা সার্বক্ষণিক কার্য। ইহাই পবিত্র কালামুল্লাতে জারী হয়েছে।

কোরআনে ইহাকে (দায়েমী সালাত) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। ইহাকে আল্লাহ্‌পাক কোরআনুল মাজিদে মুসল্লী খেতাবে ভূষিত করেছেন। তাহলে এইভাবে একটি মানুষের বা মানবের ভিতর থেকে যখন মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বাকে দূরীভূত করা যায়, তখনই মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কারিকুলামের পূর্ণতা হয়। এই পূর্ণতা হলে তখনই এই আয়াতে কালামের তারতম্য বা স্বার্থকতা প্রতিফলিত হয় যে, “আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি। বুঝতে পারছেন তো পাঠক বাবা-মায়েরা কিভাবে এবাদত করতে হয় ? তাহলে এর আগে অর্থাৎ ইহাকে (মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বা) যদি দূরীভূত করা সম্ভব না হয়, “তাহলে আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি” এই কথার স্বার্থকতা থাকে

না। আমি যদি সারা দিন-রাত ইহা বলতে থাকলে হয়ত নেকী বা সওয়াব হতে পারে কিন্তু ইহার স্বার্থকতা আমার সামনে কখনই উদ্ভাসন হবে না। কেন ? কারণ এখানে শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। তাহলে এই সময়টা একজন মানবকে এরকম একটি যোগ্যতায় ত্বরান্বিত বা সমাসীন হতে হবে। তখনই যদি সে এই পদে সমাসীন হয়, তখন দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে সে সাহায্য চায় না। যেমন আমাদের রসূলপাকের (সাঃ) (আঃ) একটি নীতি নির্ধারণী ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম অনুপ্রাণীত হয়েছে। যুদ্ধ-বিদ্রোহ থেকে শুরু করে যত রকম জঞ্জাল, ফেতনা-ফেসাদের মাধ্যম দিয়ে এই ধর্মকে দাঁড় করিয়েছিলেন।

তাহলে এই ধর্মের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) (আঃ) কিন্তু কোন মানুষের কাছে সাহায্য চায় নি। অর্থাৎ আমাদের ধর্মের মূল আদর্শ মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)। আমাদের ধর্ম যদি ইসলাম হয়ে থাকে, তাহলে এই আদর্শই হলো পূর্ণতার একটি নিদর্শন এখানে রাখা বা নিহিত রয়েছে। সকল ওলিগণের আদর্শ ইহাই দেখা যায় যে, স্রষ্টার থেকে একমাত্র সাহায্য চায়, বস্তবাদের জাগতিক কোন মানুষের কাছে সাহায্য ভিখারী হয় না যে, আমার মহান আল্লাহ্ যেভাবে চালাবে, তিঁনি যাহাতে সন্তুষ্ট, আমিও তাহাতে সন্তুষ্ট। তাহলে এই আয়াতে কালামের স্বার্থকতা এবং কোরআন যেহেতু মানব মন্ডলীর জীবন বিধান বা সংবিধান। তাহলে নিজের জীবনের সঙ্গে অর্থাৎ এই সুফিজমের যে বিধান বা ধর্ম, এই ধর্মটা হলো দেহ কেন্দ্রিক অর্থাৎ দেহের উপর যদি ধর্মীয় অবয়ব সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি বাস্তবায়ন বা ধারণ হয় তবেই ধর্মের পূর্ণতা তাঁর কাছে প্রতিফলিত হবে, উদ্ভাসন হবে, জাগরণ হবে বা সে দেখতে পারবে, তাঁর কাছে দৃশ্যায়ন হবে। এখানে ধোঁকাবাজীর কোন অবকাশ নেই বা বয়ানেরও কিছু নেই। বই পুস্তক পড়ে হয়ত পুথিগত বিদ্যায় জ্ঞানী হওয়া যায়। কিন্তু এই উদ্ভাসন প্রক্রিয়াটা নিজেকে ত্বরান্বিত করতে হয় বা সেই কার্য করতে হয় এবং এখানে যদি স্রষ্টা সন্তুষ্টি জ্ঞাপন হয় এবং নিজেকে যদি সেই যোগ্যতায় সমাসীন করা হয় তবেই ইহার পূর্ণতার প্রতিফলন বা বাস্তবায়িত হবে।

তাহলে এভাবে আয়াতে কালামের পূর্ণতা রয়েছে যে, আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাহলে তাঁর এবাদত করা এবং তাঁর সাহায্য করার পূর্বে এই যোগ্যতাটুকু মানুষের জন্য জরুরী রয়েছে, যা আজকে যারা আমাদেরকে

ধর্মীয় দর্শনবাদে বা ধর্মের দিকে অনুপ্রাণীত ব্যবস্থায় শিক্ষা দান করে চলেছে, তারা এই এইভাবে আসলে আমাদের শিক্ষা দেয় না। তাহলে এইভাবে শিক্ষা বিস্তারটা রয়েছে। আহলে বায়াতে বা সুফি মতাদর্শে যারা লালিত হয়েছে, তাঁরা এই দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষাগুলো দিয়ে যাচ্ছে। সে যেটাকে গৃহিত বলে মনে করছে, সে সেটা নিচ্ছে। কেন ? কারণ পরকালীন জিন্দিগিতে কেউ কারও হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে না, নিজের হিসাবটুকু নিজেকেই দিতে হবে এবং আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছে পরীক্ষা স্বরূপ। তাই তাঁর পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ বা সফল হয়। তাহলে সে পরকালীন জিন্দিগিতে সে পুরস্কৃত হবে আর যদি সে বিফল হয় তাহলে শাস্তিতে সমাসীন হবে, ইহা তো আল্লাহ্র সুস্পষ্ট ঘোষণা।

তাহলে এই ঘোষণা অনুযায়ী আমরা বাস্তবায়ন রূপের দিকে যদি যেতে চাই, তাহলে এই কালামপাকের মূলধারা হলো যে, আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি, তোমারই উপাসনা করি বা তোমারই দাসত্ব করি এবং সাহায্যও তোমারই কাছে চাই। তাহলে এই সাহায্য চাওয়া এবং একমাত্র তোমারই উপাসনা করি’ এই ঘোষণা দিতে হলে আমাকে সেই যোগ্যতায় সমাসীন হতে হবে, যেহেতু সংবিধান বলছে। সংবিধানের মূল হাকিকতটুকু এভাবে গোপন রাখা রয়েছে। কেন ? কারণ সার্বজনীন ব্যবস্থায় সবার জ্ঞানসীমাটুকু সমান নেই। তাই যারা ভাববাদী ব্যবস্থার দিকে অনুপ্রাণীত হবে এবং এই ধারাকে বুকে লালন করে অর্থাৎ প্রচেষ্টা করবে, নিজেকে ত্বরান্বিত করে একমাত্র তাঁর বন্দেগী কিভাবে করা যায়, সেটার পূর্ণতা কিভাবে প্রতিফলিত বা বাস্তবায়িত হয়, সেই ভাবধারার দিকে যখনই নিবে, তখনই এই একমাত্র তাঁর উপাসনা হয়। তাহলে এভাবে আমরা আয়াতে কালামের অর্থটুকু বা বিস্তারিত সামান্য ব্যাখ্যা আলোকপাতটুকু এভাবে বুঝলাম।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে যে :- “ইহ্দিনাস সেরাতাল্ মুস্তাকিম”। অর্থ :- আমাদেরকে দান কর সঠিক পথ (সেরাতাল মুস্তাকিম)। তাহলে এখন প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে, “সেরাতাল মুস্তাকিম” কি ? আপেক্ষিকতার জাগতিক অনুবাদগুলোতে রয়েছে যে, সরল সোজা পথে আমাকে পরিচালিত কর। তাহলে স্রষ্টা সরল সোজা পথে কিভাবে পরিগণিত করবে ? কেন ? আমি প্রতিনিয়ত আমার ঐ মন্দ সত্ত্বা অর্থাৎ মূলধারার কথাগুলো একই

প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এজন্য আমার পীরে বলেছেন যে, "নিজের সঙ্গে থাকা খান্নাস থেকে মুক্ত হওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ"। তাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, নিজের ভিতরে থাকা এই খান্নাস রূপী শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করাই হলো ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য"। তাহলে এই "সেরাতাল মুস্তাকিম" বলতে আমাকে সরল সোজা পথে ধাবিত কর, এই প্রার্থনাটুকু আমি করি। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক প্রথমেই বলেছেন যে, তুমি খান্নাস হতে মুক্তি নাও, তুমি শয়তানি সত্ত্বা হতে বিদূরীত হও, তুমি অহংকারীত্ব থেকে পরিত্রাণ থাকো। ইহার অর্থ হলো যে, ইবলিশ সত্ত্বা থেকে তুমি বিদূরীত হও। আর হলো এই খান্নাস, এই খান্নাসী সত্ত্বা হলো কুমন্ত্রণাদাতা এক কথায় বলা যায় যে, ইহা মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত ধোঁকা দেওয়ার জন্য রক্তের প্রতিটি সূক্ষ্ম কণার সঙ্গে মিশে থাকে এই খান্নাসী সত্ত্বা। যে কারণে বলা হয়েছে যে, আমাকে তুমি (আল্লাহ্) সরল সোজা পথে গ্রহণ করো।

তাহলে সরল সোজা পথে যতই আমি সাহায্য প্রার্থনা করি বা আমি আবেদন করি কিন্তু মহান আল্লাহ্‌পাক তো শর্ত দিয়েছেন যে, আমার এই প্রার্থনাটুকু কার্যকরি করার জন্য তোমাকে এই মন্দ সত্ত্বা থেকে দূরীভূত হতে হবে বা নিজেকে পবিত্রতার সোপানে দাঁড় হতে হবে। কারণ পবিত্র হলেই তোমার এই মন্দ সত্ত্বা দূরীভূত হবে, তবেই প্রার্থনাটুকু আমার কাছে পৌঁছাবে। তাহলে আমরা এই জীবনভর অর্থাৎ জন্ম থেকে আজ অবধি যে অবয়ব নিয়ে পরিচালিত হচ্ছি, এই পরিচালিত হলো অন্ধ বিশ্বাস অর্থাৎ ধোঁকা। কখনই এভাবে বাস্তবতার নিরীখে এগুলোকে মিল করি নি বা এই আয়াতে কালামকে নিজের বাস্তব জীবনে কিভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেই ধারাতে অনুপ্রাণিত হয় নি। তাই বলা হয়েছে যে, সাধক যখন তার এই মন্দ সত্ত্বা থেকে মুক্তি হয়, যখন সে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। "পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়" বলতে এখানে মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বা দূরীভূত হলেই সেই দেহটা "মুবারক" হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বর্ণনা করেছেন যে :- যিনি পবিত্রতা অর্জন করলো, তিনি কল্যাণপ্রাপ্ত। তাহলে এই কল্যাণ প্রাপ্তের প্রথম এবং প্রধান শর্তই হলো আপনার এই মন্দ সত্ত্বা থেকে নিজেকে আলাদা করা, পৃথক করা, সেপারেশন করা। এই সেপারেশন করতে পারলে মন্দ সত্ত্বাটা দূর্বল হয়ে যায়, দূর্বল হলে সে আস্তে আস্তে বিদূরীত হয়।

আর সাধকগণ বলেছেন যে, এই একমাত্র পথই রয়েছে হলো যে, মানব হয়ে মানবের পূজা বা উপাসনা করা, মানব ভজাই হলো এই মন্দ সত্ত্বাকে দূর্বলের একমাত্র পথ, ইহা সাধকের বাণী। এর কারণ হলো মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হয়, ইহা লালন সাঁইজি তাঁর কালামে বর্ণনা করেছেন। তাহলে মানুষ ভজ। এজন্য গুরুবাদী বা পীরতন্ত্রে দেখা যায় যে, একজন মানুষের কাছে আরেকজন মানুষ সারেন্ডার বা আত্মসমর্পণ করে। কেন ? কারণ এই সরল সোজা পথকে প্রাপ্তির জন্য তার নিজের যোগ্যতার একটি মানদন্ডে দাঁড় করবার অভিপ্রায় রচনা করবার মানুষিকতা নিয়েই সে এই কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করে, যার জন্যই এই পথে অনুগামী হয়। তাহলে এইভাবে যদি নিজেকে দাঁড় করা যায়, তাহলেই এই সরল সোজা পথ। এখন মুস্তাকিম কি ? নাস্তাইন থেকে মুস্তাকিমের উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় একটি নাম হলো এই মুস্তাকিম। যাকে বিভিন্ন মাশায়েখগণ “মাস্তান” বলে খ্যাতি করছেন বা দিয়েছেন। মুস্তাকিম হলো পূণ্যতার একটি বিশেষণের খেতাব। তাই এই পূণ্যতার বিশেষণের খেতাব জারী করতে বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করো, কখন সাধক ইহা বলতে পারে ? যখন তাঁর ভিতর থেকে মন্দ সত্ত্বা বিতাড়িত হবে, সেই এই যোগ্যতায় যাবে, তাই স্রষ্টার কাছে তার এই প্রার্থনা।

কারণ সূরা ফাতিহা হলো প্রার্থনা এবং স্রষ্টার গুণ-কির্তনের উপর এই সূরাটার বেশী আলোকপাত করা হয়েছে। তাহলে এই প্রার্থনাটা কখন ? স্রষ্টার গুণের পরেই এই স্তরগুলো আসছে। যেহেতু প্রথমেই বলা হলো যে, :- আমি একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই (মোস্তানী) সাহায্য চাই। অপর আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে যে :- আমাদেরকে দান কর সঠিক পথ (সেরাতাল মুস্তাকিম)। অর্থাৎ আমাদেরকে তুমি মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করো বা কবুল করো। ইহাও প্রার্থনা বলি, বুঝতে পারছেন তো পাঠক বাবা-মায়েরা ? তাহলে মুস্তাকিম কি ? আমরা জানলাম মুস্তাকিম আল্লাহ্‌র পছন্দের বা তাঁর কাছে প্রিয় একটি নাম এই মুস্তাকিম এবং নাস্তাঈন থেকে মুস্তাকিম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। জগতে যত সালেক, মজযুব (ঐশী প্রেমে বেহুঁশ), পাগল বেশে আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে কাজ করে, এই তারাও এই মুস্তাকিমের পথকে অনুস্মরণের জন্য বা মূলকে প্রাপ্তির জন্য স্রষ্টার পথ অনুশীলন করে।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে :- "একদা রসূল (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে, অনেকেই আছে নামাজ, রোজার দিকে পরিগমন হয় না কিন্তু স্রষ্টার মূলধারার দিকে সে চেয়ে থাকে। তাঁরা ইহজগতের কোন শান্তি এবং সুখ কখনই চাইবে না। কিন্তু তাঁরা মূলধারাকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরবে যেন তাঁরা চাইলে আল্লাহ্‌পাক না দিয়ে সেটা পারে না। জগতের সভ্যতার মেকীতে আমরা এরকম মজযুব দেখে থাকি। তাদের চলাফেলা সমাজের সাধরণ মানুষের মত নয়। কখনও কখনও যদি ভাগ্যে থাকে,তাহলে তার দর্শন হয়, এভাবেও রয়েছে।

তাহলে তাঁরা কিন্তু এই দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য অনুপ্রাণীত ব্যবস্থায় রয়েছে, কিভাবে স্রষ্টার মূল নিশানাকে মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই কার্যক্রম পরিচালিত করে। অর্থাৎ তাঁদেরও একটা ডিউটি বা দায়িত্ব রয়েছে। তাহলে এই দায়িত্বটা স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞান দ্বারা বা স্বাভাবিক দৃষ্টির চোখ দ্বারা ইহা বুঝা যায় না বা দেখা যায় না। তাহলে ইহা ধরতে হলে এবং জানতে হলে যে ব্যক্তি নিজে অনুশীলনগামী পথে আছে এবং নিজেকে পবিত্রতার সিঁড়িতে দেহকে মুবারক করতে পেরেছে, তাঁর দৃষ্টিতেই ইহা ধরা পড়ে। সে উন্মাদ বা পাগল হিসাবে ডাইভার্ট হয়ে তাঁর গতিতে সে পরিচালিত হয়। এভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। তাহলে ইহা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত।

তাহলে জগত সংসারে আসলে মূলধারার অনুশীলনগামী একটি ব্যতিক্রম পথ নিয়েই অনুসারীত বা পালনতব্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এই কিছু কিছু মানুষ যারা দশের বাহিরে এগার তারাই পরিচালিত হয়। আজকে আমাদের যে সুফিজম বা সুফির মূল মতাদর্শ, ইহাও কিন্তু একটি ব্যতিক্রম ধারা। কেন ? কারণ আমরা জগত সংসারে স্বাভাবিক সমাজ-সংসার থেকে শুরু করে যে পরিবার কেন্দ্রিক ব্যবস্থায়নের মধ্যে একটি মানদন্ড পেয়েছি, সেই ধারাতে কিন্তু এই সুফিদের মতাদর্শ কখনই পড়ে না। ইহা কি ? আত্মার অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় কিভাবে নিজেকে মুক্ত করবো, এই আয়াতে কালামের তারতম্যের সঙ্গে এটাকে একটি পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারবো, সেই ভাবধারার দিকে অনুপ্রাণীত হতে তখন আর এই বিষয়টার গুরুত্ব থাকে না। কারণ তাহাকে যে স্বাদ আস্বাদন করে, এই স্বাদের উপরে আর কোন স্বাদ নেই। অর্থ হলো যে, জগতে যত কিছু

রয়েছে তার চেয়ে অধিক হলো স্রষ্টার স্বাদ। পাঠক বাবা-মায়েরা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন! অর্থাৎ স্রষ্টার এবং সৃষ্টি দুইটা রূপ, সৃষ্টি একটি অবিনশ্বর বিন্দু কণার চাইতেও ক্ষুদ্রতম কিছু হতে পারে কিন্তু স্রষ্টা তো মূল। যাদের মধ্যে বা ভিতরে মূলের একটি জালুয়ার প্রজ্জ্বলন ঘটবে, তাহলে তাঁর কাছে তো আর সৃষ্টির কোন মূল থাকতে পারে না। সে স্রষ্টাকেই মূল্যায়ন করে, যার জন্য ব্যতিক্রমটা হয়। কিন্তু আজকে আমাদের যে মতানৈক্য বা মতাদর্শের মধ্যে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে, ইহা হলো নিজেদের আখের বা স্বার্থ হাসিলের জন্য, তাছাড়া অন্য কিছু নয় বৈকি। কেন মতানৈক্য হইবে ? আসলে যার যার মূল স্বাধীনতা তার স্বাধীন সত্ত্বাতে তার ধর্ম কার্যকরি এবং পরিচালিত হবে, কারণ আল্লাহ্পাক প্রতিটি মানুষকে স্বাধীন সীমিত ইচ্ছা শক্তি দিয়ে আমাদের প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্পাক পবিত্র কালামে সূরা বাকারা-এর ২৫৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, :- "লা ইক্রাহা ফি-দ্বীন" অর্থ ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি (বল প্রয়োগ) নেই"। তাহলে ইহার বাস্তবায়ন না করে আপেক্ষিকতায় কেন আপনি বল প্রয়োগ করেন ? ইহার খবরদারী কিন্তু এই ধর্মে নেই। কেন ? কারণ রসূল (সাঃ) (আঃ)- তাঁর ধর্ম যে মানুষকে হেদায়েতের পথে নিয়েছেন, সেটা হলো তাঁর আদর্শ দ্বারা, সুন্দর আচরণ দ্বারা তাঁর কার্যাবলীকে যখন মানুষ সকল কিছুর সঙ্গে তুলনা বা কমপেয়ার করে সৌন্দর্য লাভ করেছে, তখনই না সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তাঁর দিকে অনুপাণীত এবং মুরিদ বা বায়াত হয়েছে। এভাবেই এই ধর্মে বিস্তার লাভ করছে।

এজন্য আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রদের যে রাস্তা, সেই রাস্তার দিকে আমাদেরকে সাহায্য চাইতে হলে আমাদেরকে সেই যোগ্যতা সম্পন্ন হইয়া সাহায্য চাইলে সাহায্যটা কার্যকরি হবে। এখন একজন চেয়ারম্যানের কাছে পৌঁছায়ে যদি আপনি একটা ভি.জি.এফ. কার্ডের আবেদন করেন, তাহলে তিনি সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। যদি তার কাছেই না পৌঁছান, তাহলে তো হবে না। আবার তার কাছে পরিচিতও হতে হবে, আপনার পরিচয় নিবে এবং সব মিলিয়ে যদি তার গন্ডিতে হয় বা তার মধ্যে দয়া পরবশ হয়, তবেই না আপনার আবেদনে তাহা প্রদান করবে। ঠিক একই ভাবে আমরা যে মুস্তাকিমের পথে বা সঠিক, সরল, সোজা পথের দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করবো, এ বিষয়ে যে স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাচ্ছি বা আবেদন করছি কিন্তু এই আবেদনেরও তো একটি যোগ্যতা আছে। তাহলে এই যোগ্যতাটুকু হলো, যে নিজেকে পবিত্র করে এই মূলধারার পথে

নিজেকে দাঁড় করাইতে পারলে তখনই এই প্রার্থনাটুকু কার্যকারিতা পাবে। তাহলে আল্লাহ্পাক কোরআনুল মাজিদের প্রথম সূরাতেই এভাবে আমাকে একটা গাইডেন্সের উপর দাঁড় করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কারণ একটি হরফও অমুলক বা অহেতুক নাজেল হয় নি, যা মানব কল্যাণের জন্য বা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করবার জন্য, অর্থাৎ একমাত্র সহায় বা অবলম্বন হিসাবে ইহা কার্যকরি হবে। এজন্যই এই আয়াতে কালামগুলো জারী করা হয়েছে এবং কোরআনুল মাজিদের প্রথম সূরাতে ইহা জারীকৃত হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে :- "সেরাতাল্লাজিনা আন্আমতা আলাইহিম। অর্থ :- তাঁহাদের পথ যাহাদের উপর তোমার নিয়ামত দান (প্রাপ্ত) করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই সাহায্য চাইবার পরে যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গী-সাথী করে তুমি (আল্লাহ্) ঐ খাতায় নামটা লিপিবদ্ধ করাও। ক্রমান্বয়ে এর আগের দুই আয়াতের ধারাবাহিকতায় এই আয়াতে আসছে যে, "ঐ পথে" ঐ পথ বলতে এই সেরাতাল মুস্তাকিমের পথে আমাদেরকে গ্রহণ করো, যে পথে তোমার নিয়ামত দান বা প্রাপ্ত করা হয়েছে। তাহলে এই নিয়ামত প্রাপ্ত হতে হলে যিনি নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর কাছে তো পৌঁছাতে হবে। একটু ইশারা অর্থাৎ কোরআন রূপকভাবে একটি মানদন্ডকে দাঁড় করিয়ে ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বুঝবার জন্য আরও একটু বিস্তারিত আলোকপাত রাখবো। তাহলে এই আয়াতে কালামে বলা হলো যে, :- তাঁহাদের পথ (ঐ পথ) যাহাদের উপর তোমার নিয়ামত দান (প্রাপ্ত) করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হলো যে, যিনি তার এই সাধন-ভজন এবং স্রষ্টার সান্নিধ্যের অবয়বে বা স্রষ্টার যেটা প্রিয় পথ (মুস্তাকিম), সেই মুস্তাকিমকে যিনি প্রাপ্ত হয়েছে, এই প্রাপ্তকে নিয়ামত হিসাবে অর্থাৎ মুস্তাকিমও তো আল্লাহ্র একটি বিশেষণ বা বিশ্লেষণকৃত একটি নিয়ামত অর্থাৎ ইহাও তাঁরই একটি সৃষ্টি সেটা যত বড়ই হোক না কেন।

তাহলে সৃষ্টিটাও বিশেষ নিয়ামত, এই নিয়ামত যারা প্রাপ্ত হয়েছে তাঁদের সঙ্গে আমাকে একত্রীকরণ করো, ইহা একটি আবেদন। তাহলে এই আবেদনের পূর্ণতাও ঐ গোড়গাছা বা মূল শিকড় একই জায়গায় অর্থাৎ মূল ঠিকানা যেন আমাদের ঠিক থাকে সেটা হলো একজন মানুষকে সর্বপ্রথম পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এই পবিত্রতা অর্জন করতে

হলে মানুষের দেহভান্ড থেকে মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে হবে। মন্দ সত্ত্বা দূরীভূত হলেই দেহটা মুবারক হয়, তবেই পবিত্র হয়। এই পবিত্র দেহ কেহ দেখে না। তাহলে এই পবিত্র দেহটা যখন আপেক্ষিকতার একটি বলয়ে পানি দিয়ে অনুশীলন করলে সেটা সৌন্দর্য বর্ধন করে মানুষকে শিক্ষা দেয়। ঐ পবিত্রকারী যদি স্রষ্টার কাছে কোন আবেদন করে, সেটা স্রষ্টা না দিতে পারলে লজ্জাবোধ করে। তাহলে সেই পথে আমাকে কবুল করো, ইহাই এই আয়াতে কালামে আল্লাহ্‌পাক বর্ণানা করছেন।

এই সূরাটির সর্বশেষ আয়াতের শেষ বলা হলো যে :- গাইরিল মাগ্‌দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন। অর্থ :- যাহারা তোমার নিকট পথভ্রষ্ঠ নয় এবং বিপথগামীও নহে। অর্থাৎ তোমার (আল্লাহ্‌র) এই হেদায়েতগামী পথে যারা অনুপ্রাণীত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট নয়, তাঁদের দলে আমাকে কবুল কর। এই সূরা ফাতিহা পাঠ করবার শেষে আমরা “আমীন” বলে থাকি। আমীন শব্দের অর্থ হলো সমর্থন জ্ঞাপন করা অর্থাৎ এই প্রার্থনা হলো শেষ প্রার্থনা। অর্থাৎ এই রূপকতার আশ্রয়ে আমীন বা সমর্থন জ্ঞাপনে মানদন্ডটা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ইহা একটি মানুষ তার আপেক্ষিক মূলধারাতে যখন যোগ্যতায় পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত হবে, এই সিক্ত হওয়ার পথ তিঁনি অনুমোদন দিয়েছেন। সেই অনুমোদিত পথে যারা পরিগণিত হচ্ছে, তাঁদের দলভূক্ত আমাকে করে নাও এবং নিঃসন্দেহে যারা পথভ্রষ্ট নয়, সেই পথের দিকেই আমাকে অনুপ্রাণীত করবে। অর্থাৎ এই চাওয়াকে বারবার মোডিফাই করে বা রূপান্তর করে একই নিশানার দিকে এই চারটি আয়াত, একই মূলধারার দিকে বা একই কথাতে সমাসীন করা হয়েছে। সেটা হলো যে এই মূল অর্থাৎ নিজের দেহভান্ড থেকে মন্দ সত্ত্বাকে বিদূরীত করে পূর্ণতার অবগাহনে কিভাবে সিক্ত হওয়া যায়, কিভাবে মওলার দাসভূক্ত কাতারে নামটা লিপিবদ্ধ করা যায়! সেই পথের একটি চাওয়া বা বাসনাকে এই আয়াতে কালামগুলোতে জারী করা হয়েছে বা নির্দেশনামা রাখা হয়েছে। যার বুঝ এবং জ্ঞান যেমন, তিনি সেরকম ইহার উপর আমলনীতিটা ত্বরান্বিত করবে এবং ত্বরান্বিত করলে প্রতিটি আয়াতে কালামের বাস্তবায়নকৃত একটি রূপ রয়েছে। এই কথাগুলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে হচ্ছে অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে চাচ্ছে। তাহলে বান্দা যে আল্লাহ্‌র কাছে চায় কিন্তু কালামপাক তো আল্লাহ্‌ই জারী করেছেন!

অর্থাৎ বান্দা এভাবে আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে, এভাবে উক্ত যোগ্যতায় সমাসীন হবে, বান্দা এভাবে পূর্ণতা পাবে, ইহাই তো আল্লাহ্‌পাক চায়। তাহলে এই ভাবধারাকে সর্বশেষে "আমীন" বা সমর্পণ জ্ঞাপন দ্বারা ইহার পূর্ণতা ঘোষণা করছে। যে কারণে সূরা ফাতিহা হলো যে, নিজের সঙ্গে থাকা খান্নাস হইতে মুক্ত হওয়ায় ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। মূল কথা ইহাই চলে আসে, কারণ যে তিনটি সত্ত্বা অর্থাৎ শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ এগুলো হলো আপেক্ষিক যা সময়ে-সময়ে বা ক্ষণে-ক্ষণে কিন্তু খান্নাসী সত্ত্বা রক্তের প্রতিটি কণায় অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ :- খালি চোখে যেগুলো দেখা যায় না বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যেগুলো দেখা যায়; সূক্ষ্মতার বলয়ে লৌহিত কণিকা, স্বেত কণিকা থেকে অনুচক্রিকা ইহা রক্তের সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণা, এই কণার মধ্যেও খান্নাসী সত্ত্বা মিশে থাকে। যার কারণে এই খান্নাস যদি দূরীভূত হয়, তাহলে আপন দেহে মন্দ সত্ত্বা বা শয়তানি সত্ত্বার বলয়টা দূর্বল হতে থাকে। তাই এই দূর্বল বলয়কে পরিপূর্ণতার দিকে নিতে হলে একটি মানুষের কাছে দাসত্ব করতে হয় বা বায়াত হতে হয়।

এজন্য তিরমিজী শরীফের একখানা হাদিসে বলা হয়েছে যে :- "যুগের ওলির কাছে যারা মুরিদ (বায়াত) না হয়ে মৃত্যুবরণ করলো, তারা জাহেলাতের মৃত্যুবরণ করলো"। তাহলে মূলধারার মূল নিশানা আসলে ঠিকই রয়েছে কিন্তু আপেক্ষিকতার বলয় দ্বারা ইহাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য মুসলিম অনুপ্রাণীত ব্যবস্থা দুইটি শাখাতে বিভক্ত হয়েছে, একটি হলো ইয়াজিদী এবং অন্যটি হুসায়েনী (আঃ) মুসলিম। তাই হুসায়েন (আঃ) দ্বারা যারা অনুপ্রাণীত হবে, তারা এই আহলে বায়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, আহলে বায়াতের দিকে নিজেরা ধাবিত হবে। আর যারা ইয়াজিদের দ্বারা অনুপ্রাণীত হবে তারা আপেক্ষিক শিক্ষা দ্বারা নিজেদের বাহাদূরী চরিতার্থ করবে। জগতে আজ পর্যন্ত যত ওলি-আওলিয়া এসেছেন, সবাই একটি কথাই বারংবার বলেছেন যে, একটি মানবকে তোমার বিচারে যদি পছন্দ হয় বা মনোনীত হয়, তাহলে তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করো বা মুরিদ হও। তাহলে ইহা হলো নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচারিক বিশ্লেষণ দ্বারা বের করতে হবে যে, কোন মানুষের কাছে আমি মুরিদ বা বায়াত হবো ?

তাহলে এই মুরিদ প্রথা হলো হুসায়েনী (আঃ) মুসলমান। আর আপেক্ষিক জ্ঞানচর্চা থেকে নিজেদের দলগত পরিধি আর প্রসার বৃদ্ধির জন্য যে খবরদারী করা, শাস্তির প্রয়োগ করা

ইহা হলো ইয়াজিদী মুসলমানের অন্তরায়। কারণ মহান আল্লাহ্পাক বলেছেন, ধর্মে কোন জোর-জবর দস্তি বা বল প্রেয়োগ নেই। পাঠক বাবা-মায়েরা কি বুঝতে পারছেন তো ? তাহলে কোন মুসলমানের খাতায় আপনি আপনার নামটা লিপিবদ্ধ করবেন ? এই দুইটি ধারাতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাতে ধর্ম বিভাজন হয়ে গেছে। যার জন্য ধর্মের মূল চালিকা শক্তি এবং মূল কাঠামো আজকে যারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আমাদের সমাজে ধর্মের যে শিক্ষাগুলো দেন, সেখান থেকে আমরা স্রষ্টার প্রকৃত ধারার মূল বিধান পাই না। তাহলে পাই কাদের কাছে ? এই সুফির অনুশীলন বা আহলে বায়াতের যারা মূল নিশানার ধারক এবং বাহক হিসাবে মওলার প্রকৃত বিধানের কার্য করে যাচ্ছে তাঁদের কাছে। তাঁদের এসকল কারিকুলাম ঢাকা বা অজানা থাকে। এই তাঁদের খুঁজে-খুঁজে বের করে তাঁদের কাছে গিয়ে যারা শিক্ষা নেয়, তারা এই মূলের কিছুটা ইশারা ইঙ্গিত পায় আর যার পূর্ণতা ঘটে তিনিই হয়তো ইহার বাস্তবায়নকৃত পথে পরিগমন করতে পারে। এভাবে ধর্মীয় দর্শনের মূল পটভূমি হলো একটি মানুষের বা মান কে প্রকৃত মানুষ হতে হলে শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বাকে বিদূরীত করতে হবে বা দূরীভূত করতে হবে, করলে আমি সত্ত্বাটা মওলা সত্ত্বার সঙ্গে একত্রিত হয়। এই একত্রিত হইলে ইহাই ধর্মের মূল আকিদা বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, ইহাই হলো মূল পূর্ণতা। এজন্য উক্ত আয়াতে কালামগুলোতে এই তাগিদটাই বেশি করা হয়েছে, ইহা আমার নিজস্ব মত। আয়াতে কালামের উপর অর্থের বিস্তারিত একটি বয়ান এভাবে আপনাদেরকে আমি বুঝালাম। এর অর্থ হলো যে, কোরআন এমন এক রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ, যার বর্ণনা সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের বৃক্ষরাজী যদি কলম হয় এবং পানিগুলো যদি কালি হয়, তাহলে এই কলম দ্বারা লিখবে কালি শেষ হয়ে যাবে, তবুও ইহার ব্যাখ্যা বা গুণাগুণ লিখে শেষ করা যাবে না।

আবার অপর একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে :- এভাবে কালি ফুরিয়ে যাবে আবার মওলার পক্ষ থেকে কালি বানিয়ে দেওয়া হবে, আবার লিখতে থাকবে এভাবে ছয়বার যদি কালি শেষ হয়ে যায় তবুও কোরআনের বর্ণনা লিখে শেষ করা যাবে না। বুঝতে পারছেন তো পাঠক বাবা-মায়েরা ? তাহলে ইহা আমার নিজস্ব মত যেহেতু মূল ভাবধারা আমরা সুফিবাদের অনুশীলনগামী একটি রাস্তায় অনুপ্রাণীত হয়ে পরিচালিত হই। তাহলে এই রাস্তায় আসতে হলে প্রথমেই একজন মানুষের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করতে হয় বা আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাহলে ইহা ওলিদের পথ বা আহলে বায়াতের পথ। তাই

এই আহলে বায়াতকে যেহেতু আমরা মনে প্রাণে লালন করছি, ইহা গ্রহণ করেছি তাই আমাদের ভাবধারা বয়ান এবং কথাগুলো আসলে আহলে বায়াতের দিকেই অনুপ্রাণীত বা আহলে বায়াতের দিকেই টানে। যারা জ্ঞান গবেষণায় বস্তুবাদী জ্ঞান দ্বারা লজিক বা যুক্তি উপস্থাপন করে, তাদেরটা লজিক এবং বস্তুবাদের ধারাতে উহা প্রচারিত হবে। এখানে তো মতানৈক্যের কিছু নেই। কেন ? কারণ একটি আয়াতে কালাম অনেক রকমের অর্থ, তর্জমা, তাফসীর আসতেই পারে কিন্তু মূলধারার কোন পরিবর্তন নেই। সুফি অনুশীলন করে হলো একটি আত্মাকে কিভাবে মুক্ত করা যায়! তাই এই মন্দ সত্ত্বা বিদূরীত হলে আত্মা মুক্ত হয় অর্থাৎ স্রষ্টার সান্নিধ্যের সঙ্গে যখন একটি আত্মার মিলন হয় তখনই সে পূর্ণতা পায়, সেই আত্মা হলো মুক্ত আত্মা। এই মুক্ত হওয়াই হলো দুনিয়ার জিন্দিগির ওলিদের একটি বড় ফায়সালা রয়েছে, ইহাই সুফির শিক্ষা থাকে। এই মুক্ত আত্মা হলে বারবার আসা-যাওয়া করলে সেটা স্রষ্টার নির্দেশক্রমে হয়, প্রতিনিধি হয়ে তাঁর আগমন ঘটে। অর্থাৎ খোদাই শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়। এভাবে মূলধারায় মানুষের মধ্য থেকেই এই প্রকৃত মানুষই প্রতিনিধি হয়। তাই এভাবে স্রষ্টার মূল নিশানাটুকু বাস্তবায়নকৃত পথে অনুপ্রাণীত করতে মূলধারার দিকে নিজেদেরকে বাকী জিন্দিগিতে যার যতটুকু সময় আছে, এই মূলধারার দিকে অনুপ্রাণীত করতে বা নিজেদের আমল নীতিকে এভাবে রজ্জু করবেন, শক্ত করে ধরবেন।

মৃত্যু অর্থ বিনাশ নয়, মৃত্যু অর্থ হলো দেহের বিনাশ কিন্তু আমি বিনাশ না, আমার কর্মফল অনুযায়ী আমাকে আবার প্রেরণতব্য করা হবে, ইহা রূপান্তর, স্থান পরিবর্তনের মত। কোরআনুল মাজিদে বলা হয়েছে যে :- "নফ্‌স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে" অর্থাৎ আমি যেই হই না কেন, আমার জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে এই মৃত্যু হলো টেষ্ট অর্থাৎ স্বাদ গ্রহণ, একটি সময়ের পরিবর্তন ধারা। অর্থাৎ আমাকে যে একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে এই সময়টুকুই আমি দুনিয়াতে থাকবো, এর পরে মৃত্যু নামক একটি ঘটনা প্রবাহের পরে আমার যেখানে অবস্থান সেখানে পৌঁছে যাবো। তাহলে সেখান থেকে আবার পুনরায় শুরু। ইহা হলো ভাববাদী বা তরিকার জগতের বয়ান। কিন্তু যারা বস্তুবাদ অর্থাৎ অদেখা ঈমানের বিশ্বাসী, তারা মনে করে মৃত্যু হলো শেষ অর্থাৎ ইহা সমাপ্ত হয়ে গেল, বিচারের আশায় সে দাঁড়িয়ে থাকবে, ইহা হলো অদেখা বা অজানা, যার কারণে এমন বর্ণনা তারা করে। কিন্তু সুফির

দর্শনে বা যারা দেখা ঈমানে বিশ্বাসী তাদের বয়ান হলো এমন। তাহলে দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। যদি বিনাশ হয়ে যায়, তাহলে আর কিছু সৃষ্টি হতো না। যেহেতু অনেক হাদিস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সকল রুহ একদিনে সৃষ্টি হয়েছে।

তাহলে এই সৃষ্টি থেকে ক্রমান্বয়ে অবিনশ্বরবাদে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ইহা হলো ইনফিনিট, যদি শেষই হয়ে যেত তাহলে তো আর কোন সৃষ্টিই হতো না। তাহলে সৃষ্টি অবিনশ্বর ধারাতে ইহা রূপান্তরবাদেই চলছে। ইহাই ওলিদের দর্শনে বারবার বুঝানো হয়েছে। ইহাকেই বলা হয় পুনর্জন্মবাদ। যদিও এই পুনর্জন্মবাদ শব্দটা হিন্দু ধর্মে অনুপ্রাণীত হয়, কেন ? মুসলিম অনুশাসন ব্যবস্থার দুইটি ধারা রয়েছে। একটা হলো আপেক্ষিক সৌন্দর্যের জন্য মোড়ক বা আবরণকৃত একটি পরিমন্ডল, যাকে আমরা শরা-শরিয়ত বলি। আর তিনটি ধারা রয়েছে ঢাকা। সেগুলো হলো, তরিকত, হাকিকত, মারেফত। তাহলে তরিকত কি ? তরিকত হলো রাস্তা অর্থাৎ আমি আমাকে মন্দ সত্ত্বা থেকে কিভাবে বিদূরীত করবো ?

তাহলে একটি পথে গিয়ে ইহার বাস্তবায়ন ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হবে, নইলে কি আমি একা একা মনে করলেই হয়ে যাবে ? কখনই নয়। তাহলে তরিকত হলো পথ বা রাস্তা। তাহলে এই পথে যদি আপনি পরিচালিত হন, তাহলে এখানকার নিয়মনীতি, অনুশীলনগামী ব্যবস্থা কেমন! এই বিষয়ের উপরে নিজেকে অনুপ্রাণীত করলে শিখতে পারবেন। তাহলে এই হলো পথ বা রাস্তা। হাকিকত হলো চরম সত্য। অর্থাৎ যেখানে সত্যের দর্শন রয়েছে, সেখানে কোন ফাঁকি-ঝুঁকি থাকে না। অর্থাৎ হাকিকতে পৌঁছালে সে দেখতে পারে এবং তাঁকে আর ধোঁকা দেওয়া যায় না। অর্থাৎ তাঁর চোখ পর্দা বা আবরণকৃত ব্যবস্থাকে সে সরিয়ে সে মুক্ত করেছে। দেখতে যদিও এমনি চোখের মতই লাগে কিন্তু চোখে কোন পর্দা থাকে না, যার কারণে সে অদৃশ্যবাদের বিষয়াদী দেখতে পারে। এই দৃশ্যবাদ দেখা ঈমানের বিশ্বাসই হলো হাকিকত। মারেফত হলো আল্লাহ্ এবং বান্দার মিলন প্রক্রিয়া, এটা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মন্দ সত্ত্বা যখন একটি দেহ থেকে দূরীভূত হয়ে যায়, তখন বান্দা আর আল্লাহ্র একটি মিলন প্রক্রিয়ায়। এই মিলন প্রক্রিয়ায় যিনি ডুব দিয়ে থাকে, তিঁনি আরেফ হন। তাঁর আর দুনিয়ার জিন্দিগিতে কোন কথা থাকে না। যিনি ঐ স্বাদের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে রাখে,

তাঁহারাই ঘোষণা দেন বা এই পর্যায়ের ওলিরা ঘোষণা দেন যে, "আনাল হক" অর্থাৎ আমিই পরম সত্য বা আমিই আল্লাহ্। এখানে আর তাঁর দ্বিতীয় কোন কথা থাকে না। আর এই কথা বললে জাগতিক যে একটি রূপক আবরণকৃত ব্যবস্থা সেটাতে তাঁকে শাস্তির মানদন্ডে দাঁড় করানো হয়।

এজন্য আল্লামা ইকবাল বলেছেন যে, :- দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে এই মানুষকে মুক্ত করেছি আমরাই, তোমার কাবাকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করেছি আমরাই, তোমার কোরআনকে বক্ষে ধারণ করেছি আমরাই। এরপরেও তুমি (আল্লাহ্) বলো আমরা তোমার আনুগত্য নই, আমরা যদি আনুগত্য না হই তাহলে তুমিও দয়ালু নও। এই কথার উপর আল্লামা ইকবালকে কাফের ফতুয়াতে ভূষিত করেছিল। আসলে এই কথাগুলো আল্লামা ইকবাল কোন মানুষকে বলেন নি, ইহা অভিমানের ভাষা। পাঠক বাবা-মায়েরা ভাববাদী একটু বিচারিক জ্ঞান দ্বারা আপনারা ভাবলেও ইহা বুঝতে পারবেন।

তাহলে আল্লামা ইকবালের কথাগুলো কার সঙ্গে হচ্ছিল ? নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহ্পাকের সঙ্গে হচ্ছিল। তাই যখন আল্লামা ইকবালকে কাফের ফতুয়াতে ভূষিত করা হয়, তখন তিঁনি কারও প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ জারী না করে তিঁনি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনাতে সমাসীন হলেন এভাবে যে, আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে আমার এই গোপন আলাপগুলো প্রকাশিত করবার জন্য বেয়াদবি হয়ে গেছে, যা সবাই জেনে ফেলেছে। তাহলে এই বেয়াদবির জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও, আর তোমার যে জান্নাত তুমি বানিয়ে রেখেছো, সেটা মোল্লাদেরকে তুমি দিয়ে দাও। এজন্য সুফির মতাদর্শে থাকে হলো এই ভোগে মুক্তি নেই। এই কথাটা এজন্য এনেছি যে, জান্নাত হলো সুখ ভোগ।

আজকে আপেক্ষিক যে ধর্মীয় অনুশীলনগামী ব্যবস্থা আমাদেরকে টেনে ধরে, ইহা কিসের ? ইহা জাহান্নামের ভয়, নয়তো জান্নাতের অনুপ্রাণীত করা। তাহলে জাহান্নাম হলো দুঃখ ভোগ অর্থাৎ অনন্ত কালের শাস্তি এবং দুঃখ-যন্ত্রণায় নিপতীত হবে, এই ভয় দেখানো হয়। আর জান্নাত হলো চরম সুখের তৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হবো। এই দুইটাই ভোগ। একটা হলো সুখ ভোগ এবং আরেকটি হলে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ। তাই ভোগে মুক্তি নেই, মুক্তি পেতে হলে নিজের আত্মার অনুশীলনগামী ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে একটি আত্মাকে মুক্তি করতে হবে। এজন্য আমার পীর বলছেন যে, বাবা কিছু করো বা না করো, তোমার

জীবনের একটি সময় চারমাসের বা ১২০দিনের একটি মোরাকাবা করো। একটু সময় বের এই মোরাকাবাটি করে একটু প্রাকটিক্যাল করে দেখ, তোমার বন্ধ চোখে কিছু দেখা যায় কি না ? এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার এই দিনটুকু অনন্ত কাজে লাগাও"। এটা একটা মোরাকাবা যাহা বু-আলী শাহ কালান্দার বাবার মোরাকাবা। আমার পীর নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে ধ্যান সাধনা করবার জন্য একটি স্কুল করেছেন। এই স্কুলে ধ্যান সাধনা বা মোরাকাবা মোশাহেদাগুলো করা হয়। তাই এজন্য সবার প্রতি বা যারা দেখা বা দর্শনবাদে অনুপ্রাণীত ব্যবস্থার দিকে নিজেকে ত্বরান্বিত করবার বাসনা জাগে, তাদের সবার কাছে আহ্বান রাখি যে অনন্ত চার মাস বা ১২০ দিনের একটি মোরাকাবা করবেন।

যদি কপালে থাকে অন্তত আর কিছু না হোক, হাকিকতের একটি রূপ বা আলোক সজ্জ্বাও যদি আপনার দৃষ্টিতে পড়ে, তবুও তো চরম সত্য রাজ্যের একটি দর্শন। পাঠক বাবা-মায়েরা আপনারা বুঝতে পারছেন তো ? যা কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। সুফির আদর্শ হলো এমন যে, এখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ কোন কিছু থাকে না। কেন ? একমাত্র আল্লাহ্‌কে যদি চাওয়া হয়, তাহলে তো জাতি, ধর্ম, বেদ, সত্ত্বা কোন কিছুর বিভাজন সেখানে থাকে না। আর মহাপুরুষগণ কখনই ধর্ম-বর্ণ বা জাতি নিয়ে বিভেদ বিভাজন করেন নি। এভাবেই ধর্মের মূলধারায় বা মূল শিকড়ে চরম পর্যায়ে সুফি সাধকগণ উদ্ভাসিত হয়। এভাবে মূল ধারায় কোন কোন মানুষ প্রচেষ্টা করলেও তো আসলে মওলা যখন যাকে ইচ্ছা তখন তাকে তাঁর (আল্লাহ্) দিকে নিয়ে নেন বা মওলা দিকে অনুপ্রাণীত করেন। আয়াতে কালামে এভাবে বলছে, যখন যাকে ইচ্চা তখন তিঁনি তাঁর দিকে নিয়ে নেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র যে ইচ্ছা হবে, তাঁর ইচ্ছা হবার মত যোগ্যতাও তো সেই বান্দার থাকতে হবে। সে বিষয়গুলো সুফিরা এভাবে রিসার্চ করে বা গবেষণা করে বের করছে, যেন এগুলো বুঝতে বা প্রাকটিক্যাল করতে মানুষের দীর্ঘায়িত সময় না লাগে। দিন দিন মানুষ এত ব্যস্ত এবং অল্প সময়ে ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েছে, সেই ধারাতে যদি ধর্মীয় অনুশীলনগামী ব্যবস্থা বিঘ্নতা এবং দীর্ঘায়িত পথ হয়, তাহলে মানুষের কাছে বিরক্তির কারণ হতে পারে।

সমগ্র কোরআনের মূল মানদন্ড বুঝতে হলে এভাবে নিজেকে আগে দাঁড় করাতে হবে, তবেই কোরআনের আলোকপাতগুলো সুন্দর হবে এবং ভাববাদী ব্যবস্থার দ্বারাই কোরআনের রূপক ভাষাগুলো এই ভাববাদীরাই মূলধারার বয়ানগুলো দিয়ে ইহাকে মানুষের মাঝে বুঝিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা সবাই যেন এই মূলধারার প্রতি আকৃষ্ট ভাবধারা নিজের মনেপ্রাণে লালন-পালন করে ইহার উপর কার্য করি বা প্রতিফলন ঘটাতে পারি, এজন্য যেন মহান স্রষ্টা সহায় হউন।

সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা

যুগ যুগ ধরে ধর্ম নিয়ে বিবর্তনবাদের ধর্মীয় অনুভূতি মানুষকে কাঁদিয়ে আর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ধর্মের অমিয় ধারা মানুষ থেকে এলমে লাদুন্নি প্রাপ্ত হওয়ার পর ধর্মের মাধ্যমে এমন কি মহান ওলিগণ জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন সত্য অমর, সত্য চির জীবন্ত শাশ্বত এক আমরণ বিধান, যা খন্ডণ হয় না। মুসলিম উম্মার সব চাইতে বড় আদর্শ হলো হযরত মোহাম্মদ (সঃ) (আঃ)। তাঁহার জীবনটাকে আমরা একটু আলোচনা করলে সহজ হয়। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার বুকে যত নবী, রসূল, ওলিগণ এবং অবতারগণ এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, মুসলিম ধর্ম মতে সব চাইতে উত্তম আদর্শ প্রতিস্থাপন করে গেছেন রসূলে পাক (সঃ) (আঃ)। তাঁর জীবনের ২৫ বছর বয়স কাল পর্যন্ত নিজেকে সত্যবাদিতার উপর সু-প্রতিষ্ঠিত করা একমাত্র কার্য হিসাবে পাওয়া যায়।

তৎকালীন আরব ভূ-খণ্ডে জাহেলিয়াতের যে করণকার্য চালু ছিল সেটাকে ভূলুণ্ঠিত করার তরে যুদ্ধ অথবা দম্ভ বা গোত্র সম্প্রসারণ অথবা মানুষকে ভীতি দ্বারা ধর্মীয় বিধানকে দেখানো হয় নি। আসল কথা হলো- ইহা এক আদর্শ ভিত্তিক দৃষ্টান্ত স্থাপন, যা দ্বারা মানুষ মুক্তির বা শান্তির একটি সিঁড়ি হিসাবে অবলম্বন পেতে পারে। আসল কথা হলো- সবাই জানি- সত্য ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌও সম্ভবপর নয়। তবুও কেন জানি মিথ্যা আমাদেরকে বার বার পরাভূত করছে। হয়তবা এর সঠিক কারণ অথবা রহস্যপূর্ণ কোন বিষয় দ্বারা আমরা ক্ষতির দিকেই মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এগিয়ে চলেছি। এর থেকে বাহির হওয়ার জন্য সমাজ সংসার থেকে দুরে অবস্থান নিয়ে যারা নিজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে মহান স্রষ্টার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় সদা সর্বদা যুদ্ধরত

অবস্থায় নিজেকে নিয়োজিত রাখছে, এদেরকে সামাজিক ভাবে পাগল অথবা জানোয়ার হিসাবে খ্যাতি দান করেন অথবা চূড়ান্ত মেডেল কাফের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

এই সামাজিক নিয়ম-নীতি কি আমাদেরকে সুন্দর গর্বিত শান্তির বিধান কে রূপদান করতে পেরেছে ? অথচ আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন কত সুন্দর ভাবে তাঁর কালাম দ্বারা জানিয়ে দিলেন– বল সত্য তোমার রব হইতে সমাগত যার ইচ্ছা হয় সত্য গ্রহণ করুক আর যার ইচ্ছা হয় সে কুফরী করুক (সূরা কাহাফ আয়াত ২৯)। এ বিষয়ে যদি আমরা কিছুটা আলোকপাত করি, তবে দেখতে পাই – দুনিয়াতে যত মানব-মানবীগণ এসেছেন তাদের একটি ধর্মীয় বিধি-বিধানের উপর তাহারা পরিচালিত হয়েছেন।

আখের অর্থ আমরা বুঝি পরকালীন জীবন ব্যবস্থা। মানুষ যদি বিধানকে সঠিক ভাবে আয়ত্ত্বে রাখে এবং সেই অনুযায়ী পালন করে, তাহলে তাহাকে পুরস্কৃত করা হবে,তার কোন ভয় নাই বরং তাহার জন্য সুসংবাদ নির্ধারিত। আর যদি বিধানকে অমান্য করা হয়, নিষেধ কর্ম দ্বারা জীবনের সময়টাকে ব্যয় করা হয়, তাহলে তাহার জন্য রাখা হয়েছে কঠিন শাস্তি বা আজাব। এখন প্রশ্ন আসে যিনি আমাকে এই স্বাধীন স্বত্ত্বাতে অবমুক্ত করেছেন, তিনিই মহান আল্লাহ্। আমাকে জ্ঞান থেকে শুরু করে দুনিয়াতে তাঁহারই নিয়ামত ভক্ষণের জন্য তৈরী করেছেন। তিনিই রিযিকদাতা, পালনকর্তা, বিচার দিবসের মালিক, তিনিই হাকিম। এটা তাঁহার জন্যই প্রযোজ্য।

একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভাবুন তো, পৃথিবীর মানুষ আমরা কি স্বাধীন? আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন বাঁধা নেই? সমাজ সংসার আমাদের ধর্মের ঘোষণা কি ঠিক রাখতে সচেষ্ট হয়েছে? না যারা সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে কিছু একটা অর্জন করেছেন, আল্লাহ্‌র রঙ্গে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন সমাজ সংসার মৃত্যু নামক বলী দিতেও এদের বিবেক কাঁপেনি। এই নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতা দ্বারা কালে কালে, যুগে যুগে ধর্মীয় বিধানকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। নিজেদের দম্ভ আর অহংকার কে বড় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ফেকরা আর ফিকরিতে বিধান কে কালে কালে, যুগে যুগে ধর্মকে দুরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর নিজেরা ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করার তরে নিজেরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে ধর্মের বারটা বাঁজাতে শুরু করেছে।

হে মানুষ বিবেক দ্বারা একটু ভাবুন না? উদাহরণ হিসাবে বলছি কোন অফিসে বা এনজিওতে বা কোম্পানীতে বা কোন মহাজন এর নিকট কাজের চুক্তিতে সম্মত হন,

তাহলে প্রথমে উপযুক্ততা অনুযায়ী আপনাকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, পরে কাজ সঠিক হলে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। প্রাথমিক ভাবে কিছু ভুলক্রটি হলে এগুলো নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হবে, তার পরেও যদি বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায় তার জন্য শাস্তির বিধান দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষ সামাজিক নীতিতে কাজ কর্মে যদি এমনটা হয়, মহান আল্লাহ্র বিধানকে এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপীরা নিজেদের দলভূক্ত, গোচরীভূত হয়ে চালনা করার তরে, ধর্মকে ইতিহাসে কি নির্মম নিষ্ঠুরতাকে স্থান দিয়ে চলেছে। বর্বরতার এই ইতিহাস লিখে শেষ করা যাবে না। এরা কোরআন-এ ভুল অর্থ সংযোজন করতে বিবেকে ধাক্কা পায় না। হাদিসকে নিজেদের দলীয় নীতিতে ফেলতে যা নাই তাও সংযোজন আর বিয়োজন করেছে। রসূলের হাদীসের সঙ্গে যারা বেঈমানি করতে পারে আল্লাহ্ পাকের কালামের সঙ্গে ভিন্ন অর্থ সংযোজন করতে পারে এরা কারা ? এদের কি উপাধীতে ভূষিত করা যায় ? এটা জানা নেই। আন্দাজে গুল মারার মত জ্ঞানপাপী সম্বোধন করলাম।

একটি মানুষের মৌলিক চাহিদা বিশেষ করে– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা এ বিষয় সম্বন্ধে পরিবার কেন্দ্রিক, সমাজ কেন্দ্রিক এবং রাষ্ট্র কেন্দ্রিক যে উদ্যোগ তাহার সুফল প্রাপ্তি খুব কম অংশই চোখে পরার মত। বেশির ভাগ মানুষকেই দেখি নিরাপত্তার অভাব। একটি দেশের জাতি স্বত্ত্বাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে হলে প্রতিটি নাগরিকের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দুর্বলের প্রতি সবলের খবরদারী। এখানেই শেষ নয়, ধর্মীয় আচরণ, এমনকি কথা বলার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, যা কিনা নিরীহ অবোলা মানুষ গুলোকে ব্যবহার করে নিজেকে বড় বলে জাহির করা, কিন্তু মহান আল্লাহ্ পাক মৃত্যু নামক ঘটনা দ্বারা এক সময় সকল জুলুম অত্যাচার নির্যাতন উপেক্ষা করে এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর অবসান ঘটাইয়া দেয়। এর পরেও এ চরিত্রের অবসান হয় না। এটা সত্যিই ভাবিয়ে তোলে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মুরুব্বী বচনে শোনা যায়, যার সামর্থ আছে সে ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক স্বীয় কর্মের প্রতিফল নিজেই আদায় করে নিতে সচেষ্ট, আর যিনি অবোলা অসহায় সে বলে আল্লাহ্ বিচার করবেন। এই অবস্থা থেকে মানুষকে বের করে আনতে সুফী মতাদর্শে মানুষকে বেশী উদ্বুদ্ধ হতে হবে। কারণ এ এমন একটি বিধানের পথ প্রথমেই বলা হচ্ছে যাহা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। সুফিবাদের বর্ণনায় আমার পীরও মোর্শেদ ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান-আল-সুরেশ্বরী বলেছেন :- "সুফীবাদের দেশে

যেতে চাও, মনে রেখ ইহা একটি তথাকথিত বাস্তবতা বর্জিত আজব দেশ। এখানে পা রাখতে হলে নিজের ইচ্ছার কাছে নিজের শক্ত মেরুদন্ডটা ভেঙ্গে মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে যেতে হবে। আর সামাজিক ভাষায় টিটকারীর বিশেষণটা সর্ব প্রথম গায়ে মাখতে হবে"।

এ প্রক্রিয়া বা সংজ্ঞা যদি বিবেক দ্বারা ভাবা হয়, তা হলে হয়তবা কত না ডিজাইনের মন্তব্য চালু হতে পারে যা শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি এ বিধানকে কেউ মানতে চেষ্টা করে, তাহলে ভাবুনতো এ বিষয়ে কি মন্তব্য পাওয়া যাবে? মানুষ স্বভাবতঃ একটু আরাম প্রিয় বা মোহ গ্রস্থ জীব হওয়াতে এটা পালন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা না বলে উল্টা বলে উঠবে এটা কোন বিধানই না। নিজের দোষকে আমরা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। কিন্তু এ বিধি বিধানের উপর যখন সাধক তার সাধনা ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বা লাদুন্নি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন তার কাছে আর ধোঁকা চলে না। সে তার উপলব্ধির দ্বারা সত্য বলে ফেলে। সত্যের কাছে যখন মিথ্যা পরাভূত হয়, তখন আবার চালাকি আর কুমন্ত্রনায় প্রলুব্ধ হয়ে সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে দিতে চায়। যদিও এটা কখনও সম্ভব না তবুও সীমিত সময়ের জন্য হলেও শয়তানি ফাঁদে এই সফল গামী সাধকদের সমাজ সংসার বিপদগামী করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলায়ে কাবা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান-আল-সুরেশ্বরীর বচন হলো, নিজের সঙ্গে থাকা খান্নাস হতে মুক্ত হওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ। উনার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যতীত জাগতিকের দিকে ভাবলে সমূহ ভুল হবার সম্ভবনার দ্বার উন্মোচন করে। অর্থাৎ যাহার জন্য সৃষ্টি ও স্রষ্টার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরী সে দিকে দৃষ্টিপাত ব্যতীত মুক্তির দিকে মানুষের পৌঁছানো সম্ভব পর নয়। যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত বিলয় যাহা ধ্বংসশীল তাহাকে আঁকড়ে ধরে আমি আপনি আমরা হানা-হানি, দলাদলীতে সরল সহজ মানুষ গুলোকে ধোঁকা আর বিপদগামী পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। অথচ বিবেকের কষাঘাতে ঐ মেকীর শৃঙ্খল হতে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এ জন্য কাকে দায়ী করতে পারি? আসল রাজ্যে কেহই দায়ী নয়। সকল দায়বদ্ধতাকে এই মানুষই কালে কালে সকল শৃঙ্খল এর বেড়ী টপকাইয়া মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। বহু অলী-আউলিয়াগণ এর প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে মহানবীর সেই মহামুল্যবান হাদিস খানা "মান আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ যে নিজেকে চিনলো, সে আল্লাহ্‌কে চিনলো। সব বিষয়ে মূল কথার কোন বিভাজন পাওয়া যায় না। নিজেকে

চিনতে হলে খান্নাসকে বিতাড়িত করা ব্যতীত নিজেকে চেনা সম্ভব হয় না। একদা মহানবী বর্ণনা করছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন করে শয়তান আছে।" সঙ্গে সঙ্গে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রসূল-আল্লাহ তাহলে আপনার? আল্লাহ্‌র নবী বলিলেন হ্যাঁ আমার সঙ্গেও একজন ছিল তাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি।

ইসলাম এক সাংবিধানিক বিধান, সেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ্, ফেরেশতা, কেয়ামত, হাসর, মিজান, আখেরাত বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা, মহানবীকে রসূল (সাঃ) (আঃ) বলে স্বীকার করে নেওয়া মূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ)। হে আমাদের সচেতন বিবেক একটু ভাববাদী জ্ঞান দ্বারা ভাবুন তো, কোথায় মহানবীর হাতে হাত রেখে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে রসূলকে মেনে নেওয়া। এটা প্রকাশিত ব্যবস্থা কিন্তু নিজের সঙ্গে থাকা শয়তানকে মুসলমান বানিয়ে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করা কতটুকো যৌক্তিক। এ কারণে আমার মোর্শেদ বর বারবার একটি কথায় বুঝিয়েছেন জাহের ও বাতেনের সংমিশ্রনে ইসলাম।

আজ বিশ্বায়নের যুগে জাহের এবং বাতেনকে পৃথক করণ অবস্থা নিয়ে হানাহানি, মারামারি, দলাদলীতে ইসলাম খন্ডায়িত করতে প্রস্তুত, নাকি ইসলাম গড়তে আদর্শের বয়ান কোন ইসলামকে গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছি? একটু সচেতন বিবেকই এর সদুত্তর দিতে পারে। আবার প্রশ্ন এসে যায় এখানে তকদির এর বলয় বা খর্গ যাহা পূর্বেই নির্ধারিত। মানুষ পৃথিবীতে আগমনের বহু পূর্বেই তার অবস্থান। কার্য প্রণালী খাদ্য কর্ম চলন বলন সমস্ত কিছুই নির্ধারিত যদি এটাকে সত্য বলে মেনে নেই তাহলে আমার যত চেষ্টাই থাকুক না কেন এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে কি? আমি আমার ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যত রকমের চেষ্টা করি না কেনো, যা ঘটার সেটা ঘটবেই। আসল কথা হলো- তকদীর বিষয়ে কি নির্ধারিত সে সম্পর্কে আমার জানা নেই, এ কারণে হয়তবা সদুত্তর পাওয়া কষ্টকর। আবার এখানে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে যে সাধকগণ (মুক্তির) পথ খুঁজে চলছে উনাদের ভাষ্য হলো- এই তকদীর বা ভাগ্য বলিতে যে বিধি বিধান, সেটাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কারণ এই বলয় ছিন্ন করতে না পারলে মুক্তির পথ বা সত্য সম্পর্কে অচেতন অবস্থায় কালক্ষেপণ ব্যতীত আর কিছু লাভ হবে কি? এ কারণে হয়তবা ফকির বাউল বাবা লালন শাহ তাঁর গানের ভাষায় বুঝিয়েছেন- "এক কানা কয় আর এক কানারে, চল যাই মোরা ভবপারে, নিজেই কানা পথ চিনে না, পরকে ডাকে বারং বার"।

আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় টিচার বা সুপথের যারা শিক্ষক আছেন এদের কার্য বিধি ধর্মের উপদেশ আচার আচরণ কোন গণ্ডিতে নিয়ে চলছে। সামাজিক ভাবে চলমান প্রথাকে কোন পথে টানছে প্রকৃত সত্য বা মুক্তির দিকে, না সত্যকে আড়াল করার তরে, এর জবাব কারো দেওয়া সম্ভব হবে। তবে বিবেক দ্বারা ভাবলে হয়তবা পেতে পারি, আবার নাও পেতে পারি। কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে কখনও মুক্তির গন্ধ পাওয়া দুরূহ। তবুও একটি কথা বলে রাখা ভাল আধ্যাত্মিকতা ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যাহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক আমরা এটাকে সার্বজনীনতার সঙ্গে তুলনা করতে যেয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভেদ আর জঞ্জাল এর আবতারণা করে চলেছি। আমাদের ভাবনাটা কি এমন হতে পারে না উনার কাজটা যেহেতু ব্যক্তি কেন্দ্রিক, তাই উনাকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ভুলত্রুটি খুঁজে তার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করি। খান্নাস, ইবলিস, শয়তান ও মরদুদ মিশ্রিত দেহে এটা কি আদৌ সম্ভব? কোন ওলিই এটাকে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ খান্নাস মিশ্রিত দেহে এই উত্তরণ সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ পাকের এ এক আজব রহস্যময় লীলা খেলাতে আমরা ছুটে চলেছি। কোথায় হাড়ের ভাঙ্গা আর কোথায় জোড়া লাগানো। বাবা লালন সাঁইজি আর একটি গানে এটাকে বুঝিয়েছেন- পাতালে চোরের বহর দেখায় আসমানের উপর তিনতারে হচ্ছে খবর শুভ-শোভন যোগ মতে" কোথায় ধর্মের মুল সূত্র আর কোথায় আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, এর সমাপ্তি খুঁজে পাওয়া দুরূহ।

এ ছাড়া কি বা বলার থাকতে পারে কারণ ধর্মের ব্যাপারে আবার লিখতে গেলে জ্ঞান পাপীদের শৃঙ্খল এর সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে গেলে কঠোর হস্তে এর প্রতিকার, কি এক আজব দুনিয়া? এর পর মহানবী ২৫ বছর বয়সে মা খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) কে বিবাহ করলেন এবং ২৫ থেকে ৪০ এই সময়ে বেশীর ভাগ সময় তিনি হেরা পর্বতের গুহায় কাটালেন। (একটানা নয় সময়ে সময়ে) এখানে ভাবনার যে বিষয় তা হলো মহানবী একজন রিক্ত হত দরিদ্র বিহবল সামাজিক আচরণে বিধানকে তুলিয়া ধরলেন। যার সহায় আল্লাহ্ ব্যতীত নেই।

সাধনার চরম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ ভাবে নির্জনে একাকী সাধনা করতে হবে। এত ভালোবাসার স্ত্রী ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই তাকে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এ প্রসংগে আমার মোর্শেদ বর যে বাণীটা দিয়েছেন তা হলো- কাবায় শরিয়ত, আর হেরাগুহায় মারেফত"। আজকের জামানায় যে সকল জ্ঞানী পাপী এদের হেরা গুহার

মত সাধনা নিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিচরণকে নিরেট ধোঁকাবাজীর ফাঁদে ফেলে টিটকারী আর জুলুম নির্যাতনের নজির বা দৃষ্টান্ত চোখে পরে। যেন পরকাল মুখী ধর্মের বিধান তারা আল্লাহ্ থেকে লিজ প্রাপ্ত হয়েছে।

এই মেকির দুনিয়াতে ফন্দি ফিকিরের আড়ালে নিজের ঈমান কে ধরে রাখা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছাড়া কি হতে পারে? এই তো সেই খান্নাসী ধোঁকা যা থেকে এই মানুষদেরকে দুরে রাখতে কত না স্টাইলের মোহতে ফাঁদ পেতে বসে আছে। যিনি এ সাধন ভজন করেননি তাকে হয়তবা বুঝানো সম্ভব না। মনে রাখতে হবে এটা খান্নাসী চালাকি। এই সাধনার শেষ স্তরে যখন মহানবী পৌঁছাইলেন, তখনই তিনি জিবরাইল ফেরেশতার দর্শন লাভ করলেন। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে নবুয়্যতের উপযুক্ততার সুসংবাদ দান করা হলো। এর পরেই না আল্লাহ্র নির্দেশে দ্বীনের প্রচার কার্য শুরু করেন। এই নবীর উম্মত হওয়ার পরও এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপী আমাদের কি শিক্ষা দেয়? এই কার্য বিধিকে আড়াল করে সমাজের বুকে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের মধ্য দিয়ে এরা ধর্মের প্রবক্তা সেজে এক ইসলামকে টুকরা টুকরা করে ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে মানুষকে দুরে সরাইয়া হিংসা, মারামারি, দলাদলিতে প্রতি নিয়ত সহজ সরল অবোলা মানুষ গুলো জীবন দিয়ে চলেছে। আর যারা এর থেকে মানুষকে সত্যের আহবান জানান দিচ্ছে তাদের উপর মাসলা মাসায়েলের খর্গ চাপিয়ে কি না নিষ্ঠুর বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পত্র নিয়ে আমাদের গর্ব। দুনিয়ার যত জাতি ও সম্প্রদায় তার মধ্যে বর্তমান ইসলাম ধর্মের অনুসারী দল বা গোত্রতে বেশী ভাগা-ভাগি বা দলাদলি এবং কত মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে দুনিয়ার বুকে এই জ্ঞান পাপীরা বিবেক দ্বারা একটি বারও ভাবে না। এরাই মহান বলে ঘোষণা দেয়।

মানুষের জীবন আর রক্ত নিয়ে হলি খেলতে এদের মজা আর আনন্দ, বেশীর ভাগ মানুষ আমরা আজ এদের খপ্পরে পরে ধর্মের মূল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে জঞ্জাল আর যাতনাময় জীবন ব্যবস্থার সোপান বা সিঁড়ি তৈরী করে চলেছি। এইতো আমাদের শান্তি বা আত্মসমর্পনের ধর্ম। আল্লাহ্ পাক মনোনীত বিধানের জাতি দুনিয়ার বুকে নিজেদের কি অবস্থান তৈরী করে চলেছে জ্ঞানীদের কে এটা হৃদয় দ্বারা ভাববার সময় এসেছে। কারণ সবাই ছেড়ে দিলে চলবে কেমনে, কাউকে না কাউকে তো ভাবতেই হবে। যদিও এখানে কথা থেকে যায় "আল্লাহ্ পাকের হুকুম ব্যতীত কারো (কোন মানুষের) পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়"।

পাক কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা সেই উপযুক্ততার জন্য তো নিজেদের চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। তকদীরে থাকলে হয়তবা হবে। যিনি ধান রোপন করতে শিখেছে তাকে দিয়েই ধান রোপন করানো হয়। আল্লাহ্ পাকের হুকুম প্রাপ্তির উপযুক্ততা বা যোগ্যতা অর্জন করা স্বীয় জ্ঞানের উপর আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বোধ হিসেবে বিবেচিত হবে। নবুয়্যত প্রাপ্তির পরই কিন্তু মহানবী দীনের বা ইসলামের দাওয়াত প্রক্রিয়া শুরু করেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, "আদম যখন কাঁদা ও মাটিতে মেশানো তখনও আমি নবী" হাদিস তাহলে আমার মহানবী সে সকল বিধি-বিধান তাঁর জীবনীতে দেখাইয়া গেলেন। এই নবীর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে পূর্ণতার সিঁড়িতে অবস্থান করতে হলে অনুরূপ নিয়ম অনুযায়ী বিধি-বিধান গুলো পালনীয় নয় কি? অথচ এই মুসলামান জাতি ভোগের আর সুবিধা জনক বিধান এর খণ্ডায়িত এক একটি অংশ পালনীয় বলে বাড়াবাড়ি করে, ইসলাম কে এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাইয়া দুর থেকে বহু দুরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই ধারা যদি অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে তাহলে এক সময় মানুষের সত্য সাগরে অবগাহন করার পথটি খুঁজে বের করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ কারণে হয়তবা আধ্যাত্মবাদের উপর লেখনী মানুষের জন্য জরুরী হয়ে পড়ছে। হর হামেশা বাজারে প্রচলিত বই পুস্তকগুলো পড়ে বিস্মৃত হই। এই জন্য যে, সে সম্প্রদায় ভূক্ত আলেম তার কলমের লেখনী যেন তার দল বা গোত্রকে কি ভাবে বড় করে তুলে ধরা যায় এই প্রচেষ্টাই বেশী, এই কারণে কোরআনের কিছু ভাবধারা পরিবর্তন পর্যন্ত পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, রসূলের সহি হাদিস এর কিছু অংশ বাদ কিছু অংশ সংযোজন করতে হলে তাতেও তাদের আপত্তি বা বিবেক দ্বারা বাঁধাগ্রস্থ হয় না। এ কারণে মানুষের আশ্রয় সত্য লাভের দৃষ্টান্ত কি লিখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়। তাহা আজ এক কঠিন সমীকরণের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ বস্তা পচা আজব সব দলিল দ্বারা সত্যকে ভুলণ্ঠিত করতে সত্যকে দূরে ঠেলে দিতে ওস্তাদ সেজে আছি। এটা বুঝবার জন্য বার বার বিবেকের উপর ছেড়ে দেওয়ার আশ্রয় নিলাম।

নবুয়্যতের দাওয়াত দিতে গিয়ে যখন কোন সমস্যা বা বিড়ম্বনার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেন রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) তখন এই আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষায় আছি মারফত আল্লাহ্ পাক সুন্দর কালাম বা বাণী দ্বারা এর সমাধান দিয়েছেন। অহির দরজা বন্ধ কিন্তু এলহাম বা আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত এ ধরনের নির্দেশনা কালাম পাকে দেখা মেলেনা। অথচ এই জামানায় বড় বড় ইসলামের জ্ঞানীগণ এই পথটার (আধ্যাত্মিকতার)

প্রয়োজন নেই বলে যখন মানুষকে বুঝায় শিক্ষা দেয় এই শ্রেণীর বচন শুনতেও গভীর কষ্ট হয়। হায়রে বিদ্যার কচকচানির শিক্ষা একটি বার নিজের বিবেক দ্বারা ভাবলাম না যে নিজে যত সময় পর্যন্ত নিজেকে চিনতে না পারবো তত সময় পর্যন্ত সে শয়তানির কোন না কোন ধোঁকা বা মোহ বৃষ্টের ফাঁদে, আমিও পড়তে পারি। আর আমার ভুল শিক্ষাটা মানুষ গ্রহণ করে বিপথগামী হলে পরকালে এর জবাব মওলার কাছে কি দিব? একটি বারও আমাদের এই চিন্তা চেতনাতার উদয় হয় না। তাই কোন এক সাধকের গানের ভাষায় দেখলাম, 'এভাবে আর কাটবে কত কাল রে দয়াল।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে এ সময়ের মধ্যে তিনি যাহা অর্জন করিলেন এই অর্জন এর চূড়ান্ত রূপ হলো নবুয়্যতী লাভ। এত বড় অর্জনের পর যখন তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন সেই যুগে জাহেলিয়াত ও বর্বরতা তাঁর আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি বরং শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর এই দাওয়াত প্রক্রিয়া থেকে দূরে অবস্থান নিয়েছেন এবং কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যে আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ পাগল হয়েছে। বর্তমান দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। সেই জাহেলিয়াতের অথবা বর্বরতার দৃষ্টান্ত। পাঠক একটু চোখ মেলে হৃদয় দ্বারা অনুধাবন করুন তো। এরকমভাবে বর্তমানেও সাধক মুনি ঋষিগণ কতনা নির্যাতন আর বঞ্চনার শিকার সহ্য করে চলছে। এ কারণে হয়ত-বা কোন কবি লিখেছেন 'সত্যের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে।' এ রকম সহনশীলতার দৃষ্টান্ত যারা রাখতে পেরেছে তাঁদের কাছেই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা সত্য সাগরে অবগাহন করতে পারে তাঁদের কাছে মৃত্যু নামক যন্ত্রণাও হার মেনেছে। এভাবে বহু সাধক পুরুষের জীবনে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁরা হয়তোবা এতটুকো বুঝাইতে সক্ষম হয়েছেন যে, নিজের জীবনটা বিসর্জন গেলে সত্য যে চির জীবন্ত তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করেছেন।

দর্শন ও যুক্তি এই দুই মাত্রাকে অনেক জ্ঞানী লোকদের বয়ানে বা শিক্ষা বিষয়ক এক বানিয়ে ফেলে এটা কখনও ঠিক নয়। দর্শন যিনি লাভ করেছেন তাঁর কাছে যুক্তি অচল, দর্শনকে যুক্তি দ্বারা আড়াল করা সম্ভব নহে। দর্শনে মেকি ধোঁকা, বাটপারী বা খবরদারিতে দর্শন পরাভূত হয় না। এছাড়াও যে বিষয়গুলো অনেক বিচারকের বিচার কার্য থেকে অন্যায়কারী মুক্তি পায়। যাহা বিচারকও বুঝতে পারে কিন্তু কিছু করার থাকে না। এখানে হয়তবা যুক্তিই মুক্তি, ইহার জাগতিক বিধি বিধানগুলো এই ভিত্তির উপর দন্ডায়মান। দর্শন ভিত্তিক যে উদাহরণ আধ্যাত্মিকতার উপরে তা এরূপ বর্ণনা দিলাম,

একজন সালেক মাযজুব ওলি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। উনার জবানীতে একটি কথাই দু একবার উচ্চারিত হত আর তা হলো 'আমিই শাহেন শাহ' অর্থাৎ আমি রাজার রাজা, মুক্ত দর্শনে এরা পূর্ণ স্থিতি। এভাবেই যুগে যুগে কালে কালে আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করার বিদ্যা মানুষের মাধ্যম হয়ে দেহ থেকে দেহে স্থানান্তরিত প্রক্রিয়া বা অর্জন এবং স্থিতিশীলতা বা নিশ্চিত প্রাপ্তির বিধান খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সফল হতে সক্ষম হয়। দুর্ভাগ্য বা আফসোস তাদের জন্য, যারা এদেরকে বুঝতে বা চিনতে পারে না। এর পরবর্তীতে দেখা গেল রসূল (সাঃ) (আঃ) ইসলাম প্রচার কার্য শুরু করার পর সমসাময়িক সমাজ কেন্দ্রিক যে সকল ব্যক্তিগণ অসহায়, দরিদ্র, ক্ষুধা পীড়িত ও নির্যাতিত মানুষগুলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকল। তখন সমসাময়িক গোত্র প্রধান নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা শুরু করে বা উত্তম আদর্শের রসূলকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। এরই এক পর্যায়ে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটাকে হিজরত বলা হয়।

মদিনার সাহাবাগণ রসূল (সাঃ) (আঃ) কে খুবই ভালোবাসতেন। মদিনায় কিছুকাল অবস্থান করার পর রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) মিরাজে গমন করেন। মিরাজ থেকে আসার পর কোন কোন সাহাবা জানতে চাইলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আপনি তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তাহলে আমাদের জন্য কি নিয়ে আসলেন? জবাবে রসূল পাক (সাঃ) (আঃ) বললেন আমি জীবনে একবার আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত পেয়েছি, আমার উম্মত প্রতিদিন পাঁচবার সাক্ষাত পাবে। এজন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এসেছি (হাদিস ও আলেমদের বয়ান অনুযায়ী)। একটি বার ইসলাম নিয়ে বা ধর্ম বিষয়ে যারা গবেষণা করে চলেছেন নামাজের ব্যাপারে এতই কঠোরতা আরোপ করে চলেছেন। নামাজে আল্লাহ্ দর্শন কি? এই বিষয়ে দর্শনভিত্তিক নামাজ কি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পেরেছে?

একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিবেক দ্বারা ভাবুন তো কি উত্তর হতে পারে? যদিও এই আনুষ্ঠানিক নামাজ সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। এবারে বলতেই হয় আল্লাহ্ প্রাপ্তি বিষয়ে যদি দর্শন বা দেখা নামাজ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন আর তা হলো গুরু বা পীর সাহেবগণ। দর্শন ভিত্তিক নামাজের ট্রেনিং বা শিক্ষা পদ্ধতি তাঁদের জানা। আর এই শিক্ষাটাই ওলি-আউলিয়াগণ ভক্ত বা আশেকগণকে শিখিয়ে থাকেন যা স্বাভাবিকতার সাথে একটু কম বেশ দেখলে এটা সেটা হিয়া-হুয়া, জালিম,

কাফের ও মুরতাদ বলতেও দ্বিধা করে না। আর অবস্থান অনুযায়ী একটু দুর্বল হলে নির্যাতন এর সীমা থাকে না। হায়রে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন যারা কিনা আল্লাহ্র ও রসূল প্রচারিত দর্শন ভিত্তিক বিধানকে তাজা রাখছেন। দেখা বিদ্যা মানুষের মাঝে চালু রাখলেন।

কতিপয় আলেমগণ ফতুয়া আর বিদ্যার কচকচানিতে বলে বেড়ায় এসবের কোন প্রয়োজন নাই। পিতা-মাতা হলো বড় পীর। তাদের মান্য করা আর ইসলামী হুকুমত গুলো পালন করলেই হবে। পীর বা গুরু ধরার কোন প্রয়োজন নাই। আফসোস যারা কিনা সঠিক বিধানের উপর মানুষকে সুশিক্ষা দিয়ে চলেছেন তাঁরা বাদ। দুনিয়ার বুকে যত ওলি, গাউছ কুতুব সহ বিভিন্ন পর্যায়ভূক্ত ওলি-আউলিয়াগণ তাঁদের কি পিতা-মাতা ছিল না, দুনিয়ার বুকে পিতা-মাতাকে মান্য করা থেকে দূরে থাকতে হবে এমন শিক্ষা কেউ দিয়েছেন ? আমার চোখে পড়েনি। আমার মোর্শেদ বর সর্বপ্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হলো,"বাবা যদি মা-বাবা থাকে তাহলে তাদের প্রতি খেয়াল রাখিও" এই নির্দেশনা প্রথম পাই। এই বিধানকে আড়াল করবার জন্য এমন নির্দেশ কি না তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। সত্য বড়ই নির্মম বা করুণ যা ইতিহাস হতে দেখা মেলে তা হলো পাক পাঞ্জাতন থেকে শুরু করে দুনিয়ার বুকে যারা সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরেছেন, তাঁরাই কোন না কোন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি বা বিদ্যার কচকচানি জ্ঞান লাভকারী দ্বারা ঘায়েল হয়েছেন। এজন্য কোন কোন কবি তার কাব্যিক ভাষায় বলে থাকেন সত্য বড়ই নির্মম।

এই তো নিজের নিকট আত্মীয় যারা, আমি যতই বলি না কেন সুফির বিধানই নিরেট সত্য যাহা কখনও বিলয় প্রাপ্ত নয় কিন্তু কই কেহই তাহা মেনে নিল না। বরং যাহারা নেতৃত্বস্থানীয় কওম তাহারা কি নোংড়া চিন্তা ও এই নিরেট সত্য থেকে সরানোর জন্য কত না চালাকি আর কৌশল করে চলেছেন। সময় সময় নিজের রক্তের প্রতি ঘৃণা লাগে। হায়রে আনুষ্ঠানিক বিধান ও লোভ মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। নিয়তির অমোঘ ঘোর তকদির এর বলয় এ কত না ঘুরপাক খাচ্ছে তার ইয়ত্তা বা চিন্তা করার মত সময়টুকু মানুষের হয় না। এই সকল শিক্ষা ব্যবস্থা উৎরায়ে মানুষ কবে সত্য লাভ করবে আল্লাহ্ মাবুদই হয় তো ভালো জানেন। তাহলে রসূলে পাকের নবুয়্যতির প্রচার ও প্রসার লাভের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ সহ দ্বীনের পথে মানুষেকে সুশিক্ষা দেবার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন থেকে জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী বা সকল সমস্যার সমাধান স্বরূপ পাক কোরআনের এই আয়াতে কালাম দ্বারা সত্য ধর্মের

সুশিক্ষাগুলো দিয়েছেন। যিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করতেন না। কোন হাদিস শরীফে এও দেখা যায় যে, "আদম যখন কাঁদা ও পানিতে মেশানো তখনও আমি নবী।"

যিনি এত বড় মর্যাদার অধিকারী হবার পরও নিজেকে পনের বছর এক মাস উনিশ দিন (একটানা নয়) সাধনা করে ঐশি বাণী লাভ করিলেন। একটু হৃদয় দ্বারা ভাবুন তো এটা আধ্যাত্মিকতা না সাধারণ পাঠশালার বিদ্যা ? যার ভাবনাতে যেটা সঠিক বলে মনে হবে সেটাই হয়তবা তার জন্য সঠিক। কারণ এ স্বাধীনতা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের। এ বিষয়টিতে অনেক ওলি আউলিয়াগণের বয়ান হলো কোরআন পাকে এসেছে 'খাতামুন নাবি' অর্থাৎ নবী খতম হয়েছে এ কারণে অহি আর আসবে না কিন্তু এলহাম এর দরজা বন্ধ হয়নি। এই এলহাম প্রাপ্তির ব্যক্তিবর্গ হলো সুশিক্ষার শিক্ষক বা কর্ণধার। তাই যদি কেহ সত্য সাগরে অবগাহন করতে চায় তিনি যেন এলহাম প্রাপ্তির শিক্ষক বা পীরের অনুসরণ করে।

আজ যদি সমাজের বুকে ধর্মীয় শিক্ষকগণ সবাই এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রীতি চালু থাকত তাহলে সমাজের বুকে ধর্ম নিয়ে থাকত না কোন মারামারি মানুষে মানুষে ভুল বুঝাবুঝির শিক্ষা, এক আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল প্রচারিত বিধি-বিধান কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত থাকতো। ফেতনা ফ্যাসাদের কোন বালাই থাকত না। আল্লাহ্র সঠিক বিধান গ্রহণ করে মানুষ দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ জীব এবং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অনুসারীর পথে সবাই এক মহামিলনের আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে। তাহা কতই না সুন্দর হত। এবারে মহানবী বিদায় হজ্বের ভাষণের প্রাক্কালে বলেছিলেন আজ হইতে তোমাদের জন্য ছোট যুদ্ধকে শেষ করে গেলাম, যাহা তরবারীর যুদ্ধ আর বড় যুদ্ধ রেখে গেলাম, সেটা হলো নফ্সের সহিত যুদ্ধ। সেখানে মহানবী (সাঃ) (আঃ) জবানে নফ্সের সহিত যুদ্ধকে "জিহাদে আকবর" বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এই নফ্সের জিহাদ সম্পর্কে দুনিয়ায় মানুষ অচেতন। সমগ্র দুনিয়াতে যদি এই নফ্সের জিহাদ সম্পর্কের শিক্ষায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হইতো তাহলে সমাজের বুক থেকে অশান্তি নামক শব্দটিই থাকতো না। এ সমস্ত বিধানকে মূল হিসাবে কয়জনই বা বুঝতে পারবে। কারণ নিয়তির অমোঘ দ্বন্দ্বের শেকলে আমি আপনি বেশীর ভাগ মানুষ বন্দি। কিন্তু এই নিয়তি যে ভেঙ্গে ফেলতে পারে মানুষ। তকদিরকে ভেঙ্গে ফেলে বা দূরে সরাইয়া আল্লাহ্ পাকের একান্ত সাক্ষাত লাভে সক্ষম হয়েছে এই মানুষ। এজন্য এক সহপাঠির একটি কথা মনে

পরে গেল আর তা হলো 'জানা সহজ কিন্তু মানা খুবই কঠিন।' মুহূর্তের মধ্যে মানুষ চেষ্টা করে কোন বিষয় আয়ত্বে নিতে পারে আবার সেটাকে (Reback) অপর মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারে। নিজের আত্মার মধ্যে এর প্রতিফলন লাভ করতে হলে মানুষকে কি এক সু কঠিন সাধনা আর কষ্ট জ্বালা সইতে হয় যিনি এই বিষয়ের সাধক তিনিই কেবল ইহা উপলব্ধি করতে পারে। অন্য কাউকে ইহা বোঝানো কখনও সম্ভব নয় বলে মনে হয়। নিয়তির অমোঘ কি প্রকার লীলা খেলাই না মানুষের জন্য আল্লাহ্ তৈরী করেছেন তা তিনিই হয়তবা ভালো বলতে পারেন। ইহা বুঝবার সাধ্য কয়জনের ভাগ্যে জোটে। এখানে হয়তবা আল্লাহ্ পাকের চূড়ান্ত রহিম নামের খেলাটি অবস্থান করে। হায়রে দুনিয়ার মানুষ! কি আধ্যাত্মিকতা কি বাস্তবতা আর কি শিক্ষা ব্যবস্থা ইহার সমাধান খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুরূহ। এজন্য জগতে অনেক সালেক মাজজুব অলী আছেন যারা কথা বলিতে রাজি থাকেন না বা নারাজ। পাঠকদের ভাববার জন্য বিষয়টি উল্লেখ করলাম।

নিজের নিকট আত্মীয় কি চক্রান্তের বেড়াজাল তৈরী করতে পারে, আপন রক্ত বেঈমানীর স্রোতধারা প্রবাহমান রেখেছে এ বিষয়ে যে বা যারা অমানবিক জীবন যাপন করে চলেছে তারা হয়তবা এ বিষয়ে সঠিক মতাদর্শের বর্ণনা অনায়াশে গ্রহণ করে নিতে পারবে। আর যিনি বা যারা এই হিংস্র জানোয়ারের আচরণে নিজেকে জলাঞ্জলি, কৌশল আর হিংস্রতা মেনে নিয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এরা জগৎ সংসারের ধারাবাহিক আচরণ সম্বন্ধে কি এক হিংস্রতাকে নিজের কওম বা জাতিতে বিভেদ বিশৃঙ্খলার শিকড় পুঁতে রাখছে যা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। অপরাধ অন্যায় থেকে বিরত থাকা এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা মানুষকে সত্যের বাণীর দাওয়াত করা যদিও বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক তবুও কেন জানি এতটুকো না লিখে বিবেককে আশ্বস্ত করতে পারলাম না এজন্যই লিখলাম।

রহিম রূপি আল্লাহ্ পাকের দান হলো ক্ষমার পরের দান। ক্ষমা যদি কাউকে করা হয় তবে তাকে রহিম রূপ আল্লাহ্ করে থাকেন। কেননা ক্ষমা সার্বজনীন নয় ইহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্জন। এক কথায় ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তবেই সে আল্লাহ্ পাকের রহিম রূপ এর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। যেমন– মহান আল্লাহ্ পাক কালামে ঘোষণা করেছেন :- "ইয়া আইয়াতুনহান নাফসিন মুতমাইন্না, ইরজিই ইলা রাব্বিকা রদিয়াতাম মারদিইয়া, ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতী"। অর্থ :- "ওহে

পরিতুষ্ট আত্মা তুমি আমার সন্তুষ্ট ভাজন হইয়া আসো, অতঃপর আমার দাসদের মধ্যে প্রবেশ করো, অতঃপর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। ক্ষমা প্রাপ্তি না হইলে মহান স্রষ্টা কখনই আত্মাকে আহ্বান করতে পারে না। তাই সংক্ষেপে এটাকে রহিম রূপের দান বা যোগ্যতা অর্জন করা নফ্‌সকেই মহান আল্লাহ্‌ পাক আহ্বান করেছেন আর এই দানই রহিম রূপি দান বলে মনে হয়।

এটা কেউ মানতে পারেন আবার কেউ নাও মানতে পাারেন। কারণ এই খানে তকদির নামক বলয় দাঁড়িয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক দর্শন এক মহা সমুদ্রের চাইতে বড় কিছু। এটা একটা গভীর সত্য দর্শনের বিষয় যে সত্যকে আলিঙ্গণ করতে সাধকগণ দিন-রাত্র নিরলস প্রচেষ্টা গ্রহণ করে চলে। যে বা যারা এই দর্শনে বিশ্বাসী নয় এরা কিভাবে বেঁকে বসে, এটা বাস্তবে যিনি এর সাধনা করেন তিনিই কেবল ইহা উপলব্ধি করতে পারেন।

দুইটি আয়াতের উপর আলোচনা

ওয়াদালাহুল্লাযিনা আমানু মিন কুম ওয়া আ মিলুস চলি–হতি লা ইয়াছ তাখ লিফান্না হুম ফিল আরদি কামাছ তাখলাফাল্লাযিনা মিন কব্‌লিহিম ওয়া লাইউমাক্কী নান্না লাহুম দ্বিনা হুমুল্লা যীর তাদা লাহুম ওয়ালা ইউবাদ্দীলান্নাহুম মিম বাদী খওফিহিম আমনা ইয়া বুদু নানী লা ইফ্‌স রীকুনা বী শাইআও ওমান কাফারা বায়াদা যালীকা ফা-উলায়িকা হুমুল ফাছিকুন।

(সূরা নুর আয়াত ৫৫)

ওয়া আকীমুছছলাতা ওয়া আতুস যাকাতা ওয়া আতীয়ুর রসুলা লা আল্লাকুম তুর হামুন। (সূরা নুর আয়াত ৫৬)

সূরা নুর আয়াত ৫৫ :- (অর্থ) তোমাদের মধ্যে যাহারা আমানু এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন অবশ্য তিনি তাহাদিগকে দেহের ভিতরে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তী দিগকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী

আমানুগণকে) প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন। এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে মাকানস্থ করিবেন। (অর্থাৎ দেহস্থ করিবেন) যেগুলি তাহাদের জন্য সন্তোষজনক করিয়াছেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে বদলাইয়া তাহাদের ভীতির পরে নিরাপত্তা দান করিবেন (তখন) তাহারা আমার দাসত্ব করিবে এবং আমার সঙ্গে কোন বিষয়ের শেরেক করিবেনা এবং উহার পরে যাহারা কুফরী করিবে তবে তাহারা প্রবৃত্তি পরায়ন।

সূরা নুর আয়াত ৫৬ :- *(অর্থ)* এবং সালাত কায়েম কর এবং জাকাত দাও এবং রসূলের অনুসরণ করো, যাহাতে তোমরা রহমত পাইতে পার।

প্রথমেই ভাবতে হবে তোমাদের মধ্যে যাহারা "আমানু" এই আমানু অর্থ যদি ঈমান আনা বুঝানো হয় তাহলে মুসলিম অধ্যুসিত পরিবারের মানব মানবী গণ প্রথমেই বলতে গেলে ঈমানের উপর থাকে কিন্তু আমানু অর্থ ঈমান আনা এই ঈমান কি? এবং কিভাবে ঈমান আনতে হয় এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। এই ঈমান কি নিজে নিজে আনয়ন করা যায় ? না কি গুরু/পীর বা ইমামত প্রাপ্ত নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকটে এই প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার বিধান রয়েছে ? আহলে বায়াত নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায় দলভুক্ত (মানব-মানবী) গণ এ বিষয়ে মতানৈক্য বা বিরোধপূর্ণ বাক্য বিলাপ আলেম গণের মুখে শোনবার পর তা লজ্জাজনক বলে মনে হয়। আমরা যে মতের উপর দন্ডায়মান বা যে মতের উপর ধর্মীয় বিধানকে মেনে নিয়েছি তা হলো আহলে বায়াত অর্থ একজন পীরের নিকট হাজির হয়ে ঈমান আনয়ন করাকে আমানু হিসাবে খ্যাত করা হয়।

ঈমান অর্থ বিশ্বাস- এই বিশ্বাস ধর্ম মতের সকল মানুষ মুখে মেনে নেয়। এখন প্রশ্ন হলো যদি এভাবে মেনে নিলে ঈমানের পূর্ণতা হত তাহলে কোরআনুল মাজিদে ঈমানের যে সকল বিভাজনকৃত বিশ্বাসের বাক্যগুলো দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে বেলগায়েব একিন, এলমুল একিন, আইনুল একিন, হাককুল একিন, হুয়াল একিন, এই বিশ্বাস বা একিন স্তর। বিশ্বাস কি এবং তা কিভাবে পূর্ণতার অবগাহনে পৌছানো যায় তারই ধারাবাহিক শিক্ষা নিতিগুলো গুরুগণ সঠিক ভাবধারায় এই সু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যা প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রকারের শিক্ষা খুঁজে পাওয়া বিরল। এখন আরো একটু ভাবনার বিষয় কোরআনুল মাজিদে উল্লেখ রয়েছে আমানু, নফ্স, বনী আদম, আদম, মোমিন, মুক্তাকী, বাসার, স'বেরীন, মুহ্সিনিন সহ বহু উন্নত পদমর্যাদার খেতাবী নাম এবং এর বিশেষণ। প্রতিটি খেতাবী নামকে আল্লাহ্ পাক কত সুন্দর গঠনশৈলির মানদন্ডে

মর্যাদাবান করেছেন। এই মর্যাদাবান খেতাবধারী বা খেতাব প্রাপ্ত (মানব-মানবী) গণকে কে চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে ? তাই এই প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে হলে আধ্যাত্মিক বিষয় লাভ করা ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ আমরা জানি ইনসান শব্দের অর্থ মানুষ। এত বিশেষণ মাখা শব্দের ভাব অর্থ কি মানুষ নয় ? তাঁহাদের কে চিনিয়ে দেবে এই বিষয় বর্ণনার জন্য জ্ঞানীদের কাছে আবেদন রইল। কারণ এই সমস্ত বিষয় পরিস্কার এবং স্বচ্ছ না হলে সর্বসাধারন মানুষ ভুল করে তার আমল নামায় মন্দটা স্থান করে নেয়। ফলে অনেক আমল করবার পরও পরকালীন জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ পরিত্রানিক মুক্তির পথ বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। হয়ত দুনিয়ার জ্ঞানীগণ একদিন এই সকল চিহ্নিত ব্যবস্থা খুব শিঘ্রই মানব সমাজে ধর্মের মূল চালিকাকে সচল করতে ধর্মের সকল প্রকার বিভেদ বিড়ম্বনা অবসানের লক্ষ্যে বিষয়গুলো জানা আবশ্যক। যদি এই আমানুগণ ঈমান আনবার পরে সৎকর্ম করে (মুহসিনিন) তাহলে আল্লাহ্পাক ওয়াদা দিতেছেন তিঁনি দেহ রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন বা তাঁর (আল্লাহ্র) দাসদের দলভুক্ত অনুসারী করে নিবেন। কিন্তু এই সৎকর্মের বাঁধা সমুহ সম্যক বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা না থাকে তবে সমুহ ভ্রান্তি বা ভুলে নিপতিত হবার বিড়ম্বনা রয়ে যায়।

(১) উদ্দিল লানা – পথহারা করা।

(২) উমান নিয়াননা – মিথ্যা কামনা বাসনা তুলে ধরা।

(৩) ইয়ানজাগাননা – কুমন্ত্রণা দেওয়া।

(৪) নাজাগুন – প্ররোচিত করে।

(৫) আদাওয়াতা – শত্রুতা।

(৬) বাগদাআ – ঘৃণা।

(৭) আসিয়্যা – অবাধ্য।

(৮) আজনান – বিপথগামী করে।

(৯) মারেদিন – বিতাড়িত বিদ্রোহী।

(১০) ওয়াস ওয়াসা – কুমন্ত্রণা দেয়।

(১১) ইয়াফতি নাননা – প্রলুব্ধ করে।

(১২) তামাননা আলকা– নিক্ষেপ করে কামনা বাসনা।

(১৩) উলকি ফেতনাতান – ফেতনা নিক্ষেপ করে।

(১৪) ইয়া এদুকুমুল ফাকারা – দারিদ্রতার দিকে ফিরিয়ে দেয়।

(১৫) ইয়া মুরুকুম বিল ফাহসায়ে – তোমাকে হুকুম করে ফাহেসার সাথে।

(১৬) ইয়াদউ আস্ হাবিস সাইর - প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসী হবার জন্য ডাকে।

(১৭) কাইদা – চক্রান্ত করে।

(১৮) ইয়ান জাগু – একের উপর অন্যকে লেলিয়ে দেয়।

(১৯) হামাজাত– পরনিন্দা, প্ররোচনা, খোঁচামারা, গীবত করা।

এগুলো বর্জন পূর্বক ভাল কর্ম সম্পাদন পূর্বক সৎ কর্মশীল বলে গণ্য হওয়া যাবে। তাই আত্মার উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা দৃষ্টি ভঙ্গি রেখে এই কার্য সম্পাদন করিতে পারিলে সৎকর্ম সুসম্পন্ন হবে। উদাহরণ হিসাবে মহান আল্লাহ্পাক পূর্ববর্তী আমানুগণ এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যে, কিভাবে তাহারা দেহকে মাকানস্থ করেছিল এবং তাঁর দাস ভুক্ত হয়েছিল। অতঃপর তাহাদের জন্য যা সন্তোষজনক তাহা তাহাদের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। এটা মওলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি উত্তম ব্যবস্থা। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, ভীতির পরে নিরাপত্তা দান করিবেন। এই দান প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হলেই কেবল তাঁর (আল্লাহ্র) দাসভুক্ত হইয়া কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

তাই মওলার পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো এই যে যিনি দাসভুক্ত হইয়া থাকবে তিনি আর শিরক করতে পারবেনা আর যারা প্রকৃত এটা না পারবে কুফরী করবে এদেরকে প্রবৃত্তি পরায়ন বা শয়তানি সত্ত্বাতে সমাসীন হয়ে মন্দ স্বভাবের করণ কার্য করে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা মন্দের দিকেই সমাসীন করবে বা উপনীত হবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে সালাত কায়েম কর যাকাত দাও রসূলের অনুস্মরণ কর।

উপরের উল্লেখিত বিষয় গুলো সুসম্পন্ন হলে তাহার জন্য এই নির্দেশ নামা আর ইহা পালন করিলে রহমত পাবার ঘোষনা দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো সালাত কি ?

সালাত শব্দের অর্থ হলো – নামাজ, যিকির, দরুদ, সংযোগ, যোগাযোগ, স্মরণ, কোমর দোলাইয়া নাচা, একটি বেতকে বাঁকিয়ে অর্ধবৃত্ত করা, সালাত সংরক্ষণ, মধ্যবর্তী সালাত, রুকুকারী, সেজদা আল্লাহ্র ইত্যাদি এক কথায় সবই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে।

এখন প্রশ্ন হলো- কায়েম কি ?

কায়েম শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠিত। এখন কোন কিছু প্রতিষ্ঠা বলতে চিরস্থায়ীরূপে বা স্থায়ীরূপে কার্যকর হওয়া। এখন মসজিদ দুই রকম মেজাজী ও হাকিকী। মেজাজী হলো মানুষের তৈরি করা উপসনালয় আর হাকিকী হলো আপন দেহতে মসজিদ তৈরি করে সালাত আদায় করা। ওলিদের মতানুসারে ৪ (চার) প্রকার মসজিদ পাই।

১. আল্লাহ্র মসজিদ– সর্বক্ষণ সেজদায় সমর্পনের উপযুক্ত দেহকে বলে।
২. প্রজ্ঞার মসজিদ – ইহা মনের মধ্যে সৃষ্ট পরিবেশ যাহার মধ্যে বস্তু বিজ্ঞানী দার্শনিক বা অন্য কোন শাস্ত্রবিদ নব নব তথ্য সংগ্রহ করে এমন দেহ।
৩. এবাদত খানা মসজিদ – ইহা একটি নির্দিষ্ট স্থান ও ঘর। যেখানে একজন শিক্ষকের শিক্ষাধীন থাকিয়া আল্লাহ্র মসজিদের অবস্থায় পৌঁছিবার শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে।
৪. মসজিদে জেরার–মসজিদ ঘর শিক্ষার জন্য মিলনকেন্দ্র। যখনই আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে তখন উহাকে মসজিদে জেরার বলে।

বিস্তারিত জানতে সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) রচিত "মসজিদ দর্শন" বইটি পড়তে অনুরোধ রইল।

মোহ পরিপূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করবার অনুশীলনকে সালাত বলে। একটি দেহ মওলার সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টা বা যোগাযোগ প্রক্রিয়াই হলো সালাত। তাই এই অনুশীলন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে দেহকে মসজিদ ও তাঁর (আল্লাহ্র) সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইলে সালাত প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়। এর পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দ্বারা এর সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিপূর্ণ জ্ঞাপন ধর্মীয় দর্শনে সর্ব মানবের উত্তরণ যোগ্য পূর্ণতার স্বাদ আস্বাদন ও কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে সালাত কায়েম হইবে।

এই মতাদর্শকেই রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) তাঁর জীবন দর্শনে দেখিয়েছেন। প্রিয় পাঠক বাবা মায়েরা একবার ভাবুন, ৬৩ বছর জিন্দিগিতে ২৫ হইতে ৪০ এই ১৫ টি বছর বা সময় সীমা কি রসূলের জিন্দেগীর সব চাইতে উত্তম সময় কি না? যে সময়টা তিনি জাবালে নূর পর্বত অর্থাৎ হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থান করিলেন। এটার অনুশীলন প্রক্রিয়া আজ দুনিয়ার মুসলমান নামধারীগণ ভুলতে বসেছে। যদিও পীর ফকিরগণ এই অনুশীলন করার জন্য তাগিদ দেয় তাহাতে প্রচলিত বিধি যে সকল জ্ঞানীগণ আমাদের শিক্ষা দিয়া থাকে তাহারা এর বিরোধিতা করে চলছে। তাই এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন ব্যতিরেকে কোরআনুল মাজিদে উল্লেখিত সালাত কায়েম অসম্ভব বলে মনে করি। আমার মোর্শেদ কেবলা'র মুখে একটি কথা বারবার মনে পরে তা হলো, কাবায় শরিয়ত আর হেরা গুহায় মারেফত। তাই এই মারেফত হাসিল ব্যতীত সালাত প্রক্রিয়া পুর্ণতা অসম্ভব।

এবারে সালাতের সঙ্গে যাকাত সংযোগ স্থাপন রয়েছে। রসূল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত ধর্মীয় বিধানে আয়ের নির্ধারিত কর যা বায়তুল মালে জমা দেওয়া হতো। প্রতিদিনের আয়ের শতকরা ৫ ভাগ এটাকে খুমস বলা হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধিতে মানুষের ইসলাম ধর্ম মতে বাৎসরিক আয়ের যে নির্দেশনা সদগা শতকরা ২.৫ ভাগ দেবার নির্দেশ ধনীগণ গরীব, মিসকিন, নিকট অত্মীয়, প্রতিবেশি দরিদ্র হলে এদেরকে দান করবার জন্য বা যাকাত প্রদান করবার যে নির্দেশনামা আমরা পেয়ে থাকি এটা প্রশ্ন জাগে যে কোরআনুল মাজিদ আমাদেরকে কি এই যাকাত দেবার নির্দেশনা ব্যক্ত করে দেখিয়েছেন? সুফি মতে, নিজের আমিত্বের উৎসর্গকে যাকাত বলা হয়। সারাটি জীবন আমি আমি করে নিজের আমি স্বত্ত্বাকে সকল কিছুর উর্দ্ধে আমল বা কার্যকারিতায় স্থান দিলে খান্নাস স্বত্ত্বা আমার মধ্যে থাকতে মওলার সান্নিধ্য লাভ একেবারে অসম্ভব তার দান কার্যকারীতা কতটুকো স্থান পেতে পারে। এখন ধনীর জন্য যাকাত গরীব এই প্রক্রিয়া থেকে দুরে অবস্থান করবে এমন বিধান খোদা তাঁর কালাম পাকে নির্দেশ করলে সবার জন্য এক বিধান হয় কি করে? (খান্নাস, শয়তান, মরদুদ, ইবলিশ) এই মন্দ স্বত্ত্বা একটি দেহ থেকে যখন বিদুরিত হবে বা মুসলমান করানো হবে। তখন সেই দেহটা মওলার জালুয়াতে রাঙিয়ে সালাত কায়েম প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হবে। তখনই সেই মানবটা যাকাত দানের জন্য উপযুক্ততা পায়। তখনই যাকাত দাও তার জন্য পালনীয় নির্দেশনামা কার্যকর বলে মনে করি।

এর পরে বলা হয়েছে রসূলের অনুসরণ করো। তাই রসূলের অনুসরণ অনুকরনীয় হলেই কেবল উপরোক্ত বিধি বিধান কার্যকারিতা সুসম্পন্ন হবে। এ জন্য রসূলের (সাঃ) (আঃ) জীবনাদর্শকে মনে প্রাণে লালন করে তা সময় প্রেক্ষাপট ও পালনীয় বিষয় সামনে রেখে তাঁর জীবন আদর্শ একটি মানবের মুক্তির সিঁড়ি বা ধাপ হিসাবে পালনতব্য করলে তবেই তাকে অনুসরণ করা হয়। বিবেকের জিজ্ঞাসায় একবার ভাবুনতো কিছু হাদিস মুখস্ত করার পর সভ্যতার পোষাকী আবরণ দ্বারা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর অনুসরণ নীতি আজ গোটা সমাজ সংসার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত এটা স্থান করেছে কিনা? কোন অনুসরণ নীতি আমরা রসূলের (সাঃ) (আঃ) পালনতব্য করে চলেছি এর জবাব আপন বিবেকের কাছে চাইলে পাওয়া যাবে বৈকি ? তাই রসূল (সাঃ) (আঃ) অনুসরণীয় নীতি প্রতিটি মানব মানবীকে তার ক্রিয়ার কাল বা সময় এবং কার্যাবলি গুলোর সমষ্টি বিচার করে নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি এবং মূল ধারা পালনীয় হলেই কেবল তা গ্রহণীয় হবে বা রসূলকে (সাঃ) (আঃ) অনুসরণ করবার নির্দেশ পালন করা হবে। আর মুল ধারাতে যদি সকল কিছু পালনীয় হয় তবেই তার রহমত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা বা কালাম পাকের ঘোষণা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আর এই প্রক্রিয়া যদি সুসম্পন্ন না হয় তবে কোন কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ জন্য বলা হয়েছে "সালাত কায়েম করো", "যাকাত দাও" এবং "রসূলের (সাঃ) (আঃ) অনুসরণ করো" যাহাতে তোমরা রহমত পাইতে পার ইহা যেন পরস্পর এক সুতায় গাঁথা। একের সঙ্গে অন্যটা পরিপুর্ণ সংযোগকৃত পূর্ণতা।

আধ্যাত্মিক দর্শনে এই আমানু এবং সৎকর্ম কিন্তু কখনই বাইরের নয়। কারণ হলো একটি মানব যদি তার নিজ দেহে এর বিস্তার ঘটায়, মানুষের প্রতি মানুষের ঈমান আনবার যে নীতি ইহা সর্ব সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না কিন্তু আমানুরূপে পরিগণিত হইবার চেষ্টা ও পথ দুনিয়া নামের স্থানটি উল্লেখ করিতে হইলে দেহটাকে দুনিয়া হিসাবে উল্লেখ করিতে হয়। একটি দেহ যদি খোদা প্রাপ্তিতে সমাসিন হয় তবে সে মানবটা দেখতে আমারই মত মানব মনে হবে পার্থক্যটা কি দিয়ে বুঝব তাই জ্ঞান গর্ভের গবেষণা ব্যতীত ভাববাদ ও দর্শণবাদ আয়ত্ব না করা পর্যন্ত ইহা বুঝবার সামর্থ্য থাকে না। উদাহরণ হিসাবে বর্তমান কোয়ান্টাম মেথড বেশ সফলতার দাবীদার। তাহলে ওলিদের দর্শণ আরও ব্যাপক ও অর্থবহ হতে পারে সে সম্পর্কে বর্তমান দুনিয়া মুখ ফিরালে সমাধানটা কে দেবে ? বহু ওলির জীবনে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পরও কাফের টাইটেলটি দিতে (অন্ধ-কানা) শিক্ষায় শিক্ষিত বেপরোয়া জ্ঞানীগণ পিছপা হয়নি।

আরবিতে হুয়াল শব্দের অর্থ– "তিনি" এখানে শব্দটি কে যদি (হু+আল) পৃথক করা হয় তবে (সে+নির্দিষ্ট) এই নির্দিষ্টকরণ আল্লাহ্র ঐশী ভাবধারা ব্যতীত সর্ব সাধারণ মানব–মানবীর বুঝবার উপায় নেই। এজন্য মহান আল্লাহ্ সরাসরি কখনও প্রকাশিত বা বিকশিত হয়েছেন এর নজির বা দৃষ্টান্ত মেলানো খুবই দুরূহ। তবে আধ্যাত্মিক দর্শণে অনেক ওলিগণ এর নজির বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কারণ হলো আল্লাহ্ যখনই বিকশিত বা প্রকাশিত হয়েছেন তখন তা মানবের আকারে বা মানব সুরতেই এক মাত্র তাঁর (আল্লাহ্) প্রকাশ বা বিকাশ।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বাবা মুনছুর হাল্লাজ বলেন, "আনাল হক" অর্থ আমিই একমাত্র সত্য। বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেন "লাইসালা ফি জুববাতি সেওয়া আল্লাহ্ তায়ালা" অর্থ, আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া কিছু নাই। আবার তাঁর (আল্লাহ্র) হাবীব সম্পর্কে কোন কোন ওলির বর্ণনা এমন যে, "দোন হিকা শেকেল এক হায় কিসকো খোদাকাহু" অর্থ– আল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ দুই জনকেই তো এক রূপে দেখি কাকে খোদা বলব?

এত কিছুর তাৎপর্য একই কথাতে দাঁড়ায় তা হলো সাধক যখন তার সাধনা রাজ্যে সফলতা বা বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করে তখন সেই মানবটি আল্লাহ্তে সমাসীন হয়ে পূর্ণতার অবগাহনে ছুটে চলে। ইহাই আল্লাহ্র এক চরম লীলা খেলা সৃষ্টিতে এ এক বিষ্ময়কর সংবরণ লীলা খেলে চলেছেন। "সে" প্রাপ্ত ঐশী ভাবধারাতে কোন মানব-মানবী নিজেকে মিলায়ে বা মিশ্রন ঘটায়ে এই ধরাধামে অবস্থান করে তবে এই রহস্য বুঝিবার সাধ্য কার ? একমাত্র ভাববাদ বা আধ্যাত্মিক দর্শণে উল্লেখিত শব্দচয়নগুলির মিল বা সার্থকতা অবলোকন করা সম্ভব হয়। উক্ত আলোকপাত ধর্মীয় জ্ঞানী বা গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বা জ্ঞান গবেষণার দ্বারা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী টুকোর সঠিক সুরাহা হবে বলে মনে করি।

যেহেতু আয়াতে কালামে প্রথমেই বলা হয়েছে তোমাদের মধ্যে যারা আমানু এবং সৎকর্ম করে তাহাদের কে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, কোরআনুল মাজিদ এমন একটি বিষ্ময়কর গ্রন্থ যা মানব-মানবীর মুক্তির সনদ ও মহান আল্লাহ্র মূল বিধি বিধানের সকল কিছু এই কিতাবে স্থান করে আছে। এমন ধর্মীয় দর্শণের জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা রইল

আমানু অর্থ মানুষ, নফ্স অর্থ মানুষ। নফ্সের আবার ৩টি প্রকারন্তের বর্ণনা পাই (নফসে আম্মারা, নফসে লাউয়ামা এবং নফসে মুৎমায়িন্না) এর অর্থ মানুষ। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ রাখলাম মানুষ ব্যতীত মুলধারা প্রকাশ না পাওয়াতে সৃষ্ট জীবগণের আলোচনা না রাখতে শ্রেয় মনে করি। কারণ সৃষ্টজীব আল্লাহ্র সেফাতি রূপ বা গুণ ক্রিয়ার প্রকাশ। আর মানুষের মধ্যে জাত বা আসলের প্রকাশ।

"ইনসান" অর্থ মানুষ "মোমিন" অর্থ মানুষ

"মুত্তাকী" অর্থ মানুষ "বাসার" অর্থ মানুষ

"মোসলেম" অর্থ মানুষ "রসূল" অর্থ মানুষ

"নবী" অর্থ মানুষ "রোহবানীয়াত" অর্থ মানুষ

"অজহুল্লাহ" অর্থ মানুষ

"উলিল আমর" অর্থ মানুষ এবং "আবাদান" অর্থ মানুষ

মন্দ বর্ণনা দিতে গেলে

(১) "শয়তান" অর্থ মানুষ
(২) "মরদুদ" অর্থ মানুষ
(৩) "ইবলিশ" অর্থ মানুষ
(৪) "খান্নাস" অর্থ মানুষ
(৫) "ফাসেক" অর্থ মানুষ
(৬) "মোশরেক" অর্থ মানুষ
(৭) "মোনাফেক" অর্থ মানুষ

আরো অনেক থাকতে পারে।

উল্লেখিত মানুষের রূপ রং কার্য বিবরণী চিনিবার উপায় কর্মপন্থা এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা থাকলে দুনিয়াতে মানুষের ভ্রান্তি বা বিড়ম্বনার সম্ভাবনা কম হত। তাই জ্ঞানীদের নিকট আকুল আবেদন রইল এর সু নিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে মনে করি।

কারণ শরিয়তের নিয়ম নীতি মেনে আধ্যাত্মিক দর্শন লেখনী বা বুঝানো কখনোই সম্ভাবপর নয়। যে গ্রামটিতে বসবাস করি এখানকার মানুষগুলোর চিন্তা-চেতনা ও বিবেকবোধ মনে হয় সেই অন্ধকার যুগের বর্বরতাকে হার মানাবে।

কি ধর্মীয় অনুভুতির আধ্যাত্মিক দর্শণ উপহার দেব। এজন্য নিজের প্রতি নিজেরই ঘৃণাবোধ জন্ম হয়। অবশ্য অল্পকিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছে যারা অন্ধের মত আমাকে ভালবাসে তাদের সেই ভালবাসা টুকোই হয়ত-বা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ।

সালাত বা নামাজ

সালাত :- সালাত আরবী শব্দ। নামাজ ফারসি শব্দ। সালাত-এর অভিধানিক অর্থ হলো সংযোগ বা যোগাযোগ মূল সালাত অর্থ সংযোগ, যোগাযোগ, দরুদ, যিকির, স্মরণ, একটি বেতকে অর্ধবৃত্ত করা, কোমর দোলাইয়া নাচা ইত্যাদি। এখন এই যোগাযোগ অর্থ হলো আল্লাহ্‌র সংগে যোগাযোগ স্থাপন করাকেই সালাত বলে। যা হাকিকী বা আধ্যাত্মিক ভাবে জ্ঞাত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, পবিত্র কোরআনুল মাজিদে উল্লেখিত সালাত সম্পর্কে ৮২ টি আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র সংযোগ স্থাপন এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে ।

সালাত বা নামাজের গুরুত্বের কারণ

- নামাজ আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠ দান ও নিয়ামত।
- নামাজ হলো সমস্ত এবাদতের সমষ্টি।
- বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র যোগাযোগ স্থাপনের সহজ ও সরল পথ হলো নামাজ।
- আল্লাহ্ পাকের স্মরণই নামাজের উদ্দেশ্য।
- নামাজে আল্লাহ্ দর্শন হয়।
- নামাজ অন্তরকে পবিত্র করে।
- নামাজ চক্ষুকে শীতল করে।
- নামাজ এমন মূল্যবান আমল যা প্রতিষ্ঠিত করলে কোন মন্দ কাজই স্পর্শ করতে পারে না।
- নামাজ মোমিন কে মেরাজের সম্পদে সৌভাগ্যবান করে পূর্ণতা দান করে।

- নামাজ সকল সমস্যার সমাধান দাতা।
- আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য প্রদানকারী একামাত্র বাহন হলো নামাজ।
- নামাজ মানুষকে মনুষত্ব দান করে।
- নামাজ আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।
- নামাজ সর্বপ্রকার দুঃশ্চিন্তা দুর করে।
- নামাজ মানুষকে শান্তি দান করে।
- নামাজ সকল মন্দ স্বভাব দুর করে।
- নামাজ হলো আল্লাহ্ পাকের সাথে বান্দার সাক্ষাৎকারের মিলন ঘর।
- দোজখ হতে মুক্তির একামাত্র অবলম্বন নামাজ।
- নামাজ হলো প্রতিটি মানুষের জীবনের আত্মিক জিহাদ।
- নামাজ বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে বিলীন করে দেয়।
- নামাজ আমিত্বকে ধ্বংস করে দেয়।
- নামাজ মানুষকে দুস্কর্ম হতে দূরে রাখে।
- নামাজ মানুষকে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে।
- মানুষের ভিতরে যে এলাহী শক্তি আছে নামাজ তা উপলদ্ধি করতে সাহায্য করে।
- নামাজের দ্বারা মানুষ নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি করতে সক্ষম হয়।
- নামাজ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দুর করে ।
- নামাজ কবরের আযাব ও কিয়ামতের আযাব থেকে রক্ষা করে।
- নামাজ মানুষকে সাম্যের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।
- নামাজ মানব জাতির ঐক্যের বুনিয়াদ।
- নামাজ ইহকাল ও পরকালের সকল বিপদ আপদ লাঘব করে।
- ধর্মের পূর্ণতা অর্জনে সচেষ্ট করে নামাজ।
- শয়তানি সকল ওয়াছ ওয়াছা থেকে সফল করে নামাজ।

প্রকার ভেদে সালাত বা নামাজ

- সালাতে দায়েম
- সালাতুল মেরাজ
- সালাতুল মাকুছ
- সালাতুল ওছিয়াত
- সালাতুল ওছতা
- আচ্ছামাও কাচ্ছালাত
- সালাতে কুন ফায়াকুন

উক্ত সালাত সকল হাকিকী।

সময় নির্ধারণী সালাত বা নামাজের উল্লেখ

সময় নির্ধারণী নামাজকে ওয়াক্তিয়া নামাজ বলে। এই নামাজ গুলোর মধ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নিহিত। নিম্নে সিময় নির্ধারণী নামাজ উল্লেখ রইল :-

- ফজর
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
- তাহাজ্জুত
- জুম্মা
- তারাবিহ
- শবে কদর
- শবে মেরাজ
- সালাতুত্তাছবিহ্
- শবে বরাত
- এশরাক

- চাশ্‌ত
- জওয়াল
- আওয়্যাবিন
- কুচ্ছুফের
- খুচ্ছুফের
- এছতেছকার
- জানাজা (নামাজ বলে প্রচলিত)
- ঈদুল ফিতর
- ঈদুল আযহা
- মোসাফিরের নামাজ
- রুগ্ন ব্যাক্তির নামাজ
- ওজুর নামাজ
- মসজিদের নামাজ
- গোসলের নামাজ
- শূকরিয়া নামাজ
- বেতের নামাজ

বিশেষ দ্রষ্টব্য আরও অনেক প্রকার নামাজ থাকতে পারে যা এখনো জানতে পারিনি এ সকল নামাজ হলো সময় নির্ধারণী।

লৌকিকতা বিবর্জিত সমাজ আহ্বান

মানুষের মুক্তি পেতে সদা সর্বদা গুরু ভজন সাধন ব্যতীত আর কোন সরল পথ সাধনার জগতে নেই। এ বড় আজব এক পথ পরম প্রাপ্ত সাধকের একটু বাতাস যদি কারও লেগে থাকে তাহলে বাক্য বিলাপ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আজব লীলার বিধান যা কেবল বুঝতে পারা আর বোঝানো সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক বহন করে সৃষ্টিতে সমাসীন। আমার মোর্শেদ কেবলার বাণী "যার মধ্যে নম্রতা নেই তার জন্য সুফিবাদ হারাম" ইহা ঐশী বাণী নয়, সবার প্রতি উদাত্ব আহ্বান হলো যদি কেহ আদব, দরবার নীতির দৃষ্টান্ত দেখতে চান তাহলে একবার ঘুরে আসুন এই উদাত্ব আহ্বান রইল।

কারণ হিসাবে যা পাই তা হলো, সুফিবাদের সংজ্ঞা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী (আঃ) লিখিত বই, "সুফিবাদ আত্ম পরিচয়ের একমাত্র পথ (১ম খন্ড)" বইটাতে প্রকাশ করেছেন তা হলো "সুফিবাদের দেশে যেতে চাও জেনে রেখ ইহা একটি বাস্তবতা বর্জিত আজব দেশ, এখানে পা রাখতে হলে নিজের ইচ্ছার কাছে নিজের শক্ত মেরুদন্ডটা ভেঙ্গে মেরুদন্ডহীন প্রাণী হয়ে যেতে হবে আর সামাজিক ভাবে টিটকারীর বিশেষণটা গায়ে মাখতে হবে।" এই সংজ্ঞায়ীত সুফিবাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রচলিত সমাজ সংসার এবং মানুষের রীতি-নীতির কি বর্ণনা উল্লেখ করবো শুধু সময়ের ক্ষেপণ ছাড়া আর কি? মানুষের জীবন ব্যবস্থা চলছে অন্যের অনুকরণ আর অনুসরণে কে কত সুখে থাকবে! ভোগ বিলাসের মত্য লীলায় মাতোয়ারা যারা, তাহারাই তো সমাজটা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে 'এ যেন পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বিধান। অর্থ আর প্রাচুর্য যার বেশী, বেশীর ভাগ সমাজ ব্যবস্থার কর্ণধার তিনি। অর্থ আর অস্ত্র দিয়ে তো সমাজ পরিচালনা করা যায় কিন্তু সুফিবাদ আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। আপন দেহে নিজ গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করার তরে যিনি শুরু করেছেন তিনিই বলতে পারবেন কি বোকার স্বর্গে আমরা বসবাস করে চলেছি। একটি মানুষ তার আপন স্বত্ত্বা অর্থাৎ আত্মাকে কিভাবে চিনবো বা জানবো ? আত্মার পরিচয় জানার বা বোঝার জ্ঞান লাভ করার সূত্র কোন শিক্ষাতে পেতে পারে তার অন্বেষণ করবে এটা তার নিজ দায়িত্ব, এটা তার একান্ত ধর্মের কর্ম। অথচ এ কর্মের দিকে নিজেকে কখনই ভাবনার মধ্যে আনতে চায় না। জাগতিক বিষয় বাসনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে এবং ডুবিয়ে রাখাই নয়, যে বা যারা এই আত্মতত্ত্ব জগত

সংসারে প্রতি নিয়ত যুদ্ধ করে চলেছে তাদের বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি বলব এ চিন্তা চেতনা যে অমুলক, এটা একমাত্র ভাববাদী মানুষ ব্যতীত অন্যের বোঝা সম্ভব নয়।

আত্ম জ্ঞান লাভের জন্য যে ফর্মূলা সেটা হলো "সুফিবাদ" প্রচারিত ধর্মীয় অনুশাসন যেটা দেখতে পাই তা হলো পোশাকের বাহাদুরীতে সুফির লেবাজ মানুষকে রাহুগ্রাসে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ থেকে পরিত্রাণ কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌পাক ভাল বলতে পারেন। জগত সংসারে অনেকে চুল এবং মুচ বা শরীরের অনেক অঙ্গের বিভিন্নতা সুফির আদর্শের ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায়। অনেকে আবার সুফিবাদের শিক্ষা নিতে আগ্রহী নয় কিন্তু শরীরের বিশেষ কিছু অঙ্গ যেমন লোম, চুল, মুচ এগুলোর বিভিন্নতা মানব সমাজের বুকে মেলে ধরতে রাজী। এ কারণে প্রকৃত সুফি কোন দিকে কোন মতকে অনুশাসনে নিয়ে আসবে কারণ প্রকৃত সুফি সবই বুঝতে পারে, সবই জানতে পারে, প্রকৃত সুফি রং দ্বারা নির্বাচিত করতে গেলে প্রতি পদে পদে ভূল বা বিপদগামী হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। সুফি সব সময় নিজের আত্মাকে কি ভাবে চিনবে এ বিষয় বস্তুটা যদিও আধ্যাত্মিক একটি বলয় এর শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ একটি কর্ম যা সে নিজেই জানতে ও বুঝতে পারে অন্য নহে। এ কারণে চলমান সু-শৃঙ্খল গতি ঠিক রাখা তার জন্য হতে পারে অস্বাভাবিক যেটা অনেকে আন্দাজ করতে পারে না।

এই বিষয়টা লেখনী দ্বারা বুঝানো কখনও সম্ভব নয়। ইহা বাস্তবে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে অর্জন করে নিতে হবে। এই অনুশীলন প্রক্রিয়া সর্ব অবস্থায় একটি গোপন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ্‌পাক কি এক আজব লীলা খেলার উপর আমাদেরকে চালাচ্ছেন ইহা তিনিই ভাল জানেন। অথচ হাতের কাছে তিনি অবস্থান করছেন এবং আরও উলঙ্গ করে যদি বলা হয় তা হলো আমারই ভিতরে আল্লাহ্‌ অবস্থান করছেন। আমারই ভিতর মহান আল্লাহ্‌পাক কে দেখা বা জাগ্রত করার চেষ্টা এই তালিম তালকিন যদি পেতে চান তা হলে ফকিরী ধারা অনুসরণ করে যেতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতে এ এক আজব লীলা খেলা চালিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামিন। এ যেন স্বচ্ছ, সর্ব অবস্থায় স্বাদ গ্রহণ করে চলেছেন যোগী এবং সাধকগণ যা চলমান জগত সংসারের কাউকে সে বুঝাইতে পারবে না অথচ নিজেই সর্ব অবস্থায় কি এক আজব প্রেমের নেশায় ছুটে চলে, কোন প্রকার বাঁধা তাকে আটকাতে পারেনা।

সংসার সহ সকল মায়াজাল ছিন্ন করে ছুটে চলে সেই মহান স্রষ্টার প্রেমে মাতোয়ারা

সদাই সে ঘুরে ফেরে আজব সকল কাণ্ড জ্ঞানহীন কর্ম পর্যন্ত তার দ্বারা ঘটে যাবে, সকল সমাজ ব্যবস্থা তাকে দোষণীয় রূপ দেখাতে বিচার করলেও তার কিছু যায় আসে না। সে তার প্রেম লীলা নিয়ে সদাই বেহুঁশ অবস্থার মধ্য দিয়ে ছুটে চলে। পূর্ণতা লাভে সক্ষম এমন একজন সাধকের সঙ্গ লাভের এ বিষয়ে কি গুরুত্ব তাহা অনুধাবন করা যায়। অথচ এ কর্ম-সুসম্পূর্ণ করতে তাঁর বলতে আর কিছু থাকে না, জগত সংসার তাকে একটি সম্মান জনক অবস্থায় নিয়ে যায়, সেটার খেতাব হলো “পাগল”।

হায়রে মানুষ সৃষ্টির সেরা অথচ একটি বার ভাববার প্রয়োজন টুকো অনুভব করল না। আমি একজন মানুষ সৃষ্টিতে কেন এসেছি বা আমার কর্মটাই বা কি ? সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির সদ্ব্যবহার করে যেতে পারলাম না এ যেন আজব ভয়ানক বিপদগামী একটি অবস্থা যা দ্বারা সৃষ্টিতে বার বার ভুল করে চলেছেন আর এই ভুলের খেসারত স্বরূপ বার বার জন্ম মৃত্যুর যাতা কলে পরে মানুষ ব্যতীত ভিন্ন জীবেও পদার্পণ হয়ে কত না যন্ত্রণার শিকার হয়ে চলেছেন, বিষয়টিতে কুটি মনসুরের একটি গানের কলি মনে পড়ে গেল আর তা হলো “চন্দ্র সূর্য জ্বলে নেভে সাগর কিন্তু শুকায় নারে, জন্ম মৃত্যুর রূপ ধরিয়া চালাইছেন কারবার, আমি বুঝলাম না ব্যাপার, কে বলে মানুষ মরে ? মানুষ মরিলে পরে বিচার হবে কার?”

গানের এই কলি টুকো একটু নিরপেক্ষ মন দিয়া ভেবে দেখুন। যদি তকদিরে থাকে তা হলে বুঝতে অসুবিধা হবে না। লৌকিক সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণ দর্শনের ক্ষেত্রে যে কত বড় বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় যদি কেহ বুঝতে চেষ্টা করে তবে সে যেন কামেল গুরুর ভক্ত হয়ে সাধক রূপে একটু চেষ্টা করে উপরে উল্লেখিত বিষয়টা, তা হলেই সে জানতে পারবে নচেৎ নহে। তাই লৌকিক সমাজের যারা কর্ণধার তাদের জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে ফরিয়াদ রইল তিনি যেন তাদেরকে হেদায়েত করেন। ইহা ছাড়া ফকিরী দর্শনে তো কোন প্রকার চাওয়া বা হিংসাত্মক কোন বিষয় সংকলিত হলে সে আবার পিছায়ে যাবে, যা শাস্তির যাতাকলে পরতে পারে। প্রতিটি পথ এতই সূক্ষ যে কাগজ কলম দ্বারা ইহা বোঝানো সম্ভব নয়। আসল কথা হলো বস্তুবাদ সমাজ ব্যবস্থাকেই লৌকিক বলে আখ্যায়িত করলাম যে সমাজ ব্যবস্থা চলমান রূপ ধারণ করে আছে।

এই চলমান সমাজ ব্যবস্থার কোন বিষয় নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করে সমাজের বুকে তার ভিন্ন চিত্র আমরা দেখতে পাই। সমাজ সংসার বর্হিভূত অবস্থা চোখে পড়ে অথচ যদি সে স্বাধীন ভাবে তার গবেষণা চালিয়ে যেতে পাড়লে একটা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

আবার কেউ কেউ বলে কিছুই হলো না এখানেও সেই তকদির নামক মানদন্ডটি না পাওয়ার ঘোষণা আগেই নির্ধারণ করে বসে আছে অথচ যিনি গবেষণা নিয়ে আছে এটাই বড় কথা। তা না হলে গবেষণার দিকে কেউ মনোনিবেশ করবে না। এজন্য সমাজ সংসারের আলোকে বড় করে দেখলাম। তাহলে গুপ্ত ভেদ রহস্য ইসলাম বিষয় নিয়ে কালে কালে (যুগে যুগে) এই মানুষ বিভিন্ন প্রকার মূল বিষয় বস্তু নিয়ে গবেষণা করে এই মানুষের মুক্তির পথের পাথেয় সহজ করে গেছেন।

আল্লাহ্‌পাক ওলিদের মাধ্যমে গুপ্ত ভেদ রহস্য যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান গরিমা অনুযায়ী মানুষের মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহ্‌র) রহস্য লোকের লীলা খেলা গুলো এই দুনিয়ার মানুষ যেন ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিরূপণ করে চরম বা পরম প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে, এ জন্য হয়তবা এই ব্যবস্থা। অথচ যিনি ইসলামের এই গুপ্ত ভেদ নিয়ে গবেষণা করে, সমাজ সংসার তার প্রতি কি নিদারুণ অন্যায় আর নির্যাতন চালায় এমন কি প্রাণ নামক স্বত্ত্বাটি কেড়ে নিতেও তাদের বুক কেঁপে উঠে না। এই বিষয়গুলো ইসলামের ইতিহাস এর দিকে চোখ মেলে তাকালে একটু আন্দাজ করা যায়।

অথচ আল্লাহ্ পাক তাঁর কালামপাকে সূরা কাহাফ ২৯ নং আয়াতে ঘোষণা দিলেন :- ওয়া কুলি্‌ল হাক্‌কু মির্ রবি্‌বকুম, ফা মান্ শাআ ফাল্‌ইউমিন্ ওয়া মান্ শাআ ফাল্‌ইয়াক্‌ফুর্”। অর্থ :- “বল, সত্য তোমার রব হইতে সমাগত যার ইচ্ছা হয় সে গ্রহণ করুক, যার ইচ্ছা হয় কুফরী করুক”। অথচ সমাজ সংসারের এই চাপাচাপি, হিংস্রতা ও বর্বর ঘটনা প্রবাহ ঘটেই চলেছে। হায়রে মানুষ! কোথায় আল্লাহ্ পাকের স্বাধীন স্বত্ত্বার ঘোষণা আর চলমান সমাজ সংসার ঠিক বলে যাহা গ্রহণ করেছে তা থেকে যেন বিবেক দ্বারা এতটুকো ভাববার সময় মানুষের নাই। বর্বরতা হিংস্রতা চালানো বেশীর ভাগ মানুষের মত থাকে কিন্তু গবেষণার গতি কিন্তু থেমে থাকে না, কেউ না কেউ এটা আঁকড়ে ধরে থাকেন। এটাই আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মহিমা, কারণ বিধান তাঁর।

বিধান জীয়ে রাখেন মানুষের মধ্য দিয়ে তিঁনিই অথচ বুঝতে না পারায় এই মানুষ কত না ভুল করে চলেছেন। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পূর্ব জন্মের কর্ম ফল অনুযায়ী তকদির পূর্বেই নির্ধারিত, তাই আমরা বেশীর ভাগ মানুষ তকদির এর বলয়ে ভুল করে চলেছি। অথচ তকদির কে রোধ করার ফর্মুলা যে পূর্ণ ফকির তিনিই শিক্ষা দিতে পারেন। সেই শিক্ষার দিকে আমরা কিছুতেই যাইতে নারাজ। সমাজ সংসার থেকে এই এক ঘেয়েমীপণা কবে দূর হবে তা আল্লা্‌হ পাক ভাল জানেন। তাঁর স্বাধীন স্বত্ত্বার ঘোষণা

অনুযায়ী সমাজ সংসার কবে পরিচালিত হবে? মানুষ মুক্তির শিক্ষা নিয়ে কবে উত্তরণ হবে? সমাজ সংসার থেকে হিংস্রতা ও বর্বরতা নামক শব্দের বিলয় ঘটবে! মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র মূল বিধান অনুযায়ী জীবনটাকে পরিচালনা করবে। সেই দিন কবে আসবে হয়ত বা দেখে যাবার ভাগ্য হবে না। তবুও প্রত্যাশা রইল মানুষ যেন মুক্তির পথকে স্বাদরে গ্রহণ করে। আর এ পথ পেতে গুরুবাদ ব্যবস্থায় যেতে হবে, নইলে পাওয়া সম্ভব কিনা আমার জানা নেই।

ইসলাম অর্থ শান্তি, আসলে সমাজ সংসারে শান্তি নামক শব্দটির প্রতি নিয়ত বিলয় ঘটে চলছে। কিন্তু কেন? বিবেকের চোখ দ্বারা দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রতিনিয়ত আমরা সে সকল বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করে চলেছি। এই কঠোরতা থেকে বিভেদ বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি। অথচ এই কঠোরতা থেকে নিজেকে একটু দূরে রাখতে পারলে সমাজ সংসার থেকে অশান্তি নামক ব্যধিটা বহুলাংশে কমে যেত। কিন্তু কেন জানি অনেক বিবেকবান ব্যক্তির এই কঠোরতা দেখে হতভম্ব হয়ে যাই।

নিরপেক্ষ মন নিয়ে এই ধর্মীয় বিধানটা পালন করতে হিমশিম খাচ্ছে। তা ছাড়া মিথ্যা পরিত্যাগ করার কথা সবারই কম বেশী জানা আছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কি কষ্টের যিনি এটাকে অনুধাবন করতে পেরেছে তাহার কাছেই সত্যের মূল্যায়ন রয়েছে। উনার ত্যাগের ও কষ্টের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা সম্পর্কে উনি জ্ঞাত। ইহা আপন দেহ মোবারককে প্রতিষ্ঠা করতে তাকে যে পরিমাণ কষ্ট সইতে হচ্ছে তা মাবুদ মওলা ভাল জানেন।

আধ্যাত্মিক দর্শনে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আসলে এই আত্মসমর্পণ কেমন? আপন আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে, সেটা কোথায় বা কার কাছে? যদিও নিরাকার রুপি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে কেমনে? আকারেই না আত্মসমর্পণ করা যায়। নিরাকারে কোন প্রকার আত্মসমর্পণ হয় না। এ কারণে আধ্যাত্মিক দর্শনে আল্লাহ্‌কে আকার রূপে ধরা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে একই ইসলাম শব্দের রূপ রেখা দুই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা উভয়টাকে সমন্বয় করতে গেলে বেশীর ভাগ সাধকগণ আর পূর্বের বিধানকে ধরে রাখতে পারে না। তখনই অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় সমাজ সংসারের বিধান দ্বারা, কারণ প্রচলিত বিধি বিধানের চাইতে আধ্যাত্মিক দর্শন আরও উঁচে এবং আরও প্রসিদ্ধ।

কিন্তু এটা অর্জন করতে জগত সংসারের মোহ মায়ার শিকল থেকে বেড়িয়ে আসতে হয়। এই জগত সংসারে অবস্থান করে মোহ মায়ার শিকল থেকে বের হয়ে আসা কি প্রকার কষ্টের যিনি এই সাধন প্রক্রিয়া নিজের আয়ত্ত্বে নিয়ে সাধনা করে চলেছেন তিনিই বলতে পারেন কি এক আজব অনুভূতি কাজ করে এই প্রকারের সাধনায়। কিন্তু এই সমাজ সংসার এক নিমেষেই বর্জন করতে ফতুয়ার ঝুলি ছুড়ে মারতে এতটুকো বুক কাঁপে না। এই নিদারুণ কষ্টকে সাধক মনে প্রাণে পরিত্যাগের সিদ্ধান্তে সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এখন প্রশ্ন হলো সাধক এত কষ্ট মেনে নেয় কেন? কারণ সত্যের জালুয়া তাঁর ভিতরে উদভাষণ হওয়া মাত্র তৃপ্তির কিছু নিদর্শন সে বুঝতে পারে। এর একটা আলাদা স্বাদ তাঁর মধ্যে বিবেকের কষাঘাতে নাড়া দেয়। এ কারণে জগত সংসার থেকে মুখ ফিরায়ে নিতে দ্বিধা দন্দ্ব তাঁর বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই উদভাষণ প্রক্রিয়ায় মহান স্রষ্টার প্রতি যে প্রেমের উদয় ঘটে যা দ্বারা জগত সংসার আর মোহমায়া কোন কিছু দ্বারা তাঁকে আটকাতে পারে না। তখন সে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে জগত সংসারে চলতে আর দ্বিধা দন্দ্বে ভোগে না। তাঁর এই ধারাবাহিক অগ্রসর হওয়ার ফলে প্রেমের পরিধি বাড়তে থাকে। এর ফলে আত্মতৃপ্তি আরও বেড়ে যায়। ফলে শত প্রকার জুলুম আর নির্যাতন তাঁকে আটকাতে পারে না। সাধক তাঁর নিজস্ব গতি নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকে। এই সমস্ত সাধকদের সমাজ সংসার বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালে তাঁর কর্মের স্পৃহা আরও বহু গুণে বৃদ্ধি পেত। কবে সেই শুভ দিন সাধকগণ পাবে তা আল্লাহ্ পাক ভাল বলতে পারেন।

কারণ মানুষ আমরা তকদির নামক বলয়ে আবদ্ধ। তবুও বিবেকবান সমাজ পতিদের কাছে প্রত্যাশা রইল এই সমস্ত সাধকদের যেন স্বাধীন ভাবে কাজ করতে তারা সহায়ক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিবেচনা করেন। জগত সংসারের তুচ্ছ বিষয়ে যদি কেহ আত্মসমর্পণ করেন, দেখা যায় সে ব্যক্তির কষ্টের সীমা থাকে না। অথচ বিধি বিধানের আত্মসমর্পণ আরও জটিল বিষয়, এরপর দাঁড়ায় একটি আত্মাকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করাইতে কি যে কষ্ট আর যাতনা সইতে হয়, যিনি বা যাহারা এ বিষয়টার কার্যভার গ্রহণের পর কর্ম সম্পাদন করেন বা করতে পেরেছেন এমন সাধু সঙ্গ লাভে বুঝতে পারা যায় যদি তকদিরে থাকে। কারণ আল্লাহ্পাক এই মানুষকে খান্নাস নামক শয়তান হইতে মুক্তি নেবার তরে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। অথচ এই খান্নাসের কুমন্ত্রণাতে জলাঞ্জলী দিয়ে জীবনটাকে ভুল পথে প্রেরণ করে চলেছি। আমাকে যে খান্নাস এর কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি নিতে হবে এটা ভুলে গিয়েছিলাম। তকদিরের লিখন ছিল তাই গুরুবাদে এসে এটা

সম্পর্কে অবগত হলাম কিন্তু এরই মধ্যে অনেক সময় জীবন থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু এর জন্য আফছোস বা হতাশা ব্যক্ত করে কোন ফল দাঁড় করতে পারলাম না। তবুও এমন সাধক বা অলীদের প্রতি ভক্তির বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি মওলার কাছে এই একমাত্র ফরিয়াদ রইল। আর সাধন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার তরে মন বিবাগীকে সদাই রাজি করার তরে চেষ্টা যেন চালিয়ে যেতে পারি এটাই একমাত্র সম্বল। কিন্তু খান্নাস এরই মধ্যে দেহে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে, তাই এর অপসারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া হয়ে আছে।

গুরু দয়াময় তাঁর করুণা প্রত্যাশা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় দেখছিনা। তাঁরই নামে ভেলা ভাসিয়ে রাখতে পারি, এখন শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে দিন যাপন করে চলেছি। যা হোক একটু বাড়তি লিখে ফেললাম বেয়াদবী ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। শেষ কথা হলো আত্মসমর্পণ মন থেকে সম্পূর্ণ রূপে জগত সংসারকে দূরে সরায়ে এই জগত সংসারে অবস্থান করে, আত্মসমর্পণকারী রূপে নিজেকে আপন দেহ কাঠামোতে রূপ দান করতে পারলে আত্মসমর্পণকারী রূপে প্রকাশ পায়। এটাই খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় লওয়া বা মুক্তি নেওয়া। এ কাজটা সুসম্পন্ন করতে পারলে হয় পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, যিনি এ কার্যে সফলতা লাভ করেন, তাঁর কাছ থেকে ইসলাম নামক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকৃত বিধান সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারা যায়। আর এ কার্য সম্পন্ন কারীই হয় প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ধারক এবং বাহক। এমন ব্যক্তিকে গুরুরূপে পাওয়া ভাগ্যের এক চরম প্রাপ্তি।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে কেন দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন ? উত্তরে পাওয়া যায় তাঁর দাসত্বের জন্য, কোন কোন মতে তাঁর এবাদত বা বন্দেগীর জন্য। অথচ এই এবাদত বন্দেগী আর দাসত্ব নিজের মনে করে প্রতিনিয়ত খান্নাসের ধোঁকায় পরে সমাজ সংসারের যাতনা ও চাপে পড়ে লোক দেখানো এবাদত বন্দেগীতে মেতে রইলাম একটি বারের তরে বিবেকের কষাঘাতে ভাবনাকে জাগ্রত রূপ ধারণ করে দেখতে চেষ্টা করি না। এই মোহ মায়া জালে নিজেকে অদৃশ্য শৃঙ্খলাতে এমনই আবদ্ধ করলাম, এটাকেই একমাত্র বিধান বলে পালন করে গেলাম, আমার এবাদত বা বন্দেগী যে আল্লাহ্ পাক পর্যন্ত পৌঁছায় না, এটা একটি বারও ভেবে দেখলাম না। কোরআন কত সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন “রব বলিলেন, একা ডাকো, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে” অর্থাৎ খান্নাস মিশ্রিত দেহ সর্বদাই দুই এর অবস্থান এই দু'য়ের অবস্থান। আল্লাহ্ পাকের আরাধনা বা

বন্দেগী কবুল হবার নয়। এ কারণে সুফি সাধকগণ এই খান্নাস হতে মুক্তি নেবার ঘোষণা এবং কিভাবে এই দেহ থেকে খান্নাসকে সরাইতে হবে এ ফর্মূলা দিয়ে থাকেন। আপন দেহ থেকে খান্নাসকে বিতাড়িত করতে পারলেই একা হওয়া যায়। আর এই একা হবার পর আল্লাহ্ পাককে ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব কোরআন পাক ঘোষণা করেছেন। পূর্বের যুগের মুনি-ঋষিগণ মায়াকে খান্নাস বলে অভিহিত করেছেন।

মোহমায়ার জগত সংসারে জন্ম লাভের পর থেকে একজন মানুষ নিজের নফ্‌সকে মায়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বড় হতে থাকে। এটাই প্রতিটি মানুষের জন্মগত একটি বলয়ে আবদ্ধ তকদির। এই তকদির নামক বলয় থেকে বের হয়ে আসা সহজ কোন বিষয় না। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নফ্‌স যে মায়াকে সুফিজম বুঝবার পূর্ব পর্যন্ত সে এই জগত সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের অবস্থান গড়ে। কিন্তু সুফিজম আয়ত্বে নেবার পর এই নফ্‌স্ হতে মোহ মায়াকে দূরে সরাতে না পারলে খান্নাস দুর্বল হতে পারে না। আর খান্নাস দুর্বল না হলে ধর্মীয় বিধান দর্শন ভিত্তিক কোন দৃষ্টান্ত ধর্মীয় অনুভূতিতে দেখা মেলে না। এই দেখা না মিললে একিন বা বিশ্বাসের কোন মূল্য থাকে না।

সুফিবাদ বা গুরু প্রেমে যদি দর্শন না মেলে তবে তা ফকিরী লাইন হবে না, তা হয় ফিকিরী জীবনের অধিক সময় ফিকিরী করে সময় হারিয়ে ফেললাম। কেননা এই মোহ মায়ার জগতে পদার্পণ এর পর থেকে নফ্‌স বা আত্মার সঙ্গে মিশে আছে এই মায়া জীবনে এই মায়াতে ডুবে রইলাম। অনেককে এই মোহ মায়া ছেড়ে মুক্ত হবার নির্দেশ দিয়ে থাকি কিন্তু নিজেও এই মোহ মায়াতে ডুবে রইলাম, এর থেকে উত্তরণ হতে চেষ্টা করেও বার বার পরাজিত সৈনিক হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি মেখে সাধুর বেশ ভূষণে মানুষকে ঠকানোর পাঁয়তারা করে চলেছি। এটা অনুধাবন করার পরও উত্তরণ করার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইহা লাভ করতে পারছি না, তাই গুরু দয়াময় যদি একটু সু-দৃষ্টি দান করেন, তবে হয়ত বা এই উত্তরণ সম্ভব বলে মনে করি। তাই তাঁর নেক নজরের আশায় চাতকের মত অপেক্ষায় রয়েছি। অধীন গুরু দয়াময়ের দান ব্যতীত ইহা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। সাধকদের জন্য এই মায়া কত বড় বিপর্যয় তা যিনি সাধনাতে লিপ্ত হননি তাকে বুঝানো কখনই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে যদি জগতে পূর্বেই প্রতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা থাকতো তা হলে সবাই কম বেশী একটু ধারণা মানুষের মধ্যে জন্ম নিত। ধীরে ধীরে এই মোহ মায়া বর্জনের বিষয়ে মানুষ উদ্বুদ্ধ হতো। তা থেকে সুফির দিকে বা নিজেকে চেনার তরে মানুষ ফকিরী লাইনে অনেক অগ্রসর হত।

লৌকিক ব্যবস্থা আমাদেরকে এমন ভাবে গ্রাস করে চলেছে যা থেকে একটি মানুষকে উত্তরণ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বোবা বনে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। কারণ সুফিবাদের সংজ্ঞাতে বলে দিয়েছেন গুরু দয়াময় "ইহা একটি বাস্তবতা বর্জিত আজব দেশ"। বাস্তব যে কত প্রকার শৃঙ্খল দিয়ে মুক্তির দিকে অগ্রসর হতে হয় তা যিনি এ রাস্তা বা পথে অবস্থান করেন তিনিই বলতে পারেন বা ধারণা করতে পারেন। তাই একই কথা বারবার পূনরাবৃত্তি করে চলেছি।

সবার প্রতি উদাত্ব আহ্বান রইল যে, এই সুফিবাদ বা ফকিরি লাইন জীবনের কিছু সময় একটু আয়ত্বে নিয়ে জীবনকে জানবার জন্য চেষ্টা করে দেখলে এ সম্পর্কে একটা ধারণা জন্ম নিবে। সবার মাঝে যার ফলস্বরূপ জগত সংসার থেকে এই লৌকিকতার কিছু অবসান হতো তা হলে মনের কাছে একটু তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারতাম। জানিনা দয়াময় আল্লাহ্ পাক সামাজিক এই পরিবেশ গড়ে দেবেন কিনা, এটা তিনিই ভাল বলতে পারেন। তাই সবার জন্য আল্লাহ্ পাক এর নিকট দোয়া প্রার্থনা রইল তিনি যেন সবাইকে হেদায়েত দান করেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো মানুষ আল্লাহ্ পাকের সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। আল্লাহ্পাক কালামপাকে ঘোষণা করলেন "মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে"। অর্থাৎ সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়া মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। লৌকিক সমাজ সংসারে একজন মানুষ কতটুকু স্বাধীন, বিবেকের কড়া নাড়িয়ে একাগ্র মনে একটু ভাবলে বাইরে খুঁজতে হবে না। নিজের কাছেই উত্তরটা পাওয়া যাবে। প্রচলিত শরীয়তের ঝান্ডা কাঁধে উঠায়ে মানুষকে মুক্ত ধারার চিন্তা চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে উমাইয়া আব্বাসিয়দের চক্রান্তের ইসলামী রূপরেখাকে মানাতে বাধ্য করানো এবং সুফিজম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তা চেতনা থেকে মানুষকে দূরে সরানোর কি সব নোংরা খোলসের আবরণে মানুষকে আটকাইয়া রাখা ধর্মের নামে প্রতারণার ব্যবসা চালু রাখার কত যে কৌশল এদের মাথায় খেলা করে চলেছে তা সৃষ্টিকর্তা ভাল জানেন।

সূরা বাকারা'র ২৫৬ নাম্বার আয়াতে ঘোষণা দিলেন :- "লা ইক্রাহা ফি-দ্বীন"। অর্থ :- ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি (বল প্রয়োগ) নেই"। এ প্রসঙ্গে রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) তাঁর জীবনাদর্শতে দেখায়ে দিলেন ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়স পর্যন্ত হেরা গুহায় কি কঠিন সাধনার মাধ্যমে নিজেকে আত্মশুদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা, যা উম্মতে মোহাম্মদী যদি নিজেকে আত্মশুদ্ধি করতে চায় তাহলে এই ভাবেই করতে হবে। অথচ এই সময়ের পূর্বে কোন

প্রকার আনুষ্ঠানিক বন্দেগীর ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ এই বিষয়টা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকরি রূপ বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় না। নিজেকে জানার মারফতি জ্ঞান সেখানে পূর্বে হাসিল করার বিধান রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) দেখিয়েছেন।

এ দিকে ধর্মীয় কর্ণধার ব্যক্তি বর্গ মানুষকে এই শিক্ষা থেকে দূরে সরায়ে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এরপরও যদি কেহ নিজ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাহা জানার জন্য চেষ্টা করে তবে তার উপর কি প্রকারে অমানুষিক নির্যাতন আর মাছলা মাছায়েলের ফতুয়া দিয়ে তাকে অমানবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়। এই প্রকার সামাজিক শৃংখলের বেরী থেকে মানুষকে মুক্তির ধারাতে নিয়ে আসতে কি করণীয় হতে পারে? এমন প্রশ্নের জবাব হলো আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কারণ লৌকিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ সহজ কোন বিষয় না। তারপরও কথা থাকে যে ইসলামের ইতিহাস কি নির্মম পাষণ্ড আর ভয়াবহতার বেরীতে কত না মানুষের প্রাণ আকাতরে কেড়ে নিয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এই মানুষকে স্বাধীনতার কথা আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন। কোরআনের বাস্তবায়ন রূপ সমাজ সংসারে না হলে ব্যক্তি জীবনে এর সুফল ফলানো কখনই সম্ভব পর নয়। তাই, সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান যে, মানুষকে মুক্তির ধারাতে অবস্থান করতে হলে কোরআন পাক নির্দেশিত ব্যবস্থার আঙ্গিকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে হবে। কোন বাঁধা-বিপত্তের হার মানলে বিধান ঠিক রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ্ পাক সবাইকে কোরআনের আঙ্গিকে জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন।

তাহলে লোক দেখানো এবাদতবন্দেগী থেকে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এখানেই শেষ নয় বরং কঠিন শাস্তিতে সমাসীন করার অঙ্গীকারাবদ্ধ মহান আল্লাহ্ পাক। অথচ এই লোক দেখানো বন্দেগী নিয়ে চুলছেরা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারিতে কত যে মানুষের প্রাণহানী ঘটে চলেছে জগত সংসারে। তবুও জ্ঞানী সম্প্রদায় জগত সংসারে এর জন্য দায়ী। কারণ যারা বুঝে না তারা হয়ত ভুল করতে পারে কিন্তু এক শ্রেণীর জ্ঞানীদেরকে দেখা যায় এই ধরনের লৌকিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক রূপ দানের জন্য সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেও চলেছে। বিবেক দ্বারা একটি বারও বুঝবার চেষ্টা করে না, জ্ঞানীদের ভুলের কারণে সহজ সরল কাঁচা গলা মোমের মত মানুষগুলো নিজেদের জীবন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। মওলা এদেরকে জ্ঞানপাপীর কবল থেকে কবে রক্ষা করবেন তা তিনিই ভাল বলতে

পারেন। এখানেও হয়তবা তকদির নামক বলয়ের শৃঙ্খলাতে আবদ্ধ, এ কারণে হয়তবা এমন পর্যায়ে ঘটে থাকে যা রোধ হয় না। এই তকদির নামক বলয় থেকে বের হয়ে আসার শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ সংসারে প্রচলিত থাকলে হয়তবা এর মধ্য হতে কিছু লোক মনে করলে এই শিক্ষা লাভ করতো। এ ধরনের বড় বড় ভুলের পাহাড় সরিয়ে কিছুটা আলোর ঝলকানীতে সচল থাকতো, তা হলে কতই না সুন্দর হত। পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তবা এমন দিন আসবে মানুষ সত্য গ্রহণ করার তরে প্রতিযোগিতার ঝড় উঠাবে দলে-দলে মানুষ সত্য দ্বীন গ্রহণ করবে। এমন শুভ দিন যেন নিকটেই হয় মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে এই মিনতি। আমিন।

আমরা তরিকার জিন্দেগীতে অন্তত একটি বিষয় সুনিশ্চিত হতে পারি যে, প্রতিটি মানুষকে মুক্তির জন্য একজন মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ বা বায়াত গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তার নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সে ঐ ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে। এতে যদি ভুল হয় তা হলে এর দায়বদ্ধতা নিজের কাঁধেই থাকবে। সঠিক হলে সে সুপথ গামীর পথ অন্তত সে নির্বাচন করেছে। সুপথ লাভ করতে বেশ কিছু জনম অতিবাহিত হলেও দোষের কিছু থাকে না অথচ এই চরম সত্য সমাজ সংসারের অনেক মানুষই বুঝতে পেরেছে যে, একজন মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এটা বুঝবার পরও এই মানুষটা নির্বাচন করতে পারছে না বা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মুচরা মুচরী শুরু করে দেয়। কারণ আমি আপনি তো তকদির নামক বলয়ে আবদ্ধ একটি গন্ডির মধ্যে ঢাকা পরে আছি। এই বলয় ছিন্ন করে মুক্তির ধারাতে নিজেকে সমর্পণ করা সহজ কোন বিষয় নয়। এর পরেও এর সঙ্গে থাকবে শয়তান বা খান্নাস নাম অপশক্তি। আমারই ভিতরে যার সক্রিয় অবস্থান সে যে কি প্রকারের আকামের গুরু ঠাকুর যারা সাধক বা যোগী এরাই কেবল এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে। সর্ব সাধারণ এর বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত বুঝতে পারে না। কারণ শয়তান কেবলই গুরু পূজা বা পীর পূজাকে ভয় পায়। কেননা পীর পূজার মধ্য দিয়েই কেবল এই শয়তানি স্বত্ত্বাকে বশে আনা সম্ভব। অন্য কোন উপায় হয়তবা নেই বা আমার জানা নেই। যদি থাকত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস হতে পীর পূজা বা গুরু পূজা বহু পূর্বে বিলুপ্ত ঘটে যেত।

অথচ আল্লাহ্ পাকের মূল সত্য বিধানটা গুরুবাদী আউলিয়া কেরামগণ জীয়ে রেখেছেন। এখানে জাহের বাতেন সহ আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য রহস্য লোকের লীলার পরিপূর্ণ রূপ আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা মানুষকে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। যা কখনই ধ্বংস হবার

নহে। এ যেন চির বিস্ময়কর এক আজব লীলা খেলা। যে বা যিনি এই খেলায় না মেতেছেন তাকে বুঝানো কখনই সম্ভবপর নয়। অথচ যিনি এই খেলাতে অংশ নিয়েছেন জগত সংসার তার উপর বিরূপ আচরণে মাতোয়ারা হয়ে কতো না অমানুষিক নির্যাতনের তরবারী চালিয়ে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে? আল্লাহ্ পাকের এই খেলা সম্বন্ধে যারা জানতে পেরেছেন, তাঁরা অকপটে প্রকাশ করে তাঁরা সমাজ সংসার হতে কাফের নামের এক চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করে চলেছে। কাউকে আবার জীবনটাও দিতে হয়েছে। যেমন আল্লামা ইকবাল, মনসুর হাল্লাজ এমন দর্শনের ব্যক্তিবর্গ আরও হয়ত-বা অনেক আছেন যাদের কথা উল্লেখ করলাম না। উনাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যদি কেহ সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে তাদেরকে এই রকম কঠিন আঘাত সহ্য করে হলেও সত্যকে জীয়ে রাখতে হবে।

কেননা পাক-পাঞ্জাতন থেকে শুরু করে যত প্রকার ওলি-আউলিয়া, গাউস-কুতুব, আবদাল-আরিফগণ দুনিয়ার বুকে সত্যের অমিয় সুধা পান করে চলেছেন এবং মানুষের মাঝে বিলিয়েছেন তাদের বেশীর ভাগ বা দু-একজন ব্যতীত সবাই সমাজ-সংসারের নির্যাতনের তরবারীতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। বিধির কি নির্মম বিধান তা তিনিই ভাল জানেন। সুফিদর্শনের উপর গবেষণার যে বিস্ময়কর দর্শন উপস্থাপন করেছেন দাদা জান শাহ সুফি সদর উদ্দীন আহম্মদ চিশতী (আঃ) তা হলো, প্রতিটি মানুষ জগত সংসারে শিশু থেকে শুরু করে ১৮ বছরে সে পূর্ণ কাফেরে পদার্পণ করে। যদি সে এই কাফের থেকে উত্তরণ হতে নিজেকে বাহির করতে না পারে তা হলে সে ঐ কাফের উপাধিতে সমাসীন থাকে।

তাই আধ্যাত্মিক দর্শনের দৃষ্টান্তে অবশ্যই একজন মানুষকে কাফের থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে তাকে অবশ্যই গুরুবাদীতে আত্মসমর্পণ করে কঠিন সাধনা পদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেকে মুসলমান বা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যশীলদের দলে নিজেকে সমাসীন করতে হবে। এ মত ও পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ আধ্যাত্মিক দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই রূপকথার আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক মনিষীগণ বলে থাকেন এই পথে আসাটাও তকদির এর লিখন থাকতে হবে নচেৎ ইহা সম্ভবপর নয় বলে মন্তব্য করে গেছেন। নিজের ভিতরে নিজের আমিত্বকে লোপ বা বিলুপ্ত ঘটায়ে নিজেকে জানতে ও চিনিতে পারা যায়। এই নিজেকে কেন চিনব আর এই চেনার প্রয়োজন কেন? জবাবে যদি বলি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “তুমি তোমার ব্রহ্মাকে তোমার মাঝেই দেখতে পাবে”। আবার

মহানবী বলেছেন, "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু"। অর্থ যিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন সে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে চিনেছে।

এই সকল মনিষীগণ এর বাণী একই সীমা রেখাতে অবস্থান করে চলেছে যা আধ্যাত্মিক দর্শনে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এই দর্শনের কোন মিল তো নেই আবার এক এর সঙ্গে অপরের লেলিয়ে দিয়ে সমাজের বুকে মানুষে মানুষে হানাহানিতে, ঘৃণা আর কুসংস্কার এর মাঝে মানুষকে আবদ্ধ রেখেছে। তার পরেও যদি কোন ব্যক্তি এই শৃঙ্খলার বেরী থেকে বেরিয়ে আসতে চায় জগত সংসার তার উপর কি এক অমানবিক আচরণে তাঁকে বেঁধে রাখার প্রয়াশ পরিচালনা করে যেন সে কত না অপরাধী। সত্যের দিকে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন আচরণ তাঁকে জানান দেয় যে সে শত প্রবঞ্চনা উপেক্ষা করেও সত্যকে আঁকড়ে ধরে।

আর যিনি তা করতে সক্ষম হন তিনিই আধ্যাত্মিক দর্শনে নিজের নামটা লিপিবদ্ধ করান। আর যিনি এই সমাজ সংস্কারের প্রবঞ্চনার কাছে নতি স্বীকার করেন তার পক্ষে এই সত্য সাগরে অবগাহন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এ যে মহান সৃষ্টিকর্তার এক বিস্ময়কর এক লীলা খেলা আর কঠিন শৃঙ্খল, এ আবদ্ধ জীবনে নিজেকে আবদ্ধ করিয়ে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার এক অভিনব শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বই খাতা কলম অকেজো। যিনি এই পথে না এসেছেন তার পক্ষে এই শিক্ষা বুঝা খুবই কঠিন।

যেহেতু লেখনী সার্বজনীন সে কারণে মহৎগণ বলে থাকেন তকদিরের লিখন, যদিও এটা কে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই তকদির নামক বলয় থেকেও বের হয়ে আসতে হবে নিজেকে মুক্তির ধারাতে অবস্থান করতে হলে, এই মুসলমান হওয়া বা কাফের থেকে মুক্তি লাভ করার বিষয়ে যদি বলতে চাই তাহলে মহানবীর সেই অমিয় বাণীটি অবলোকন করি। তাহলো প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন করে শয়তান আছে এই বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্ তাহলে আপনার? জবাবে মহানবী বললেন আমার সঙ্গে ও একজন শয়তান ছিল তাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি। তাই সুফি দর্শনে এই শয়তান হতে মুক্তি নিতে হবে নচেৎ শয়তানকে মুসলমান বানাইয়া ফেলতে হবে। এই শয়তানের কু আশ্রিত থেকে নিজেকে মুক্তির শিক্ষা সুফি সাধকগণ তাদের অনুসারীদেরকে কালে কালে যুগে যুগে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। এ যেন অনন্ত কালের অবিচল একই ধারা, একই নীতি, একই তালিম তালকীনে অবস্থান করে চলেছে। যার নীতি ও আদর্শের কোন পরিবর্তন খুঁজে পেলাম না।

সৃষ্টির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত এই একই নীতি থাকবে বলে মনে হয়। কারণ সৃষ্টিতে আল্লাহ্ পাক এই একই উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষকে তৈরী করেছেন। অথচ প্রচলিত সমাজ সংসার আমাদের কি বিশ্রী আর নোংরামী শিক্ষা দিয়ে চলেছে এটা উল্লেখ করে পাঠককে কষ্ট দিতে চাই না। তাই সবার প্রতি উদাত্ব আহ্বান রইল এই শয়তান কে মুসলমান বানিয়ে ফেলুন বা শয়তান হতে মুক্তি অর্জন করুন। যদি একটি মানব শিশু তার শিশুকাল থেকে নিজেকে মুক্তির শিক্ষাটা পেতো যেমন মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)-এর আদর্শ বা তাঁর শিশু কালেরই বিকাশ তাহলে মানুষের জন্য সঠিক আদর্শের কি সুন্দর পটভূমি সে রচনা করে যেতে পারতো। তাঁর শৈশব এর পালনীয় বিষয়াদি আমাদের আদর্শ বা বাস্তব জীবনে এ বিধি বিধান সমাজ সংসারে চালু থাকত তাহলে কি মানুষ মানুষের সঙ্গে অমানবিক যে সকল আচরণ করে চলেছে তার অপমৃত্যু ঘটত। তাঁর যৌবন কালের করণীয় বিষয় যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় চালু থাকত তাহলে মানুষ আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠত মানুষে মানুষে সাম্যের একটি দৃষ্টান্ত গড়ে উঠত।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাম্যের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করতো। মানুষের অমানুষিক আচরণ আদর্শের কাছে মাথা নুইয়ে আছরে পরতো। থাকত না কোন প্রকার ধোঁকা, মানুষ গড়ে উঠত প্রকৃত আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত। মানুষ জনমের সার্থকতা খুঁজে পেত, অন্যায় সমাজ সংসার থেকে বিদায় নিত। অথচ কি বিধি বিধান সমাজ সংসারে সু-প্রতিষ্ঠিত রইল ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ খুন করতে তার হৃদয় কাঁপে না, মানুষে মানুষে ধর্ম আর ফেকরা বাজির ঢোল পিটিয়ে কত মানুষ ধর্মটা বুঝবার পূর্বেই জীবন দিয়ে চলেছে এদের অবস্থার কোন পরিণতি তা হয়তো আল্লাহ্ মাবুদ ভাল জানেন। আর এদের কে যারা উৎসাহিত করে চলেছে তাদের পরিণতিও আল্লাহ্‌র কাছেই। কারণ ধর্মীয় অনুভূতির লেখনী জানা থাকলেও স্থান কাল পাত্র ভেদেই প্রকাশ, এ আর এক যন্ত্রণার সাগর বয়ে বেড়ানো। কবে সেই শুভ দিনের সূর্য উদিত হবে যেখানে থাকবে না মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ ধর্ম নিয়ে রেষারেষী মানুষ সবাই নিজের মুক্তির পথের শিক্ষা নিয়ে দ্রুত আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে সফলতার প্রান্তে পৌঁছাইয়া যাইবে। মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীলদের দলে পৌঁছাইয়া যাইবে। মানুষ আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে মিশে যাইবে, থাকবেনা কোন রেষারেষি বিভেদ আর বিশৃঙ্খলা বিলুপ্তি হবে। মানুষ মানুষের কল্যাণে নিজেকে সোপর্দ করবে শান্তির সূর্য উদিত হবে, মানুষ পাবে মুক্তি। এই শুভ দিনের কবে সূচনা হবে ? তবুও প্রত্যাশা রইল মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই শুভ

দিনের ভাবনা যেন মানুষ করে এবং জ্ঞানীগণ এই বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য নিজেদেরকে সেই উপযুক্ততায় গঠন করে বা সচেষ্ট থাকে। যেহেতু হেদায়েতের মালিক আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন। তাই তাঁহার কাছেই এই প্রার্থনা বা মিনতি এই ব্যবস্থা পত্র পৃথিবীর বুকে অচিরেই দান করেন।

কোরআনুল মাজিদ সূরা আম্বিয়া'র ৩৫ নাম্বার আয়াতে দেখতে পাই :- "কুল্লু নাফ্সিন্ জায়িকাতুল্ মউত্ ওয়া আল্লাহ্ নাব্লুকুম্ বিশ্শার্রি ওয়া খাইরি ফিত্নাতান্ তুর্জাউন্"। অর্থ :- "প্রত্যেক নফ্স্ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমরা পরীক্ষা করি ভাল এবং মন্দ দ্বারা এবং আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে"। এই কালাম পাকে উল্লেখিত রয়েছে নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। অথচ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যাহা দেখতে পাই আর তা হলো মানুষ মারা যায় এবং এই মানুষের রুহের মাগফিরাত চাওয়া হয়। এ রকম ভুলের সাগরে সামাজিক ধর্মীয় বিধান সু-প্রতিষ্ঠিত রূপে মানুষ ভুলটা সত্য রূপে গ্রহণ করে আছে। অথচ সত্যটা যদি কেহ জানান দিতে চায় তাহলে সেটা গ্রহণ তো দূরের কথা তার উপর এই সমাজ ব্যবস্থা কি নির্যাতন চালায় তা দেখতে বা বুঝতে হলে আপনাকে এ রকম প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা মূলক বিধান জারী করলেই বুঝতে পারবেন।

কারণ হিসাবে বলা যায় রুহ মৃত্যুবরণ করে না। ইনসান অর্থ মানুষ, নাস অর্থ মানুষ, নফ্স অর্থ মানুষ এই তিন প্রকার বাক্যের ভিন্নতা সম্পর্কে সঠিক বিষয়টা বুঝতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ্ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শুধু শুধু ব্যবহার করেন নাই। ইহা গভীর তাৎপর্য বহন করে। যারা ইসলামের আধ্যাত্মিক গবেষণা করে চলেছেন তারাই ভাল বলতে পারেন। যেহেতু কোরআনুল মাজিদের ঐশী বাণী তাই ইহা জ্ঞানীদের ভাববার জন্য উল্লেখ করলাম। লৌকিকতার অবগাহনে এই ইসলামের উপর কত না ভুলের পাহাড় জমা হয়ে আছে ইহা কি মুখের কথাতে পরিস্কার হয়ে যাবে? কখনই না। এ বিষয়ে সঠিক চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্গের সু-নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্য দিয়ে একদিন হয়তবা পৃথিবীর বুকে কোরআনের এই অমিয় বাণীর সার্থক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আত্মপ্রকাশ করবে।

সব চাইতে যে বিষয়টা মানুষের মধ্যে বিরাজ করে চলেছে সেটা হলো প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহ্কে দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু কোন অবস্থাতে আল্লাহ্ পাক দোষের মধ্যে থাকতে পারে না। কোরআন গুণবাচকে সমাসীন, আর এই গুণকে বা গুণের অধিকারী হওয়ার তরে মানুষকে আদেশ আর উপদেশ এ ভরপুর রেখেছে

কোরআন। যেমন কোন মানুষ অপরিণত বয়সে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করলে মানুষ আক্ষেপের দৃষ্টিতে বলে আল্লাহ্ কেড়ে নিয়েছে। একবারও এই মানুষ ভাবে না আমার দোষটা কোথায়? এক বাক্যে আল্লাহ্কে দোষারোপ করে।

ব্যবসা বাণিজ্যে অবনতি হলে আল্লাহ্কে দোষারোপ করে। আবার কঠিন কোন রোগ বালাই ঘটে গেলে আল্লাহ্কে দোষারোপ করে। দলিল হিসাবে দাঁড় করায় আল্লাহ্র বিনা হুকুমে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। এই রকম যুক্তি পেশ করেন। অথচ মহান আল্লাহ্পাকের এই সৃষ্টির শুরু দিকে বাবা শামসেত্তাব্রীজের দর্শনে ফুটিয়ে তুলছেন যে :- আদম গন্ধম খাবে এটা আল্লাহ্র নিষেধ ছিল, আযাজিল (আঃ) সেজদা দিবে না, না দেওয়াতে শয়তান হিসাবে পরিগণিত হয় এবং লান্নতে মালা গলায় পড়েন। আদমের (আঃ)-এর মধ্যে নূরে মোহাম্মাদী মওজুদ তাই আদম (আঃ) মোরাকাবায় বসে দেখতে পেলেন আল্লাহ চায় আমি (আদম আঃ) গন্ধম খাই কিন্তু আল্লাহ্পাক দোষ নিবেন না। কারণ গন্ধম না খেলে পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটে না। আযাজিল (আঃ) মোরাকাবাতে দেখতে পেলেন আমি সেজদ্া দিলে আল্লাহ্পাক যে পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন, সেখানে আদমের আবির্ভাব হয় না। আল্লাহ্পাক চায় যে আমি সেজদ্াটা না দেই কিন্ত কিন্তু আল্লাহ্ দোষ নিবেন না। এ জন্য বাবা শামসেত্তাব্রীজ বর্ণনা করেছেন, আযাজিল কে আলাইহেস সালাতুস সালাম বলিও। ইহা যেন “আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, প্রাণ দিয়ে সঁপেছি এই মন প্রাণ”। আপন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাকে পূরণের প্রেম সবার মাঝে বুঝবার ক্ষমতা কয়জনের ভাগ্যে জোটে। এবার বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো আর এই দর্শন প্রচারিত সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণনা করা কত টুকো যুক্তি যুক্ত তা আমার জানা নাই।

সত্য দর্শনে যদি কোন সাধক তার ভাব জগতে প্রাপ্ত বিষয় Negative দর্শন ফুটে উঠে ইহা সাধারণের আশ্রয়ে সমাধান টানতে চায় তা হলে তা কেহই বিশ্বাস করবে না। জগত সংসারের মায়ার বন্ধনে মানুষ এতটা অ-মানুষে পর্দাপণ করে চলেছে যা মন্দ আঁধারে তার বিবেককে ঢেকে ফেলে। একটি মানুষকে তার দৈহিক নির্যাতনের চাইতে তাকে মানসিক ভাবে আঘাতে প্রতি নিয়ত কি প্রকার যন্ত্রণার পাহাড় চাপিয়ে চলেছে যা অবগত হবার পরও এ বিষয়ে কোন সুরাহার পথ পেলাম না। তাই সৃষ্টিকর্তার নিকট ছেড়ে দিলাম যা কল্যাণকর তা যেন হয়। পূর্বের অনুভূতি আবার সক্রিয় হয়ে উঠে চলেছে। পূর্বের পদক্ষেপ গুলো সুফি দর্শনে গ্রহণ না করায় ঐ পদক্ষেপ জাগতিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ

করে একটি ফায়সালা পাই। এ কারণে উহা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। কিছু আকার ইঙ্গিত আভাস সহ ঘটনা বহুল একটি কালো থাবা আমার সমানে অবস্থান করে চলেছে। এটাকে সামনে নিয়েই চলেছি। যদিও এ বিষয়টা লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করানোটা দোষণীয়, যদি অতিরিক্ত কিছু ঘটে যায় তবে জ্ঞানীদের জন্য ইশারা রাখলাম।

যাই হোক আমার মোর্শেদ কেবলা বার বার যে কথাটা বলে থাকেন তা হলো– কাবায় শরিয়ত আর হেরা গুহায় মারেফত এই হেরা গুহার দর্শন সম্পর্কে সবাই বুঝতে পারে না। এই জন্য উল্টা পাল্টা মন্তব্য করে থাকে কিন্তু তারা না বুঝতে পারে, না জানতে পারে, মোহ দ্বারা আবিষ্ট থাকে, এই জন্য এদের দোষারোপ বা গালি দেবার বিধান নাই। এ জন্য এদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিতে উপদেশ রইল"। লৌকিকতা আর সন্দেহ আমাকে যেমন রাহুগ্রাস করে চলেছে, তেমনি মনে হয়েছে যুগে যুগে ইসলামের ইতিহাসে এ রকম কালো অধ্যায় রচনা করে চলেছে জালিমগণ, এ জন্য ব্যথিত হবার কিছু নেই। যাহারা বিদ্রুপ আর মুনাফেকীতে লিপ্ত তাহারাই বিচারক তাহারাই সমাজ সংসারের জ্ঞানী। এদের কালো থাবাতে যিনি একবার পড়েছে তিনিই বলতে পারবেন এদের দ্বারা যুগে যুগে সত্য পথের যাত্রীরা জীবন দিয়ে চলেছে। আমার মুর্শিদ বলেছিলেন কাফের না থাকলে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা থাকে না। বার বার একটি প্রশ্ন জাগে কাফের দ্বারা আল্লাহ্ সত্য পথের যাত্রীদেরকে আঘাত করে এটাই কি আল্লাহ্‌র বিধান? ইতিহাসের দিকে তাকালে এই দর্শন বার বার ফুটে উঠে। যদিও এই কথাগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই, তবুও জ্ঞানীর ইশারা বা নিদর্শন স্বরূপ ইহা উল্লেখ করিলাম।

সত্য কি এতই নির্মম আর যন্ত্রণার কারণ বাবা জাহাঙ্গীর বার বার তাঁর লিখনীতে উল্লেখ করেছেন কাউকে গালি দিতে নেই কারণ তকদির এর বলয়ে ইহা সীমাবদ্ধ গন্ডিতে আবদ্ধ। তাছাড়া হয়তবা একটি মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে পরিগণিত হওয়ার জন্য যে খান্নাস নামক শয়তানের যে ধোঁকা ইহা পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি সফলতা লাভ করতে পারে তবেই সে সু-সংবাদ প্রাপ্ত মানব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর ব্যর্থ হলে বিফল অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক আগ্নেয়গিরির পথ অবলম্বন করে চলেছে। এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে সত্যকে জাগ্রত রাখতে জীবনটা উৎসর্গ করতে অ-সম্মতি বা অ-পারগতার ছাপই যেন ব্যর্থতা, তাই এই দেহটাকে সর্বপ্রকার যাতনার বোঝা বহন করার মত প্রস্তুতি সদা সর্বদা রেখে জীবন পরিচালনা করা উচিত। ১১-৪০ বছরের জীবনের কঠিন সময় অতিবাহিত করে চলেছি। জানি না দয়াল

গুরু এই যন্ত্রণা কত সময় কাল এই নফ্‌সের উপর বহন করাইবেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, এই কল বুকে নিয়ে জীবনটাকে সাজাইতে চেয়েছি, এটাই আমার অপরাধ।

তবুও শান্তির মূল লক্ষ্য হলো ধর্মের মূল বিষয় অনুসন্ধান করা। তবে কেন জানি আজ বার বার মনে হয়েছে আধ্যাত্মিক দর্শনে যারা বিচরণ করে চলে, জাগতিক তাদেরকে বিরোধের ছকে আটকাতে চায় কিন্তু এমন একটা সময় এই সুযোগটা সুযোগ সন্ধানিরা গ্রহণ করেছে, আধ্যাত্মিক জগতে যদি কেহ শক (বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মত) খায় তাহলে বুঝতে পারবে। নচেৎ নহে, উল্লেখ করতে পারলাম না তকদির নামক বলয় আমাকে কি করে রেখেছে ? তবে আমার একার কারণে যদি অনেকের সুখ বিঘ্নিত হয় তবে তাদের সুখের মূল্যায়ন যেন তারা জ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করে। একদিন হয়ত-বা বুঝবে যদি তকদিরে থাকে এটাই প্রত্যাশা। পৃথিবীতে সত্য পথের যাত্রীদের সমস্যা থাকে কিন্তু আমার বেলায় এমন ঘটবে জানি না। মওলার কি খেলা, তবে যারা এই মিথ্যাচার এবং চক্রান্তের এই সিঁড়ি তৈরি করেছে এদের জ্ঞান কে মূল্যায়ন করে চলেছি। জগতে যারা এ ধরনের কর্মে লিপ্ত থাকে এরাই সমাজের বিবেক তাই উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে এগুলো নিজেই বহন করে চলেছি। কোন দিন হয়তবা জ্ঞানীরা এ বিষয়ের মোড়ক উন্মোচন করে দিতে পারবে এদের জন্য ইশারা রেখে গেলাম।

সত্য কথা বলার সময় যদি না পাই তাই লিখলাম ফেব্রুয়ারীতে পালায়ন করি। রাতে বসে আছি, বাহিরে কিছু লোক গভীর রাতে বাড়ীতে আসে এবং তারা বলাবলি করতে থাকে ঘরের বেড়া কেটে বাহির করে মেরে দোগাছী বাজারে ফেলে দিয়ে কেস করা যাবে। তখন সাধনার স্কুল থেকে শক খেয়ে বাড়ীতে এসেছি এমন অবস্থায় প্রতিবাদ করার সাহস না পেয়ে পালায়ন করি। কিন্তু সেখানেও আমাকে ছাড়া হয়নি। আজও পর্যন্ত এ লোক গুলোকে প্রমাণ সহ ধরতে পারি নাই। তাই এই ব্যর্থতা আর কষ্ট বুকে নিয়ে ঘুরছি। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত মানুষের মিথ্যাচার, কিন্তু এর হোতা ধরা ছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করে চলেছে। এই বিষয় কিভাবে প্রকাশ করব আল্লাহ্ পাক ভাল জানেন। বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ ভেবে দেখবেন।

রোজা (সিয়াম)

জাগতিক এবং সুফিমতের ধারণা :-

রোজা :-

জাগতিক :- সুবহে সাদিক হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার এবং সঙ্গমাদি নিয়ত সহকারে বিরত থাকার নাম রোজা। অবশ্য শ্রেণী বিভাগ রয়েছে যেমন:- ফরজ, ওয়াজিব, নফল।

সুফিমত :- ১.) আপন নফ্‌সের সঙ্গে যে খান্নাস টিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উহাই লোভ, মোহ, মাৎসর্য, কাম, ক্রোধ এবং অহংকার নামক আবর্জনা, যা মানুষকে সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই এই ষড়রিপুর বন্ধনটিকে সম্পূর্ণ উপড়িয়ে ফেলার জন্য সিয়াম একটি উপযুক্ত সুন্দর মাধ্যম।

২.) দুনিয়া থেকে মনকে বিরত বা বারিত করিয়া রাখিবার আমল বা কার্যক্রমকে বা প্রচেষ্টাকে সিয়াম বলা হয়। রোজা ফার্সি শব্দ, আরবীতে সিয়াম। কোরআন বাণীর সঙ্গে সংগতি রাখতে সুফিমতে সিয়াম বলা হয়।

তারাবীহ :-

জাগতিক :- রমজান মাসের চন্দ্র পশ্চিম আকাশে উদয় ঘটলে রমজানের প্রস্তুতি মূলক এশা নামাজ অন্তে যে নামাজ রোজার নিয়তে পড়া হয় তাহা তারাবীহ বলে পরিচিত – দুই রাকাত করে (৮, ১২, ২০) রাকাত পড়া হয়।

সুফিমত :- তারাবিয়্যাৎ হইতে তারাবীহ। ইহার অর্থ হইল ধীরতা, স্থিরতা ও একাকীত্ব লাভের সালাত হলো তারাবীহ। ইহা একাকীত্ব সুফল প্রাপ্ত ঘটে। রসূলাল্লাহ্‌র (সাঃ) (আঃ) জীবদ্দশায় খুব কম দিনই এই আনুষ্ঠানিকতা পালন করেছেন। রসূল (সাঃ) (আঃ) ওফাতের সপ্তম বছর হতে হযরত ওমর উক্ত বিধান চালু করে। পরবর্তীতে মওলা আলী (আ:) এর শাসনামলে ইহা উচ্ছেদ করা হয় এবং তার পরবর্তীতে আমির মুয়াবিয়ার রাজত্ব কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই বিধান একটানা চলমান রয়েছে।

সেহরী :-

জাগতিক :- সুবহে সাদিকের সময় রোজার নিয়তে আহার বা পানাহারকৃত ব্যবস্থাকে সেহরী বলে। জাগতিক ভাষায় ইহা একটি বরকতময় খাবার হিসাবে সেহরী নামকরণ করা হয়েছে।

সুফিমত :- আত্মশক্তি, আত্মবল অর্জন করা হলো সেহরীর মূল কার্য অর্থাৎ মিমাংসা সূচক সমাধানের মাধ্যম সেহরী।

ইফতার :-

জাগতিক/প্রচলিত :- সূর্য অস্ত যাবার পর যে খাবার দ্বারা রোজার পূর্ণতা করা হয় বা খাবার গ্রহণ করা হয় তা ইফতার নামে পরিচিত।

সুফিমত/আধ্যাত্মিক :- সাধকের আপন নফ্সের উপর ছয়টি রিপুর লেলিহান জিহ্বাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং রোজাদারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তখনই সেই সাধকের জন্য সেই সময়টিকে বলা হয় ইফতার। এক কথায় ইফতার হচ্ছে দিদার লাভ বা আত্মশুদ্ধি লাভ করা। রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেন – আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন," আমার বান্দাগণের মধ্যে আমার নিকট তাহারাই প্রিয়, যাহাদের ইফতার শীঘ্র হয়"। (তিরমিজি)

যাকাত :-

জাগতিক :- সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ এবং সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান সম্পদ মজুদ থাকলে বৎসরে শতকরা আড়াই টাকা কর বা খাজনাকে যাকাত বলে।

সুফিমত :- আমিত্বের উৎসর্গকে যাকাত বলে। আমির সঙ্গে আল্লাহ্ ব্যতীত সকলই বাদ দেওয়া যাকাত। আমিত্ব ত্যাগ বা মায়া ত্যাগ হলো যাকাত।

ফেতরা :-

জাগতিক :- চাউল বা গম কে একদিনের খাদ্য চাহিদার সঙ্গে তুলনা করে নির্ধারিত মূল্য দানকে ফেতরা বলে।

সুফিমত :- পূর্ণতার পরবর্তী অংশের দান বা কার্যমতকে ফেতরা বলে।

এতেকাফ :-

জাগতিক :- সংসার, সামাজিক কর্তব্য থেকে বিরত থাকিয়া রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণায় মশগুল থাকাকে এতেকাফ বলে। কেহ কেহ তিনদিনও করে থাকে, ইহা মহড়া স্বরূপ।

সুফিমত :- নফ্‌সের আমিত্ব মৃত্যু পর্যন্ত অনুশীলন হলো এতেকাফ। রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন, "সর্বপ্রকার সৎকর্মে নিযুক্ত থাকিলে যে কল্যান বা সওয়াব লাভ করা যায়, এতেকাফ অবস্থায় সর্বপ্রকার সাংসারিক কর্ম হইতে বিরত থাকিলেও সেইরূপ একই কল্যান লাভ করা হয়।

শবে-কদর :-

জাগতিক :- রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে বেজোড় তারিখে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ যে কোন একটি রাত্র শবে-কদর রাত্র। তবে অধিকাংশ মতে ২৬ শে রমজান অর্থাৎ ২৭ শে রাত্রকে বেশি মত দিয়েছে। এই রাত্রে মানুষ এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে পালন করে থাকে।

সুফিমত :- কদর অর্থ আত্মিক শক্তি ও সম্মান। রুহ নাজেল হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিশুদ্ধ মানসিক পরিবেশকে কদর রাত্রি বলে। যাহা দ্বারা প্রভূত্ব ও প্রজ্ঞা উদয় হয় তাহাই কদর। কদর হলো নিজেকে দর্শন।

ঈদ-উল-ফিতর :-

জাগতিক :- এক মাস রোজা শেষে আনুষ্ঠানিক সমাপ্ত ঘটে যা আনন্দের দিন হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন হয়ে থাকে।

সুফিমত :- আপন সাধনাতে থাকিয়া যখন আপন প্রকৃতিকে জয় করবার পর ইফতার হইয়া যাবে তখন হইতে বাহিরের জগতের সঙ্গে সমাজ শুদ্ধির কার্যের দায়িত্ব-কর্তব্য আসিয়া হাজির হইবে, এরূপ একাধিক সিয়ামকারী সমবেত হবে, ইহাই ঈদ-উল-ফিতর পালন বা খুশির ঈদ মুবারক।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা, জাগতিক এবং সুফিমতের ধর্ম কার্য কেমন তা অনুধাবন করবার নিমিত্ত্বে উক্ত আলোচনা টুকো জ্ঞানীদের নিকট সমর্পন করা হইল। (আমিন)

একত্ত্ববাদের বিষয়ে আলোচনা

সূরা ইখলাসের আলোকে

► বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।

অর্থ:- আল্লাহ্‌র নামে শুরু, আর-রহ্‌মান (যিঁনি দয়াল দাতা) এবং আর-রহিম (যিঁনি দয়ালু)।

► কূলহু আল্লাহু আহাদ।

অর্থ:- বলো আল্লাহ্‌ একক।

► আল্লাহুস সামাদ।

অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ।

► লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ।

অর্থ:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

► ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ানে আহাদ।

অর্থ:- তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না।

(সূরা ইখলাস অর্থ একত্ত্ববাদ)

জাগতিক ভাবে এই কালাম পাক সূরা ইখলাস ছোট্ট একটি সূরা। এই সূরাটি আল্লাহ্‌র একত্ত্ববাদের শান-মান, জালুয়া বহন করে। এ বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করব। শুরুতেই যে আলোচনাটুকু রাখব সেটা একটু ভিন্নতার প্রেক্ষাপট।

নিম্নে সে বিষয়ে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব, সেটা হলোঃ-

আমরা যে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম বলি বা পড়ি, এটার অর্থ করা হয় হলোঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিলাম।

এই আয়াতের জাগতিক শাব্দিক অর্থ এবং আমরা যারা সুফি মতাদর্শের বা আধ্যাত্মবাদের আলোকে বিষয়গুলো একটু ভাববাদীতে বুঝতে যাই, যার কারণে অর্থের বিন্যাসটুকু শ্রুতি মাধূর্য না হলেও বিষয় গুলো একটু পরিস্কার ভাবে বুঝতে চেষ্টা করি।

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। অর্থ:- আল্লাহ্‌র নামে শুরু, আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা) এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু) নামে শুরু করিলাম।

এখানে একটু খেয়াল করবার বিষয় এই যে, আয়াতে কালামে তিনটি বিশেষণ উপস্থিত রয়েছে আর সেগুলো হলো:- বিস্‌মিল্লাহির অর্থ আল্লাহ্‌র নামে শুরু, আর-রহ্‌মান অর্থ যিনি দয়ালদাতা এবং আর-রহিম অর্থ যিনি দয়ালু। তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম এই আয়াতে কালামে আল্লাহ্‌র দুইটি নাম সংযোজন করা রয়েছে। একটি হলো, আর-রহ্‌মান এবং অপরটি আর-রহিম। এখন এই আর-রহ্‌মান এবং আর-রহিম আল্লাহ্‌র এই দুইটি নামের বিশেষণ সম্পর্কে আমাদের সম্মক জ্ঞান না থাকলে বিস্‌মিল্লাহর কার্যকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধি হয় না। এজন্য আমরা শুধু মুখস্থ বিদ্যায় পড়ে গেলাম এর ভাব অর্থ এবং কার্যকারিতার দিকে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলাম না।

তাহলে এই নিয়োজিত ব্যবস্থাটা কি একটু বুঝতে হবে। কারণ আর-রহ্‌মান শব্দের অর্থ করা হয় হলো যিনি দয়াল দাতা এবং আর-রহিম শব্দের অর্থ করা হয় হলো যিনি দয়ালু। তাহলে দয়াল দাতা এবং দয়ালু এই দুইটা শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ? এই শব্দের উচ্চারণ গুলো, এর বিভাজন গুলো মানুষের দোরগোঁড়ায় না পৌঁছে এক বাক্যে বলে দেওয়া হলো:- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিলাম। বুঝতে পারছেন তো, জাগতিক এর সাথে আধ্যাত্মবাদের একটি তফাৎ কোথা থেকে শুরু হয়! প্রতিটি স্তরে এভাবে বিভেদ বিভাজন বা আবরণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। এই আবরণের পর্দা যদি আপনি সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। আর যদি আবরণের পর্দা ঢাকনা দিয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে মূল বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে না বা কার্যকারিতা পাবে না।

তাহলে আয়াতে কালামে প্রথমে আল্লাহ্‌র নামে শুরু, এর পরেই আসছে আর-রহ্‌মান। সূরা আর-রহ্‌মান নামে একটি সূরা আল্লাহ্‌ কালামপাকে নাজেল করেছেন, এই আর-রহ্‌মান অর্থ যিনি দয়ালদাতা। এই আর-রহ্‌মানের গুণাবলী বা কার্যাবলী কেমন সেই বিষয়ে আপনাদের আগে একটু জানিয়ে দেই। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র থেকে শুরু করে

সৃষ্টি রাজ্যের ফলমূল, বৃক্ষ-তরুলতা, জীবজন্তু সকল কিছুর বর্ণনা এই সূরা আর-রহ্‌মানে তুলে ধরা হয়েছে। আর এটা হলো দয়াল দাতার অবিনশ্বর বা যাকে আমরা একক বলি বা ইনফিনিট বলি। অর্থাৎ গোটা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌পাকের যত নেয়ামত বা বৈশিষ্ট সকল কিছু বান্দার জন্য।

আর-রহ্‌মানের অর্থ একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। দুনিয়ার জিন্দিগিতে অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না, যাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। তাহলে এই মানুষ গুলোর খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে যত কিছু বিশেষণ সমস্ত কিছুর যোগান তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়। সে মুখে ঠিকই প্রকাশ করে যে আমি আল্লাহ্‌কে মানি না অথচ তার রিযিক আল্লাহ্‌পাক বন্ধ করেন না। সে ঠিকিই খেতে পায়,পরতে পায়। তাদেরকে আল্লাহ্‌ কিন্তু কখনও তাঁর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না। কারণ বান্দা দুনিয়াতে আসার বহু পূর্বেই তার তকদির নির্ধারিত। ইমাম গাজ্জালী (আঃ) বলেছেন যে :- আপনার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা যদি দুই পর্বতের নীচেও থাকে তা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। যা আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয় নি, তা যদি আপনার দুই ঠোঁটের মাঝেও থাকে তবুও তা আপনার কাছে পৌঁছাবে না। সে কি করবে ? কিভাবে খাবে ? কিভাবে পরিচালিত হবে ইত্যাদি। সকল কিছু বান্দা পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্বেই এটা তার জন্য প্রস্তুত থাকে বা রেডি করা থাকে। এই রেডি হলো রহ্‌মানের দান। মানে রহ্‌মান যে দান করে, সেই দানকে কখনই তুলে নেওয়া বা ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। বান্দা পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর বা জন্ম লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাঝামাঝি যে সময়টা, এই সময়ের মধ্যে এটা নির্দিষ্ট করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তার ভাগ্যলিপি বা তকদিরে সে যেটা পাবে, সেটা আল্লাহ্‌ দিয়ে দেন। অর্থাৎ এই দানকে কখনই বান্দার তকদির থেকে আল্লাহ্‌ কর্তন করেন না। তাহলে এই রহ্‌মানের যে বিশেষণ বা দান এটা হলো অবধারিত।

তাই সূরা আর-রহমানের মধ্যে আল্লাহ্‌পাক বার বার বলেছেন যে :- ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান"। অর্থ:- তুমি আল্লাহ্‌র কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ? তাহলে এই নিয়ামত আমাদের উপর অবধারিত ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রহ্‌মানের বিশেষ যে দান, সেই দানকৃত ব্যবস্থায় এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আর ফেরৎ নেওয়া হয় না। তাহলে এই যে দান, এই দানের বিশেষণটাই হলো রহ্‌মানের দান। অর্থাৎ রহ্‌মানের দান যা পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন, যা আর ফেরৎ নেওয়া হবে না।

কতটুকু সময় ? এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সে যা প্রাপ্ত, তার জন্য সেটা বরাদ্দ হয়ে গেছে। এই দানকে সার্বজনীন বলা হয়। অর্থাৎ রহ্‌মানের যে দান সেই দান থেকে আল্লাহ্‌পাক কখনই কাউকে বঞ্চিত করেন না।

এজন্য তাকে বলা হয় হলো দয়াল দাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের এটা এমন এক ধরনের দান, যার বৈশিষ্ট হলো কখনই সেই দান থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না। সেই দানকারীর যে অবয়ব বা খেতাব, সেই খেতাবি নামটাই হলো রহ্‌মান। এই রহ্‌মানের দান এভাবে রাখা হয়েছে। তাহলে এই আর-রহ্‌মান হলো ঐ সকল দানের মূল উৎস।

তাই সূরা আর-রহ্‌মানের মধ্যে আল্লাহ্‌পাক বার বার বলেছেন যে :- "ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্‌জিবান"। অর্থ:- তুমি আল্লাহ্‌র কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ? আল্লাহ্‌পাক কোরআনে এভাবে কেন বললেন ? এর অর্থ কী ? এটারও তো একটি কারণ রয়েছে, শুধু শুধু তো আমাদেরকে এই সকল নিয়ামতকে দেওয়া হয় নি। এর অর্থ হলো:- আল্লাহ্‌পাক মানুষকে সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুক। এই মানব কূলে আবির্ভাবের পর থেকে তার কার্যক্রম হবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের বিকাশ নিয়ে চিন্তা করা। আল্লাহ্‌র প্রেমময়ীতার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌কে প্রাপ্তির যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সেটারই বাস্তবায়ন বান্দা দুনিয়াতে এসে করবে। এই কারণে রহ্‌মানের দানটা এরকম ভাবে রাখা হয়েছে। এই পৃথিবীতে ৮৪ লক্ষ প্রাণীর বাস। মানুষই শুধু রোজগার করে বাকী প্রাণীরা কিন্তু অনাহারে মরে না। বেশির ভাগ মানুষই রিজিকের পিছনে দৌঁড়ায় কিন্তু রিযিক দাতার দিকে মানুষ যেতে চায় না।

তাহলে রহ্‌মানের যে দান সেই দানটুকু আমরা ভক্ষণ বা ব্যবহার করবার পর, আমরা অধিকাংশই স্রষ্টার প্রেমময়ীতার মুখ থেকে ডাইভার্ট বা দূরীভূত হয়ে যাই। এই মানব যখনই এভাবে দূরীভূত হয়, তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি আসেন। তাঁরা স্রষ্টার সুশিক্ষার আলোকে মানুষকে আবার আল্লাহ্‌র প্রেমময়ীতার দিকে ফেরানোর জন্য সেই তালকিন বা মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে তাঁর প্রেমময়ীতাতে লীন করবার প্রেক্ষাপট গুলোই বুঝিয়ে থাকেন। যারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হন, তাদের কার্যক্রম এরকম স্রষ্টার সান্নিধ্যের বিকাশময় ধারাতে পরিচালিত করেন। তাহলে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম, এই আয়াতের শেষ বিশেষণ হলো আর-রহিম। এই রহিম নামে যত প্যাঁচ। প্যাঁচ কেন ? আসলে এই রহিমের যে দান, সেই দানটুকু হলো:- আল্লাহ্‌পাক যদি কোন বান্দাকে

ক্ষমা করে দেয় এবং এই ক্ষমা করবার পর বান্দা যদি মওলার সান্নিধ্য গ্রহণ করে তাহলে তখনই তাঁর নাম হয় রহিম। সেটাই হলো রহিমের দান এবং তখনই আল্লাহ্‌পাকের নাম হয় হলো রহিম। এই রহিম নামের যে দান, এই দানটি সবাই পাবে না। সমগ্র কোরআনুল মাজিদে যদি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন, তাহলে কোথাও গাফুরুর রহ্‌মান পাবেন না। কোরআনের কোথাও গাফুরুর রহ্‌মান নেই, আছে হলো গাফুরুর রহিম। অর্থাৎ ক্ষমার পরের একটি বিশেষ অবয়বের দান হলো এই রহিম। অর্থাৎ বান্দা যখনই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে বা বান্দা তার কৃত কর্মের আমলের দ্বারা বা তার মোরাকাবা মোশাহেদার দ্বারা ত্বরান্বিত করতে করতে একটি পর্যায়ে গিয়ে সাধক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট লাভ করতে পারে। সাধক যখন স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন স্রষ্টা ডাকবে যে, আমি তোমাকে আহ্বান করছি তুমি আমার দিকে আসো বা তোমার এই কার্যাবলীতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌ সন্তুষ্টি সাধিত হলে, সেই সন্তুষ্টির ফলশ্রুতিতে এই রহিম রূপের আবির্ভাব হয়। তখনই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তখনই এই বিশেষ নামের সারকথা বান্দা উপলব্ধি করতে পারে বা বুঝতে পারে। এটাই হলো এই রহিম।

তাহলে ক্ষমা প্রাপ্ত যদি না হয় তাহলে এই বিস্‌মিল্লাহর কার্যকারিতা ফলবে না। আল্লাহ্‌পাক যুগে-যুগে, কালে-কালে নবী-রসূলদেরকে পাঠিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন যে, যদি বিস্‌মিল্লাহ পরিশুদ্ধ হয় এবং এই পরিশুদ্ধ হবার পরে বিস্‌মিল্লাহর জালুয়া বা বরকতের কার্যকারিতা ফলে। আপনারা জাগতিক ভাবে শুনে থাকবেন যে, অনেক বড় একজন জবরদোস্ত খাতক ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে তাকে মাত্র তিনটি রুটি খেতে দিয়েছিলেন। সেই বড় খাতকের কাছে এই তিনটি রুটি খাওয়া হাস্যকর মনে হয়েছিল। তিনি ভেবেছিল আমি এত বড় একজন খাতক আর আমাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র তিনটি রুটি। অথচ বিস্‌মিল্লাহর জালুয়া বা বরকতের কার্যকারিতা ফলবার কারণে তিনি মাত্র এই তিনটি রুটি খেয়ে শেষ করতে পারেনি।

তাহলে বরকতের জালুয়াটা যিনি খাতক ছিলেন তার প্রতিফলন হয়নি, প্রতিফলনটা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির দ্বারা। কেন ? কারণ উঁনি গাফুরুর রহিম এর যে প্রক্রিয়াটা, সেটা নিজের ধারণকৃত ব্যবস্থার দ্বারা সুসম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর এই রহিম রূপের দান থাকবার কারণে এর ফলপ্রসূ বা কার্যকারি ব্যবস্থা জারী হয়। এই প্রক্রিয়াতেই হয় হলো দয়ালু অর্থাৎ আমি দয়া পাবার উপযুক্ততা বা তাঁর পরিপূর্ণতার কেন্দ্রে যখন উপবিষ্ট

হয়েছি তখনই আল্লাহ্ আমার প্রতি এই দয়া বর্ষণ করেন। এই দয়ার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণ পরিচালিত হয়। এটাকে একটু সহজ ভাবে বুঝবার জন্য নিম্নে আরও একটু আলোচনা করছি।

রসূলেপাক (সাঃ) (আঃ) যখন ধর্মীয় কারিকুলাম প্রচারের জন্য বা এই ইসলাম ধর্মকে একটি বিস্তৃত ভাব ধারায় জারী করবার জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। রসূল (সাঃ) (আঃ) এর আপন চাচা আবুজাহেল উনার একটি গ্রুপ ছিল রসূলের (সাঃ) (আঃ) ধর্ম বা তাঁর বিধানকে নশ্বাৎ করবার প্রক্রিয়াতে। আমি সংক্ষিপ্ত আকাড়ে বলছিঃ- রসূল (সাঃ) (আঃ) কে বলা হলো, আপনি যদি এই চন্দ্রকে কেটে দ্বিখন্ডিত করতে পারেন তাহলে আমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনব বা কলেমা পড়ে মুসলমান হব। তখন রসূলেপাক (সাঃ) (আঃ) চুপ হয়ে রইলেন। এর কিছুক্ষণ পর জিব্রাইল আমিনের আগমন ঘটল এবং তিনি বললেন, হে রসূল (সাঃ) (আঃ) আপনি আপনার আঙ্গুলি নির্দেশ করুন চন্দ্র স্ব-সম্মানে কেঁটে দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র হাবীব আঙ্গুলি নির্দেশ করার পর চন্দ্র স্বসম্মানে কেঁটে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল রহিমের দান। তাহলে এই দানের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণ যে ধর্মে বিস্তার করে থাকেন। এই কারিকুলামের মধ্যে মানুষ যদি ত্বরান্বিত হতে পারেন, সেই ত্বরান্বিত গতি ধারা এরকম প্রক্রিয়াতে সু-সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই এই বিশেষ প্রক্রিয়া হলো রহিমের দান।

তাহলে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম, এই আয়াতের যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামের মধ্যে প্রথমেই বলা হলো যেঃ- বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র নামে শুরু, মাঝে হলো আর-রহ্‌মান যিনি দয়াল দাতা বা সকল নেয়ামতের অবয়ব এবং সর্বশেষ হলো আর-রহিম যিনি দয়ালু অর্থাৎ ক্ষমার পরের একটি অবয়বের দান। এজন্য যিনি দয়ালু তাঁকে লাভ করবার জন্য সুফিদের অনুসরণ অনুকরণ বা তাদের কার্যাবলী ত্বরান্বিত করবার প্রচেস্টা থাকতে হয়। এজন্য মূল ধারার যে আকিদা বা বিষয়বস্তু সে দিকে ধাবিত হবার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

তাই সুফিদের বা তাসাউফধারীদের কার্য হলোঃ মানুষ রূপে যাদের দুনিয়াতে আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের স্রষ্টার রূপে রঞ্জিত হওয়া বা স্রষ্টার প্রেমময়ীতার সঙ্গে নিজেকে প্রেমময় বা প্রেম করা। প্রশ্ন হলো কি দিয়ে প্রেম করব ? তাঁকে তো দেখি নি ? দেখার প্রক্রিয়াতে আসলে ইখলাস বা একত্ত্ববাদে আল্লাহ্‌তে লীন হতে হয়। ইখলাস শব্দের অর্থ হলো একত্ত্ববাদ। তাহলে একত্ত্ববাদ কি ? সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বললেনঃ-

কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। অথচ আমরা সবাই আল্লাহ্‌কে এক বলে জেনে থাকি বা মনে প্রাণে লালন করে থাকি। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন আমি একক।

পার্থক্যটুকু আপনাদের ধরিয়ে দেই। যারা আরবি জানেন তাদের জন্য বোঝাটা সহজ হবে। আরবিতে যারা পান্ডিত্য বা অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন সৌদি আরবে বিভিন্ন কারণে বসবাস করে থাকেন, তাদের কাছে শুনে থাকবেন যে, আরবিতে ওয়াহেদ শব্দের অর্থ হলো এক। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামপাকে কখনই বলেন নি যে:- কূলহু আল্লাহু ওয়াহেদ, বলো আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ বলেছেন হলো:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। আহাদ শব্দের অর্থ হলো একক। অর্থাৎ একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বা। যে সত্ত্বার কোন বিলয় হয় না। যার কোন পরিবর্তন নেই, যার কোন ভাঙ্গাচুড়া হয় না, যার কোন বিভাজনকৃত ব্যবস্থা নেই। সেই সত্ত্বাকেই বলা হয় আহাদ। তাহলে আল্লাহ্ বললেন এই আহাদ শব্দের অর্থ হলো একক সত্ত্বা। এই এক আর একক এর যে বিভাজনকৃত ব্যবস্থা, এইটা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই বা বোঝার চেষ্টা করি না। ধারণা না থাকার কারণে আমরা একটি গোঁজামিল ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় দর্শনকে দাঁড় করাই।

জাগতিক ভাবে যারা আমাদের প্রচিলত ধর্মের আলেমগণ, যারা আমাদের ধর্মের শিক্ষা দেন তারা বলে থাকেন যে আল্লাহ্ এক। এক আর এককের পার্থক্যটুকু যদি আপনারা বুঝতে না পারেন তাহলে ধর্মের মধ্যে ল্যাঁবড়া হয়ে যায়। অর্থাৎ ধর্মের মূল ধারায় পোঁছাতে আপনার খুব কঠিন হয়ে যাবে। বুঝতেই পারবেন না যে আমি বা আপনি ধোকার মধ্যে রয়ে গেলাম! তাহলে আয়াতে কালামে বলা হলো: কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। এক বলতে আমরা সবাই বুঝি এই শাহাদৎ আঙ্গুলটাকে ইশারা করলে একের নিদর্শন বা দৃষ্টান্তে একের প্রতীক বুঝানো হয়।

তাহলে প্রশ্ন হলো একক কী ? এই একককটুকু আপনাদের প্রচলিত একটি ব্যবস্থা দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করি। সেটা হলো:- আপনারা সবাই ওজনের বাটখারা চিনে থাকবেন এবং এই ওজনের ১ কেজি নামের একটা পাথর আছে, আপনারা সেটাও হয়ত চিনে থাকবেন। তাহলে এটাকে বলা হয় হলো ওজনের পরিমাপক। এই ওজনের পরিমাপক হলো কেজি। এটা হলো আমেরিকার স্টান্ডার্ড, আগে বৃটিশ ছিল তখন সের ছিল। আজকের আধুনিক বর্তমান যুগের হাল জামানার ছেলেমেয়েরা তারা কেজিও ভুলতে বসেছে, কারণ এখন ডিজিটাল প্যাকেট পদ্ধতি এসেছে। যাই হোক এই আমেরিকার স্টান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের প্রচলিত মাপের যে বাটখারা সেটার নাম হলো কেজি।

তাহলে এই কেজিটা মেট্রিক পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে ওজনের পরিমাপ কেজি। তাহলে আমাদের এই অঞ্চলের নাম হলো কায়েমকোলা, এখানে বিভিন্ন দোকানপাট বা পণ্যের যে মাপকাঠি পরিমাপ করা হয় বা ওজন করা হয়, এখানে যে কেজি পাবনা থেকে যদি এখানে মাল বা পণ্য আনায়ন করা হয় তাহলে সেখানে এই একই পরিমাপ বা কেজি। তাহলে কায়েমকোলা আর পাবনার কেজির বা পরিমাপের মধ্যে কিন্তু কোন পার্থ্যক্য নাই। এক কেজি লবন পাবনা গেলে কি দুই কেজি হবে ? তাহলে এক কেজি, এক কেজিই থাকবে। আবার পাবনা থেকে যদি ঢাকাতে রূপান্তর করি তাহলে ঢাকার এক কেজি পাবনার এক কেজি কায়েমকোলার এক কেজি, সব কিন্তু একই পরিমাপ, কোন পার্থক্য নেই।

তেমনি যদি ঢাকা থেকে চিটাগাং নিয়ে যায় মিল ফ্যাক্টরীতে, সেখানে যে কেজি এখানেও সেই একই কেজি । তেমনি সারা পৃথিবীতে ওজনের পরিমাপক হলো কেজি। এক কেজিতে সকল জায়গায় সমান পরিমাপ বহন করে। এখন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বা কিছু মোনাফা খোঁড় যদি এটাকে কম বেশি করে থাকে, তাহলে সেইটা দূর্নীতিগ্রস্থ ব্যবস্থা, সেটা ভিন্ন কথা। তাহলে এক কেজি হলো ওজনের একটি পরিমাপ। সকল জায়গায় এই পরিমাপ নির্দিষ্ট মানে একই। তাহলে এটা ওজনের একটি পরিমাপ। তাই ওজনের পরিমাপকে একক হিসাবে বলা হয় কেজি। তাহলে এই কেজি গুলোকে যদি সমগ্র দুনিয়ায় যত কেজির বাটখারা বা পাথর রয়েছে, সবগুলোকে যদি আমরা এক জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করাই তাহলে পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে বা পাহাড়ের চাইতে বড় আকারও ধারণ করতে পারে। কিন্তু আসলে প্রতিটি এক কেজির মান কিন্তু এক কেজিই রয়েছে। কমও নেই বেশিও নেই। তাহলে ওজনের পরিমাপক হলো কেজি। আল্লাহ্ ঠিক একক বা আহাদ। এই আহাদ শব্দের অর্থ হলো:- একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বা ঠিক এই কেজির পরিমাপক ব্যবস্থার মতই সমাসীন প্রতিটি মানুষের মধ্যে। অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে ৭৫০ কোটির উপরে মানুষ বাস করে। তাহলে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ এই আহাদ বা একক রূপে বিরাজিত।

কোরআনুল মাজিদের সূরা কাফ-এর ১৬ নাম্বার আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে যে :- "নাহনু আকরাবু ইলাহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ"। অর্থ :- "আমরা তোমার শাহারগের নিকটে রয়েছি"। এই এক কথাতে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ ভাবে সকল বিষয়কে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেটাই হলো:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। তাহলে

আল্লাহ্ যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বিরাজিত দলিল এভাবে বলছে। তাহলে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ বিরাজিত। তাহলে আমার মধ্যে যে আল্লাহ্ বিরাজিত আছে, আপনার মধ্যে কোন আল্লাহ্ বিরাজিত আছে ? এই একক সত্ত্বায় বিরাজিত প্রতিটি মানুষের মধ্যে একই আল্লাহ্ বিরাজিত রয়েছেন।

তাহলে আমরা সেই আল্লাহ্র তাঁলাশ বা অনুসন্ধানগামীর যে ব্যবস্থা, সেই দিকে পরিগমন না করে লেবাসের একটি আশ্রিত ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মকে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা করে আল্লাহ্কে তালাস করে চলেছি। প্রতিটি ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত আঁড়াইশতের অধিক পৃথিবীতে ধর্মের অনুসারীগণ রয়েছে। প্রত্যেকেই তার স্বীয় নিজ নিজ ধর্মের অবলম্বনে তার স্রষ্টা বা তার মাবুদ কে সে খুঁজে থাকে। ধর্ম এসেছে হলো স্রষ্টার প্রণিত ব্যবস্থায় তাঁকে লাভ করবার জন্য। তাঁকে কিভাবে লাভ করা যায়, সেই দিক নির্দেশনা গাইড হিসাবে বা সংবিধান হিসাবে ধমর্কে দাঁড় করিয়েছে। তাহলে সেই ধর্মের মূল চালিকাশক্তি বা চাবিকাঠি একটি আপেক্ষিক পরিচিত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে আহাদ সত্ত্বাকে লাভ করা। তাই আল্লাহ্ বলছেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:– বলো আল্লাহ্ একক। যদি এখানে এক বলা হয় তাহলে আমার আল্লাহ্ দৃশ্যমান হলে আমি এই আল্লাহ্কে কনসেপ্ট করে যদি আটকিয়ে ফেলি, তাহলে সমগ্র ভূমন্ডল, নভোমন্ডল, পৃথিবী, বিশ্ব, সবকিছু আটকে যাবে আর কিন্তু নড়াচড়া করতে পারবে না। কারণ একটাই আল্লাহ্, এটা প্রচলিত ভাবধারায় বলা রয়েছে, কিন্তু সুফিমতে বা গুরুবাদি ব্যবস্থায় এটা থিসিস বা গবেষণা করে দেখা গেছে যে, আল্লাহ্ একক।

তাহলে এই একক সত্ত্বা হলো নির্ভূল। এই নির্ভূলতা খুঁজতে গেলে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে আল্লাহ্ এক, বিনা দলিলে আল্লাহ্ এক এভাবে অনেকেই মানুষকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু ওটা হলো রূপক বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মূল সত্ত্বার ধারাবাহিক প্রণালী যদি এক হয়, তাহলে অনেক ওলিগণ যেমন মুনসুর হাল্লাজ বলেছেন:- আনাল হক। অর্থ:-আমিই আল্লাহ্ বা আমিই সত্য। মুনসুর হাল্লাজ যদি আল্লাহ্ হন, তাহলে আল্লাহ্র আর তো কোন অস্তিত্ত্ব থাকে না, আল্লাহ্ বন্ধন হয়ে যায়। তাই আয়াতে কারিমায় যদি বলা হয় যে বলো আল্লাহ্ এক, তাহলে মুনসুর হাল্লাজের কাছে আল্লাহ্ আটকে গেছে। তাহলে আল্লাহ্ আর কোথায় ? তাহলে আল্লাহ্ আর নেই ? নাস্তিক্যবাদ এসে যায় যদি এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু আমাদের বিষয়টা তা নয়।

আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্পাক বলেছেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্

একক। এই একক যদি মানুষ বুঝে, তাহলে সবার মধ্যে আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত এ কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে গুরুবাদ এসে যায় বা পীরতন্ত্র এসে যায়। যার কারণে যারা পীর বা মোর্শেদকে মানবে না তারা এই আয়াতে কারিমার অর্থকে এভাবে রূপান্তর করেছে, আল্লাহ্কে এক বলে আমাদের মাঝে চালিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ্ হলো একক।

এটাকে আমরা আরেকটু উপস্থাপিত বিষয় হিসাবে মেলে ধরতে চাই:- তাহলো বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে:- সৃষ্টি রাজ্যে জন্ম দেওয়ার মালিক আল্লাহ্, মৃত্যু দেওয়ার মালিকও আল্লাহ্। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমেই তো হয়ে থাকে। তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে ৭৫০ কোটিরও অধিক মানুষ রয়েছে। তাহলে প্রতিটি মানুষের জন্ম হার এবং মৃত্যু হারকে যদি আমরা গাণিতিক ভাবে একটি বিশ্লেষণে আনি, তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আল্লাহ্ কুন বললে হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয় বা জন্ম লাভ করে এবং ফায়াকুন বললে যে পরিমাণ ধ্বংস হয় বা মৃত্যু বরণ করে। তাহলে এই জন্ম এবং মৃত্যুর হিসাবটাই শুধু আল্লাহ্ অবারিত ভাবে যদি বলেন, কুন-ফায়াকুন, কুন-ফায়াকুন, কুন-ফায়াকুন তবুও এটা সময়ে কভার হয় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হিসাব।

তাহলে এটা কি ? আসলে এটা বুঝবার জন্য এই একক সত্ত্বাকে যারা মানে না তারা এরকম বিভাজনকৃত এমন কিছু দাঁড় করিয়েছে যে, ধর্মের প্রতি মানুষের অনিহা হয়ে গেছে। এই অনিহার কারণে আজকে আল্লাহ্র প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। মানুষ ভ্রান্তির দিকে চলে যাচ্ছে। তাই এই ভ্রান্তি অপসারিত করবার জন্য ধর্মকে বুঝতে হলে সুফিদের আকিদায় যারা ওলি মাশায়েখগণ, তাদের দ্বারা কোরআনুল মাজিদের যে সকল তাফসির রয়েছে, সেগুলোকে একটু অর্থ করবার জন্য অনুরোধ রাখি।

কারণ আমরা দুনিয়াতে আসছি, সবারই মৃত্যু রয়েছে। আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্পাক বলে দিয়েছেন যে, কুল্লু নাফছিন জায়িকাতুল মউত। এখানে কিন্তু নফ্সের কথা বলা হয়েছে, শুধু মানুষ মারা যাবে এমন কথা আসেনি। তাহলে এই মৃত্যু অবধারিত। কার ? নফ্সের । তাহলে নফ্সধারি আত্মা যা কিছু রয়েছে শুধু মানুষ নয়- গোটা দুনিয়াতে যত জীব রয়েছে তাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাহলে আমাদের সবাইকে একদিন মৃত্যু বরণ করতেই হবে এটা থেকে নিস্তার নেই। যার জন্ম হয়েছে তাকে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এই মৃত্যু পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য এই বিধান বা ধর্ম এসেছে। ধর্মের আকিদা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে এই ইখলাস পয়দা করতে হবে। সূরা ইখলাস

আমি পড়লাম আর সওয়াব পেলাম এটা নয়। আসলে এই ইখলাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অর্থাৎ এই একত্ত্ববাদে নিজেকে লীন করবার জন্য এই আয়াতে কারিমাগুলো দৃষ্টান্ত স্বরূপ বা এটা সংবিধান স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পাঠানো হয়েছে।

তাহলে এটা হলো সুফিদের আকিদা অর্থাৎ কোরআনুল মাজিদকে তাঁরা আয়ত্ত্বে রাখে নিজের দেহ ভূবনে। এটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁদের ভক্তবৃন্দকে আমল নীতিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। তাহলে সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ একক। একক সত্ত্বা বলতে এই আল্লাহ্ একক রূপে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন। অর্থাৎ আমার ভিতরে যে আল্লাহ্ রয়েছে সেটার যে রূপ, সেটা যে রকম, আপনার মধ্যে যে আল্লাহ্ রয়েছে সেটাও ঠিক সেই একই রকম। তাহলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একই রকম আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত।

তাহলে ধর্ম কি সূক্ষ্ম আর চালাকির মাধ্যম দিয়ে আমরা আমাদের কাছে পেয়েছি। সুফি বা ওলি মোর্শেদ প্রদত্ত্ব রাস্তাকে যদি অবলম্বন করা না হয়, তাহলে এই বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা বা কার্যকারিতা মিলবে না। এটা শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই আয়াতে কারিমায় সুস্পষ্টভাবে সকল ধোঁয়া আর কুয়াশা ডিভাইডেড করে দিয়ে একটি সৌন্দর্যের উপর দাঁড় করেছেন। আমরা সবাই জানি আল্লাহ্ এক। এটার উপরেই বিশ্বাস বা একিনে দন্ডায়মান হয়েছি। যদি আল্লাহ্ এক হত, আল্লাহ্ তাহলে কিভাবে প্রতিটি মানুষের জীবন রগের সঙ্গে থাকে ? পবিত্র কালাম পাকে আল্লাহ্ বলছেন, আমি চারটি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে থাকি। সেগুলো হলোঃ-

(১) সাবেরিন - ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।

(২) মোহসিনিন - সৎ কর্মশীলদের সঙ্গে।

(৩) মমিনিন - মমিনদের সঙ্গে।

(৪) মুত্তাকীন - মোত্তাকীনদের সঙ্গে।

তাহলে এই কালামপাক যাদের আয়ত্ত্বে রয়েছে তাদের সঙ্গেই আল্লাহ্ জাগ্রত অবস্থায় থাকে। এর প্রমাণটা তাঁরাই দিতে পারবেন, যারা এই আল্লাহ্‌কে একক রূপে দৃশ্যমাণ করতে পেরেছেন, তিঁনিই এটা ধরতে পারবেন। আমার আর আপনার শুধু মুখে বলা ছাড়া অন্য কিছু হয় না। এটা জানতে হলে আল্লাহ্‌র এই একত্ত্বাবাদে নিজেকে সমাসীন

করতে হবে। যদি আল্লাহ্ এক হয় এবং তিঁনি যদি ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন, তাহলে আমি বা আপনি কী ?

তাহলে আল্লাহ্ কী আমাকে বা আপনাকে সৃষ্টি করে কলঙ্কিত করেছেন ? তাই যে বোঝে না সে কখনও স্বীকার করে না এবং সে বড় জ্ঞানী সাজতে চায়। জজ বার্নড শো বলেছেন :- মিথ্যা জ্ঞান হতে সাবধান, এটা অজ্ঞতার চেয়েও বিপদ জনক। এজন্য তারা ধর্মে মন্দের আশ্রয় আর অবতারণাকে অবলম্বন করে মানুষকে ধর্মান্ধারিত করার চেষ্টা করে। এটাই শয়তানি সত্ত্বা। এই শয়তানি সত্ত্বার জাগরণ যাদের মধ্যে ক্রিয়া আছে তারা সত্যকে অস্বীকার করে। আর ভাল করে খেয়াল রাখবেন সত্যকে অস্বীকারকারী হলো কাফের, এটা চূড়ান্ত কথা। তাহলে সাবেরিন, মোহসিনিন, মমিনিন, মুত্তাকিন যারা আল্লাহ্র এই গুন সম্পন্ন ক্রিয়াতে সমাসীন হয়ে আল্লাহ্কে নিয়ে পরিচালিত হয়, তাদের সাথে আল্লাহ্পাক সংযুক্ত থাকে। এই সত্ত্বাকে জাগরিত করবার জন্য ওলিগণের যে ক্লাস বা যে ধারাবাহিক প্রণালীর শিক্ষা ব্যবস্থার মানদন্ড দাঁড় করিয়েছেন।

এটার উদ্দেশ্য হলো একটি দেহকে প্রথমে পবিত্র করার অনুশীলন করা। পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত আল্লাহ্ একক, এটা কারো বোঝার সাধ্য নেই বললেই চলে, সে বুঝতে পারবে না। কুরানুল মাজিদে সূরা আশ-শামস্ এর ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- “ফাদ আফলাহা মান বাক্কা-হা”। অর্থ:- যে নিজেকে আত্মশুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধ বা পবিত্রতা অর্জন করলেই সে সফলকাম বা কল্যাণকর হয়। তাহলে আয়াতে কারিমায় প্রথমেই বলা হলো :- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:– বলো আল্লাহ্ একক। একটি দেহ যখন পবিত্রতার স্বাদ গ্রহণ করবে অর্থাৎ দেহের মধ্যে যখন একটি মন্দের আঁশও স্থান পাবে না, তখনই এটা প্রমাণ হবে। সাধক কী শুধু তার সাধনা রাজ্যে থাকে ? তাহলে এটাই তার একটি সত্যায়িত অবয়ব জারী হয়। যে অবয়বকে সে ধারণ করলে সে বুঝতে পারে অর্থাৎ তার দেহটাকে যে পবিত্র করার অনুশীলনটা করেছিল সেটারই ফল। এই অনুশীলন কী কোন দিন শেষ হবে না ? এই অনুশীলনের কী কোন অবসান নেই ? এই বিষয়ে জানতে বা বুঝতে হলে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিতে হয়। তাছাড়া এটা বোঝা যায় না ?

তাই আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন হলো একটি শ্বাশত সত্যের অবয়ব। আর এটা যে সত্য, একটি দেহ অনুশীলন বা যে মোরাকাবা মোশাহেদাগুলো সাধকগণ করে থাকেন এবং এই মোরাকাবা মোশাহেদার অবয়ব যখন তার উপর জারীকৃত হয় তখন সে ধীরে ধীরে

বুঝতে পারে। একটি দেহের মন্দের সকল অবতারণা যখন দূরিভুত হবে, তখনই মওলা সত্ত্বার অবয়ব সেই দেহতে জাগ্রত হয় আর জাগ্রত হলে সেই মানুষের সকল বিষয়াবলী তৌহিদে রূপান্তর হয়।

সেই মানুষের সকল বিষয়াবলী তৌহিদে রূপান্তর কেমন করে হয় তা একটু বুঝিয়ে বলি। জাগতিক ভাবে আপনারা শুনে থাকেবেন। সেটা এরকম যেমন: এই হাত, এই হাত কিন্তু আমার না। কারণ আমি এই হাত দ্বারা ইহকালে যত পাপ করছি বা করতেছি, সেই পাপের সাক্ষ্য এই হাতটা পরকালে আমারই বিরুদ্ধে কথা বলবে বা সাক্ষ্য দিবে। এই পাঁ দিয়ে আমি কোথায় পরিগমন করি, সেই পরিগমনের সাক্ষ্য হলো এই পাঁ দিবে। আমি এই মুখ দিয়ে যে ধান্দাবাজির বয়ান বা মন্দের প্রকাশ করি, এই মুখ সেটারই সাক্ষ্য মওলার কাছে দিবে। তাহলে তারা কেউ আমার না কিন্তু আমার সাথে রয়েছে।

তাই একটি দেহ যখন পবিত্র হয় তখন তারা (হাত,পাঁ,মুখ ইত্যাদি) সচল বা জাগ্রত হয়। এই হাত আপনার সাথে কথা বলবে । এই পবিত্রতা যে একবার করবে, সে সফলকাম হবে। এটা যদি কেউ করতে পারে, তাহলে এই সকল তৌহিদের সঙ্গে কথোপকথন করে আপনাকে আবার নতুন করে ওয়াদাবদ্ধ করে তাদেরকে আটকিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে দুনিয়াতে এসেছি, ফিরে গিয়ে আপনার আবার তাঁর কাছে এ বিষয় নিয়ে দন্ডয়মান হতে হবে। আপনার আর মওলা সত্ত্বা দুইয়ের কথোপকথন হবে, এখানে শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা থাকে না এবং আপনার পীর বা মোর্শেদও থাকে না। লাউৎস (আঃ) বলেছেন:- যখন তুমি প্রস্তুত তখন গুরু আসেন, যখন তুমি একেবারেই প্রস্তুত তখন গুরু উধাও হয়ে যান। পীরকে যে আপনি ভজেন, এই পীরের কাজ হলো এই ধরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ডিউটি। পীর হলো ওস্তাদ। এই ওস্তাদি হলো দেহতে বা আত্মাতে থাকে। তাই এই ওস্তাদির স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তাঁকে আর ধর্মান্ধারিত করা যায় না। যে করতে পারে তাঁর সঙ্গেই এদের (হাত, পাঁ, মুখ ইত্যাদি) কথা হয় বা প্রমাণিত হয়। তাঁকে আর কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর দরকার হয় না। এটাই আধ্যাত্মিক।

মনে রাখবেন, আপনারা যারা আত্মার মুক্তির রাস্তায় বা আহলে বায়াতে দাখিল হয়েছেন, আপনাদের এক জন্মে যদি না হয়, যদি শত জন্মও লাগে তবুও এদেরকে ওয়াদাবদ্ধ করে নিয়ে, আত্মার মুক্তির চেষ্টা করবেন। কি আর আপনাদের বোঝাবো ? কারণ বর্ণনাতে তথাকথিত আলেম সমাজ ধর্মের যা করেছে, সামান্য কিছু ব্যতীত ধর্মের আর

কিছু থাকে না। কারণ তারাই মূল হয়ে বসে আছে। এই আল্লাহ্‌কে এক বলে গোটা দুনিয়ায় মানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ্‌পাক বলেছেন: বলো আল্লাহ্ একক। কি ভাবে মানেন ? আপেক্ষিকতার রং ঢং জুব্বার বাহাদুরি এগুলো কোন ধর্ম নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে:- যেখানেই জ্ঞান পাবে তা অর্জন করে নিও, কিন্তু ফিকাহ শাস্ত্রের পন্ডিতদের (মোল্লা-আলেমদের) নিকট যেওনা, কারণ এরা খোঁয়াড়ে বাস করা মানুষ রূপী ভেড়ার দল। কারণ রসূল (সাঃ) (আঃ) বলছেন :- "যার মধ্যে এই গুপ্ত ইলম বা আধ্যাত্মিকতা নেই, সে যদি হাজার বছরও এবাদত করে তবুও তার কোন এবাদত বন্দেগী কবুল হবে না" আমরা বর্তমান সমাজে কিসের অনুশীলন করি ? এই এক্সারসাইজ বা ব্যয়াম দিয়ে স্রষ্টাকে লাভ বা পূর্ণতা হবে এটা উঁনি দিয়েছেন ? তাহলে কিসের অনুশীলন আপনি করছেন ?

তাই একত্ত্ববাদ হলো আল্লাহ্‌র প্রতি প্রাথমিক ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মন আর জ্ঞান দ্বারা সারেন্ডার হতে হয় । আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই নেই, আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই করবার থাকে না। আমার সকল ক্রিয়াকর্ম যেন এই মওলার হয়, এভাবে নিজের মনকে গুছিয়ে নিতে হয়। মওলা যদি অচৈতন্য বা অদৃশ্য হয় তাহলে আমার সাধন ভজনে কী হয় ? তাহলে আমার সাধন ভজনতো বিফলেও যেতে পারে। একজন দার্শনিক বর্ণনা করেছেন যে:- ফেইথ ইজ মিনিং লেস উইদাউট অ্যানি প্রাকটিক্যাল। অর্থ:- বিশ্বাসের এক পয়সাও মূল্য নেই যদি সে কিছু না দেখে। তাহলে কী দিয়ে বিশ্বাসকে মজবুত বা দৃঢ়করণ করব ? তাই এই মওলা রূপে একজন পীর বা মোর্শেদ কে গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তাঁর দাসত্ব করতে হয়। কারণ তিঁনি মওলাকে ধরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে পরিগত। তাই যিনি জানেন, তিঁনি আপনাকে সেটা দেখিয়ে দিতে পারেন। পাবনা শহর কোথায় অবস্থিত সেটা যদি আমি জানি আর আপনি যদি সেখানে গমন করতে চান, তাহলে আমি সহসাই সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব বা সেই পথ সম্পর্কে আপনাকে বলে দিতে পারবো। তাহলে যিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তিনি সেই ঠিকানায় একটি মানবকে পৌঁছে দিতে কী করতে হয়, সেই করণতব্য বিষয়টা তিঁনি নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তাই ওলি বা মোর্শেদ এই অনুশীলন বা মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো দিয়ে থাকেন। এটা হলো স্রষ্টা প্রাপ্তির অনুশীলন।

এজন্য আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক।

আল্লাহ্ এবং বান্দা এই দুইটি সত্ত্বা একত্রে একটি দেহতে মিলন হলে সেটার নাম হয় আহাদ সত্ত্বা। এই একক হলো নির্ভূলতা, এখানে কোন ভূল নেই। নির্ভূলতার প্রেক্ষাপটে কালামপাকে আল্লাহ্ বলেছেন যে:- ইহা এমন একটি কিতাব যাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহর অবকাশ নেই। মানুষের যদি সন্দেহ হয় কোন আয়াতে কারিমা সম্পর্কে, তাহলে সেটা সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। নিঃসন্দেহে এখানে যদি কোন ভ্রান্তির অর্থ সন্নিবেশিত করা হয়, তাহলে এরকম চিন্তা চেতনার উদ্ভব আসতে পারে।

আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন যে এই কালাম পাকের মধ্যে কোন ভূল নেই। আল্লাহ্ তাঁর কালাম পাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে:- কোন ভূল পাও কি ? তুমি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখ কোন ভূল পাবে না, নিঃসন্দেহে তোমার চোখ বিস্ফরিত হয়ে তোমারই কাছে ফিরে আসবে। এটাই আল্লাহ্‌র চ্যালেঞ্জ। তাহলে আমরা আয়াতে কারিমায় যে ভ্রান্তি বা ভূলের প্রদর্শন দেখতে পাই বা নিজেদের কাছে আফসেট মনে হয় এটা হলো আমাদের চিন্তা ধারার ভূল। আসলে আয়াতে কারিমায় কোন ভূল নেই। বাস্তবতার সঙ্গে আয়াতে কারিমার যে তারতম্য এটা হলো অনুবাদ বা অর্থের তারতম্যের কারণে ঘটেছে। এজন্য আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে নির্ভূলভাবে উল্লেখ করেছেন যে:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। অর্থাৎ তিঁনি একক শক্তিতে বিরাজিত।

আমরা পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ সমবেত হয়েছি, এই সমবেত প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ একক সত্ত্বা রূপে বিরাজিত। পার্থক্য আর বিভাজনকৃত ব্যবস্থায় আমরা ধর্মের দন্ড বা কোন্দোলের কারণে মূল ধারা থেকে সরে গেছি বা ডাইভার্ট হয়ে গেছি। প্রচলিত যে কালামপাকটুকু আমরা পেয়ে থাকি সেখান থেকে আহলে বায়াতের বা জাতের মূল ধারার পাঁচ শতেরও অধিক আয়াত খন্ডিত করা হয়েছে। তাহলে কি দিয়ে এই ধর্মের মূল ধারা মানুষের দোরগোঁড়ায় পোঁছায় ? একক এবং এক, এই দুইয়ের যে একটি পার্থক্য, এই পার্থক্যটুকু না বুঝলে ধর্মে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়ে যায়, মনোরাজ্যে বিভিন্নতার প্রশ্ন আসতে পারে।

তাই সুফি মতাদর্শের আহলে সুফ্‌ফা রসূলের (সাঃ) (আঃ) অনুশারীগণ এক কথায় তাসাউফধারী, যারা আত্ম চৈতন্য ধারার জাগরণের মোরাকাবা মোশাহেদার শিক্ষা টুকু পেয়েছে, তাঁদের মাধ্যম দিয়ে এই ধর্মের মূল নিশানাটা জাগরিত হয়ে আছে। তাঁরাই এই মূল ধারার অনুশীলন অনুকরণ ব্যবস্থাগুলো মানুষের দোরগোঁড়ায় সঠিক ইরাদা অনুযায়ী তুলে ধরবার চেষ্টা করে। তা না হলে এই ধর্মের চক্রান্তের শেষ নেই। এক আর

একক এর পার্থক্য যদি না বুঝি তাহলে গোঁজামিল হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র ভারসাম্য বিভাজনকৃত ব্যবস্থার দিকে চলে যায়।

তাই একক সত্ত্বার জাগরণ ঘটাতে হবে, স্রষ্টার রঙে নিজেকে রাঙাতে হবে। তাঁর প্রেমময়ীতার সঙ্গে নিজেকে প্রেমময় করতে হবে। খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহঃ) বলেছেন:- প্রেমহীন ইবাদকারী হাজার রাকাত নামাজ দ্বারা যে স্তরে পৌঁছাবে, আল্লাহ্‌র প্রেমিক সে স্থানে এক হুংকারেই পৌঁছে যাবে। কিতাবে বর্ণনা করেছেন:- লা ইউতা আলাল আশেকীন। অর্থ:- প্রেমিকের জন্য কোন ফতুয়াই নেই। তাহলে যিনি স্রষ্টার প্রেমিক হন তাঁর জন্য কোন ফতুয়া চলে না। আমার আধ্যাত্মিক বিধান বইটা যারা পড়েছেন তারা দেখে থাকবেন সেখানে রসূলের (সাঃ) (আঃ) একখানা হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে:- যে ব্যক্তি দুনিয়া তলব করে সে হিজরা, অর্থাৎ (পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়) যে ব্যক্তি জান্নাত তলব করে সে আওরত, যে ব্যক্তি খোদাকে তলব করে সেই প্রকৃত পুরুষ। তাহলে এই হাদিস খানার মধ্যে প্রথমেই বলা হলো:- যে কেবল দুনিয়া চাইল সে হিজরা, ছেলেও না মেয়েও না। আর যে জান্নাত চাইল সে আওরত। আওরাত এটা ফার্সি ভাষা, আওরত বলতে ফার্সিতে সুদর্শন মহিলাকে বোঝায়।

আমাদের এখানে যারা প্রবিন মুরুব্বিগণ রয়েছেন তাদের মুখে এই ভাষার বহিঃপ্রকাশ অনেক সময় ঘটে যায়। তৃতীয় ধাপে বর্ণনা করলেন, যে কেবল খোদাকে তলব করে সেই প্রকৃত পুরুষ। তাহলে এই হাদিস খানার তারতম্য অনুযায়ী আমরা যদি বলি যে আমরা আল্লাহ্‌র এত নেয়ামত বা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবার পরেও আমরা আল্লাহ্‌মুখী হই না, তাহলে এটা কী ? আল্লাহ্‌মুখী হবার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় যখন একজন মানব ত্বরান্বিত হতে থাকবে বা হাঁটতে থাকবে, তার এই ত্বরান্বিত গতিরও তো একটি সনদ আছে যে কতকাল এভাবে আমাকে হাঁটতে হবে ?

তার একটি সত্যায়িত সনদের বিশ্বাসের পঞ্চভূত বা আকিদার পরিপূর্ণতার একটি অবয়ব সেটাতো তার মধ্যে জারী হবে। না কি সারা জীবন শুধু আল্লাহ্‌কে চাই, আল্লাহ্‌কে চাই, আল্লাহ্‌কে চাই বললেই হবে ? তারও তো একটি পূর্ণতার অবগাহন আছে। যে পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত হলে সে পরিপূর্ণ ভাবে আত্ম তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে, আমি যে এতকাল যাবৎ ধরে এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মধ্যে ছিলাম, সেই অনুশীলনগামী ব্যবস্থা আজকে আমাকে পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত করেছে। এটাই আমার আত্ম তৃপ্তি বা এটাই আমার চাওয়া ছিল। এই যে আত্ম তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ বা পরিপূর্ণতার একটি মানদন্ড। এই

পরিপূর্ণতার মানদন্ড হলো একটি বিশেষ অবয়ব। এটা হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা।

তাহলে আমাদের কি চাইতে হবে ? একমাত্র আল্লাহ্‌কে চাইতে হবে। এ বিষয়ে সুফি তাপসী রাবেয়া বসরী বর্ণনা করেছেন যে:- "আল্লাহ্ আমি যদি তোমার জাহান্নামের ভয়ে এবাদত বন্দেগী করে থাকি তাহলে আমাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে দাও। আর আমি যদি তোমার জান্নাতের লোভে বন্দেগী করে থাকি তাহলে আমাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত কর। আর আমি যদি একমাত্র তোমাকেই চাই, তাহলে আমাকে তোমার দর্শন থেকে নিরাস করো না বা আমাকে তোমার দর্শন দিও। এর অর্থ কী ? আসলে সুফি মতাদর্শ থেকে যারা জন্ম চক্রের আবির্ভাবকৃত ব্যবস্থায় বা এক কথায় যারা আহলে বায়াতে দাখিল, সেই দাখিলকৃত ব্যবস্থার মূল নিশানা থাকে হলো স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা। এই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে হলে একত্ত্ববাদের যে ধারা, সেই ধারাতে নিজেকে নিয়োজিত বা দন্ডায়মান করতে হবে।

এই দন্ডায়মানকৃত ব্যবস্থার প্রাথমিক যে সোপান সেটাই চলে আসে এই গুরুবাদ বা আহলে বায়াত। কারণ আল্লাহ্‌কে দেখিনি, তাঁর সান্নিধ্য কিভাবে লাভ করব ? কালামপাকে বর্ণনা করেছেন তোমরা আমার রঙ্গে রঞ্জিত হও। তাহলে আল্লাহ্‌কে পেলে তো তাঁর রং দেখব, তাঁর রং-ই তো দেখিনি। তাঁর রঙ্গে কিভাবে রঞ্জিত হব ? এজন্য আল্লাহ্‌পাক সূরা ইয়াছিনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে:- তুমি তাঁকে অনুসরণ কর, যে তোমার কাছে মুজুরী চায় না এবং হেদায়েত পাইয়াছে। এই হেদায়েত নামের ব্যবস্থাটাই তাঁর রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ার পরিপূর্ণতা। এজন্য প্রত্যেকের ধারাবাহিক জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মন বিবেকের ক্ষমতা অনুযায়ী একটা মানবকে নির্বাচন করবেন, যিনি আপনাকে সেই চূড়ায় বা ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সেখানে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে বা সেই শিক্ষার ট্রেনিং গুলো আপনাকে দিতে পারে।

একত্ত্ববাদের মূল ধারাতে যেতে হলে আপনাকে এই প্রাথমিক ব্যবস্থায় সমর্পণ জ্ঞাপন করতে হবে, এটার অর্থই হলো আত্মসমর্পণ। তাসাউফ বা সুফি মতাদর্শে ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। তাহলে আল্লাহ্‌কে যে দেখিনি, এই না দেখা অবস্থায় বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। কেন ? আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে বিরাজিত, সকল ওলি, আউলিয়া, কেরামগণ এর প্রমাণ দিয়ে গেছেন যে আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। এজন্য তাঁকে দেখতে হলে একটা মানবের কাছে স্যারেন্ডার হতে হবে।

এজন্য ফকির লালন শাঁই বলেছেন:- মানুষ থুয়ে খোদা ভোজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়েছে, মানুষ ভোজ খোদা খোঁজ কোরআনের পাতায় পাতায় সাক্ষ্য আছে। তাহলেই মওলার দর্শন হবে। মানুষকে ভোজলেই সোনার মানুষ হবি। অর্থাৎ একজন মানুষ যে পরিপূর্ণতায় সফল হয়, সেটা এই ভাব ধারাতেই। এই ভাব ধারা শুধু লালন ফকির নয়, বিশেষ করে তাসাউফ ধারী সকল ওলি আওলিয়া মহা মানবগণ তাদের কিতাবে বলে গেছেন যে, একটা মানুষের কাছে তোমাকে আত্মসমর্পন করতে হবে, যদি আল্লাহ্কে পেতে চাও।

তাহলে এই একক, অখন্ড, অদ্বিতীয় স্বয়ংভূ সত্ত্বা। সেই সত্ত্বার মূল বিকাশিত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটা প্রাথমিক ভাবে রূপক আকারে এটা জারী হয় একজন কামেল মোর্শেদের কাছে। কেন ? কারণ আপনি যদি এখন বাজার থেকে একটি ঔষধের সিরাপ কিনে আনেন সেটাও একটি প্যাকেট বা মোড়কে ঢাকা থাকে। ঐ মোড়কের গায়ে সেই সিরাপের নামটা লেখা থাকে কিন্তু এই মোড়কের গায়ে লেখা নামটা কিন্তু আসল সিরাপ বা ঔষধ না। এটা হলো লেখা সিরাপ বা ঔষধ। আর আসল ঔষধ বা সিরাপ বের করতে হলে আপনাকে এই প্যাকেট বা মোড়ক খুলে আলাদা বা পৃথক করতে হবে। এই পৃথক করার কারণে ভিতরে একটি বোতল পাবেন, এই বোতলের ক্যাপ বা ছিঁপি খুললে আপনি সেই আসল সিরাপ বা ঔষধটা দেখতে পারবেন। সেখানেই এই আসল সিরাপ বা ঔষধের পরিমাণ, কালার, কার্যকারিতার গুনাগুণ সকল কিছু রয়েছে। সব কিছুই হলো এই ঔষধ বা সিরাপের পরিপূর্ণতা। তখন দেখবেন, নাড়াচাড়া করবেন এর কার্যকারিতায় আপনি জ্ঞাত হবেন।

ঠিক একই ভাবে মওলা বা মাবুদ সত্ত্বা আমার মধ্যে বিরাজিত। আল্লাহ্পাক বলছেন :- “নাহনু আকরাবু ইলাহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ”। অর্থ :- “আমরা তোমার শাহারগের নিকটে রয়েছি”। এই নিকটে যে আল্লাহ্, তাঁকে যে আমি দেখতে পারিনি, তাঁকে যে আমি বের করতে পারিনি। এই বের করতে না পারার মূল কারণ হলো আমি একা একা আমাকে পৃথক করতে শিখিনি। তাহলে এই একা একা বের করবার পৃথকীকরণ ব্যবস্থা আমার মধ্যে রাখিনি, এ কারণে একজন মোর্শেদ বা শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হতে হয়। স্মরণাপন্ন হলে তিঁনি কিভাবে একটি মানবাত্মার মধ্য থেকে মূল সত্ত্বাকে পৃথক বা বের করতে হয়, তাঁর জাগরণ ঘটাতে হয়, তাঁর রূপ বৈচিত্রের ধারায় বান্দা কিভাবে একত্রিত হতে পারবে, এই শিক্ষাগুলো তাঁরা দিয়ে থাকেন, এটাই তাঁদের শিক্ষা, এটাই সুফিবাদের মূল আদর্শ এবং এটাই আহলে বায়াতের মূল কারিকুলাম।

আল্লাহ্পাক সূরা মমিনের ৬০ নাম্বার আয়াতে বলছেন:- ওয়া কালা রব্বিকুম, উদউনি আস্তা জেবলাকুম। অর্থ:- তুমি একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তাহলে আমি আমি যে বুলি ধরেছি কিন্তু আসলে আমি যে আমি না। কেন ? আমি একা হলে আল্লাহ্কে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেতাম, কালাম তার সাক্ষ্য। আমি এত ডাকি আল্লাহ্ কী শুনে না ? আমার ডাকের কার্যকারিতা না পাবার কারণ কী ? এইটা কোন দিন জানলাম না বা বুঝতে চেষ্টা করলাম না। এই কার্যাবলির মূল কারণটা কি সেটা আমাকে জানতে হবে, এ বিষয়টা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

এজন্য অনেকেই বলে থাকেন দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজের ভূল ধরা, আর সহজ কাজ হলো অন্যের ভূল ধরা। আমার ভূল আমি ধরতে পারিনি, আমিতো ঠিকই আছি, এটাই গেয়ে বেড়ায়। তাই একজন কামেল মোর্শেদ বা পীর বা শিক্ষকের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। আত্মসমর্পন করলে আমাকে আমি কিভাবে বিভাজন করব, সেই বিভাজন প্রক্রিয়া হলো:- আমি কী ? আমি দেহধারী। আমার দেহের মধ্যে কি কি সন্নিবেশিত রয়েছে সেইটা সম্পর্কে আপনাদের একটু অবগত করি। সেটা হলো এই আমি হলাম নফ্স, নফ্সধারী এই দেহ। নফ্স জন্ম নেয় এবং সাধরণত এটা ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি হয় এবং প্রবৃদ্ধি হতে হতে বার্ধক্যে উপন্নিত হয়ে নফ্স মৃত্যুতে সমাসীন হয়। শুধু আমরা মানুষেরই নফ্স আছে তা নয়।

আল্লাহ্পাক সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নাম্বার আয়াতের প্রথমাংশে এক বাক্যে সবাইকে বলে দিয়েছেন :- “কুল্লু নাফ্সিন্ জায়িকাতুল্ মউত্। অর্থ:- প্রত্যেক নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ নফ্সধারী হলেই তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমার মধ্যে নফ্স আছে, আমার জন্ম হয়েছে এবং আমাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

আমার মধ্যে আর কী রয়েছে ? আমার মধ্যে মন্দ সত্ত্বা বা শয়তানি সত্ত্বা রয়েছে। কালামপাকে আল্লাহ্পাক শয়তানের চারটি রূপের বর্ণনা করেছেন, তারা আমার মধ্যে বিরাজিত। সেগুলো হলো:-

১) শয়তান।

২) ইবলিশ।

৩) মরদুদ ।

৪) খান্নাস।

তারা আমারই ভিতরে কিন্ত তাদেরকে আমি দেখি না। এই একত্ত্ববাদে একটি দেহকে জাগরণ ঘটাতে হলে, এই শয়তানি সত্ত্বা বা মন্দ সত্ত্বা:- শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ, খান্নাস এই চারটি সত্ত্বাকে দেহ হতে দূরীভূত করতে হবে বা মুক্ত করতে হবে। অথবা এই চারটি সত্ত্বার অবয়বের জাগরণ ঘটিয়ে কলেমা পড়িয়ে এদেরকে মুসলমান করতে হবে। এটাই হলো পূর্ণতার অবয়বের মুসলিম।

আমার মধ্যে আর কী আছে ? ঐ আয়াতে কারিমায় বর্ণনা করলাম:- নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ। অর্থ:- আমরা তোমার শাহারগেরও নিকটে আছি। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- ওয়াফি আনফুসি কুম ওয়ালা তাফসিরুন। অর্থ:- আমি তোমার নফ্সেও মিশে আছি তুমি তা দেখ না। দেখলে তো কাজ হয়েই গেল। আল্লাহ্পাক বলছেন ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিঁনি জবাব দেন। তাহলে এই তিনটি স্তরে সমাসীন এই দেহ, আর এজন্য এই দেহটা আশরাফুল মাখলুকাতে ভূষিত। তাই এই সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ। আল্লাহ্ সত্ত্বা এবং শয়তানি এই দুইটি সত্ত্বা একত্রে মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি।

মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সকল কিছু তৌহিদ রাজ্যে বসবাস করে। যেটা এই একত্ত্ববাদের সূরাতে এসেছে। একটি গাছ আপনি মনে চাইলে এখনি কেঁটে ফেলতে পারেন, কেঁটে ফেললে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। তৌহিদ রাজ্য এমন অর্থাৎ তার কোন প্রতিবাদ থাকে না। কোরআন বলছে:- গাছ, বৃক্ষ, তরুলতা তৌহিদ রাজ্যের সকল কিছু আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকে। কোন দিন গাছের কাছে এসে তো শুনতে পেলাম না। কি দিয়ে শুনব ? কারণ আমি শয়তান, মরদুদ, ইবলিশ, খান্নাস মন্দ সত্ত্বা দ্বারা পরিচালিত। যার কারণে কোন কথায় আমার কর্ণে প্রবেশ করে না বা আমি শুনতে পাই না। এগুলোকে যদি আমি বিতাড়িত করতে পারতাম বা এদের যদি আমি মুসলিম করতে পারতাম, তাহলে আমি মূল সত্ত্বায় মিশতে পারতাম, আর কালামের যা কিছু বর্ণনা রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত বা দৃষ্টিগোচর হত। এগুলো আমি নিজ কর্ণে শুনতে এবং নিজ দৃষ্টিতে দেখতে পেতাম। তাই আমার এই দুর্ভাগ্য, এই মানব জনম নিয়ে আমার আফসোস হয়। তাহলে অখন্ড অর্থাৎ এর কোন খন্ডন নেই, বিভাজনকৃত ব্যবস্থা নেই, সেই অখন্ড

ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে আসবার জন্য এই মন্দ সত্ত্বাকে এই নফ্সধারী আত্মা থেকে কিভাবে বিতাড়িত করতে হয়, এটাই হলো আহাদের মূল অনুপ্রাণিত ব্যবস্থা।

যদি কোন বান্দা তার ভিতর থেকে এই চারটি সত্ত্বা: শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ, খান্নাসকে যদি কেউ বিতাড়িত করতে পারে বা এদের যদি কলেমা পড়িয়ে মুসলিম করতে পারেন, তাহলেই সেই সত্ত্বাটাই আহাদ সত্ত্বা হয়ে যায়। এজন্য কোন এক সুফি গবেষক বলেছেন, আহাদ আল্লাহ্ হলো দূর্বল আল্লাহ্। কেন ? কারণ এটা হলো প্রাথমিক স্তর। যে কোন মানব সাধনার দ্বারা, তার ক্রিয়াকলাপ বা অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দ্বারা সে এই স্তরে উন্নিত হতে পারে।

ওলি, মাশায়েখগণের যে মতাদর্শ বা সুফিদের যে কারিকুলাম, সেটা এই আহাদ সত্ত্বারই জাগরণ ঘটানো। মূল সত্ত্বা সেখানেই সমাসীন, কিন্তু এটা রূপান্তরিত যে প্রতিটি মানবের মধ্যে আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত, এই সত্ত্বাকেই দেখে থাকেন ওলিরা। এটাই হলো আল্লাহ্ সত্ত্বার কারিকুলাম। এটারই এই ট্রেন্ডেন্সি, এটারই বাহাদুরি ওলিদের। কারণ এই জালুয়াতে একটি মানবের স্থীর থাকা খুব কঠিন হয়ে যায়। কারণ এটা একটি বিভাজনকৃত ব্যবস্থা কিন্তু মূল ধারাতে এটা প্রতিটি মানুষের মধ্যে সন্নিকটে দেওয়া রয়েছে। এত নিকটে দেওয়া রয়েছে তবুও সেখান থেকে আমরা মূল সত্ত্বার উৎগীরণের পথে হাঁটতে পারলাম না, এই আফসোস।

ধর্মের কি শিখবেন ? যে আল্লাহ্ বলছেন ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। এত কিছু চাই আল্লাহ্র কাছে, এত কালাম তেলোয়াত করি কিন্তু কোনটাই কার্যকারিতা পায় না। কেন ? আসলে গোঁড়া বা মূল তো কাঁটা রয়েছে, শিঁকড় যদি মোট কাটা থাকে, ঐ গাছে যতই পানি ঢালেন গাছ তো বাঁচবে না। কারণ কালাম নির্দেশ দিয়েছে একা ডাকো কিন্তু আমি যে ঐ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ডাকি। তাই আল্লাহ্ এই ডাকের জবাব দেন না। আবার এই কথাগুলো জাগতিক ভাবে বলাও হয় না। যদি জাগতিক ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বলা থাকতো, তাহলে মানুষ জন্ম লাভের পর থেকে এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে ত্বরান্বিত হত। যদিও এগুলো কেউ বলে থাকে তাদেরকে অবাঞ্চিত বলে গণ্য করা হয় এবং তাদেরকে কিভাবে বিতাড়িত করা যায় সেই সকল কাজে তারা লিপ্ত হয় এবং হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেই যুগের আবু জাহেলের মত। সত্য বললে যাদের মিথ্যার আশ্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য, তাদের আর ব্যবসা থাকে না। মন্দের দৃষ্টিতে ভালোও মন্দ হয়ে যায়। সত্য কথা হলো এমন। সত্য নিভু নিভু আলোতে

জ্বললেও এটা সবার কাছে পৌঁছে যায়। গ্রহণ করা বা না করা বান্দার ইচ্ছা।

তাহলে সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বললেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। তাহলে একক সত্ত্বা হলো প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ একক রূপে বিরাজিত রয়েছেন। অর্থাৎ আমার ভিতরে যে আল্লাহ্ রয়েছে সেটার যে রূপ বা সেটা যে রকম, আপনার মধ্যে রয়েছে সেটাও সেই একই রকম। তাহলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একই রকম সত্ত্বা বিরাজিত। এই একক সত্ত্বা হলো এমন। এই একক সত্ত্বা জাগরিত করতে হলে একজন পীর বা মোর্শেদ আমাদের ধরতে হবে এটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

এর পরের আয়াতে বলা হলো:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। এই মহা নিরপেক্ষ হলো দ্বিতীয় শক্তিশালী আল্লাহ্। এই নিরপেক্ষতা কি দিয়ে হয় ? নিরপেক্ষতার বলয় হলো:- একটি মানবের মধ্যে যখন শয়তানি সত্ত্বা দূরীভূত হয় বা শয়তান ইবলিশ মরদুদ খান্নাস এই চারটি সত্তা যখন দূরীভূত হয় তখন পূর্ণ আহাদ সত্ত্বা বিরাজিত হয়। তখন দ্বৈত সত্ত্বার জাগরণের মিলনে এই আহাদ সত্ত্বা সর্ব মানবের কল্যাণে কাজ করার জন্য সে গোটা দুনিয়াতে বা ধরাধামে সে বিচরণ করে। সেই কার্যাবলি সম্পর্কে সে পরিজ্ঞাত হয়। সাধক তখন বুঝতে পারে তখনই তাঁর মধ্যে এই দ্বিতীয় অবয়ব বা সামাদ সত্ত্বা জারী হয়। এটা কার মধ্যে ? এটা মানুষের মধ্যে হয়, তাই মানুষের বিকশিত রূপ হলো এই আহাদ সত্ত্বায় উন্নিত রূপ বা পরবর্তী স্তর বিন্যাস, সেই বিন্যাসটাই হলো সামাদ। তাই সামাদ হলো মহা নিরপেক্ষ।

কারণ আহাদ সত্ত্বায় একজন বান্দা যখন পরিপূর্ণতা পায়, এই পরিপূর্ণতা পেলেই তো তাঁর পরিতৃপ্তি হয়। তাহলে তাঁর সাথে আল্লাহ্‌র মোলাকাতের একটি ব্যবস্থা রয়েছে বা তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র কথোপ-কথনের ব্যবস্থা রয়েছে। সকল কার্যক্রম তাঁর কার্যাবলির সঙ্গে যে একটি নিরপেক্ষতার অবয়ব, সেটা এই কার্যকারিতার রূপে দাঁড় করবার জন্য আরও অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে পরিগণিত হতে হয়। সেই পরিগণিত হতে হতে একটি নিরপেক্ষতার বলয়ে এসে দাঁড় করায়।

এজন্য আমার মোর্শেদ কেবলা-কাবা উঁনি বলেছেন, সুফি মতাদর্শে রাজনীতি হারাম। যদিও কেউ করে থাকে সেটা তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক কার্যাবলী। কিন্তু আসলে সুফির যে মানদন্ড বা সুফির যে কারিকুলাম সেই কারিকুলাম যদি কেউ এ্যানালাইসিস করে বা তার

হৃদয়ে সেই সংবিধানকে লালন করে, তাহলে সে রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারবে না। কেন ? তার একমাত্র লক্ষ্যটাই তো সে স্থীর করে ফেলেছে। তাহলে তার দ্বিতীয় বা অন্য কোন লক্ষ্যের দিকে সে কিভাবে যায় ? এজন্য সেই নিরপেক্ষতার অবয়বে বলা রয়েছে:- আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ। সেই মহা নিরপেক্ষতার অবয়বে একটি বান্দা তার কারিকুলাম এবং কার্যাবলী দ্বারা সেই স্তরে পৌছালে, সেই বান্দাটাও সামাদ বা মহা নিরপেক্ষ হয়ে যায়। এখন আমরা অনেকেই আল্লাহ্র নামের সাথে নাম সংযুক্ত করে রেখে থাকি। যেমন:- আহাদ, সামাদ, রাজ্জাক, কুদ্দুস, রহিম, রহ্মান ইত্যাদি। আমাদের সমাজে অনেকেরই নাম সামাদ রেখেছেন। এই সামাদকে যদি আপনি গালি দেন তখন কিন্তু এইটা আল্লাহ্পাকের সেই সামাদে লেগে যায়। শুধু ভাল নাম রাখলেই হবে না, আপনার সন্তানকে সেই ভাল নামের কার্যকারিতা বা তার নামের সুফলকে ফলানোর জন্য তাগিদ করতে হবে। আল্লাহ্র নামের সঙ্গে তাঁর যে গুণাবলি, সেই গুণাবলিতে বিকাশিত হবার যে রাস্তা, সেই রাস্তাতে তাকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। তবেই সেই নামের স্বার্থকতা থাকে এবং আল্লাহ্ খুশি হন, যে আমার বান্দা আমার নামকে নিয়ে সেই নামের পরিপূর্ণতার অবগহনে সিক্ত হতে পেরেছে। শুধু নাম রেখে দিলে সেটা ঐ ঔষধের বা সিরাপের প্যাকেট বা মোড়কের মত হয়ে যাবে। এটা তখন শুধু রাখা নামই হয়ে থাকবে, আপনারা নিশ্চই বুঝতে পারছেন।

তাহলে আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। এখন এই নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ কোন দোষের মধ্যে নেই। আমাদের যদি কোন বিপদ বঞ্চনা আসে তাহলে আমাদের ধৈর্যের ত্রুটি ঘটে যায়। অর্থাৎ ধৈর্য হারা হয়ে যাই। আল্লাহ্কে দোষারোপ করে ফেলি অর্থাৎ অনেকেই এভাবে বলে থাকেন যে:- আল্লাহ্ আমাদেরকে একটি সন্তান দান করেছিল তার সময় হয়েছে সে নিয়ে গেছে, তাহলে দোষটা কার ? দোষটা আল্লাহ্র হয়ে গেল না ? কিন্তু আল্লাহ্তো কোন দোষের ভাগই নেয় না। আল্লাহ্ বলছেন যে, আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। তাহলে নিরপেক্ষ যদি হয় এই দোষটা কার ? একটি শিশু যদি মারা যায় তাহলে শিশুতো নিষ্পাপ, যার কোন পাপই হয় নাই। তাহলে সে মারা গেল এর কারণ কি ? তাহলে এই কথা গুলো যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে পুণর্জন্মবাদ একটা ব্যবস্থা জারী হয়ে যায়। এই পুণর্জন্মবাদ হলো জাগতিক শরিয়তের বিধানে এখানে এটাকে স্থান দেওয়া হয় নি, এটাই সমস্যা। তাহলে এই আল্লাহুস সামাদ বা আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ সম্পর্কে যদি

আমরা আরেকটু বুঝতে চাই। সেটা হলো:- সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যে আল্লাহ্‌র অবস্থান সম্পর্কে তিনটি স্তর বিন্যাস বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অবস্থান হলো আহাদ আল্লাহ্। এই আহাদ আল্লাহ্ হলো দূর্বল আল্লাহ্। দ্বিতীয় স্তর হলো এই সামাদ আল্লাহ্, অর্থাৎ নিরপেক্ষ আল্লাহ্, এই নিরপেক্ষ আল্লাহ্ হলো আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় স্তর। আরেকটি স্তর রয়েছে সেটা যদিও এই সূরায় আসে নি, সেটা হলো লা স্তর। অর্থাৎ একটি বান্দা আল্লাহ্‌র সঙ্গে পূর্ণ মিলনের যে বিন্যাসকৃত ব্যবস্থা, সেই বিন্যাসকৃত ব্যবস্থায় লা শরীকআলার রূপ হলো এই লা। এই লা হলো আল্লাহ্‌র শক্তিশালী স্তর, সে স্তরে কলেমা সৃজিত হয়েছে। এটাই হলো আধ্যাত্মবাদের ধারা।

তাহলে আল্লাহ্‌র তিনটি স্তর। প্রাথমিক স্তরে ওলিরা যে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করে থাকে, সেটা হলো আহাদ রূপে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ হয়। দ্বিতীয় স্তর হলো নিরপেক্ষ আল্লাহ্। এই নিরপেক্ষ আল্লাহ্ হলো শক্তিশালী আল্লাহ্। অর্থাৎ এই নিরপেক্ষ শক্তিশালী আল্লাহ্ হলো যিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না। অর্থাৎ আহাদ আল্লাহ্ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সে যদি আরও গভীরে অগ্রসর হয়, তাহলে তাঁর শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় আল্লাহ্‌র স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়। এই সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে আল্লাহ্‌র এই স্থানান্তরিত ব্যবস্থাটাও রূপান্তর হয়ে যায়। তাহলে এই রূপান্তর হতে হলে সাধককে তখন বার বার নিরপেক্ষতার বলয়কে প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ এটা এত সহজ ভাবে হয় না। মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে সৃজনকৃত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় গেলেই যে এটা হয়ে যাবে তা নয়।

প্রাথমিক দর্শনে গিয়ে তাকে যে গতিতে বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষায় উপনিত হতে হয়, যে পরীক্ষার মধ্যে বান্দার পক্ষপাতিত্ত্বের কোন অবকাশ নেই বা লেস নেই। সেটাকেই বার বার প্রমাণ করতে বা মেলে ধরতে বান্দার প্রচেস্টা করতে হয়, আর সেটা যদি আল্লাহ্‌র কাছে গৃহিত হয় তখন সেটা কার্যকারিতা পায়। এই প্রকৃতির যত ওলি আওলিয়া রয়েছে বেশির ভাগ জগতের মধ্যে মাজ্‌যুব হালে তাঁরা থাকেন অর্থাৎ পাগলের হালে থাকেন। এই পাগলের হালে সামাদ রূপে তাঁরা থাকেন। আমরা হয়ত আমাদের সামাজিক বা জাগতিক দৃষ্টিতে এটা বুঝিনা বা এটার দর্শন পাই না। কিন্তু আসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র কর্মের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কারণ পাগল আর উন্মাৎ যদি সে না হয় তাহলে তার কোন না কোন পক্ষ থেকেই যায়। একটি ছোট বাচ্চার প্রতি যদি তাঁর ভালবাসা থাকে তাহলে সেই বাচ্চার পক্ষের দিকে সে চলে যেতে পারে। তাহলে

এটা একটি আমল বা আকিদা, যার উপর নিজেকে স্থীর রাখা বা কার্যকারিতা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যায়। এজন্য সাধকগন নিজের স্ব-ইচ্ছায় মাজ্যুব হালটাকে বেছে নেয়, যে আমি এই স্তরকে অন্তত দুনিয়ার জমিনের যে কয় দিন আমার হায়াতের জিন্দিগি থাকে, সেই সময়টা এই কার্যের মধ্যে চূড়ান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি। সেটাই তাঁর সাধনার মূল কার্য।

এজন্য আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ। তাহলে এই আহাদ আল্লাহ্ থেকে রূপান্তর হয়ে দ্বিতীয় স্তরে আসে সামাদ। তাহলে এই সামাদ আসলে নিরপেক্ষতা। এজন্য প্রতিটি মানুষের আকিদাতে শুরুতেই বলা হলো তুমি নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। তাহলে শুধু এই আকিদাটুকু থাকলে হবে না এটার কার্যকারিতা বা যথার্থতার রূপ ফলপ্রসূ করতে হবে। এটা হলো সুফি দর্শনের উদ্ভাসনকৃত একটি ব্যবস্থা। সেই উদ্ভাসনকৃত ব্যবস্থা যদি তরান্বিত বা কার্যকারিতা পায়, তাহলেই এটা ফলপ্রসূ হবে। নিরপেক্ষতার অর্থ হলো: মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, বিবি বা রক্তের বন্ধন বলতে যা কিছু বোঝা যায় সকল কিছুকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেন ? কারণ আপনার একমাত্র লক্ষ্য তো আপনি মনোরাজ্যে স্থীর করেছেন। এই স্থীর করলে এর প্র্যাকটিক্যাল ব্যবস্থাটা এখানে এসে দাঁড়ায়। কারণ এটা যদি প্র্যাকটিক্যাল কার্যাবলিতে আপনি প্রমাণিত না হন, যার কারণে আল্লাহ্পাক আগেই ব্যবস্থা পত্র দেন নি যে, অমুক জায়গায় গেলে আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে।

যদি মক্কাতে গেলে আল্লাহ্কে পাওয়া যেত তাহলে মানুষের যা কিছু আছে সব ফেলে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ ওখানে গিয়ে সমাসীন থাকত। কিন্তু ওখানেও আল্লাহ্ নেই, ওটা একটি রূপক ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনে প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি দিক রয়েছে, একটি রূপক অপরটি আসল। কারণ রূপক না থাকলে আসলের অস্তিত্ত্ব থাকে না। এজন্য রূপক দিয়ে আসলকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু আসল-আসলকেই খুঁজে বের করবে এটাই মানুষের স্পৃহা। এজন্য আমাদেরকে মানুষ রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুইটি মাখলুককে আল্লাহ্ এই স্বাধীন সত্ত্বা দান করেছেন, এক হলো মানুষ অপরটি জ্বীন। তারা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্কে মানতেও পারে আবার না ও মানতে পারে। এদেরকেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আর কারো কিন্তু স্বাধীনতা নেই। এই কারণে আবার শাস্তির ব্যবস্থাটাও রাখা রয়েছে। যদি শাস্তির ব্যবস্থা আর স্বাধীনতাটুকু না থাকত, তাহলে আমরা

কেউ উল্টা পাল্টা হতাম না। কারণ আল্লাহ্পাক কালামপাকে বলছেন, তোমাকে পরীক্ষা স্বরূপ দুয়িাতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাহলে আমি আপনি সবাই পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে এসেছি। কি পরীক্ষা ? তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তাঁর কালাম পাকে বা সংবিধানে বলে দিয়েছেন। তাহলে সেই সংবিধানের আলোকে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় পরিচালনা করলাম, না কি এই মোহ গ্রস্থতার দিকে নিজেকে নিয়োজিত করলাম ?

যে যেটা করবে সে সেটার ফল পাবে। কোরআনুল মাজিদে সূরা নজমের ৩৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- এবং মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, অপর সূরা আশ-শুরার ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- তোমাদের উপর যে সব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মেরই ফল এবং তিঁনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এজন্য আল্লাহ্পাক বলছেন তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। কেন ? কারণ বান্দা বা আমি যা করব সেই অনুযায়ী আমার ব্যবস্থা। আমি যদি মন্দ করি এবং আপনাদের কাছে ভাল সাজি বা ভাল কথা বলি তাহলে এর শাস্তি আমাকেই নিতে হবে। এক জার্‌রা পরিমাণ আল্লাহ্পাক পারসিয়ালটি করবেন না। অর্থাৎ আমার কর্মফল আমাকেই দেওয়া হবে বা আমাকে ভোগ করতে হবে। আমি যা প্রাপ্ত হব তাই আমাকে দেওয়া হবে। তাই প্রত্যেক মানুষ এবং জ্বীনের জন্য স্বাধীন সত্ত্বা রাখা হয়েছে। এই জাগতিক ব্যবস্থা দিয়ে এটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আধ্যাত্মিকতার বলয় পুস্তকে মুক্ত ভাবে যদিও প্রকাশ করা যায় না তার পরেও একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা রেখেছি। যেহেতু আমরা সুফি মতাদর্শের উপর পরিচালিত। তাই মূল ধারার কথাগুলো একটু বলার চেষ্টা করলাম, বলা রয়েছে জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট। জ্ঞানীগণ এভাবে বলছেন এবং রসূল (সাঃ) (আঃ) বলছেন, তোমরা জ্ঞানের পরিমাপ বুঝে কথা বল। অর্থাৎ সকল জায়গায় সব কথা বলার আইন নেই।

বোখারী শরীফে আবু হোরায়রার বর্ণনা এসেছে যে, আমি রসূল (সাঃ) (আঃ) এর কাছ থেকে দুই প্রকারের জ্ঞান সংগ্রহ করেছি। একটা প্রকাশ করে গেলাম, আরেকটা প্রকাশ করলে আমার খাদ্যনালী কর্তন করা হত। তাহলে সে শিক্ষাটাও তো আছে, যা প্রকাশিত হলে খাদ্যনালী কর্তন করা হয়। সে শিক্ষাটাও কোনও না কোন মাধ্যম অনুযায়ী দেওয়া হয় বা সেই স্তরে পৌঁছলে সে জানতে পারে বা বুঝতে পারে।

তাহলে আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ। তিঁনি কারো সাথে পারসিয়ালটি করেন না, সেই

প্রক্রিয়াটাই এই একত্ববাদের মধ্যে বলা রয়েছে সেটা হলো:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ আল্লাহ্ কারো প্রতি ইনজাস্ট্রিস করবেন না। এই আয়াতে কালামের মূল ধারা যদি আলোচনা করা হয় তাহলে জন্মান্তরবাদ এসে যায়। যদিও এটা জাগতিক ভাবে শরিয়তে রাখা নেই, যার কারণে বিতর্কিত একটি অধ্যায়। কারণ মহা নিরপেক্ষতার কর্ম অনুযায়ী যদি ফল হয় তাহলে পুনর্জন্মবাদ বা রূপান্তরবাদে হয়ে যাচ্ছে। স্রষ্টা থেকে আমাদের আবির্ভাব এবং স্রষ্টাতেই লীন বা পৌঁছানো। তাহলে যা করব সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র। এটা অবারিত ভাবে চলমান তা না হলে বেশি বা কম হয় কী করে ? কনোস্টেন্ট বা স্থীর থাকত। যে রকম সূর্য এক, চন্দ্র এক কিন্তু মানুষ এ রকম কনোস্টেন্ট নেই, প্রবৃদ্ধি আছে। তাহলে এটা হলো সূক্ষ্ম জগতের বস্তু, এটা বিতর্কিত হয়, জাগতিক ভাবে যার কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো বা সংবিধান অনুযায়ী দলিল প্রণিত হয় না। কিন্তু ভাববাদী ব্যবস্থায় যারা এটাকে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে জ্ঞাত হয়েছে, তাঁরা এ বিষয়ে ফায়সালাটা দিতে পারেন।

এজন্য অনেক ওলি মাশায়েখগণের কিতাবে জন্মান্তরবাদের বিষয়গুলো সুন্দর ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁরাও আয়াতের ভাববাদী ব্যবস্থা অনুযায়ী এ বিষয়ে দলিলগুলো রেখেছেন কিন্তু মানা আর না মানা জাগতিক একটি বিষয় তো থাকেই। যার জন্য সবারই একটি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সেই কারণে আমরা বিতর্কিত ব্যবস্থার আলোচনা না করাই শ্রেয় মনে করি। যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে তার সঙ্গে সেটা পারসোনাল ভাবে আলাপ করাই সমীচীন বলে মনে করি।

তাহলে এই যে নিরপেক্ষতা, এই নিরপেক্ষতাই হলো একক সত্ত্বাকে উপলব্ধি করবার দ্বিতীয় স্তর। তাহলে এই মানুষের ধর্মের যিনি সৃষ্টিকর্তা বা বিধানদাতা, পালনকর্তা, আল্লাহ্ বা মাবুদ যাই বলি না কেন, উঁনি যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে উঁনার সেই আদর্শ গরিমা নিজের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করবার অনুশালীন গামী ব্যবস্থাটাই তো আমরা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় পেঁয়ে থাকি। তাহলে পীর বা মোর্শেদ কি শিক্ষা দেয় ? নির্জনে নিরব নিস্তব্ধভাবে যে সকল মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো করা হয়, সেই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে একটি মানুষের মধ্যে যে অবাঞ্চিত মুর্তি বা মন্দ সত্ত্বা বিরাজিত রয়েছে, সেই সকল মুর্তিকে বা মন্দ সত্ত্বাকে ধ্বংস করে আপন সত্ত্বাকে জাগ্রত করতে হয়। আপন সত্ত্বাকে জাগ্রত করবার যে ব্যবস্থা, সেই পথ অবলম্বন করবার যে সূচনা বা সিঁড়ীর সেটা একটি নিরপেক্ষতার বলয়। আর এ সকল শিক্ষাগুলো পীর বা মোর্শেদ অর্থাৎ আহলে

বায়াতের বংশ বা নূরের বংশধরেরা দিয়ে থাকেন। যদি কারো পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করা হয়, অবশ্য মোর্শেদ বা পীর ব্যতীত, কারণ হলো তিঁনিই তো আমার ধারাবাহিক একটি প্রণালিতে আমাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাহলে নিরপেক্ষতার যে অবয়ব সেটাই হলো এই মোরাকাবা মোশাহেদার চূড়ান্ত অবয়ব। যদি আমার এটা, আমার ওটা, আমার সেটা, আমি এটা, আমার অমুক এমন ভাবখানা এসে যায়, তাহলে পরিপূর্ণতার বিকাশে কেউ পৌঁছাতে পারে না। এজন্য মোরাকাবা মোশাহেদা হলো একক কর্তৃত্ব যেটা আমি অবশ্য অনেক সময় বলে থাকি যে সাধন আর ভজন দুইটা দুই জিনিস। কারণ মোর্শেদ প্রদত্ত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার দিকে নিজেকে যদি নিয়োজিত করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে সন্নিবেশিত করার পর, আপন-আপন উদ্ভাসিত যে রূপ, সেই রূপটাতো মোর্শেদ প্রদত্ত রূপ থেকেই এই রূপের বিভাজন হয়। এই রূপটা তো গুরু বা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায়। এজন্য তরিকাতে মোজাদ্দেদে আল-ফেসানী সিরহিন্দ (আঃ) এর মকতুবাত শরীফে বলছেন যে:- পীরে তাস্ত আওয়াল মাবুদ তাস্ত। অর্থ:- তোমার পীরই তোমার প্রথম মাবুদ। এখানে শেষ বা চূড়ান্ত মাবুদ বলেন নি। এইটা হলো কল্পনার মাবুদ। তাহলে এই কিতাবে উঁনি বলছেন পীরই হলো তোমার প্রথম মাবুদ। অর্থাৎ এই মাবুদকে আমি কল্পনা করি এটা প্রকাশিত হলে শিরক হয়ে যায়, এটার প্রকাশিত হলে বেদাত হয়ে যায়। এজন্য এটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটি উপমা দেওয়া হয়েছে। কেন ? কারণ এই মাবুদকে দিয়ে আসল মাবুদের সন্ধান লাভ করতে হবে।

তাহলে এই মাবুদকে আমি কল্পনার রাজ্যে বা মনোরাজ্যে স্থান দিয়েছি। তাহলে এই মাবুদের স্থানান্তরিত ব্যবস্থাকে রূপান্তর করে এই আয়াতে কারিমার তাৎপর্য নিজের মধ্যে উদ্ভাসন না হওয়া পর্যন্ত এই সাধনা চলমান অর্থাৎ এই সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। যদি এটার পরিস্ফুটন ঘটে তাহলে এই সাধনায় সফল হয়েছে। তখনই বোঝা যায় যে:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। কারো সাথে তিঁনি পারসিয়ালটি করেন না। এটাই এই নিরপেক্ষতার বলয় বা আল্লাহুস সামাদ। আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ তাঁর অনুসন্ধান করি বা তাঁকে ডেকে লাভ করবার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছি। আমার ডাকটা যত দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে তত টুকু পরিমাণ আমাকে ফল দেওয়া হবে। কালামপাকে বিভিন্ন আয়াতে এভাবে অনুধাবন করা রয়েছে।

আমাদের পরকালীন যে জিন্দিগি রয়েছে অর্থাৎ আমরা সবাই যে মৃত্যু বরণ করব। জন্ম যেহেতু নিয়েছি মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু পরবর্তী ব্যবস্থাকে পরকাল

বলা হয়। তাহলে পরকালীন জিন্দিগিতে আল্লাহ্ এক জার্‌রা পরিমাণ ইনজাসট্রিস করবেন না। অর্থাৎ পারসিয়ালটি করবেন না বা কারো পক্ষপাতিত্ত্ব অবল্বন করবেন না। সুষ্পষ্ট ভাবে এটা বলে দেওয়া রয়েছে। যদি পক্ষপাতিত্ত্ব অবলম্বন না করে তাহলে কর্ম গুনে যে বিচার ব্যবস্থা রয়েছে, আমি আপনি যে কর্ম করব তার ফল আমাকে আর আপনাকেই বহন করতে হবে। কেউ কারো টা নিবে না। তাই মহা নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত এই আয়াতে কারিমায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে:- আল্লাহুস সামাদ অর্থ তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ নিরপেক্ষতার চাইতেও যদি বেশি কোন ব্যবস্থা থাকে সেই ব্যবস্থাকে বলা হয় মহা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তিঁনি কারো পক্ষ নেন না। যে যেভাবে তাঁকে তাঁলাশ করে, যে যেভাবে তাঁকে ডাকে, যার ডাক তাঁর পর্যন্ত পোঁছে যায়, তাঁর ডাকে অবশ্যই তিঁনি সাড়া দেন। আমি আপনি হয়ত ডাকটা ঐ ভাবে দিতে পারিনি। তাঁর কর্ণ গোচর পর্যন্ত হয় না, যার জন্য আমার আপনার ডাক শুনে না। আর শুনবেই বা কিভাবে ? এর মূল কারণ হলো যে সংবিধান বা যে নিয়ম নীতির উপর আমাদেরকে থাকতে বলা হয়েছে সেই সংবিধান বা নীতিতে আমরা নেই, বা সেই সংবিধানে আমরা ধাবিত হই না। যার জন্য উঁনি ডাকের জবাব দেন না।

সূরা মুমিনের ৬০ নাম্বার আয়াতে প্রথম অংশেই উঁনি বলেছেন:- ওয়া কালা রব্বিকুম উদউনি আস্তা জেবলাকুম। অর্থ:- তুমি একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তাহলে জবাব যদি পেতে হয় তাহলে একা একা ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এই একা ডাকার যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার মূল ধারা হলো এই একা হয়ে মহা নিরপেক্ষতার উদ্ভাসন করতে হবে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক যে ব্যবস্থায়ন সেই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যারা পীর বা মোর্শেদ প্রদত্ত যে ব্যবস্থায় মোরাকাবা মোশাহেদায় লীন বা ধাবিত হয়েছেন, সেই মোরাকাবা মোশাহেদার কার্যের মাধ্যম দিয়ে মহা নিরপেক্ষতার অবয়বকে জারী করতে হবে বা তুলে ধরতে হবে। যদি তা পরিষ্ফুটন হয় বা কার্যকারিতা পায়, তবেই সেই কার্য সফল হবে এবং তাঁর উদ্ভাসন প্রক্রিয়া হবে।

এটা যদিও আধ্যাত্মিক। জাগতিক ভাবেও আমরা এই বিশ্বাস বা আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, উঁনি একজন মহা নিরপেক্ষ। কারো প্রতি তিঁনি ইনজাট্রিস বা পারসিয়ালটি করবেন না। তাহলে সেই মহা নিরপেক্ষতার বলয়কে আঁকড়ে ধরে ফলপ্রসু করতে হবে। এটাই এই আয়াতে কারিমায় উঁনি সুষ্পষ্টভাবে সকল কথার জঞ্জালকে অপসারণ করে বা জলাঞ্জলি দিয়ে এক কথায় সমর্পণ করেছেন। গোটা জাহানের মানব মন্ডলীর জন্য এই

আয়াত দ্বারা সমাধান করে দিলেন যে, তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। তাই তিঁনি কারো পক্ষপাতিত্ত্ব করবেন না। তৃতীয় আয়াতে বলা হলো:- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থ:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তাহলে জন্ম কে দেয় ? জাগতিক ভাবে এটা আমরা সবাই বুঝি যে, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

তিঁনি যদি জন্ম না দেন তাহলে আল্লাহ্‌পাক সবকিছু করেন এই কথার ভিত্তিটা কোথায় ? অবশ্য কোরআনুল মাজিদের সূরা আল-ইমরানের অপর আয়াতে বলা রয়েছে যে, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কারো-ই জন্ম হয় না। এ কথাটাও বলা রয়েছে। তাহলে এখানে তিঁনি বললেন:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। এটা হলো তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা মানে একক সত্ত্বাকে পরিস্ফুটন করে মেলে ধরবার জন্যই এই আয়াতে কারিমা। তাই আল্লাহ্‌পাক সুস্পষ্ট বলে দিলেন যে, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তাহলে জন্মটা কোথা থেকে হলো ? আমি আপনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাহলে এটা একটি রহস্যময় ব্যবস্থা। তিঁনি তো মহা বিশ্বের মহান স্রষ্টা। তাহলে তাসাউফধারী বা সুফিজম কী বলে ? জন্মই যদি না দেন তাহলে তিঁনি কোথা থেকে আসলো ? সুফির আসনে যেটা ভাবতত্ত্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বা এটা নিয়ে তাদের গবেষণা কালচার কার্যকারিতায় দাঁড়াতে তারা ওয়াকিবহাল থাকে। সেই আলোচনাগুলো মানুষের দোরগোঁড়ায় তুলে ধরার প্রচেস্টা করা হয়।

আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। কিছু বলা বিষয় বলা যায় না কিন্তু আসলে ধারণাটুকু আমরা আপেক্ষিক ভাবে এদিক ওদিক করে বুঝানোর জন্য চেস্টা করি। কারণ স্রষ্টার সান্নিধ্যের মূল ধারার কথা গুলো যদি প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে জগতে সে বিতাড়িত হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সে সৌন্দর্যময় ব্যবস্থাটুকু আর থাকবেনা। এজন্য গুপ্ত ব্যবস্থা যখন প্রকাশিত হয়ে যায় তখন ফাসেকী রূপ হয়ে যায়। এজন্য অনেকেই হয়ত তার বুদ্ধি বা বিদ্যার জ্ঞান দ্বারা এটাকে আগলে জানবার বা বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা তা নয়। এই আটকানো ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ়করণ করতে হবে। তাহলে তিঁনি কেমন সত্ত্বা যে:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। আহাদ সত্ত্বা যখন সামাদ সত্ত্বাতে রূপান্তর হতে হতে সমাসীন হয়ে যায়। তখনই তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে বিচরণ করে। অর্থাৎ পূর্ণতার একটি অবয়ব একক রূপে পরিগণিত হয়। এই পরিগণিত অবয়ব বা

অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বা যখন কোন মানবের মধ্যে জাগ্রত হয় তখনই তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে অবস্থান করেন।

তাহলে উৎপত্তিটা কোথা থেকে আসলো ? এটা হলো সৃষ্টির চরম রাজ্যে। এই গবেষণায় যেতে শরিয়তে নিষেধ করা রয়েছে। কারণ আপনি যদি এই গবেষণাতে যান তাহলে আপনার ব্রেনের কন্ট্রোলে না থাকলে আপনি মেন্টাল ডিজিজ হয়ে যেতে পারেন। আপনি আর এটা সহ্য করতে পারবেন না। আর এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য ওলিদের স্মরণাপন্ন হবার জন্য বা অছিলা অন্বেষণ করবার জন্য বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ্ নির্দেষ করেছেন। তাহলে এর মূল উত্তরটা কি ? আসলে এর মূল উত্তরটা হলো তিঁনিই সব। তিঁনিই প্রকাশিত, তিঁনিই বাতেনি। তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি, তাঁর দ্বারাই স্রষ্টা। অর্থাৎ সকল কিছুতেই একাকার। এক ভিন্ন দুই নাই। এজন্য একত্ত্ববাদে সব লীন রয়েছে। দুইটি সত্ত্বাকে উঁনি এই সীমিত স্বাধীন সত্ত্বা দান করবার কারণে দুনিয়ায় এই বিষয়গুলো কালচার এবং আলোচনা হয়।

যদি আমরা সকল মানুষকে নিয়ে বিচার করি বা সকল সৃষ্টিকে নিয়ে যদি বিচারিক জ্ঞান দ্বারা এই আয়াতে কারিমা মেলানোর চেষ্টা করি, তাহলে কিছুটা হিমশিম খেতে হয় অর্থাৎ একটু ভিন্নতার মত এসে যেতে পারে। কিন্তু এখানে কোন ভিন্নতা নেই। কেন ? কারণ আল্লাহ্পাক এই সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াতেই বলছেন যে:-আল্লাহু আহাদ। অর্থ আল্লাহ্ একক। যে একক সত্ত্বাটা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিরাজিত। আর এই একক সত্ত্বায় লীন হবার জন্য আমাদের তাগিদ করা রয়েছে। যদি সেই তাগিদে কেউ উপনীত হয়, তাহলে তিনি আল্লাহ্র এই চূড়ান্ত রূপের অবয়বে বা জাগরিত হবার চূড়ান্ত প্রক্রিয়াতে সফল হলে তিঁনি কাউকে জন্ম দেন না। এটা কালামপাক সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেহেতু আমরা এই ধর্মের অনুসারী। আমাদের সংবিধান যা বলে সেই বিধান অনুযায়ী (মহা পুরুষদের পথে) পরিচালিত হতে হবে।

আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে, আঠার হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি রয়েছে। তার মধ্যে সতের হাজার নয়শত আটানব্বই মাখলুক হলো আল্লাহ্র তাবেঈ অর্থাৎ তারা তৌহিদ রাজ্যে বসবাস করে। মানুষ আর জ্বীন এই দুইটি মাখলুককে আল্লাহ্ স্বাধীন সত্ত্বা দিয়ে দুনিয়াতে বা সৃষ্টি রাজ্যে প্রেরণ করেছেন। এই সৃষ্টিরাজ্যে এই দুইটি সত্ত্বা প্রেরিত হবার কারণে এই সকল বিষয় গুলো কালচার হয়। আর অন্যান্য সকল সৃষ্টি তৌহিদ রাজ্যে অর্থাৎ একত্ত্ববাদ সূরা ইখলাসের আকিদাতেই তারা প্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণ:- যেমন এই সৃষ্টিরাজ্যে বৃক্ষ, তরুলতা, জীবজন্তু সকল কিছু আল্লাহ্‌র সেজদায় রত। তাহলে একটি বৃক্ষ বা গাছ কিভাবে সেজদা দেয় এটা আমরা কখনও কি চোখে দেখি ? কিন্তু কোরআন এ কথা বলছে। তাহলে এর সত্যটা কি ? কোরআনকে আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে গাছ সেজদা দেয়। অপর আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- গাছ বা যা কিছু তৌহিদ রাজ্যে আছে, তারা সবাই আল্লাহ্ জিকিরে রত। তাহলে গাছ কিভাবে জিকির করে ? তাহলে এটা আমরা শুনিনা, তাহলে কিভাবে শুনতে পাবো ? সকল কিছু যে আল্লাহ্‌র তৌহিদ রাজ্যে বাস করে এটা বুঝতে হলে নিজেকে এই ইখলাস বা একত্ত্ববাদে সমাসীন করতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্ত্বায় সমাসীন হয়েছে তিঁনি এই স্রষ্টার যত সৃষ্টি রয়েছে তাদের আকিদা বা তাদের কথা বার্তা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়।

এজন্য আল্লাহ্‌র হাবীব উটের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে এ হাদিস সম্পর্কে আমরা জেনেছি। তাহলে উঁনি এই সৃষ্টিরাজ্যে এই ইখলাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এজন্যই উঁনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। উঁনার নবুয়্যত সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আল্লাহ্ খ্যাঁতি করেছেন। যদিও অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে:- আমার নবীগণের মধ্যে তোমরা ছোট-বড় পৃথক করিও না। কারণ সমসাময়িক যুগ হিসাবে আমিই (আল্লাহ্) তো প্রতিনিধিগণ প্রেরণ করেছি। সকল সৃষ্টির মূল আঁধার তিঁনিই। তাহলে এই মূলকে বা মূলের ধারাতে যদি আমরা পৌঁছাইতে চাই, তাহলে এই ইখলাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করলে কি হবে ? আইনুল একিনের ফোকাস আসবে অর্থাৎ সে দৃশ্যায়ন হবে, সকল কিছু সে দেখবে।

এটাকেই আমরা আমাদের সুফিমতের ধারায় আত্মার মুক্তির স্তর বলে থাকি। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ যাকে আমরা আত্মা বলে থাকি। অবশ্য আত্মার দুটি বিভাজন জাগতিক ভাবে বা অনেক কিতাবে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। একটা হলো জীবাত্মা যাকে আমরা নফ্‌স বা দেহধারী মানুষের অবয়ব বলে থাকি, আরেকটির নাম হলো পরমাত্মা যাকে রুহ বলে থাকি। এই পরম আত্মাই হলো আল্লাহ্ সত্ত্বা। যাকে কালামপাকের ভাষাতে রুহ বলে সম্মোধন করা হয়েছে। তাই এই পরমকে লাভ করাই হলো ধর্মের মূল নিশানা বা মূল চালিকা শক্তির একটি অবয়ব। এজন্য সেই মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহ্। আমরা অনেকেই হয়ত উপরের দিকে তাকিয়ে বলি উপরে একজন আছে কিন্তু এটা বদ্ধমূল ধারণা। সুফিদের আকিদা বা কথা হলো প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ বিরাজিত। তাহলে আমার আল্লাহ্ আমার ভিতর থেকেই সবকিছু জানেন, দেখেন, শোনেন। যার

জন্য কোন অবয়ব লাগে না, কোন মাধ্যম লাগে না কোন ব্যবস্থা লাগে না। কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত। আমরা যে দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা এগুলো ভোগ করি কেন ? কারণ আল্লাহ্ আমাকে ঠিকিই দেখেন কিন্তু আমি তাঁকে দেখিনা। আমাদের এই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বা যত রকমের অশান্তির মূল কারণ রয়েছে, আল্লাহ্‌কে না দেখাটাই হলো এসব কিছুর মূল কারণ। যিনি দর্শনে এসে গেছেন তাঁর আর এগুলো থাকে না। তার আর কোন বিড়ম্বনা নেই। তাই এ কারণে বলা রয়েছে যে মূল ধারাকে যদি কেউ লাভ করতে চায় তাহলে এই পীরের আশ্রিত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে, মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে যে আত্মার জাগরণ হয়, সেই জাগরণকৃত ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোটাই হলো এই আত্মার মুক্তি।

এজন্য প্রতিটি মানুষেকে আত্মার মুক্ততা করার জন্যই এই ধর্ম এসেছে। এটাই হলো সংবিধান। তাই এই ধর্মের খুঁটিনাটি যত বিষয়াবলী আছে সবকিছু সংবিধান সাহায্যকারী হিসাবে কার্যকারিতা করবে আর সেই সংবিধান হলো এই আল-কোরআন। তাহলে এই আল-কোরআনকে আমরা যে আমাদের সীমিত জ্ঞান গরিমা দ্বারা যদি বুঝতে না পারি, তাহলে এটা বুঝবার জন্য হাদিসের আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর হাবিবের অনুসরণ করবার কথা বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে পরিপূর্ণতাকে লাভ করা। ধর্মের মূল নিশানাটাই হলো এই আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্য। এটা যত দ্রুত করা সম্ভব, ততই এটা ফলপ্রসু বা কার্যকর হবে। এই কার্যকারিতার দিকে আমরা যদি ধাবিত না হই এর প্রয়োগ পদ্ধতিতে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে যদি না হাঁটি তাহলে আমাদের পথচলাটা বৃথা হয়ে যায়। এই কথার কোন কার্যকারিতা হলো না। শুধু আলোচনায় থেকে গেল। এখন কিতাব কোরআন বলে যা জানি তা প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে এক খানা করে সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাহলে তো কোন কার্যকারিতা হলো না।

এই কালামপাকের একটি আয়াতও যদি কারো দেহ রাজ্যে প্রতিফলন বা বাস্তবায়ন ঘটায় তাহলেই এটার কার্যকারিতা হলো, এই সংবিধানের স্বার্থকতা রইল। অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে এই আয়াতে কারিমাগুলো দেহ রাজ্যে কার্যকারিতা লাভ করে। তো এজন্য এই কার্যকারিতার চূড়ান্ত রূপ, আল্লাহ্‌র তিনটি রূপকে এই সুফিতত্ত্বে বিভাজন করে বলা হয়। এই তিনটি রূপের মধ্যে সবচেয়ে চূড়ান্ত রূপ হলো এই লা। অর্থাৎ লা সত্ত্বায় আল্লাহ্‌পাক প্রথমে কালামপাকে বলেছেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। দ্বিতীয় হলো আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। তৃতীয়

হলোঃ- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থঃ- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। অর্থাৎ লা শরীক বলতে তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন বিভাজন নেই। তাই লা শরীকের দলিল আয়াতে কারিমাগুলো এভাবে রয়েছে। এই লা শরীক বলতে আসলে এটা জাগতিক ভাবে বা রূপক অবস্থায় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু লা শরীক হলো চূড়ান্ত অবয়বে আল্লাহ্‌র মূল ধারা। অর্থাৎ আমি আপনি আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টি রয়েছে সকল সৃষ্টি তো তাঁর থেকেই সূচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালী (আঃ) আল্লাহ্‌র বর্ণনায় বলেছেন যে, আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রথম অবয়ব তিঁনি যে সৃষ্টি করেছেন, প্রথম সৃষ্টি হলো নূরে মোহাম্মদ। তাহলে নূরে মোহাম্মদ হলো দ্বৈত সৃষ্টি অর্থাৎ বিকাশিত একটি রূপ, আল্লাহ্ থেকে দ্বিতীয় অবয়বের সৃজন হলো। এই নূরে মোহাম্মদ হতে গোটা সৃষ্টি রাজ্যে যত মাখলুক রয়েছে এই মাখলুকগণ সকল সৃষ্টি এভাবে হয়েছে। এটা হলো বিকশিত ধারা হতে আবার বিকশিত। এটাকে বলা হয় সৃষ্টি সেফাতি গুণ সত্ত্বার ধারাবাহিকতা। যেমনঃ- তুলা থেকে সুঁতা হয় এবং এই সুঁতা থেকে কাপড় হয় আর সুঁতা রঙ্গিন হয় বিভিন্ন রঙের যে উপকরণ মেশানো হয় সেই উপকরণের সমৃদ্ধায়ন হলে এটার আরেকটি অবয়ব জারী হয়। তাহলে তুলা হলো মূল আর সুঁতা হলো সেটার গুণ। অর্থাৎ তুলা হলো জাত আর সুঁতা হলো সেফাত এবং কাপড় হলো সেফাতের সেফাত। কাপড়কে নিয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্র বা অন্য সামগ্রী তৈরী করলে সেটা হলো আরেকটি সেফাত। সৃষ্টির ক্রমবিকাশময় ধারাবাহিকতা গুলো এই সৃষ্টির মূল ধারা থেকে এসেছে। কিন্তু মূলে যিনি পদার্পন করতে পারে বা মূল ধারার পূর্ণতার অবয়ব হয় তিঁনি এই বর্ণনা করেছেন যেঃ- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

বিজ্ঞানী ডারউইন মতবাদে বর্ণনা করেছেন যে, এই মানুষের সৃজন বা অস্তিত্ব হলো শৈবাল বা সাগরের এক ধরনের শেওলা থেকে। তাদের মতে পানিতে সূর্যের কিরণ পরে। সূর্যের কিরণ পরলে সেখান থেকে শেওলার সৃষ্টি হয় এবং শেওলাটা ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধি হয়। প্রবৃদ্ধি হলে মোটাতাজা হয়ে গাছের মত হয়। এই শেওলা থেকে রূপান্তর হতে হতে এই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী এটা পরিবর্তিত হতে হতে এভাবে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানী ডারউইন কিন্তু আল্লাহ্‌কে মানে না। এটা বললাম বিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদের কথা। তারা এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র এই অবিভাজনকৃত ব্যবস্থা সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী (আঃ) এভাবে বর্ণনা

করেছেন যে, আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেই নিজের রূপে বিভোর হলাম। আমি কখনও ঈসা, কখনও মুসা, কখনও জাকারিয়া সর্বশেষ মোহাম্মদ রূপে অবতার হয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্তে দুনিয়াতে সমাসীন হয়েছি। কত মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি বহন করে চলেছি।

এই বিভাজন বা ট্রান্সফার বা স্থানান্তরিত ব্যবস্থা অর্থাৎ এটাকে যদি দ্বৈত নীতিতে কল্পনা করি তাহলে আমাদের পাপ হবে, আপনাদের বুঝবার জন্য বলা হচ্ছে। তাহলে উঁনি নিজেই নিজের রূপে বিভোর হলেন। এই যে রূপের দর্শন সেই দর্শন থেকে বিভাজনকৃত ব্যবস্থায় আজকে পৃথিবীর বুকে ৭৫০ কোটিরও অধিক মানুষ এসেছি এবং মানুষের একেক জনের একেক রূপ। কোন রূপের সঙ্গে অন্য কোন রূপের সংমিশ্রন বা মিল নেই। হয়ত কাছাকাছি হতে পারে কিন্তু কোথাও না কোথাও ভিন্নতা বা পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ এখানে ইমাম গাজ্জালী (আঃ) যখন স্রষ্টার সান্নিধ্যের মূল ধারাতে পৌঁছায়, তখনই কিন্তু তিনি এই ঘোষণাটুকু দিতে পারেন। যে আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। এটা হলো আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত একটা স্টেজ বা অবস্থান সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী (আঃ) তুলে ধরেছেন তাঁর কিতাবের মধ্যে। তাই তাঁর নিজের রূপের বিভোরকৃত যে অবস্থা, সেই বিভোরকৃত অবস্থাটাই হলো:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। এই বিষয়ে পরিপূর্ণতার অবগাহন হলে তিঁনি নিজেই নিজের মত করে বিভাজন হয়েছেন। সেই বিভাজনকৃত ব্যবস্থাটাই হলো মানবাত্মার মধ্যে যে রুহ রূপে আল্লাহ্‌ বিরাজিত আছেন এটাই হলো সেটা।

আপনারা জাগতিক বা শরিয়তি আলেম সমাজের মুখে শুনে থাকবেন যে, সকল রুহের সৃজনকৃত ব্যবস্থা একই দিনে একই সময়ে। তাহলে সকল রুহের যে সৃষ্টি এটাই হলো স্রষ্টার একটি বিভাজনকৃত ব্যবস্থা। সেই বিভাজনকৃত ব্যবস্থাটি প্রতিটি মানুষের মধ্যে একক সত্ত্বার রূপে বিকশিত হয়ে জারী হয়। সেটাই হলো এই:- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ বা তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি, এটাই এই আয়াতের কারিকুলাম বা কার্যকারিতা।

যিনি আল্লাহ্‌র নবী হন, তিঁনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। এইটা কলেমার সঙ্গে সংযোজিত করে দেওয়া রয়েছে। এর অর্থ যিনি নবুয়তের সনদ হন, তিঁনি হলো স্রষ্টা। তাঁর আর আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন বিভাজনকৃত ব্যবস্থা থাকে না। কলেমার তাফসিরে বা আলোকপাতে এটা সুবিস্তৃত ভাব ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার ত্বরান্বিত যে ভাব ধারা, সেটাই

হলো এই লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ এর কারিকুলাম। তাহলে সকল কারিকুলামই তো তাঁর। তাই ইমাম গাজ্জালী (আঃ) সুফিমতাদর্শের আলোচনায় বলেছেন যে, আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। এটা কী আসলে ইমাম গাজ্জালী (আঃ) বলেছেন ? আল্লাহ্‌র কথাটাই ইমাম গাজ্জালী (আঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীতে প্রকাশ হয়েছে।

তাহলে উঁনি নিজেই নিজের রূপে বিভোর হলেন। তিঁনি কখনও ঈসা, কখনও মুসা, কখনও জাকারিয়া সর্বশেষ মোহাম্মদ রূপে অবতার হয়ে দুনিয়াতে সমাসীন হয়েছেন। এ কথা বললে যাদের আল্লাহ্‌র উপরই বিশ্বাস নেই তাদের মনে দাগ লেগে যাবে। এজন্য সুফির মূল ধারার কথা গুলো বাস্তবতায় এভাবে পুস্তকে উপস্থাপন করাটাও একটি সমস্যা গ্রস্থ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মূল ধারার কথা এসে গেলে জাগতিক বন্ধন পরে যায়। কেন তুমি কি বলছো ? এই আপনাকে গলা টিপে ধরা হতে পারে। কারণ এই আধ্যাত্ববাদের কোন দলিল থাকে না এটা দর্শনবাদের ভিত্তিতে যার যার দর্শনের উপলব্ধি যেমন হবে, তার বলার বয়ানকৃত ব্যবস্থাও সে রকম হয়ে যায়। এই হলো মূল ধারা। এজন্য এই লা শরীক হলো চূড়ান্ত আল্লাহ্। অর্থাৎ লা শরীক স্তরে যদি কোন মানুষ জাগরিত হয় তাহলে তার নির্দেশ আল্লাহ্‌র নির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সেটা হলো এমন যে, তিঁনি যদি বলেন:- আমরা যারা পাবনা বসবাস করছি তাদের সবাইকে ফ্রান্সের একটি জঙ্গলে ফেলে দাও। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকারি হয়ে যাবে। এটা হলো এই লা শরীক আল্লাহ্‌র অবয়ব। অর্থাৎ এখানে বিভাজনকৃত ব্যবস্থা থাকে না। অর্থাৎ উঁনি যে সকল কিছুর মালিক এই প্রক্রিয়াটাই প্রমাণ করেছেন।

তাহলে আল্লাহ্‌র প্রতিটি নামের এক একটি কার্যকরি ক্রিয়াশীল গুণ ক্ষমতা রয়েছে। এগুলো না বুঝলে এই ধর্মের তালগোল পেকে যাবে। তাহলে এই সুফিমতের ভাবধারার বয়ান আর থাকবে না। তাহলে সবই দন্ডনীয় হয়ে যাবে। এজন্য সেই লা শরীকআলাতেই এই স্তর রয়েছে । যেখানে কারো কাছ থেকে জন্ম নেওয়া নেই, যেখানে কাউকে জন্ম দেওয়াটাও নেই। অর্থাৎ তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে অবস্থান করেন। তিঁনিই সেই মূল সত্ত্বা। সেই মূল পর্যন্ত পৌঁছালেই এই আয়াতে কারিমার তাৎপর্য কার্যকারিতা পায়।

তাহলে কোথায় সেই মূল সত্ত্বার অবয়ব। আর কোথায় এই বিভাজনকৃত রিপুতাড়িত ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তাঁকে চিন্তার রাজ্যে নিদর্শন করে আমরা পরিমাপ করি বা ওজন করি। সেটা ভূল হবে। তাই তাঁর সেই অবয়বকে মানে প্রাপ্তির জন্য এই অছিলা রাখা রয়েছে। যদি অছিলা না থাকতো তবে সরাসরি সেই জালুয়াতে মানুষ আর তাঁকে

কোন দিনই খুঁজে পেত না। অর্থাৎ তাঁর জালুয়াতে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যেত তাঁর অস্তিত্ত্ব কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

তাহলে মানবিক গুলাবলির যে গুন, যে মূল ভাব ধারা শক্তি সেই শক্তি যদি কারো আকিদাতে সন্নিবেশিত হয়, স্থানান্তরিত হয় বা কার্যকারিতা পায়। তাহলে ধীরে ধীরে তিনি ঐ শক্তিতে উপন্নিত হলে তবেই তাঁকে দেখা যাবে। হুট করে আমি দেখব তা দেখা যাবে না। এটার প্রমাণ মুসা কালিমুল্লাহকে নিদর্শন স্বরূপ আমাদের দিয়ে রেখেছেন। তিনি আল্লাহ্‌কে দেখতে চাওয়ার পরেও তিনি দেখতে পারেন নি। কেন ? পর্বত পুড়ে সুরমা তে রূপান্তর হয়ে গিয়েছিল। কারণ ঐ জালুয়ার ক্ষমতার ধারণকৃত ব্যবস্থার যে ক্ষমতায়ন সেইটা তিনি নবী হওয়ার পরেও তাঁর মধ্যে ছিল না। এটাই অছিলার প্রমাণ। তাহলে একটি মানুষকে এই গুণ ক্ষমতা বা ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা কার্যকারী করবার জন্য আরেকটি মানুষকে অবলম্বন হিসাবে ধরতে হয়। এটাই অছিলা, এটাই মোর্শেদ বা পীরতন্ত্রের মূল ভাবধারা। আর এই আমল বা কার্যকারিতার মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যে শয়তানি সত্ত্বা বা মন্দ সত্ত্বা বিরাজিত। সেই ব্যবস্থাকে ডাইভার্ট করার কলা কৌশল রাখা রয়েছে। কারণ শয়তান কোন আমল নীতিতেই বন্ধন তৈরী করে না একমাত্র তাসাব্বুরে শায়েখ।

এই তাসাব্বুরে শায়েখটা কী ? এই তাসাব্বুরে শায়েখ হলো পীরের ধ্যান বা পীরে সঙ্গে একত্রিত ভাবে সমাসীন হবার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই তাসাব্বুরে শায়েখ বলা হয়। তাহলে এই প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তি পীর বা মোর্শেদের রূপকে ধারণ করে, সেই রূপে সন্নিবেশিত কার্যকে ফলপ্রসু করবার প্রচেষ্টা। তাহলে এই পীর থেকে রূপান্তরবাদ ব্যবস্থাটা জারীয়া হয়ে যায়। এটা হলো এই রূপান্তরবাদ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ফলপ্রসু করবার কৌশল। সেই কৌশল হলো এই গুরুবাদ ব্যবস্থা। এজন্য গুরুবাদ ব্যবস্থার সূচনায় স্তর মাফিক যখন চূড়ান্ত অবয়বে সেই মহান সত্ত্বার গুণ ক্ষমতা একটি মানবের মধ্যে বিকশিত হবে তখনই তিনি এই আয়াতে কারিমার তারতম্য এবং স্বার্থকতা বুঝতে পারবেন যে, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

তাঁর এই অবস্থিত রূপকে জারী করলে সাধক তখন বুঝতে পারেন যে, তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। পূর্ণতার অবয়ব তার মধ্যে আল্লাহ্ সত্ত্বা জারীয়া হয়ে গেছে। তখনই সে বলতে পারেন যে, এটা আল্লাহ্‌র একত্ত্ববাদের পূর্ণতার বিকাশ। এখানে মানুষের সম্পৃক্তায়ন যদিও রাখা হয় নি, আধ্যাত্মিকতার বা গোপনীয়তার যে অবয়ব।

এটা হলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পৃক্তায়নের মিলনকে পূর্ণ মারেফত বলা হয়। তাই এটা সম্পৃক্তায়ণ করতেই এই আয়াতে কালাম জারী করেছেন যে:- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থ:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তিঁনি হলো সৃষ্টির আদিতে পূর্ণতার যে অবয়ব, যে বিকশিত ভাব ধারায় জাগরণ ছিল বা যেখান থেকে সৃষ্টির ক্রমবিকাশময় ধারাতে সৃষ্টি হয়েছে। সেই সৃষ্টির মূল ধারাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হলো:- ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। অর্থ:- তাঁর (আহাদের) সমতুল্য কেউ না। অর্থাৎ তিঁনি (আহাদ) কারো মুখাপেক্ষী না, তিঁনি অমুখাপেক্ষী। এই সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, কূলহু আল্লাহু আহাদ এবং শেষের আয়াতে বলা হলো:- ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। তাহলে তিঁনি কে ? সেটা কোন সত্ত্বা ? যে মানব সত্ত্বাটা শয়তানি সত্ত্বাকে দূরীভূত করে পূর্ণতার অবয়বের জাগরণ ঘটিয়েছে সেই সত্ত্বাটা কারো সমতুল্য না, তাই কারো মুখাপেক্ষী হতে পারে না। অর্থাৎ তিঁনি কারো আশ্রয়, কারো দন্ড, কারো কথা, কারো অবতারণা, কারো সম্পৃক্তায়ন যত বিশেষণ আছে তিঁনি এসবকিছুর বাইরে অবস্থান করেন। তাই তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না।

এটাই হলো ধর্মের বা একত্ত্ববাদের মূল ধারা। এই একত্ত্ববাদে যিনি পূর্ণতায় ফলপ্রসূ করতে পেরেছেন, তিঁনিই কারো মুখাপেক্ষী না বা তাঁর সমতুল্য কেউ না। সেই সত্ত্বাটাই হলো আহাদ সত্ত্বা। এই আহাদ সত্ত্বা কারো মুখাপেক্ষী না বা তাঁর সমতুল্য কেহ না। অর্থাৎ তিঁনিই যে সর্বেসর্বা সেই প্রক্রিয়াটাই তিঁনি জানান দিলেন। তিঁনি সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণতার সেই সত্ত্বা। এটাই হলো সাধকের চূড়ান্ত অবয়ব। যেটা সূরা ইখলাসের শেষে এসে বর্ণনা করেছেন।

তাহলে এই একত্ত্ববাদের পূর্ণতাকে জারী করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ এক, এই এক হলো স্বাভাবিক ভাবে। কারণ স্বাভাবিকতায় সকল মানুষের জ্ঞান গরিমা এক রকম থাকে না। জ্ঞানের তারতম্য অনুযায়ী মানুষের অবস্থান কমবেশি রয়েছে। যার জ্ঞান বেশি তার বুঝবার ক্ষমতা বেশি থাকে। কিন্তু যার জ্ঞান কম তার জন্যও তো ধর্মীয় বিধান থাকে। তাই আনুষ্ঠানিকতার যে সকল রেওয়াজ রয়েছে সেটা হলো স্বাভাবিক। আর এই আধ্যাত্মিকতার অবয়ব হলো অস্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের সমন্বয়ে থাকে হলো পূর্ণতা। এজন্য বলা রয়েছে এই জাহের এবং বাতেন এই দুইয়ের সমন্বয়ে

ইসলাম। তাই ইসলামের মূল ধারা জানতে হলে আধ্যাত্মিকতা এবং জাগতিকের যে সকল বিধি বিধান রয়েছে উভয়ই জ্ঞাত হওয়াই ধর্মের মূল মন্ত্র বা ধর্মের মূল শিক্ষা। একমাত্র সত্যকে লাভ করলে সেখানে আর বিভাজন নেই। মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন:- আনাল হক। অর্থ:- আমিই সত্য। বাংলা ভাষায় এটাকে ভিন্নভাবে বলা হয় যে, আমিই আল্লাহ্। যদি তিঁনি আল্লাহ্ হয়ে যান তাঁর সমতুল্য যদি কেহ না হন বা তিঁনি যদি কারো মুখাপেক্ষী না হয়, তাহলে এখানে একটি পূর্ণতার সংকেত বা আভাস আমরা পেয়ে থাকি। আসলে মূল ধারাটা হলো:- একটি মানুষ তার কর্মযোগে সূচনালগ্ন থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর আর আল্লাহ্র মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই আল্লাহ্র কথাটা আমরা সাময়িক দৃষ্টিতে দেখতে পাই না বা শুনতে পাই না। যা প্রকাশিত হয় তা হলো তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যম দিয়ে। তাকে সনদ করলে এই আল্লাহ্র কথাটা সেই বান্দার মাধ্যম দিয়ে প্রকাশিত হয়।

আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে এই সূরার সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে একটু বোঝাতে চেষ্টা করি। সেটা হলো:- আপনারা জাগতিক ভাবে অনেক মাজ্জুব বা পাগল দেখে থাকবেন। তাঁদের দেখে থাকবেন যে, এদের ভোগ-বিলাস, শান-শওকত সবকিছু দিয়ে তাঁকে যদি পায়ে ধরেও নিয়ে আসেন, তারপরেও কিন্তু সে আপনার আশ্রিত ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে না। কেন ? সে কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, কারণ তার সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ না। সে রাস্তায় পড়ে থাকবে, সেখানেই তাঁর শান্তি, ওটাই তাঁর তৃপ্তি। কারণ তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না। মওলা তাঁকে যে গতিতে ত্বরান্বিত করবে, সেই প্রক্রিয়াতেই তিঁনি থাকবেন।

তাই এই আহাদ সত্ত্বা অর্থাৎ একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বার যে মূল ধারা, সেই ধারাতে বান্দা যখন অবলোকন করবে বা পরিপূর্ণতায় সে সিক্ত হবে, সেই সিক্ত হবার প্রক্রিয়া বা কারিকুলামই হলো:- তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না বা তাঁর সমতুল্য কেউ না। সেটা হলো এমন যে, যিনি মূল স্বত্ত্বা, যার শক্তিতে সকল কিছু সৃজিত হয়েছে, যিনি সকল কিছু পরিচালনা করেন। অন্নদাতা, রিযিকদাতা তিনি সকল কিছু শোনেন, সকল কিছু দেখেন, বোঝেন।

তাহলে তিঁনি বললেন যে:- তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী বা তাঁর সমতুল্য কেউ না। তাহলে আমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ আমাদেরকে এই ইখলাস প্রতিষ্ঠিত করবার তাগিদ রয়েছে। এই ইখলাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদেরকে ইখলাসের আকিদার উপর

সুবিন্যাস্ত ভাবধারায় প্রতিস্থাপন করতে হবে। তাহলে আমরা অপরের উপর যে নির্ভরশীল, এই নির্ভরশীলতাকে ডাইভার্ট করতে হবে বা সরে আসতে হবে। এই ডাইভার্ট বা সরে আসার যে মূল কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রটাই রয়েছে হলো আপেক্ষিক। তাই শুরুটা আর হয় না। যে কারণে এদিকে মানুষ যেতে পারে না। এটা সম্পর্কে বুঝতে পারে না। যার জন্য বিভ্রান্তির শিঁকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। যদিও এই প্রসঙ্গ গুলো একটু উচ্চ পর্যায়ের দর্শনের দিকে ধাবিত হয়, কারণ এই ইখলাস সাধারণ কোন বিষয় নয়। এটা হলো আল্লাহ্‌র গুণ ক্ষমতাকে ধারণ করবার জন্য উপযুক্ততা তৈরী করবার প্রক্রিয়া। আমাদের যদি এই প্রক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হয়, তাহলে এই সূরার আয়াতে কারিমায় যে ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেইটা সেই মানবের মধ্যে বিকশিত বা প্রকাশ হবে। ঐ গুণগুলো সেই মানুষটার দ্বারা প্রকাশ হবে। তখন সৃষ্টিরাজ্যে যা কিছু তৌহিদে আছে তাঁর সঙ্গে মিশে আমি আপনি একাকার হয়ে যায়। তখনই মুনসুর হাল্লাজ বলেছেন:- আনাল হক। অর্থ:- আমিই সত্য বা আমিই আল্লাহ্। তাহলে কিভাবে বলেছেন ? এই প্রক্রিয়া যখন সুসম্পন্ন হয়েছে তখনই এই ঘোষণাটা দিয়েছেন। বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেছিলেন:- লাই ছালাফি জুব্বাতি ছেওয়া আল্লাহ্‌তালা। অর্থ:- আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই নেই। জমদগ্নি মুনি বলেছেন:- সোহ্‌হম সোহ্‌মি অর্থ:- তিঁনিই আমি, আমিই তিনি। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব বলেছেন:- তুঁই মুঁই, মুঁই তুঁই। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ওলিগন এভাবে বর্ণণা করেছেন। কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে ঐ সমস্ত ওলিগণের মুখ নিঃসৃত অবয়বে। যার কারণে যখন এটা নিঃসৃত হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে তখন তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে দন্ডায়মান হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন জ্ঞানীগণ যখন এটাকে নিয়ে থিসিস বা গবেষণা করেছেন তখন দেখা গেছে না আসলেই তাঁরা ঠিকই বলেছিলেন।

তাহলে এই দর্শনকৃত ব্যবস্থা বা এই ইখলাসকে যখন পরিপূর্ণ রূপে তিঁনি সমাসীন করতে পেরেছেন, তখন তাঁর আর কিছু নেই। অর্থাৎ সকল কিছুর কার্যকারিতা আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃজিত হয়েছে বা কার্যকারিতা পেয়েছে। সেই প্রক্রিয়া গুলো তাঁর দ্বারা এক সময় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এজন্য তিনি হয়ত এ কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা বুঝতে না পেরে এটা জঞ্জাল বা বেদাত, কাফের, মূর্তাদ, এভাবে ফতুয়া দিয়ে তাঁকে ঝান্ডা দিয়ে আটকে ফেলি।

মোর্শেদ কী ? মোর্শেদ হলো রসূল (সাঃ) (আঃ) দেখার আয়না আর রসূল (সাঃ) (আঃ)

হলো আল্লাহ্ দেখার আয়না। তাহলে রূপান্তরবাদ হয়ে এসেছে। এই রূপান্তরবাদ কী ? আল্লাহ্র যত কথা সবকিছু আল্লাহ্ই মুখে বলেছে ? না এটার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর হাবীব দ্বারা। অর্থাৎ মোহাম্মাদ (সাঃ) (আঃ) উঁনার মুখ নিঃসৃত জবানীতে প্রকাশ হয়েছে। উঁনি বলছেন যে, এটা আল্লাহ্র কথা। এভাবে কোরআন নাযিল বা লিপিবদ্ধ হয়েছে। না কী আল্লাহ্ অন্য কোন ভাবে এসে সরাসরি এটা বলছেন ?

তাহলে একটি মাধ্যম ব্যবস্থা রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) ব্যবহার করেছেন সেটা হলো জিব্রাঈল আমিন নামক ফেরেশতার। জিব্রাঈল আমিন আমাকে ওহী মারফত জানান দিয়েছেন তাই আমি আল্লাহ্র বাণী এভাবে প্রকাশ করলাম। এভাবেই তো আল্লাহ্র কালামগুলো এসেছে। তাহলে সরাসরি যদি না পাওয়া যায় তাহলে উঁনার সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই। তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না। তাহলে আল্লাহ্ যে বিকশিত হয়, প্রকাশিত হয় এটা মানুষের মাধ্যম দিয়ে।

তাই এই মানব সুরতে বা অবয়বে আল্লাহ্র সকল প্রতিনিধি এসেছেন। অন্য কোন সুরতে বা অবয়বে আল্লাহ্র প্রতিনিধি আসেননি। আবার জ্বীন জাতির মধ্যেও আল্লাহ্র ওলি হয়, সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় না। তাহলে এই যে যুগে-যুগে, কালে-কালে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার নবী-রসূল এসেছেন, তাঁরা সবাই এই মানুষ রূপে এসেছেন। এই মানুষের মাধ্যম দিয়েই আল্লাহ্র বহিঃপ্রকাশ। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে যে:- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরতিহি। অর্থ:- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্) নিজ সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্র চেহারার অবয়বে। এই আদম সন্তান থেকে আমরা বণী আদমে রূপান্তর হয়ে আজকে দুনিয়াতে এত মানুষ।

এভাবে দুনিয়ায় যত নবী-রসূল, ওলিগণ আছে সবারই মানব আকৃতিতে তাঁদের পাক জবানে আল্লাহ্র বাণী বা আল্লাহ্ময় অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ্ সরাসরি না বলে তাঁর মাধ্যম ব্যবস্থায় প্রকাশ করেছে তখনই তিঁনি দুনিয়াতে দন্ডণীয় হয়েছেন। এজন্য অনেক জ্ঞানীগণ বলে থাকেন যে, বাবা সত্য কোথায় পাবো! জবাবে বলি:- তুমি হকের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা কর তাহলে সব বুঝতে পারবে। সত্য দূরে নেই, সত্য তোমারি ভিতরে।

এখন আপনার এত সার্কেল, এত লোক, এত নিকটজন, এত আত্মীয়স্বজন কোন কিছুই আর থাকবে না। তখনই বুঝতে পারবেন কে আপনার আপন আর কে আপনার পর।

কারণ আপনিই তো আপনার না, তাই এত কিছু আপনার বলে মনে হয়েছে। যে দিন আপনি আপনার হবেন, সে দিন সমস্ত কিছু বা যারা আপনার এই মত আর পথের না, তারা একাই আপনাকে ডিভাইডেড করে ফেলবে। আর আপনি তখনই বুঝতে পারবেন যে কে আপনার আসল আপন। তাহলে আসল আপনার যেটা, সেটা আপনার ভিতরে রয়েছে। তাঁকে জাগরিত করে দেখেন না! জাগতিক একটি দেহ বা শরীর কেন্দ্রিক আশ্রিত ব্যবস্থা কাঠামোকে ধারণ করে আপনি বলেন যে, এইটাই আমার আপন। আসলে এগুলো আপন না। এজন্য মৃত্যু পরবর্তী কালীন অবয়ব কবর দিয়ে এটা উপলক্ষ্য হিসাবে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে কেউ কারো সাথে যায় না। এত যে আপন বা এত যে কাছের হলো, আসলে ঐ বেদনায় কেউই সম্পৃক্ত হয় না। তাহলে সেখানে আপনাকে আমাকে একাই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আপনার যেটা আপন ছিল ঐ আপনটা আপনার থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি লাশ হয়ে যাবেন।

যে সঙ্গে থাকে, এই থাকাতে এত বড়াই, এত কোদাই, এত বাহাদুরি। সকল বাহাদুরির মূল নিশানা যিনি সেইটা আপন কি না ? যিনি থাকলে আমার চৈতন্য থাকে, আমি জীবিত বলে আমার বাহাদুরি, আমার হাম্পাই। এই দিব্য দৃষ্টিতে জ্ঞান, ক্ষমতা, শক্তি আমার জীবনের শ্বাসটা যত সময় চলমান আছে, এই সময়ের মধ্যে তাঁকে ধরতে পারাটাই হলো সুফি আকিদার মূলকার্য। তাই এই কার্যে যিনি সমাসীন হয়েছেন, তাঁর দ্বারা এই কথাতে বোঝা যায় যে, তিঁনি কারো সমতুল্য বা সমকক্ষ না বা মুখাপেক্ষী না। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কারো সমন্বয় সাধন চলে না। এজন্য ওলি এবং মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থার পথ, সেখানে আল্লাহ্‌র বহু ওলিরা এভাবে প্রমাণ রাখছেন। তাঁরা নিজেকে যে আল্লাহ্ বলে প্রমাণ করেছেন, এই কথাটা তাদের না। এই কথাটা হলো স্বয়ং আল্লাহ্‌র। এটাই প্রমাণ হয় এই আয়াতে কারিমার দ্বারা।

এই কার্যের দিকে মনোনিবেশ করে যদি কেউ কার্যকারিতা ফলাতে পারে, তবেই এই মূল ধারা সেটার প্রতিফলন বা ফলপসূ করতে হবে। এজন্য একজন গুরু বা মোর্শেদের কাছে গিয়ে তাঁর দেওয়া মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যম দিয়ে আপনার দেহ রাজ্যে যে অবাঞ্চিত ব্যবস্থাগুলো আছে, সেগুলোকে দূরিভুত করে আপন রুহ সত্ত্বার উদ্ভাসন রূপকে জাগ্রত করতে হবে। তাহলেই এই মূল ধারার কার্যকারিতা বা ক্রিয়াশীল হবে। এজন্য ইখলাস শব্দের অর্থ একত্ত্ববাদ বলা হয়। এই একত্ত্ববাদ বলতে একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভু সত্ত্বা। যার কোন বিভাজন নেই। অবিভাজনকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি

মানুষকে নির্মিত হতে হবে। সেই নির্মিত ব্যবস্থায় যেতে হলে দুনিয়াদারীর সকল আশ্রিত ব্যবস্থাকে নিজের ইচ্ছার কাছে কোরবানি দিয়ে, নিজেকে দন্ডায়মান হতে হবে। তাই দন্ডায়মানকৃত ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে নির্মিত করতে হলে প্রথমেই একটি গাইড বা একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। একা একা দন্ডায়মান হওয়া যায় না, যার জন্য এই গুরুবাদ মাধ্যম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এজন্য এই প্রক্রিয়াতে যাবার যে সূচনা, সেই সূচনাটাই তো মোর্শেদ বা পীর। তাহলে সেই প্রক্রিয়াটাই যারা মানে না, তাদেরকে আপনি কি দিয়ে বোঝাবেন ? আসলে আমি আপনি কেউ কাউকে বোঝাতে পারব না। কারণ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ বা তকদির বলা হয়, সেটা যদি পূর্বেই নির্ধারিত থাকে তাহলে আমি আর আপনি কি দিয়ে বোঝাবো ?

এজন্য তকদিরকে যারা জয়লাভ করে তকদিরের কর্তৃত্ত্বের বলয়কে ছিন্ন করে যারা কামিয়াব হয়েছে। তাদের কর্তৃত্ত্ব দ্বারা কিছু মানুষকে হেদায়েতে আনা যায়। তাছাড়া যার যেটা লেখা আছে সেটা ঘটবে। এই ঘটা ব্যবস্থাকে তাঁরা হয়তো সুপারিশ করে সেটাকে সুসম্পন্ন করে। তাঁরা নতুন করে একটি আকিদাতে বা হেদায়েতের রাস্তায় নিয়ে আসে। হযরত মোজাদ্দেদ আল্-ফেসানী সিরহিন্দ (রহঃ) তাঁর মকতুবাদ শরীফের ১ম খন্ডে বলেছেন:- নেগাহে অলীমেঁ ইয়ে তাছির দেখি বদলতী হাজারো কি তাকদীর দেখি। অর্থ:- আল্লাহ্‌র ওলিদের নেক নজরের মধ্যে এমন তাছির রয়েছে যে! এক মুহূর্তে হাজারো তকদির পরিবর্তন হয়ে যায়। হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী (রহঃ) বলেছেন:- মুর্শিদ একজন চিকিৎসকতুল্য। তিঁনি প্রয়োজন অনুযায়ী মুরিদদের রুহানী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এজন্য প্রতিটি মানুষকে মুরিদ হতে হবে। অর্থাৎ পীরের শিক্ষায় দীক্ষিত হতে হবে। অর্থাৎ একজন ওলিয়াম মুর্শিদের কাছে সারেন্ডার বা আত্মসমর্পন হতে হবে। এই ক্লাসটা হলো ধর্মের প্রাথমিক ক্লাস। এই ক্লাসটা যদি সুসম্পন্ন না হয়, তাহলে তার ঈমান আনাই হলো না। ঈমান আনা যদি না হয় তাহলে কলেমার সনদ হয় না, আর কলেমার সনদ না হলে সে ধর্মে দাখিল হয় না। তরিকার জগতে এভাবে বলা রয়েছে। আর আমরা আনুষ্ঠানিকতা ধর্মের সাইনবোর্ড লাগিয়ে লেবাসে পরিচালিত হই ? এই উপ আনুষ্ঠানিক যে ব্যবস্থা, এটা আসলে ফকিরি না। ফকিরি হলো মানুষকে প্রকৃত মানুষ করবার যে মাধ্যম ব্যবস্থা, সেটা হলো ওলিদের নির্দেশিত ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা ত্বরান্বিত করতে বলা হয়েছে। তাহলে একজন ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হলে তাঁর

সহবতে থাকতে হয়, তাঁর দাসত্ব করতে হয়। এই দাসত্বের মাধ্যম দিয়ে নিজের মধ্যে অবাঞ্ছিত যে শয়তানি স্বত্ত্বা বা মন্দ স্বত্ত্বার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই মন্দ স্বত্ত্বাকে দূর করে আল্লাহ্‌র মূল স্বত্ত্বায় ত্বরান্বিত করে এই একত্ত্ববাদ বা তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করবার তাগিদ করা রয়েছে। এই তাগিদ বা কার্যক্রম যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে এই সকল কিছু এক সময় গিয়ে কার্যকারিতার রূপ পাবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রাথমিক স্তর হলো একটা ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হওয়া। আমাদের দেখতে হবে ধর্মীয় দর্শনে মুরিদ হবার প্রমাণ আছে না কি ? অনেকেই বলে মুরিদ হওয়া যাবে, আবার অনেকেই বলে মুরিদ হওয়া যাবে না। তাহলে এর প্রমাণটা তো থাকতে হবে ?

প্রমাণ হিসাবে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের বলি, আল্লাহ্‌পাক কোরআনুল মাজিদের সূরা কাহাফ, ১৭ নাম্বার আয়াতের শেষ অংশে বলা রয়েছে :- "ওয়া মান ইউদ্‌লিল্‌ ফালান্‌ তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম্‌ মুরশিদান্‌"। অর্থ :- তুমি পাইবে না তাদের জন্য কোন ওলি এবং মোর্শেদ যারা পথভ্রষ্ট। তাহলে যাদের ওলি এবং মোর্শেদ নাই সে পথভ্রষ্ট। সূরা আরাফের ১৮৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন :- মাইঁ ইউদলি-লিলল্‌া-হু ফালা-হা দিয়্যিলাহু ওয়া ইয়াযারুহুম ফী তুগইয়া-নিহিম ইয়া মাহুন"। যাদের পথ প্রদর্শক নাই সে পথভ্রষ্ট বিপথগামী আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুষ্টামিতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন"। আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্‌ পাক সুস্পষ্ট এভাবে বলে দিয়েছেন।

তাহলে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) এ বিষয়ে কি বলছেন ? রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- "যুগের ওলির কাছে বায়াত গ্রহণ না করে যারা মৃত্যু বরণ করলো তাদের মৃত্যুটা হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু"। তাহলে আল্লাহ্‌র বাণীর সঙ্গে রসূলের (সাঃ) (আঃ) বাণী কত সামঞ্জস্যশীল বা তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো যে, যুগের প্রতিনিধিত্বের যে ধারা অর্থাৎ রসূল (সাঃ) (আঃ) পরবর্তী ব্যবস্থা ওলিদের যুগের কথা, এটা রসূলের (সাঃ) (আঃ) মুখ নিঃসৃত বাণীতে প্রমাণ হয়েছে। এই হাদিস খানা এসেছে হলো তিরমিযী শরীফের হাদিসে। রসূলআল্লাহ্‌ (সাঃ) (আঃ) মওলা আলীর (আঃ) এর হাত ধরে বললেন:- মান কুন্তুম মাওলাহু ফাহাজা আলীউন মাওলাহু (মেশকাত শরীফের ৫৮৪৪ নাম্বার হাদিস)। অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের ধারা রসূলের (সাঃ) (আঃ) হায়াতে জিন্দিগিতে জারীয়া করে গেছে। মনে রাখবেন এই হাদিস এবং কোরআনুল মাজিদের আয়াতকে যদি আপনি মুসলিম হিসাবে জ্ঞাত হন, তাহলে অবশ্যই আপনাদের একজন ওলির কাছে বায়াত বা মুরিদ হতে হবে। যদি না হন এ স্বাধীনতাটাও আল্লাহ্‌পাক আপনাকে দিয়ে

দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা এটা সম্পর্কে অবগত হয়েছি, জেনেছি, এই জানাটুকুই তো আপনাদের কাছে তুলে বা মেলে ধরছি। কার কাছে হবেন এটাতো বলা নেই। আপনার যাকে পছন্দ হয়,যাকে আপনি ওলি মোর্শেদ হিসাবে সমথর্ন করতে পারেন তাঁর কাছে হবেন। নির্ধারিত করা নেই। তাহলে আপনার জ্ঞান-বিবেক, বিচার-বুদ্ধি এগুলো খাটিয়ে আপনার প্রতিনিধিটা সেই ভাবে নির্বাচন করুন। তার কাছে সারেন্ডার হবেন, বায়াত বা মুরিদ হবেন।

মুরিদ হওয়ার ভাষাকে সুফিদের পরিভাষায় বলা হয় আমানু অর্থাৎ কোরআনুল মাজিদে আমানু সম্পর্কে যতগুলো আয়াত আছে, এই ঈমান আনবার পরে এই আয়াতের বাস্তবায়ন হলো তার কাছে থেকে। ওলিরা এই কোরআনুল মাজিদের যে বাস্তবায়নকৃত রূপ থেকে, এই রূপগুলো আধ্যাত্মিক একটি প্রক্রিয়াতে ত্বরান্বিত করেন। এটা বস্তু মোহ ব্যবস্থায় জাগতিক ভাবে কোন কিছু তুলে ধরা হয় না। তাহলে আমরা জাগতিক ভাবে এটা উপস্থাপিত হলেই যে পরিপূর্ণতা পেলাম বা শুনলেই যে সেটা হয়ে গেল তা নয়। আজকে আমি আমার উপস্থাপন ব্যবস্থায় এভাবে মেলে ধরছি। আবার আরেক জন জ্ঞানীর উপস্থাপন ব্যবস্থা আরেক রকম হতে পারে বা আরও সুন্দর হতে পারে।

কারণ আল্লাহ্পাক কালামপাকে সুস্পষ্ট ভাবে এটা বলে দিয়েছে যে, এই দুনিয়ায় যত বৃক্ষরাজি আছে, সকল বৃক্ষরাজিকে যদি কলম বানানো হয় এবং যত পানি রয়েছে সকল পানিকে যদি কালি বানানো হয় তবুও কোরআনুল মাজিদের ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না। তাহলে এই বিশেষণে এক এক জনের এক এক রকম ভাবধারা। ব্যাখ্যা এক এক রকম হতেই পারে। কিন্তু নিজের আয়ত্ত্বকৃত ব্যবস্থাটা নিজেকেই কার্যকারিতার দিকে নিতে হবে।

তাহলে এটা রহস্যময় একটা ব্যবস্থা যে প্রতিটি বিশেষণ এক একটা একেক রকম ধারাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র কালিগুলো শেষ হয়ে যাবে, এই কলমে আবার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কালিগুলো বানিয়ে দেওয়া হবে, আবার লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে। এই ভাবে ছয় বার তবুও এই কালাম পাকের গুণাগুণ লিখে শেষ করা যাবে না। আর আমরা সামান্য একটু পড়লেই সব জেনে যাই বা বুঝে যাই। এমন আহামরি ভাবখানা আমাদের বোকার বচন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ হলো

এটা একটা রহস্যময় কিতাব। এই কিতাব সুফিদের আকিদায় বলা হয়, এটা নিজের দেহ রাজ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর প্রতিফলন উৎগীরণ করতে হবে। তবেই আপনার এই কালাম পাকের জালুয়া এবং কার্যকারিতার প্রতিফলন হবে। একটি হরফও যদি কোন দেহেতে বিকশিত হয় বা উৎগীরণ হয়, তাহলে এটার বাস্তবায়নে ঐ দেহটা কোন জাহান্নামের আগুন তাকে পোঁড়াতে পারবে না বা স্পর্শ করতে পারবে না। তাহলে এই কোরআনকে আমরা সবাই জানি যে, এটা একটি সংবিধান। যাকে বলা হয় দ্যা কোড অফ লাইফ হলি কোরআন। অর্থাৎ এই সংবিধানকে আমরা শুধু কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ব্যবস্থায় রাখলাম আর পড়লে সওয়াব এগুলোর মধ্যেই রেখে দিলাম। কিন্তু এর বাস্তবায়নকৃত ব্যবস্থার দিকে আমরা যাই না। যার জন্য এটার কার্যকারিতা হয় না। এজন্য প্রাথমিক স্তরটা শিখতে হলে একটি অছিলার মাধম্যে শিখতে হবে। এই অছিলাটা হলো একজন পীর বা মোর্শেদের কাছে দীক্ষিত হতে হবে বা মুরিদ হতে হবে বা বায়াত গ্রহণ করতে হবে। এই বায়াত হবার পরে পীরের দেওয়া মোরাকাবা এবং মোশাহেদার অনুশীলন করতে হবে।

তাহলে আমরা এবার আসি দ্বিতীয় স্তরে মোরাকাবা এবং মোশাহেদা। তাহলে মোরাকাবা মোশাহেদা কি রসূলের (সাঃ) (আঃ) আকিদায় ছিল ? এটা আমাদের দেখতে হবে। রসূলের (সাঃ) (আঃ) জিন্দেগীর ২৫ বছর সময় থেকে নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন জাবালে নূর পর্বতে এই মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত ছিলেন। মুসা (আঃ) তুর পর্বতে ধ্যান সাধনা করেছিলেন। বড় পীর আব্দুল কাদির জীলানী (রহঃ) ১৮ বছরের ধ্যান সাধনা গভীর জঙ্গলে করেছিলেন। হযরত ওয়ায়েছ ক্বরনী (রহঃ) গভীর অরণ্যের মাধে ধ্যান সাধনা করেছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এভাবে যত নবী-রসূল, ওলিদের আগমন ঘটেছে তাঁরা সবাই এভাবে নির্জনে আল্লাহ্‌কে পাবার ধ্যান সাধানা বা মোরাকাবা মোশাহেদা করেছেন। তারা জাগতিক বা রূপক কোন মসজিদে এই কার্য করেন নি।

তাহলে আমরা যদি উম্মতে মোহাম্মদী হয়ে থাকি, তবে কেন তাঁর সেই আমলটা এখন আমাদের ভিতরে কার্যকারিতা পায় না ? এর কারণ কি ? কারণ হলো এই আমল নীতি থেকে মানুষকে ডাইভার্ট বা সরানো হয়েছে। এই অনুশীলন কার্যকারিতা না পাওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন ভাবে নাজেহাল হই। কারণ এই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে একটি মানুষ কোরআনুল মাজিদের এই প্রতিফলন বা বাস্তবায়নের রূপের যে ধারা সেটা

একটি দেহেতে কার্যকারিতা পায়। তাহলে এই কার্যকারিতার আমল রসূলের (সাঃ) (আঃ) জিন্দিগিতে যদি আমরা একটু ভাববাদী ব্যবস্থায় অর্থাৎ মনে মনে যদি ভাবনাতেও আসি, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সময়টা সেই সময়টাই উঁনি কিন্তু এই জাবালে নূর পর্বতে কাটিয়েছেন। অর্থাৎ মা খাদিজাতুল কোবরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর রসূল (সাঃ) (আঃ) এই জাবালে নূর পর্বতে অর্থাৎ হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এটাকে বাংলাতে ধ্যান বলা হয় আর আরবিতে মোরাকাবা মোশাহেদা বলে।

তাহলে মোরাকাবা মোশাহেদা বাংলাতে যদি একটু বিস্তারিত বুঝতে চাই, তা হলো কাবায় মৃত্যু বরণ করা। অর্থাৎ এই কাবাটা একটি জ্যান্ত কাবাতে নির্ধারণকৃত ব্যবস্থার মধ্যে মৃত্যু বরণ করা। রসূলের (সাঃ) (আঃ) হাদিস শরীফে আসছে যে:- "মওতা কাবলা আনতা মওতু"। অর্থ :- তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই মরিয়া যাও। এই মরাটা কেমন ? তাহলে এই মরাটাই হলো সেই মরা যে, আমার দেহে সকল চৈতন্য ক্রিয়াশক্তি থাকবার পরেও এত কিছু থাকতে আসলে আমি মৃত একটি রূপ। আর এই মৃত রূপটাই কাবায় মৃত্যুবরণ করাকে মোরাকাবা বলে। আর মোশাহেদা হলো ধ্যেয় বস্তুকে সামনে রাখা। অর্থাৎ আমি যে উপলক্ষ্য, যে ভিউ বা যে চিত্রকে ধারণ করে আমার সেই ভজন সাধনকে জাগরিত করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছি সেটাকে ফলপ্রসূ করবার জন্য এই প্রচেষ্টা। তাহলে এই হলো মোশাহেদা অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুটা সামনে আনা অর্থাৎ কল্পনাকে বাস্তবায়িত রূপে প্রতিফলিত করা হলো মোশাহেদা।

এটাকে যদি আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বুঝতে চাই, তাহলে টেলিভিশন তো আবিষ্কৃত হয়েছে। এই টেলিভিশন আমরা বেশির ভাগ মানুষই দেখে থাকি। এই টেলিভিশন আবিষ্কার করেছেন হলো স্যার এলজন বেয়ার্ড। সংক্ষিপ্ত নাম হলো লেজি বেয়ার্ড বলা হয়। এই টিভি যিনি আবিষ্কার করেছেন তার এই আবিষ্কার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাকে প্রশ্ন করলেন বা তাকে জিজ্ঞ্যেস করলেন যে, আপনি এটা কি ভাবে সম্ভব করলেন ? তখন তিনি বললেন যে, প্রথমে আমি একটি মানব দেহ বা মেন্টাল বডি নিয়ে গবেষণা বা থিসিস করি। এই মানব দেহ নিয়ে দীর্ঘ সময় থিসিস করতে করতে এক সময় গিয়ে দেখি এটা রূপান্তর হয়ে গেল। এই রূপান্তরকৃত দেহটা যে আমি পেলাম সেটাকে আমি নাম দিলাম অস্ট্রাল বডি বা জ্বতির দেহ।

অর্থাৎ রূপান্তরিত একটি রূপ। অর্থাৎ যে দেহটা, যে আকৃতিতে, যে ধারায় আমি নিয়েছিলাম সেটা আর ঐ ধারায় নাই। সেটা একটি আলোকিত ধারাতে জারীয়া হয়ে

গেছে। তাই সেই আলোকিত ধারাকে যখন আমি পেলাম তখন আমার মধ্যে কৌতুহল এলো। অর্থাৎ থিসিস সম্পর্কে বুঝাতে আজকে বিজ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো এই কম্পিউটার, কম্পিউটার থেকে এই মোবাইলের আবিষ্কার।

তাহলে এটা দীর্ঘকাল গবেষণার মাধ্যমে এটা আবিষ্কার হয়। থিসিসেরই একটি রূপ যখন যান্ত্রিক উপায়ে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তখন পন্য হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। তাহলে যিনি তৈরী করেছেন তাকে এই সাধনা গুলি করতে হয়েছে। না কি একা একা এটা মানুষের কাছে এসেছে ? ওটা থেকে নিয়ে মানুষ বিভিন্ন কোম্পানিতে তৈরী করে মার্কেটে ছাড়ে। তাহলে যিনি আবিষ্কার করেছেন ওইটা হলো মূল। আর যত ভুল-ভাল, রং-ঢং শৈলিতে যত কোম্পানি বানিয়েছে, যার যার কোম্পানির লোগো দিয়ে সেটা তারা মার্কেট বা বাজারজাত করে। একটু ভিন্নতার আলোচনা এসে গেল।

যাই হোক তাহলে এই মেন্টাল বডিটাকে যখন তিনি স্থানান্তরিত করল তখন সেটা অস্ট্রাল বডি হয়ে গেল। তখন উনি বললেন যে, এই অস্ট্রাল বডিটাকে নিয়ে আমি আরও দীর্ঘ সময় আমার মধ্যে কৌতুহল যে, এটার আরেকটি রূপ কি হতে পারে বা এটার পরিবর্তন হয় কি না ! আমি আরও গভীর থিসিসে মনোনিবেশ করলাম। এই মনোনিবেশ করার পর আমি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর আমি দেখতে পেলাম যে, এটা আরেকটি চূড়ান্ত রূপান্তর আকৃতিতে ফলপ্রসূ হয়ে গেল। সেই ফলপ্রসূ রূপটার নাম দিলাম হলো অকেশনাল বডি। অর্থাৎ নিমিত্ব দেহ। তাহলে তিনটি স্তর অর্থাৎ এই অকেশনাল বডিটাই সৃষ্টিরাজ্যে বিচ্ছিরণকৃত অর্থাৎ এটা যেতেও পারে ফিরে আসতেও পারে। অর্থাৎ একটি টিভির যদি মনে করেন যে, আজকে সারা পৃথিবীতে যদি দুই কোটি টিভি থাকে এবং সেখানে যদি সোনি চ্যানেল থাকে, তাহলে সোনি চ্যানলে যেটা ছাড়বে দুই কোটি টিভিতেই সেটা দেখা যাবে। আসলে মূল অনুষ্ঠান কিন্তু এক জায়গাতেই হয়।

তাহলে এই মোরাকাবা মোশাহেদার মূল কার্য হলো, আসলে আমাদের একের যে মূল ধারার নিশানা বা চাওয়া, অর্থাৎ ধর্মীয় আঙ্গিকে যদি আমরা বুঝতে চাই যে, সবার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌কে চাওয়া বা আল্লাহ্‌কে লাভ করা বা তাঁর দর্শন লাভ করা। তাহলে এই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে এই মূলকে হাজির নাজির করা। এই মূল যখন বিচ্ছুরণকৃত অবস্থায় শক্তি পায় বা এজাযত পায় তখন সে বিচ্ছুরণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত হয়। যেমন:- যার কথা না বললেই নয়, বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জীলানী কয়েকজন ভক্তের বাড়ীতে একই সময় রোজার দিনে ইফতার সম্পন্ন করেছিলেন।

কিভাবে করেছিলেন ? তাহলে এই বিচ্ছুরণকৃত ব্যবস্থায় অর্থাৎ যিনি এই প্রক্রিয়াতে ত্বরান্বিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তার দ্বারা এই কাজটা সম্পন্ন হয়। এভাবে এই দর্শন বা মোরাকাবার মাধ্যম দিয়ে একটি মানুষ প্রকৃত স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে। তাই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবার পরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি তাকে দুনিয়াতে ধর্মীয় দর্শনের প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়, এই তিঁনিই আল্লাহ্‌র ধর্মীয় প্রতিনিধি হন।

এভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে ধর্মকে ধারণ করতে শিখিয়ে যায়। এই শিক্ষায় কিতাবের কোন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এগুলো কাজ করে না। এখানে এটার কোন মূল্য নেই। এজন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার নবী, রসূল, পায়গাম্বার যারা এসেছেন, তাঁরা কেউ-ই কলেজ, ভার্সিটি, মাদ্রাসা এগুলোতে লেখা পড়া করে ধর্মকে শিখায়নি তারা এই আধ্যাত্মিকতার বলয় বা মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজেদেরকে আত্ম জাগরণ করে, কালামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিভাবে একটি দেহকে কিতাবে পরিণত করতে হয় সেই সুশিক্ষা দিয়ে ধর্মকে ধারণ করতে শিখিয়েছেন। এই ধারার শিক্ষাগুলো ওলিরা দিয়ে থাকেন। তাহলে চলমান আমরা যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান দ্বারা এটাকে বিশ্লেষণ করে বা মোডিফাই করে সকল কিছু বুঝতে চাই। কিন্তু এটা লেখাপড়ার কোন জ্ঞান নয়। এটাকে বলা হয় ওলিদের ভাষায় এলমে লাদুনী অর্থাৎ এটা সৃজনকৃত জ্ঞান বা সীনা হতে সীনার জ্ঞান।

তাহলে একটি মানুষকে সৃজিত হতে হবে। তাহলে এই সৃজিত করবার যে প্রণালী সেই প্রণালীর দুইটি স্তর, এক হলো একজন ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়ত বা মুরিদ হওয়া, দুই হলো মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত লাভ করা বা পরিপূর্ণতার দিকে নিয়োজিত করা। তাহলে এইটা সফল হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জারীয়া হয়। এই জারীয়াকৃত ব্যবস্থা হলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহ্ সবাইকে জারীয়া করে দিলে তো হয়েই গেল। কিন্তু এটা তেমন বিষয় না। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামপাকে বলছেন যে:- ইয়াদু আল্লাহু লিনুরিহি মাইয়া শাউ। অর্থ:- যখন যাকে খুশি তিঁনি তাঁর দিকে নিয়ে নেন। তাহলে এই যাকে খুশি আল্লাহ্ নিয়ে নেন, সবাইকে নিয়ে নিলে তো হয়েই গেল। তাহলে আল্লাহ্ যে নেন না, তাহলে তিঁনি দোষ করে না ? আল্লাহ্ দোষী না ? কিন্তু এটা তা নয়, বোঝাটা আমাদের জন্য হিতে বিপরীত হয় বা ভিন্নতার মাত্রায় আমরা বুঝার জন্য এরকম দৃষ্টি ভঙ্গির উল্টাপাল্টা হয়। মূলকে বুঝতে হলে দৃষ্টি ভঙ্গিকে বদলাতে হবে সব সময় পজিটিভ ভাবতে হবে। তো পজিটিভ ভাবনাটা হলো

এমন যে, আল্লাহ্ যে নিয়ে নিবেন সেই নেওয়ার মতো একটা যোগ্যতা আমার মধ্যে রয়েছে কি না! সেটাও তো বুঝতে হবে।

দুনিয়ার জিন্দিগিতে জাগতিক ভাবে আপনি যদি একটি কর্মে লিপ্ত হতে যান, তাহলে সেই কর্ম সম্পর্কে আপনার জানা থাকলে আপনাকে তারা স্বাদরে গ্রহণ করবে। আর সেই কর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান না থাকলে তারা কেউ আপনাকে নেবে না। তাহলে আল্লাহ্ যে তাঁর দিকে নিয়ে নিবেন সেই গুন ক্ষমতা বা যোগ্যতায় ত্বরান্বিত তো হতে হবে, তবেই তো তিনি নিবেন। না হলে তাঁর নেওয়াটাও আমরা বুঝি না, তাঁর দেওয়াটাও আমরা বুঝি না, অর্থাৎ কাঁনা। এজন্য সাধক বাউল লালন সাঁইজি বলেছেন যে:- "এক কাঁনা কয় আরেক কাঁনারে, চলো রে যাই মন ভব পারে, নিজেই কাঁনা পথ চিনে না পরকে ডাকে বারং বার, এ সব দেখি কাঁনার হাট বাজার"। এই কাঁনার হাট বাজারের মত আমাদের ধর্মীয় দর্শন এখন মুখস্থ বিদ্যার উপর জারীয়া হয়ে গেছে।

যদি মোরাকাবা মোশাহেদা করতে বলা হয়, তাহলে মুসকি হাসি দিয়ে মানুষকে ব্যাঙ্গ করতে দেখা যায়। আর যারা এটাকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হয়, তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে লাঞ্চনা গঞ্জনা দিয়ে বিতাড়িত করবার উপক্রম করা হয়। তাহলে কি দিয়ে ধর্মীয় দর্শন দাঁড়াবে ? কিন্তু সত্য কখনও পিছু পাঁ হয় না। সত্য শত আঘাত গঞ্জনার মধ্য দিয়ে যে কেউ এটার উপর নিজেকে স্বক্রিয়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে এবং তার পীর বা মোর্শেদের নির্দেশক্রমে মোরাকাবা মোশাহেদা চালিয়ে যায়, তাহলে সে সত্য লাভ করতে পারে। এজন্য পীর বা মোর্শেদ বড় না, বড় হলো সত্য লাভ করা। তাহলে এই সত্য লাভ করতে হলে অবশ্যই এই আকিদার মধ্যে আমাদের নিহিত হতে হবে।

তাহলে রসূলের (সাঃ) (আঃ) আকিদায় সবচেয়ে মূল্যবান সময় ছোট শিশু থেকে শুরু করে ২৫ বছর পর্যন্ত নিজেকে আল আমিন বা সত্যবাদী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাহলে যৌবনের উন্মাদনা তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী যে ক্রিয়া সেটাইতো ২৫ বছর। অতঃপর ২৫ বৎসর থেকে ৪০ বৎসর বা নবুয়্যতির পূর্ব পর্যন্ত তিঁনি হেরা গুহায় ধ্যান সাধনার মাধ্যমে নবূয়্যতি লাভ করলেন। এই সময়টা তাঁর জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই সময় হেরা গুহায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। রসূলের (সাঃ) (আঃ) হায়াতের জিন্দিগি সম্পর্কে জাহেরি জগতে যেটা প্রকাশিত রয়েছে সেটা হলো ৬৩ বছর আমরা সবাই জানি। তাহলে তার মধ্য থেকে আপনি ২৫ বছর উপন্নিত হবার যে সময়টা সেইটা সবচেয়ে মূল্যবান সময় কি না একটু ভাববেন ? এই

মূল্যবান সময় মা খাদিজাকে রেখে উনি জাবালে নূর পর্বতে বা হেরা পর্বতের গুহায় মোরাকাবা মোশাহেদাতে পরিগমন করেন। তাহলে এই আমল নীতিতে আজকে আমাদের সমাজে কার্যকারিতা নেই। দুনিয়ার জিন্দিগির কোন দেয়ালের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি ? এগুলো আমাদের মধ্যে কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূ পায় না। এজন্য এ বিষয়গুলো বিভ্রান্তির দিকেই রয়ে যায়।

তাহলে এই মূল্যবান সময় আপন বিবিকে রেখে মোরাকাবা মোশাহেদা বা এই ধ্যান সাধনার কার্যসম্পন্ন হয়েছে। আজকের জামানায় যদি কোন সন্তান এরকম কার্যকরে, তার স্ত্রী বা তার বাবা-মা কী অনুমতি দেবে বলেন ? তাহলে ধর্মটা কত ক্রিটিক্যাল এবং কত শক্তিশালী আবরণকৃত বলয় দ্বারা এটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। যে বলয় থেকে আমরা আর সহজে বের হতে পারছি না, মূল ধারাকে আর বুঝতে পারছি না। এজন্য নবুয়্যতি বা প্রতিনিধি লাভ করবার যে প্রক্রিয়া, সেই অনুশীলন বা মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো যদি কেউ করে থাকে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে সত্যের জালুয়াটা কিভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় বা সত্যের কার্যকারিতা কেমন হয়?

অর্থাৎ দুইটি আমল। মনে রাখবেন রসূলের জিন্দিগিতে জন্ম লাভের পর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত একটি মাত্র আমলে জারীয়া ছিল। সেটা হলো নিজেকে ২৫ বছর পর্যন্ত আল-আমিন বা সত্যবাদী বলে সবার কাছে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্‌র ছেলে মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) সত্য কথা বলে দ্বিতীয় আর কোন আমল তখন আসেনি। তাহলে এই যে আমল নীতিটা, এই আমল নীতিটা আমার আপনার সবার জন্য একটি প্রয়োগ পদ্ধতি করেছেন। আর দ্বিতীয় হলোঃ- ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন সময় অসময়ে উঁনি ধীরে ধীরে একাকীত্বে অর্থাৎ সেই ২৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় একাকীত্ব ভাবে মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত ছিলেন, সেই আমলের দ্বারাই উঁনি নিজের পরিশুদ্ধতা লাভ করেছিলেন। আর এগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করেছিলেন।

জাবালে নূর পর্বত বা হেরা পর্বতের গুহায় জিব্রাঈল আমিনের আগমন ঘটে। তাহলে জিব্রাঈল আমিন এসেছে এটা নগদ। জিব্রাঈল আামিনকে যে রসূল (সাঃ) দেখেন কিন্তু রসূলের সাহাবারা তাকে দেখে না। কেন ? কারণ তারা বেশির ভাগই এই আমলটা করে নি। তাহলে আজকের দিনে আপনি এই আমলটা করলে এর হাকিকত বা এর যে একটি রহস্যময় ঘটনা গুলি রয়েছে এটা বুঝতে পারবেন।

এজন্য ওলিরা তাগিদ করে মোরাকাবা মোশাহেদার। কিন্তু মানুষ এদিকে যেতে চায় না। কারণ এটা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। তাহলে এটাকে বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাকে এই প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। তাহলে কোরআনুল মাজিদের আয়াত জিব্রাঈল আমিন এনে রসূলকে (সাঃ) (আঃ) দিলেন, তাহলে সেটাও তো সেই হেরা পর্বতের গুহায়। মক্কা, মদিনা কোথাও কিন্তু প্রথমে এই আয়াতে কারিমা জারী হয় নি। যদি জারী হয়ে থাকে তাহলে সেই সাধনার অর্থাৎ রসূলের (সাঃ) (আঃ) মোরাকাবা মোশাহেদার স্তরেই কোরআনুল মাজিদ পেয়েছেন।

তাহলে এটা নগদ পেয়েছেন, জিব্রাঈল আমিনের দর্শন সেটাও নগদ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে নবুয়্যতের সনদ করা হয়েছে, সেটাও নগদ। ধর্মীয় দর্শনের মূল আকিদা গুলো যদি নগদ হয়, তাহলে আমি আপনি কেন বাকির লোভে এভাবে থাকি ? তাহলে এই নগদের যে ধারার আমল নীতি গুলো আছে, সেই নীতি গুলো অনুযায়ী একজন কামেল ওলি বা মোর্শেদের স্মরণাপন্ন হয়ে তার দেওয়া আমল গুলো বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত হবার জন্যই আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রতিনিধিগণ বলে গেছেন। এই অনুশীলন বা কারিকুলাম বাস্তবায়নে পূর্ণতা লাভ করলে ধর্ম সম্পর্কে আপনাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে না। কারো স্মরণাপন্ন হতে হবে না, কারো দারস্ত হতে হবে না। মূল ধারার বিষয় গুলো এমন।

এজন্য মূল বিষয় গুলো সম্পর্কে এই ইখলাস পয়দা হওয়ার ব্যাপারে আমি হয়ত আপনাদের মাঝে একটু তুলে ধরলাম। এজন্য ওলি বা মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। এটা কার্যকর না পাওয়ার যে বন্ধন, এই বন্ধনটা হলো আমরা বলে থাকি সুফি ভাষায় মন্দ সত্ত্বা বা শয়তান। কাম, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, মোহ, মাৎসর্য এগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে, মন্দ সত্ত্বার শিঁকলে বন্দি হৃদয়ে স্রষ্টার দর্শন হবে না। কোরআন, হাদিসে যত উপদেশ আছে মূলত এই মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বাকে বিতাড়িত করে আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হবার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে লীন হবার জন্য এই সকল বিধি-বিধান।

আল্লাহ্‌পাক কালামপাকের পৃথক পৃথক আয়াতে মন্দ সত্ত্বা বা শয়তানি সত্ত্বা সম্পর্কে বলছেন যে:-

১) আউযুবিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম।

অর্থ:- বিতাড়িত বিদ্রোহ শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২) ফাসাযাদু ইল্লাহ্ ইবলিস।

অর্থ:- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী সেজ্‌দা দিল না।

অর্থাৎ ইবলিস সেজ্‌দা দেয় না।

৩) আত্তালে বুদ্দুনিয়া মরদুদ।

অর্থ:- যে কেবল দুনিয়া চাইল বলে দাও সে মরদুদ নামে শয়তান।

৪) মিনশার্‌রিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস।

অর্থ:- তুমি খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নাও।

তাহলে কোরআনুল মাজিদের ভাষায় শয়তানের চারটি রূপ। যথা:- শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ, খান্নাস। এই চারটি সত্ত্বাকে একত্রে প্রচলিত ভাষায় এক কথায় শয়তান বলা হয় ।আল্লাহ্‌পাক মন্দ সত্ত্বা বা শয়তান সত্ত্বাকে এই চারটি নাম বা চারটি লকব বা চারটি খেতাবে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথক আয়াত জারী করেছেন। আর আমরা শয়তানকে শুধু শয়তান বলে থাকি কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তা বলেন নি। তাহলে আল্লাহ্‌র কথা আর আমাদের কথা কম-বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই পৃথক পৃথক যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার দ্বারাই এই আমাদের মধ্যেই শয়তান বাইরে নেই। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা রয়েছে।

যখন রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই শয়তান রয়েছে। তখন এক সাহাবী জিজ্ঞ্যেস করলেন, ইয়া রসূলআল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাহলে আপনার সঙ্গেও কী ? আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও একজন শয়তান ছিল তাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি। তাহলে এই শয়তান মুসলমান হলে আমি মুসলমান। এজন্য আল্লাহ্‌পাক সূরা বাকারার ১৩২ নাম্বার আয়াতে দেখিয়ে দিলেন যে নবীর ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমান হয় না, মুসলিম হতে হয়। তাই এই আয়াতে ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর সন্তানদের মুসলমান হবার জন্য এবং ইয়াকুব নবীও (আঃ) তাঁর সন্তানদের মুসলমান হবার জন্য তাগিদ করছেন। অথচ আমরা জন্মগত ভাবে বাবা মা মুসলিম সেই ওরসজাতে দুনিয়াতে এসে মুসলিম দাবি করি। এটা জন্মগত মুসলিম কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রকৃত বিধানের যে মুসলিম সেই মুসলিম নিজেকে হতে হয়। আর এই মুসলিম স্বত্ত্বা হলেই

সকল কিছুর পরিপূর্ণতা ফলে, ধর্মের কার্যকারিতা পায়।

এজন্য ধর্মের কার্যকারিতার মূল যে কাজ সেটাই হলো এই মন্দ স্বত্ত্বা থেকে উত্তোরণ। অর্থাৎ শয়তানি স্বত্ত্বা থেকে নিজেকে বাহির করতে হবে। তাহলে এই শয়তানি স্বত্ত্বা থেকে বাহির হতে হলে কি করতে হবে সেই প্রক্রিয়া গুলো ওলি বা পীর মোর্শেদ দিয়ে থাকেন। দুনিয়ার কোন স্থাপত্যে এটা রাখা নেই যে অমুক জায়গায় জীবন্ত শয়তান আছে। শুধু রূপক আকারে মক্কায় রাখা রয়েছে, ছোট, বড় এবং মেজ শয়তান। কারণ এই শয়তান কোথায়ও আঘাত করে না, শুধু এই মানুষের মনে বা হৃদয়ে। এই হলো তার অবস্থানের জায়গা। আর কোথায়ও থাকবার অধিকার তাকে দেওয়া হয় নি।

আবার আল্লাহ্পাক এই হৃদয়ে বা ভিতরে অবস্থান করে। তাহলে উভয়ের স্থানের জায়গাা একই। কিন্তু আসলে একটা থাকলে অপরটা হয় না। যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে পজিটিভ অকার্যকর আর যদি পজিটিভকে কার্যকরি করতে হয়, তাহলে নেগিটিভকে অপসারণ করতে হয়। এই হলো একটি প্যাঁচ। এই নেগেটিভকে যদি অপসারণ না করতে পারি তাহলে আমার আর মুসলিম হওয়া হলো না, এটা নামের মুসলিম। উপ আনুষ্ঠানিকতার উপর কিছু আমল নীতি আর কিছু পোশাকই সভ্যতার আলোকে এই ডিজাইন করে আমি দুনিয়াতে দেখিয়ে চলে গেলাম যে, আামি একজন আমলধারী বা মুসলমান। আসলে কাঁনা হয়ে ফিরে গেলাম। আল্লাহ্পাক বলছেন যে, যে দুনিয়াতে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। এই অন্ধ অর্থ চোখ কাঁনা না, এই অন্ধ হলো চৈতন্য ধারাকে জাগরণ করে না দেখার অন্ধ।

তাই এজন্য দর্শনবাদে হলো ধর্মের পূর্ণতা। আজ অনেকেই দর্শনবাদ মানে না এটা সত্যিই কষ্টের। কারণ তার জ্ঞান বা তার যে আকিদা মেধা সেটা ভিন্ন খাতে প্রভাবিত হচ্ছে। এজন্য সে মানে না। কিন্তু ধর্মীয় সকল দর্শন সুফিদের আকিদার ভিত্তিতে এটা জারীয়া হয়েছে বা চলমান রয়েছে। তাই সেই প্রক্রিয়াগুলো বাস্তবায়ণের জন্য এই চারটি স্বত্ত্বা, যদিও আমরা একত্রে নাম শয়তান বলে থাকি। এই শয়তানি সত্ত্বাকে দূর করে মুসলান হবার প্রক্রিয়ায় প্রথমে একজন কামেল ওলি বা মোর্শেদের কাছে সারেন্ডার হতে হবে। এরপর সুফিদের বা ওলিদের মূল আমল নীতি হলো তাসাব্বুরে শায়েখ। অর্থাৎ একজন পীর বা মোর্শেদের কাছে যখন একজন মুরিদ বা বায়াত হয়, তখন তাকে যে আমল নীতিতে দাঁড় করানোর জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয়, সেটাই হলো তাসাব্বুরে শায়েখ।

তাসাব্বুরে শায়েখ কী ? অর্থাৎ এই হাত আর আমার নেই, এই হাত আমার মোর্শেদের হাত, এই চোখ দিয়ে আমি আর দেখি না, এই চোখ দিয়ে আমার মোর্শেদ দেখেন, এই মুখ দিয়ে আমি আর কথা বলি না, এই মুখ দিয়ে আমার মোর্শেদ বলেন। এভাবে সর্ব অঙ্গ বা দেহটাকে যদি রূপান্তর বা স্থানান্তরিত করা যায়, সেটাই হলো তাসাব্বুরে শায়েখ।

শয়তান কোন কর্মে বন্ধন তৈরী করে না কিন্তু এই কর্ম যখন একটি মানুষ করতে যায় তখন সে উপলব্ধি বোধ দ্বারা বুঝতে পারে যে, সকল আমলে বন্ধন তৈরী হয় না, অথচ এই তাসাব্বুরে শায়েখ করতে গেলে কেন এটা পারি না ? এই উপলব্ধির কারণে দীর্ঘ সময় মোর্শেদের নিকটবর্তী সহবতে থাকতে হয়, তার দেয়া আমল নীতি গুলো আঁকড়ে ধরে তিল তিল করে এই নিজের দেহ ভান্ড থেকে ঐ সকল অপশক্তিকে বা মন্দ সত্ত্বাকে অপসারিত করলে, সে কামিয়াব হয়।

তাসাব্বুরে শায়েখে থাকতে থাকতে যখন মন্দ সত্ত্বা দূর্বল হয়ে যায়, তখন মন্দ স্বত্ত্বা আর কাজ করতে পারে না। এই মন্দ সত্ত্বাকে যদি আপনি ধরতে পারেন, এই ধরা দিলে তাকে যদি কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করতে পারেন, তাহলে সে আর এই বিদ্রোহ বিড়ম্বনা বা স্রষ্টামুখী কর্তৃত্বের উপর বন্ধন তৈরী করতে পারে না। তাহলেই সে মুসলিম হিসাবে পরিগনিত হয়। তার সকল কার্য ফলপ্রসূর দিকে ধাবিত হয়। তখন পজিটিভ বা মওলা সত্ত্বা কাজ করে। আর আমরা যারা প্রতিনিধিত্ব করি এটার জন্য আরও উচ্চ স্তর। কারণ এটার স্বীকৃত সনদ লাগে। এটার সনদ যদি না হয়, তাহলে এটা কার্যকারিতা পায় না। এজন্য মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই বা বুঝতে চাই বা এই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই এই চ্যাপ্টার গুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। কথা দিয়ে কোন কিছু হয় না যদি কার্যকারিতা না ফলে।

এজন্য বড় পীর সাহেব উনি বর্ণনা করেছেন যে:-

“যখন তুমি কোন পীরের নিকট গমন কর

তখন জাহেরি বিদ্যাকে পরিত্যাগ করে যেও”

কারণ জাহেরি বিদ্যাটায় যদি সকল কিছু হয়ে যেত, তাহলে তোমার পীরের নিকট গমন করবার বা কিছু শিখতে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বর্ণনা করেছেন যে:-

**"কোরআন কিতাব যা কিছু আছে সব পানিতে ফেলে দাও ওখানে আল্লাহ্ নেই।
আল্লাহ্কে যদি পেতে চাও তাহলে তুমি শামসেত্তাব্রিজের গোলামি কর"**

অপর বাণীতে মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বর্ণনা করেছেন যে:-

"কোরআনের তাফসির যদি কোরআন হত বা হাকিকত হত

তাহলে রুমিকে শামসেত্তাব্রিজের কাছে যেতে হত না

কারণ রুমি একাই কোরআনের তাফসির লিপিবদ্ধ করতে পারে"

তাহলে এই জ্ঞান, এই ধারাবাহিকতা একটু ভিন্নতা। এজন্য এই ধারাবাহিকতার এই প্রয়োগ পদ্ধতি। এই মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে কথা কম। যারা সাধক পর্যায়ে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে অ্যানালাইসিস করে বা রিয়াযত করে কার্যকারিতা করার জন্য প্রচেষ্টা করে। তাদের কাছে এই কথা গুলো একটা বন্ধন হয়ে যায়। কারণ কথা দিয়েতো আসলে এগুলো বোঝানো যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। এটাই কষ্টের হয়ে যায়। এজন্য সাধকদের মূল কার্য কারিকুলাম থাকে ভাববাদী ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা।

এজন্য ওলিদের মাহফিলে আমরা দেখে থাকি সামা, কাওয়ালি বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে মাস্তির হালে নাচছে। কারণ মূল ধারার জাগরণকৃত ঐশি যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাকে আনায়ন করবার জন্য বা সেই ব্যবস্থাকে দৃষ্টিপট বা বিতরণ করবার প্রচেষ্টাতেই আনুষ্ঠানিকতা গুলো হয়। এটাকে হয়ত জাগতিক বিধি বিধানের আলোকে আমরা অনেক রকম মন্দের মূর্ছনায় বলাবলি করে থাকি। কিন্তু এটা ঠিক না। এটা যে আমরা বুঝতে পারিনা, এই কথা আমরা কোন দিন স্বীকার করি না। এটাই হলো আমাদের এক ধরণের শয়তানি ধোঁকা। বাবা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশেখর (রহঃ) বলেছেন:- অনুমানের উপর কথা বলে দিলকে শয়তানের খেলার পুতুল করা উচিৎ নয়। সক্রেটিস বলেছেন:- প্রশ্নে ভরা দুনিয়া। জ্ঞানীরা কনফিউজড। বুঝতে পারা সম্ভব না, তা যখন বুঝবেন, তখনই প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ পেলেন। বোকাদের কাছে উত্তর বেশি থাকে।

এজন্য সবাই চেষ্টা করবেন, যে আলোচনাটুকু করলাম, এই আলোচনার উপর অন্তত কার্যকারিতা ফলাবেন। যদি কার্যকারিতা না পায়, দিনভর জন্ম লাভের পর থেকে যে পর্যন্ত আপনার জ্ঞান হয়েছে, তখন থেকেই ধর্মের এরকম কথা আমরা শুনি। কিন্তু বাস্তবায়নের দিকে নিজেদেরকে নেই না। যার কারণে আমাদের পূর্ণতার ফলপ্রসূ বা

কার্যকারিতা হয় না।

তাই যে আলোচনাটুকু রাখলাম, সেটা কার্যকারিতা করবার জন্য চেষ্টা করবেন। তাহলে এই সকল কিছু সহজ হবে এবং মান্যতার ধর্মটাই হলো বড়। জানা সহজ, মানা কঠিন। কারণ ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা গুলো আমরা কিতাবে বা দলিলে উপস্থাপন দেখি, তাহলে তার বাস্তবায়ন যদি নিজেরা না করি, তাহলে এর স্বাদ হবে না। এটা শুধু কথার মধ্যেই থেকে যাবে। তাহলে আমাদের ধর্মের পালনকৃত ব্যবস্থাটা হবে রূপক। কিন্তু ধর্ম রূপক নয় ধর্ম হলো হাকিকত অর্থাৎ এর ভিউ রয়েছে। এটার দৃশ্যায়ন রয়েছে অর্থাৎ এর দর্শন রয়েছে। এই দর্শনকৃত ঈমান বা হালের যে অবস্থা, সেই অবস্থাটা হলো পরিপূর্ণতার একটি হাল অর্থাৎ সত্যের জগৎ। এজন্য আমার মোর্শেদ কেবলা বলে থাকেন যে, পীর বাবা বড় না বড় হলো সত্য। তাহলে তুমি সত্য লাভ কর। আমার কাছে এসে তুমি যদি সত্য লাভ করতে না পার তাহলে তুমি অন্য পীরের স্মরণাপন্ন হও। সেখানে গিয়ে হলেও তুমি সত্য লাভ কর। অর্থাৎ সত্যটা বড়।

চূড়ান্ত পর্যায়ের মধ্যে যে লা ধারি স্তর, সেই স্তরে যখন ওলিরা পৌঁছে যায়, সেখানে আর দ্বিতীয় কোন বিভাজন থাকে না। এই দ্বিতীয় বিভাজন না থাকলেই সেটাই পরিপূর্ণ স্তর। সেখানে আর পীর থাকে না। তখন যিনি এটাকে ধারণ করে, তিঁনিই তাঁর পীর, তিঁনিই তাঁর মোর্শেদ। অর্থাৎ তিঁনিই একাকার তিঁনিই আল্লাহ্ রূপে ঘোষণা দেন, এই স্তরেই হয়ত ওলি মাশায়েখগণ তাদের ঐ সমস্ত ধারাবাহিক প্রণালির বর্ণনাগুলো দিয়ে থাকেন। এজন্য মূলধারায় যেতে হলে আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন যে:-

১) একজন ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হওয়া।

২) তাঁর দেওয়া মোরাকাবা মোশাহেদা অনুযায়ী নিজেকে স্থায়ী করা, এ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা চৈতন্য লাভ করা।

৩) পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া।

এই তিনটি বিষয়কে কার্যকারিতা করতে হবে। তবেই ধর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারবেন। তা না হলে হয়ত আমি আজকে যেটা বর্ণনা করছি, অপরজন এটার সুন্দর সুন্দর যুক্তি বা কথা উপস্থাপন করলে এটা তখন ডাইভার্ট হয়ে যাবে আপনার কাছে। কারণ আপনি যুক্তি বা সুন্দর কথার মূর্ছণায় পরে আপনি যে সত্যকেই ফেলে দিলেন,

এটা আর বুঝতে পারবেন না। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে কেউ সত্যকে গ্রহণ করবে বা পজিটিভ কাজ করবে, কারো আবার নেগিটিভ কাজ করবে। জ্ঞান নেগিটিভ-পজিটিভ দুই ধারাতে কাজ করে। মাছিরা খোঁজে কোথায় ক্ষত রয়েছে আর মৌমাছিরা খোঁজে কোথায় মধু আছে। দুইটি শ্রেণী:- এক শ্রেণী দোষ খোঁজে অপর শ্রেণী ভাল কিছু সংগ্রহ করে। তেমনি আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যারা অন্যের ভিতরে ভালগুণ গুলো দর্শন করে আর কিছু লোক আছে যারা অপরের নিন্দা করতে ভালোবাসে। সত্যের দর্শন থাকলে আমরা কারো সম্পর্কে উল্টাপাল্টা কথা বলতাম না। তাই সত্যকে লাভ করতে হবে। মহানবী (সাঃ) (আঃ) বিশ্ব শান্তি, শ্রী কৃষ্ণ জীবে প্রেম, যীশু বিনয় এবং নম্রতা, তথাগত বুদ্ধ অহিংসার বাণী প্রচার করে গেছেন, কিন্তু তুমি মানুষ হয়ে যদি কেবল অশান্তিই প্রচার করো, তাহলে তোমার ধর্ম রইল কই!

এজন্য আমি বলে থাকি আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলার আহ্বান করেছেন যে, অনেক কষ্ট করে তিল তিল করে নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে একটি ধ্যান সাধনার স্কুল করা হয়েছে। যদি কারো মনে চায়, অন্য পীরের মুরিদ হলেও আপত্তি নেই। স্কুলটায় গিয়ে সে মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে এই আমল নীতিতে স্টাডি করে বা প্রাকটিক্যাল করে সে সত্য জানতে চেষ্টা করতে পারেন। তিঁনি আরও বলেছেন যে, আসো বসো মুরিদ হও, আমার কথা মত চারটি মাসের একটি মোরাকাবা কর, আইনুল একিন যদি কিছু দেখতে না পাও আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে, তাহলে সে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে গালি দিও যে বাবা আমি কিছু পায় নি। আমি মাথা নিচু করে থাকব। তাহলে এই মোরাকাবা মোশাহেদায় কিছু না কিছু আইনুল একিনের উন্মেষ হয়, জাগরণ হয়। তাহলে সেই স্টাডি গুলো আমরা যেন করতে পারি সেই প্রক্রিয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত হবেন। তাই আপনাদের বার বার অনুরোধ করি। মোরাকাবা মোশাহেদার জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। আপনাদের সকল প্রতিকূলতার বন্ধনকে ছিন্ন করে হলেও এই চার মাসের একটি করে মোরাকাবা করতে হবে। তা না হলে আপনাদের এই মুরিদ হবার স্বার্থকতা থাকবে না।

তাই আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নির্দেশনামা হলো, এই চার মাসের অন্তত একটা মোরাকাবার একিন রাখেন। এর জন্য প্রচেষ্টা করেন এক সময় হয়ত মালিক আপনাকে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবার জন্য সহায় হবেন।

হায়াতে ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

অদ্য ১লা রমজানুল মুবারক ১৪৪১ হিজরী (বিশ্বের যে কোন স্থানে নতুন চাঁদ দেখার ভিতিত্তে), ২৫শে এপ্রিল ২০২০ ইং তারিখে বাবা পর্দা গ্রহণ করেন। অতিব দুঃখের সাথে জানাইতেছি যে, এই খবর জাগতিক বাস্তবে শোনার পর হইতে দেহে প্রাণ আর সক্রিয় ভাবে কাজ করছে না। কিন্তু চলমান দুনিয়া তো আর আমার জন্য থেমে থাকবে না। বার বার পজিটিভ হতে চেষ্টা করি। কোথা হতে যেন অদৃশ্যের ভাবনা ঢেউ এর মত এসে সব হারিয়ে দেয়। এভাবে ক্ষন অতিবাহিত হওয়ায় শরীরটা একটু দূর্বল ও নিস্তেজ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে হৃদয়ে কালো মেঘের আঁধার নেমে আসতে শুরু করেছে।

বাবার নিকট মুরিদ বা বায়াত হবার পর থেকে বাবার বিদায় পর্যন্ত যে সকল স্মৃতি গুলো আমার হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে, সেগুলো বার বার উকি দিয়ে যায়। তাঁর বাণী, আচার-আচরণ, ভাল লাগা-মন্দ লাগা এ সবকিছুর আলোকে মনে হয় এক ব্যতিক্রমধর্মী মানব রূপেই নিজেকে মেলে ধরে ছিলেন। এমন মানব আর হয় না হতে পারে না। আমার খুব একটা বেশি সময় তাঁর নিকটে অবস্থান করার সুযোগ হয় নাই। যতটুকু হয়েছে, তাতে আমার নির্ণয়কৃত জ্ঞান দ্বারা এমন ধৈর্য ধারণ করা মানব খুব কমই আছেন। তাঁর সবচেয়ে যে ভাল গুনটা দেখতাম সেটা হলো, তিঁনি নিজের দুঃখ বা ব্যথাটা কারো সাথে বিনিময় করতেন না। আনন্দময় বিষয় গুলো বা আনন্দের মুহূর্তগুলো শিশুর মত আলাপ চারিতা করতেন।

প্রথম যখন বাবার দরবারে যাই তখন মনে পড়ল (ইমাম জাফর সাদিকের পীর) ইমাম আবু হানিফার কথা :-

“ওলির দরবারে যাও

ওলির দরবারে গেলে তকদির পরিবর্তন হয়

কারণ ওলিরা খোদার জাত”

সভ্যতার আলোকে ধর্ম সম্পর্কেই আমার ধারণা। আধ্যাত্মিকতার মূল বিধান সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নাই। এমন অবস্থা নিয়ে তাঁর দরবারে বা নিকটে উপস্থিত হলাম। বাবা বললেন, সাধনা করার ইচ্ছা থাকলে মুরিদ হও আর ইচ্ছা না থাকলে অনেক দূর থেকে এসেছো খাওয়া দাওয়া করে বিদায় হও। এমন কথাতে যেন মহা সমুদ্রে নিপতিত

হতে লাগলাম। একে তো ধর্মের লেবাস নেই তার উপর আবার এমন নির্দেশনামা। তবে মোরাকাবা মোশাহেদা করলে এখানে সত্য আছে কি না তুমি সেটা জানতে পারবে, সত্য না পেলে চলে যেও। তাই সে দিন তাঁর কথাতে নিরীক্ষা করতে মুরিদ হই। এখান থেকেই সুফিবাদে পথ চলা উনি চালিয়ে নিচ্ছেন।

হতাশাটা যেন কোন ভাবেই দূর করতে পারছি না, এ কারণে কলম ধরেছি। বীণা অনুমতিতে বাবার রুমে কখনই প্রবেশ করতাম না। একদা বাবা বললেন, বাবা তোমার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। তোমার যখন খুশি ইচ্ছা তখনই চলে আসবে, এমন কি যদি তোমার মায়ের সঙ্গেও থাকি তবুও তোমার অনুমতি লাগবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সনদ পৃথিবীর কোন আপনজন দিতে পারে! তবুও তাঁকে চিনতে পারিনি। নিয়তির অমোঘ কালো অন্ধাকার করে বিষাদময় একটি অবস্থা করে দিল। যদিও নফ্স ধারী আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। বুঝবার মত সময় দেননি।

কারণ রমজানুল মুবারক আগত তিন দিন বাকী এমন রাতে বাবা আসলো, আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হঠাৎ বাবার কথাতে চিৎকার দিয়ে উঠি। ঘুমের অবসান হলো। ঘরে বাইরে উকি দিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই, আমার বুঝতে আর বাকী রইল না। চারিদিকে লকডাউন চলছে...১৪৪১ হিজরী, ১৪২৭ বাংলা, ২১ শে এপ্রিল ২০২০ ইং। সেই রাত থেকেই একটি অজানা কষ্ট বুকের মধ্যে চেপে চলতে লাগলাম। এর পূর্বেই দরবারে যাতায়াত নিরুৎসাহিত করেছেন। এভাবেই সময় ফুরিয়ে গেল বাবার সান্নিধ্যে পৌঁছানো হলো না, তিঁনি পর্দা গ্রহণ করে নিলেন।

অস্বস্থির একটি নিঃশ্বাস হৃদয় আসনে স্থায়ী করে নিল। এই স্মৃতিচারণ হয়ত কোন দিন কোন কালেই ভুলতে পারবোনা। একটু ইশারা রাখতে পাঠকের জন্য তুলে ধরলাম। বাবার মুখে যে কথাটা বার বার শুনতাম তা হলোঃ-

"বিনয় এবং নম্রতা যার মধ্যে নাই

তার জন্য সুফিবাদ হারাম"

সুরেশ্বর দরবার শরীফ মোবারকে বাবাকে বিনয়ের সম্রাট খেতাবে ডাকতেন। বাবার সঙ্গে সুরেশ্বর দরবার শরীফে গমন করলাম। একা একা বাবা চলতে পারে না, চারজন মিলে ধরে নিতে হয়। অনেক কষ্ট করে পৌঁছালাম শাহ সুফি বাবা আলম নূরী আল-সুরেশ্বরীর মহলে। সেখানে বাবার বিশ্রামের জন্য দুইটা রুম দিয়েছিলেন। সেখানে বাবা,

আওলাদগণ সহ প্রায় তিনশত'র মত ভক্তকূল।

শরীরে কুলায় না তবুও যেন হার না মানা এক সৈনিকের মত বাবা রুমে অবস্থান না নিয়ে, প্রতিটি আওলাদে সুরেশ্বরীর আস্তানায় গমন করলেন তাঁদের প্রতি তাজিম করতে। বাবার তাজিম (আদব, বিনয়, নম্রতা) ভাষায় উল্লেখ করা দায়। বাবা বেদম ওয়ারেছী আমাকে বললেন, ভাই তুমি বাবার রুমের সামনে থেকে বাবার বিশ্রামের ব্যবস্থা হলে কেউ যেন বিরক্ত না করে।

শীতের রাত, মাঘ মাসের বড় ওরশ। ঘরের সিঁড়ীতে বসে আছি রাত্রি ২টা বাজে (আনুমানিক)। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি নিজেও জানি না। রুম থেকে বাবা বের হয়ে বাথরুম সেরে আবার রুমে ঢুকতেই ডাক দিলেন' দেলোয়ার! আমি জেগে দেখি হায়রে আমার দায়িত্ত্ব পালন। বাবা বললেন, শরীর খারাপ লাগলে বিশ্রাম নাও। এমন করে বলা হয়ত আর কেউ বলবে না। এরকম অজস্র স্মৃতি বার বার স্মরণ করে দেয় যা কখনই ভুলা সম্ভব নয়।

বাবার সহবত যারা পেয়েছেন, তারা বাবার আধ্যাত্মিক মোজেজা পেয়েছেন। বাবা সুফিবাদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং কারিগর। কিভাবে একজন সাধারণ মানুষকে সুফিতে রূপান্তর করতে হয় এটাই তাঁর কারিশমা। শাসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে বাবা এটা করতেন। তাঁর একটি বাণীতে লিখেছেন:-

"শক্তির পূজারী দুনিয়াতে কিছু পেতে চায়

প্রেমের পূজারী সেচ্ছায় সবকিছু হারাতে চায়"

উনার দৃষ্টান্ত ভাষার শৈলীতে উপস্থাপন করা আমার মত গন্ড-মূর্খ অজ্ঞানীর পক্ষে তুলে ধরা বেমানান। তাই উচ্চ শিক্ষিত সুফিবাদের উঁচু সিঁড়ীতে যারা উচ্চে অবস্থান করছেন, আপনারা উপস্থাপন করলে মনে হয় একদিন জাতির জন্য তা উপস্থাপিত হবে। এখানে আবেগ বসত একটু স্মৃতিচারণ করে রাখলাম মাত্র। মওলা সহায় হউন, সকল সুফি ও আশেকদের প্রতি। সকলের কল্যাণ হোক। আমিন।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর মূল্যবান কিছু

বাণী চিরন্তনী

* "অগণিত, অসংখ্য গুণ গুলোকে একত্র করে নাম দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্। আসলে আল্লাহ্ বলতে কিছুই নাই বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ দর্শনের বহু উর্ধ্বের একটি নাম। এই দর্শনটির নামই হলো ফিলোসোফি ইউনিফরচুনেটি অব নেচার তথা প্রাকৃতিক ঐক্যতানের দর্শন"

* "একটি মাত্র চিরন্তন ধর্মের মধ্যে সাধকেরা অবস্থান করেন। ইহাই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ধর্ম, ইহাই রিলিজিয়ন অব ডেডিটেশন, ইহাই হলো নমস্তে, হরিওঁম, ইহাই আরবি ভাষায় ইসলাম"

* "কামেল পীরেরা অনেক ধ্যান সাধনা করবার পর আল্লাহ্পাকের বিশেষ রহমত অর্জন করতে পেরেছেন। সেই রহমতটি আর কিছুই নয়, কেবল খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুহ তথা আল্লাহ্ স্বয়ং রবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন নফ্সটি হয়ে যায় রুহ এর বাহন মাত্র"

* "সত্য সাগরে অবগাহন করার বাসনাটি যাদের প্রবল তাদেরকেই কেবল বলছি গুরু না ধরে ভূলেও সাধনা করতে যাবেন না। কারণ তখন কপালে জুটবে কাঁচকলা। আপন সত্ত্বার সঙ্গে খান্নাসটি অবস্থান করার দরুন গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না। ইহাই খান্নাসের কুমন্ত্রণা"

* "মানুষ নিজের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সত্যটিকে বুঝতে না পেরে উর্ধ্ব গগণে আল্লাহ্র অবস্থানটি আছে বলে বিশ্বাস স্থাপন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থণার ভাষাটি বলতে থাকে"

* "রুহের পরিপূর্ণ দর্শনটিকে আমরা তথা মুসলমানেরা নূরে মোহাম্মদীর দর্শন বলে থাকি। আবার অন্য যে কোন ধর্মের যে কোন সাধক যদি রুহের পরিপূর্ণ দর্শনটি লাভ করে থাকেন আর যদি সেই ধর্মের প্রবর্তকের নামে নূরটির নামকরণ করে থাকেন তাহলে আমার বলার কিছুই থাকে না। কারণ আল্লাহ্ এক তাঁর নূরও এক এবং বীজরূপী রুহের অবস্থানটিও এক"

* "আসলে উলঙ্গ সত্য কথাটি বলতে গেলে বলতে হয় যে, রুহুল আমিন হলো মহানবীর আপন আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি ইহা জগতময় ব্যক্তও হতে পারে আবার যে কোন রূপ মুর্তি ধারণ করতেও পারে। ইহা স্থান-কালের (টাইম এন্ড স্পেস) সব রকম মানুষের আদি এবং আসল রূপ। এই রূপের মাঝে প্রত্যাবর্তন করাই মানব জীবনের পরম এবং চরম স্বার্থকতা। আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের প্রত্যাবর্তন করা তথা ফিরে আসার অর্থটি ইহাই"

* "আল্লাহ্‌র প্রত্যেক ওলি. যাদের আমরা মহা মানব বলে থাকি তাঁরা রুহুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র রুহ"

* "ধর্মীয় অনুশাসনে প্রত্যেকটি বিষয়ের দুইটি দিক থাকে, একটি বাহির অপরটি ভিতর"

* "বৈষয়িক চিন্তা চেতনার মধ্যে যখন একজন মানুষ প্রচন্ড ভাবে ডুবে থাকে তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সত্যের পরিচয় জানবার ধ্যান সাধনা তথা মোরাকাবা মোশাহেদাটি করতে পারে না"

* "একই তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনায় কেউ হেদায়েত গ্রহণ করেন আবার কেউ হেদায়েতের বলয় থেকে ছিটকিয়ে দূরে পড়ে যান"

* "ফেরেশতারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তারা মানুষের চেয়ে জ্ঞানী নয়"

* "দুনিয়ার লোভ ও মোহের সুতাগুলো এতই শক্ত যে মুক্তির দর্শনের আহ্বানটি কানে ও হৃদয়ে প্রবেশ এবং আঘাত করতে পারে না। ইহা তাদের তকদির কি না জানি না, তবে আল্লাহ্ কর্তৃক যে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে সেই স্বাধীনতার বলয় হতে স্বেচ্ছায় মুক্তির দর্শনটিকে তারা আলিঙ্গন করতে চায় না"

* "আপন নফ্‌সের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাস হতে মুক্ত নেওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ"

* "যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগটি স্থায়ী করার ইচ্ছায় ধ্যান সাধনায় মশগুল থাকেন, তাদেরকে সালাতি তথা (দায়েমি) নামাজি বলা হয়। সালাতি শব্দটির বাংলা অর্থটি হলো যোগী"

* "ঘর ছেড়ে দিলেই সংসার বৈরাগী হয় না, বরং খান্নাসরূপী শয়তানকে নিজের পবিত্র নফ্‌স থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই হয় বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য সাধনই ইসলামের মূল মন্ত্র"

* "যে কল্যাণের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে জয় করে নিতে পারে তথা জ্ঞান চক্রের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে উহাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একমাত্র কল্যাণ তথা একমাত্র রহমত। ইহাই আল্লাহ্‌কে পাবার পথে ধাবিত করে এবং পরিশেষে যাহা পাওয়া উচিৎ সেই রবরূপী আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনে একাকার হয়ে যায়"

* "লোভ, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কুলষিত কালিমার তিনশ ষাটটি (হিজরি সনের মাপকাঠিতে) মুর্তি মানব দেহে বিরাজ করে। এই মুর্তিগুলোকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবার নামই হজ্ব। তওয়াফের মাধ্যমে বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর্শনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে"

* "পিতৃ পুরুষের অনুসরণ এবং অনুকরণ করবার অভ্যাস ধর্মজীবনে সত্য লাভের পথে সত্যিই একাটি শক্তিশালী বাঁধা"

* "ছয় রিপুর মাধ্যমে যাহা মনমগজে বাসা বাঁধতে থাকে উহাই একটি একটি করে হিসাব করে বর্জন করে দেবার সাধনাটির নাম সিয়াম"

* "লোভ, মোহ, মাৎসর্য, কাম, ক্রোধ, অহংকার এগুলো মিলিত ফসলের নামই হলো শয়তানি"

* "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলার চেয়ে কি- ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন বললে আরও বেশি ভাল মানায় না ?"

* "মমিন তিঁনিই, যিনি এই কামনার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পেরেছেন। এই কামনাই দুনিয়ার কর্মগুলোকে কুলষিত করে ফেলে"

* "মানুষকে জন্মলগ্ন হতে ফেরেশতা এবং জ্বীন উভয়ের স্বভাবের সমন্বয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে"

* "আল্লাহ্ হতেই আমাদের আগমন আবার আল্লাহ্‌র দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। এই প্রত্যাবর্তনের সময়ে অতিরিক্ত কোন ভেঁজাল নিয়ে যাওয়া যাবে না। শোধন কর্মের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করে পূর্বের মত যখন হতে পারবে তখনই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। সেই অতিরিক্ত বিষয়টির নামই হলো আমিত্ব তথা খান্নাসরূপী শয়তান"

* "পৃথিবীর এক মিনিটের মধ্যে যতগুলো ঘটনা ঘটে চলেছে এক একটি বিশেষ রূপ বৈচিত্রে সেই এক মিনিটের অগণিত রূপগুলো আর কোন দিনও দেখানো হয় না এবং হবেও না। এই কারণে মহান আল্লাহ্‌পাক জুল জালাল এবং কারামতওআলা"

* "সাধক যখন ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বীজরূপী রুহকে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করার সাধনায় মত্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হলে রুহ আলোর মুর্তি ধারণ করে এবং এই আলোকিত নূরটির আত্মপ্রকাশ নিজের ভিতর থেকেই ফুঁটে এবং ইহাকে হুর বলা হয়। হুরের রূপটি মানুষের নিজের নূরানী অতীব সূক্ষ্ম চেহারা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটাই হলো আত্ম দর্শনের চরম পর্যায়"

* "আল্লাহ্‌কে আপন নফ্‌সের উপর পূর্ণরূপে জাগ্রত করে তোলার ধ্যান সাধনার নামটিই সুফিবাদ"

চূড়ান্ত স্থায়ীত্বের ভাবধারা নিয়ে আলোচনা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।

অর্থ :- আল্লাহ্‌র নামে শুরু আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা)

এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু)।

★ কুল্লুমান আলাইহা ফান।

অর্থ :- সকল কিছুই ধ্বংসশীল।

ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা,

★ জুল জালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ :- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা,

জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ।

(সূরা আর-রহ্‌মান, আয়াত নাম্বার :- ২৬ এবং ২৭)

প্রথমেই বলা হলো যে, সকল কিছুই ধ্বংসশীল অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। যা ধ্বংস হয়ে যাবে তা স্থায়ী নয় অর্থাৎ অস্থায়ী। যেমন আমরা দুনিয়াতে এসেছি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। তাই এই সময়টা হলো অস্থায়ী, মানে এটার স্থায়ীত্ব নেই। কেউ ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পারবে না। সময় হলে যেতে হবে, যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তাই আল্লাহ্‌র এই কারিগরি সিস্টেম মাফিক আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সেই কারিগরি পদ্ধতিগত ভাবে যে ব্যবস্থায়ন জারী হয়েছে সেই ব্যবস্থাটুকু হলো এমন যে, এখানে কেউ স্থায়ীত্ব পাবে না। কিন্তু এখান থেকে সেই স্থায়ীত্বের রোজগার, উপার্জন বা কামাইটুকু যদি কেউ করতে পারে, তাহলেই তার নিশানাটুকু স্থায়ী রূপে চির স্মরণীয়

হয়ে থাকবে। এজন্য কালামপাকে বর্ণনা করা হয়েছে:- কূল্লুমান আলাইহা ফান। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। অর্থাৎ সৃষ্টিরাজ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিষয়ে যদি আমরা একটু বুঝতে চাই তাহলে এমন যে:- দুনিয়ার জিন্দিগিতে আমরা এই ধর্মীয় পালনতব্য বিষয়ের মধ্যে নিজেকে নিহিত করবার পর সবচেয়ে বড় আশা আকাংখা থাকে হলো জান্নাত বা বেহেস্ত লাভের।

জাগতিক ভাবে এটা প্রায় সবার মনে একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ নিয়েছে। সবাই জান্নাতের আশা বা বেহেস্তের লোভের এবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকে, এটাই তাদের উচ্ছ্বাস বা চাওয়া। এই জান্নাতের মোহে পরে যাই কিছু করি কিন্তু এখানে যে জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, এটা কিন্তু এই আয়াতে কারিমায় নেই। দুইটি রূপ থাকবে, তাছাড়া সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও জাগতিক ভাবে যারা আলেম বা ধর্মীয় পন্ডিত তারা সমাজে ধর্মের শিক্ষাগুলো দিয়ে থাকেন, তারা বলে থাকেন যে পরকালে অনন্তকালের সুখের নিবাস বা জান্নাত ভোগের ব্যবস্থা রয়েছ। কিন্তু এই আয়াতে কারিমায় জান্নাত যে স্থায়ীত্ব পাবে বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে জান্নাত থাকবে, সেটা কিন্তু উল্লেখ নেই। বলা রয়েছে সকল কিছু ধ্বংসশীল বা ধ্বংস হয়ে যাবে। এক কথাতেই সব শেষ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- কুল্লু নাফ্সিন জায়িকাতাল মাউত। অর্থ প্রত্যেক নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এই আয়াতে কারিমায় শুধু মানুষের মৃত্যু হবে এমনটা বলা হয় নি। অর্থাৎ সৃষ্টিরাজ্যে যা কিছু নফ্সধারী রয়েছে, সবারই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, এই কথাতেই সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। ঠিক এমন ভাবে এই আয়াতে কারিমায় বলা হলো যে:- কূল্লুমান আলাইহা ফান। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। তাহলে সকল কিছু ধ্বংস হলে জান্নাত ধ্বংসশীলের মধ্যে আসতে পারে। আবার পরকালে যে জাহান্নামের ভয় করি সেটা যে স্থায়ী থাকবে এটার কিন্তু উল্লেখ্য নেই। এই আয়াতে কারিমার থিসিস বা গবেষণার প্রেক্ষিতে এই কথা বললাম।

অবশ্য ওলি বা সুফিদের মতাদর্শের পথে আসার আগে, আমরা আলেমদের কাছে শুনতাম বা জানতাম তারা বলতেন যে, জান্নাতের শান্তি বা জাহান্নামের কষ্টের শেষ নেই, এটা কি চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। অনন্তকাল এই কষ্ট ভোগ করবার পরে মালিকের দয়া হলে তাকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে স্থানান্তর করে দিবে। এটা হলো শোনা কথা। জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়ই ভোগ। জান্নাত হলো:- সুখ, শান্তি, বিলাস ভোগ। আর জাহান্নাম হলো:- দুঃখ-কষ্ট, জালা-যন্ত্রণা ভোগ। তাহলে উভয়ই ভোগ।

আমরা যদি প্রথম মানব-মানবী বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) এর দিকে তাকায়, তাহলে দেখা যায় যে, তাদেরকে সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখা হয়েছিল। একটি আদেশ অমান্য করার ফলে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাহলে অনন্তকাল বা স্থায়ীত্বের যে স্বপ্ন আমরা দেখি, তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটার বিষয়টা ভিন্ন হয়ে যায়। তাহলে মূল বিষয়টা আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছেঃ- সকল কিছুই ধ্বংসশীল।

তাহলে থাকবে কী ? ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থঃ- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ। তাই সৃষ্টিরাজ্যে অনুশীলনগামী যে ব্যবস্থা, বিশেষত্ব ওলি বা পীর মাশায়েখদের প্রদত্ত বিধানের আলোকে বর্তমান জামানাতে এই রাস্তা বা পথ। যে অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে একটি মানব তার আপন পীর বা মোর্শেদের রূপের যে একটি সাধন ও ভজনে লিপ্ত থাকে, সেই সাধন এবং ভজনের রূপ থেকে রূপান্তরবাদ বা পরিবর্তিত ধারাতে মওলার রূপের একটি ধারাবাহিক অবয়ব সে পেয়ে যায়। আর সেই ধারাবাহিক প্রণালীতে এই রূপেরই সাধন এবং এই রূপেরই ভজন করা হয়। এই রূপকে আয়ত্বে নেওয়ার জন্য মোডিফাইকৃত কথা গুলো, আমরা জড়িয়ে পেঁচিয়ে বলে থাকি। কারণ জাগতিক যে বিধানাবলি রয়েছে সেটার মান সৌন্দর্য্যময় রাখতেই এরকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে এগুলো প্রকাশ করতে হয়। সরাসরি বললে আর কিছু থাকে না। কারণ কোরআন বলছে তোমার রবের চেহারাই স্থায়ীত্ব পাবে। তাহলে রবের চেহারা! রবকে পেলে তো তাঁর চেহারাকে ধারণ করা যায়।

সৃষ্টিরাজ্যে তাঁর যত মসজিদ (এবাদত খানা) ঘর বা আসন রয়েছে এটা মানুষ কর্তৃক নির্মিত। আমরা সাধারণত জাগতিক ভাবে এই নির্মিত মসজিদকে আল্লাহ্‌র ঘর বলে জেনে থাকি। তাহলে মসজিদে গিয়ে সেখানে আল্লাহ্‌কে পেলে আমরা সবাই তারঁ রূপকে ধারণ করে নিজের মধ্যে রাখতে পারি। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ্‌র কোন দিশা বা অবয়ব মিলে না। আসলে আমরা মসজিদ কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় যে লিপ্ত হই, সেই পরিগনিত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে হলো স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য কিছু এবাদত বন্দেগী করা।

স্রষ্টার তাঁলাশকৃত যে কার্যক্রম, সেটা মসজিদ কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় নেই। এটা হলো এবাদত খানার ঘর। মসজিদ যদি আল্লাহ্‌র ঘর হয়! তাহলে যাদের অর্থবিত্ত বা প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে তার জিন্দিগিতে একখানা বা দুইখানা বা কেউ ইচ্ছা করলে

একশখানা আল্লাহ্‌র ঘর বানিয়ে দিতে পারে। তাহলে এটা আল্লাহ্‌র ঘর নয়, এটা হলো রূপক ব্যবস্থা। কারণ এই রূপকতা দিয়ে আসলকে খুঁজে বের করবার জন্য কিছু চিহ্ন বা কিছু নিদর্শন ব্যবস্থা জারী করে রাখা হয়েছে। কারণ এই আনুষ্ঠানিকতা বা রূপকতার ব্যবস্থায় যখন একটি মানুষ এখানে (মসজিদে) আসে, আসবার পর তার এই চিন্তা চেতনার বিকাশ হবে। তকদিরে থাকলে সে তখন মূলকে খুঁজতে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হবে। আর এই আনুষ্ঠানিকতা বা রূপকতা যদি না থাকে, তাহলে সে কী করে মওলার কারিকুলাম সম্পর্কে অবগত হবে ? এটা সে যদি জিন্দিগিতে না শুনে বা না দেখে থাকে ? আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বলেছেন:- কুলুবিন মুমিনিন আরশে আল্লাহ্। অর্থ:- মমিনের কলবই হলো আমার (আল্লাহ্‌র) বসিবার স্থান। আর রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- কুলুবিন ইনসানি বাইতুর রাহ্‌মান অর্থাৎ (প্রকৃত) মানুষের অন্তর হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঘর। সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন:- মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়, এখানেই বসে ঈসা, মুসা পেল সত্যের পরিচয়। তাই রূপক মসজিদ ভেঙ্গে আবার তৈরী করতে দেখা যায়, তাই স্রষ্টার প্রেমিকের অন্তর ব্যতীত স্থায়ী কোন মসজিদ নেই।

বিষয়টা এমন যে, আমরা সুফিরা যে সকল আলাপ আলোচনা করে থাকি, সাধারণ জনতার মুখে এটা ভিন্ন রকম বাণী হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম কথা তারা কখনই শুনে নাই বা এরকম আলোচনা তাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনেকেই এভাবে প্রকাশ করে ফেলে। এর অর্থ কী ? এর অর্থ হলো এই রূপকতার ঢাকনার আবরণে আমরা নিজেদেরকে এমন ভাবে ঢেকে ফেলেছি, যার কারণে মূলকে উদ্ধারের ব্যবস্থার দিকে মানুষ আর পরিগমন করতে চাচ্ছে না। রূপকতা হলো সহজ সরল ব্যবস্থা যা সবাই মেনে নেয় বা করতে পারে। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা বেশির ভাগ মানুষই মানতে পারে না। প্রতিকূলতার বন্ধন, জ্ঞানসীমা এবং এভাবে পরিশ্রমী মানসিকতারও প্রয়োজন থাকে। যদি এগুলো প্রতিযোগিতা মূলক হত, তাহলে সবাই পরস্পরের মধ্যে একটা রেওয়াজ বা রীতি কার্যকরি প্রথা চালু থাকত। যেটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নেই, সেটা বিশেষ কিছু লোকজন করে যাচ্ছেন। যার কারণে এটা একটি ভিন্নতার মানদন্ড। তাহলে মসজিদকে আমরা আল্লাহ্‌র ঘর বলে থাকি এটার রূপ রেখাটাও এমন। মসজিদে গেলে যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যেত, তাহলে আমরা সবাই মসজিদগামী ব্যবস্থার দিকে যেতাম। এই সমস্ত ওলি মোর্শেদ প্রদত্ত পথে আমরা কেউ পা বাড়াতাম না। এখন দুনিয়াতে যত

মসজিদ আছে সকল মসজিদ ঘর কাবাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ঘর মক্কায় (এটা একটায়) সারা পৃথিবীর হাজীরা সেখানে হজ্জ করতে যায়। মসজিদ গুলো নির্মিত হবার হিসাব হলো, ভৌগলিক ব্যসার্ধের ক্যালকুলেশন করে কাবাকে কেন্দ্র করে, মসজিদগুলো সমন্বয় করে কাবার সম্মুখে রেখে তৈরী করা হয়। বর্তমানে স্যাটেলাইটের যুগ, এই স্যাটেলাইট দ্বারা কাবা ঘরে কী কী আছে, সেইগুলো আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি দ্বারা আমাদের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু সেটা যে আল্লাহ্‌র ঘর, সেখানেও আল্লাহ্‌র দেখা মিলছে না। আল্লাহ্‌কে যদি না দেখা যায় বা না মেলে, তাহলে এই রূপের কার্যকারিতার প্রতিফলন বাস্তবায়ন কী করে হবে ?

তাই এটা হলো বিশেষ ব্যবস্থার ঘর। এটা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। বহু নবী-রসূলের আবির্ভাবকৃত ব্যবস্থায় এই কাবা কেন্দ্রিক অনেক ঘটনা প্রবাহ রয়েছে। যার কারণে এটাকে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ ভাবে রাখা হয়েছে। কোরআনুল মাজিদেও আসছে যে, অনেক সময় এই ঘরকে রক্ষা করবার জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে গায়েবি ভাবে হেফাজত করা হয়েছে। যার কারণে মুসলিম উম্মার কাছে এটা এত বেশি সম্মানে ভূষিত বা মূল্যবান হয়েছে। তাহলে সেখানেও আল্লাহ্‌কে পেলাম না। যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যেত, তাহলে যাদের সেখানে যাওয়ার মত সামর্থ্য আছে তারা সকল কিছু দিয়ে হলেও সেখানে গিয়ে অন্তত আল্লাহ্‌র একটু সাক্ষাত লাভ করত। যার রূপ স্থায়িত্ব পাবে, তাঁর খোঁজাখুঁজি বা ব্যবস্থায়নটুকু জারী করা যেত। তাহলে সেখানেও আল্লাহ্‌র চেহারা দেখা হলো না। তাহলে শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ। এটা চিরসত্য বাণী। তাহলে আল্লাহ্‌র চেহারাটার উৎঘাটন কী দিয়ে করা হবে। সেই রূপ লাভ কি দিয়ে হবে ?

এজন্য কোরআনুল মাজিদের সূরা নিসার ৮০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহ্‌র হুকুমই মান্য করল। অপর আয়াতে (১৫০-১৫৩ মিলিত ভাবে) বলা হয়েছে যাহারা ইচ্ছা করিল রসূল আর আল্লাহ্‌র মধ্যে ভাগ করিতে, তাহারাই খাঁটি কাফের। সূরা আল-ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা চাও তাহলে রসূল (সাঃ) (আঃ) কে অনুসরণ কর। রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- শেষ বিচার দিবসে আমার সাফায়াত হবে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাদের জন্য, যারা আমার আহলে বায়াতকে ভালোবাসে (তারিখে বাগদাদ, খন্ড-২. পৃষ্ঠা নং-১৪৬: কানযুল উন্মাল, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা নং২১৭)।

অর্থাৎ আল্লাহ্পাক বলছেন যে:- আমাকে পেতে চাইলে আমার হাবীবকে অনুসরণ কর। আর আল্লাহ্র হাবীব বলেছেন, আমাকে পেতে চাইলে আমার আহলে বায়াতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এই আল্লাহ্র রূপকে দেখার যে ব্যবস্থা, সেটাই হলো এই আহলে বায়াত কর্তৃক ব্যবস্থা বা পথ। তাহলে এই আহলে বায়াতকে ধরে তাঁর হাবীবকে পেতে হবে। আর হাবীবকে পেলে আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে। এই যে শিঁকলের মত একটি বলয় ব্যবস্থায়ন রাখা হয়েছে। এজন্য অনেক মাশায়েখগণ বলে থাকেন মোর্শেদ হলো রসূল (সাঃ) (আঃ) কে দেখার আয়না, আর রসূল (সাঃ) (আঃ) হলো আল্লাহ্ দেখার আয়না। তাহলে এটা হলো ভার্সেস বা রূপান্তর ব্যবস্থা।

এই যে রূপের কার্যকারিতার ব্যবস্থায়ন, সেই ব্যবস্থায়ন মোর্শেদ কর্তৃক ব্যবস্থা। এখান থেকেই এর সূচনা বা অগ্রযাত্রা। এই অগ্রযাত্রা হলো যেমন:- একটি বীজ যখন মাটিতে পোঁতা হয় তখন সেই বীজটা ধীরে ধীরে পরিষ্ফুটন হয়। যখন বীজটা ফুঁটে তখন তার দুইটি পাতার অবয়ব জারী হয়। এই দুইটি পাতার বিভাজন থেকে ধীরে ধীরে ক্রমাগত ভাবে একটি বিশাল বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই এই মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় রূপের যে জালুয়া, সেটা এই বীজ রূপে প্রাথমিক কার্যটুকু সম্পন্ন হয়। সেই বীজটাকে ধীরে ধীরে একটি বিশাল বৃক্ষে রূপান্তরিত করতে হয়। এই ব্যবস্থায়নই ওলিদের শিক্ষা। তাহলে ব্যবস্থায়ন করতে হলে কী করতে হবে, মোরাকাবা মোশাহেদা করতে হয়। এটা আধ্যাত্মিক প্রণালীর ব্যবস্থা। জাগতিকভাবে এই রূপের কোন অস্তিত্ত্ব রাখাই হয় নি। আধ্যাত্মিকতা যদি জাগতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিতে কার্যকরি থাকত, তাহলে জাগতিক যে রূপক ব্যবস্থা কার্যকরি রয়েছে সেটা আর থাকত না। অর্থাৎ আবরণের পর্দা থাকত না। এজন্য সত্য বড় তেঁতো হয়ে যায়, সত্য বড় উলঙ্গ হয়ে যায়, সত্যের কোন পোশাক লাগে না। সত্য সদা উলঙ্গ চলতে পারে কিন্তু মিথ্যা পোশাকহীন চলতে পারে না।

তাহলে যুগে-যুগে, কালে-কালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যত প্রতিনিধিগণ আগমন করছেন, তাঁরা সবাই এই আধ্যাত্মিক প্রণালির সাধনা দ্বারা স্রষ্টার রূপ বা চেহারা লাভ করেছেন। এই লাভ করবার পর তাঁর অনুমতি স্বাপেক্ষে তাঁর প্রতিনিধি হয়েছেন। তাহলে সেই প্রক্রিয়ার কার্যক্রম আজকে আমরা মানতে রাজি না। কেন ? এটা হলো কষ্টের। তাহলে ধর্মীয় অনুভূতিতে যারা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা সবাই এই কষ্টের মাধ্যম দিয়ে এই অর্জিত ব্যবস্থায় সুফল পেয়েছেন। আর আমরা এই কষ্ট করতে রাজি না, যার কারণে আমাদের

সুফল হয় না। কারণ একটি সুন্দর ব্যবস্থাকে যদি উপস্থাপিত করা হয়, তাহলে দেখা যায় সেটা একটি আবরণকৃত কভারের সিস্টেমে রাখা হয়। যেমন একটি মোবাইল যদি আপনি দোকানে কিনতে যান, তাহলে সেটাও একটা সুন্দর প্যাকেজিং সিস্টেমের মধ্যে রাখা রয়েছে, যার কারণে নিরাপদ ও সুন্দর দেখা যায়। তাই এই বাহ্যিক যে সকল বিষয়গুলো রয়েছে এটা হলো সুন্দর। কিন্তু ভিতরে যদি সুন্দর না থাকে তাহলে এর সুন্দর কী দিয়ে হয় ? প্যাকেটের চাকচিক্য দিয়ে কার্যকারিতা পাবে ? পায় না।

যেখানে আল্লাহ্ বললেন যে:- রব্বিল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াত্তাখিজু ওকিলা। অর্থ:- পূর্ব পশ্চিমের যে দিকেই তাকাও না কেন, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না, অছিলার অন্বেষণ কর। এই আয়াতে কারিমাতে অছিলার কথা বলা হয়েছে। এই অছিলাটাই হলো পীর বা মোর্শেদ। তাহলে সেই অছিলার অন্বেষণ করলে রবের চেহারা পাওয়া যাবে, এভাবে বর্ণনায় আসলো। তাহলে সেই অছিলাকে আঁকড়ে ধরবার কথা বলা হয়েছে।

কালামপাকে বলা হয়েছে:- ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, ওয়া জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ। এই রবের উদ্ভাসনকৃত পথটা হলো এমন। হাদিস শরীফে আসছে যে, কেউ যদি বিনা তাহকিকে কলেমা পড়ে, তাহলে সে ফাসেক। এই কলেমার যে রূপ স্থানান্তরিত ব্যবস্থা, সেটাই এই মোর্শেদের সামনে তাঁর চেহারার সনদকৃত ব্যবস্থায় আমি আমার ঈমানে চুক্তিবদ্ধ হলাম। এই চেহারা দ্বারা আল্লাহ্র চেহারাকে উৎঘাটন করতে হবে। অর্থাৎ রূপান্তর ভার্সেস বা পরিবর্তিত ধারা। হযরত আমীর খসরু (আঃ) বলেছেন:- পীর পারাস্তী হক পারাস্তী। অর্থ:- পীর পুঁজাই আল্লাহ্র পুঁজা। এজন্য অনেক সাধকগণ বলে থাকেন যে:- আমি আল্লাহ্কে চিনিনি, আমি খোদাকে চিনিনি, আমার খোদা যিনি, আমার রসূলও তিঁনি, তিঁনিই মোর্শেদ, সকল বিষয়েই তিঁনি, তিঁনিই সব। কারণ আমিতো তাঁর দ্বারাই এই অবস্থাতে অবলোকন করতে পেরেছি।

যেমন মুনছুর হাল্লাজ তাঁর সাধনার কার্যে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন মহান স্রষ্টা জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি ? মুনসুর হাল্লাজের ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, আমিই তুমি। এই ব্যবস্থায়নে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে এমন হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক সংকলন যে ব্যবস্থা, সেটা হলো পীরের আশ্রিত একটি রূপ বা ধারা। সেই ধারাবাহিকতার তাগিদে মানুষ যদি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ পদ্ধতিতে ঘসে ঘসে সুন্দর মসৃন করতে করতে যদি সেই পর্যায়ে

নেওয়া যায়, তাহলে তখনই সেটা হয়। তাই মুনসুর হাল্লাজের কথাটা আমাদের সবার জন্য কার্যকরি না।

তাহলে সূত্র হলো এই মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে স্রষ্টার রূপ উৎঘাটন হয়। তা না হলে আয়াতে কারিমায় সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে, পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই তাকাও না কেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না। যে দিকেই তাকাবে সে দিকেই আল্লাহ্র চেহারা দেখতে পাবে। আসলে সবই দেখি তাঁর সৃষ্টির গুণাগুন বা সৃষ্টির জীব বৈচিত্র থেকে শুরু করে সকল কিছুই চোখে পড়ে কিন্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই চোখে পড়ে না। কোরআনের ভাবধারা বুঝতে হলে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রণালীর মাধ্যমে এটা বুঝতে হবে কিন্তু এইটা বেশির ভাগ মানুষই মানে না। যদি মেনে নেয় তাহলে তাদের আর এই ব্যবসায়িক কেন্দ্রিক বা নিজেদেরকে অহমিকা বা বড়াইয়ের যে মানদন্ড এইটা আর থাকবে না। তারা বুঝতে পারে এজন্য মানে না। কিন্তু কে মানবে কে মানবে না সেটা বিষয় না। আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা কাবা উনি একটা কথা বলে থাকেন যে, আমার ৫৩ বছরের জিন্দিগিতে কোরআনের রিসার্সকৃত ব্যবস্থায় আমি একটি কথাই পেয়েছি। সেটা হলো আমি কোরআনের কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তাহলে এই কিতাবের বাণীগুলো হলো এমন। তা না হলে আমরা এই আয়াতে কালাম পড়ার সাথে সাথে, দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র চেহারা পেয়ে যেতাম। তাহলে আর কোন দ্বিধা দন্ড বা সংশয় থাকত না। তাহলে এটা একটি রহস্যময় কিতাব। যার রহস্য উৎঘাটন করতে হলে এই মানুষকে সেই রহস্যের ভান্ডারের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই ডুবন্ত ব্যবস্থা থেকে ডুবুরির মত তাঁর অনুশীলনগামী প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে তাঁর প্রকৃত ধারাবাহিকতার আলোকে সেটাকে উৎঘাটন করতে হবে। তাহলে সেই উৎঘাটনকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকল কিছু সৃজন করতে পারলে তবেই তাঁর কাছে এটার আর কোন ধোঁয়া বা কুয়াশার অবকাশ থাকবে না। অর্থাৎ চূড়ান্ত ফায়সালায় সেই রূপটাই স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

তাহলে আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ। এই আয়াতে কারিমা দ্বারা আমরা দুইটি রূপকে বিভাজনকৃত অবস্থায় পেয়ে থাকি। একটা হলো জামালিয়াতের এবং আরেকটা হলো কামালিয়াতের ধারা। জামালিয়াত এবং কামালিয়াত দুই শব্দটাই হলো আধ্যাত্মিক প্রণালীতে। জাগতিক ভাবে

এই জামালিয়াত এবং কামালিয়াতে কোন অস্তিত্ব রাখা হয় নি। শুধু বলা হয় আমলের দ্বারা মানুষ আউলিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু সেই আমল পদ্ধতিগত ভাবে না করায় আমরা সেই রূপকে পাচ্ছি না। এজন্য ওলি মাশায়েখগণ বলেছেন যে, তোমরা যদি পীর বা মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পণ না কর বা মুরিদ না হও, তাহলে হাজার বছর বন্দেগী করেও কবুল হবে না। লা শাইখ ইল্লা ইবলিস। অর্থ যার পীর নেই তাঁর পীর হলো শয়তান। তাহলে শয়তান যদি তার পীর হয়, তাহলে তার বন্দেগী কবুল হবে কী করে ? তাই রূপান্তরবাদের প্রার্থক্যটা এমন হয়।

যারা পীর বা মোর্শেদ মানে না, তারা অকপটে এমন কথা বলে থাকেন যে, এবাদত বন্দেগীর মাধ্যম দিয়ে সব হয়। যদি তাই হবে তাহলে এই মতবাদ বা পথের তো কোন প্রয়োজন পরে না। সবাই এক কাতারে একই রাস্তাতে যদি সমাসীন হত, তাহলে সেটা আরও বেশি সৌন্দর্যময়! তাহলে এখানে একটি কথা এসে যায়, সেটা হলো:- জগৎ সংসারে যত ওলি মোর্শেদগন এসেছেন তাঁরা সবাই বলছেন যে একজন পীর বা শিক্ষকের কাছে তোমাকে সারেন্ডার বা বায়াত হতে হবে। এটাই তাদের সংবিধান যে, আহলে বায়াতের দাওয়াতটা পৌঁছে দেওয়া। সেটা যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে সেটা তার একিন আর যদি সে বর্জন করে সেটাও তার একিন। কিন্তু তিঁনি যে সত্যের দিশা লাভ করেছেন, তাই তাঁর পক্ষ থেকে এই আহ্বান থাকে যে, তুমি একজন পীর বা মোর্শেদ নির্বাচন করে তাঁর কাছে বায়াত বা মুরিদ হও।

তাহলে এই প্রক্রিয়াতে যত ওলি মোর্শেদগণ এসেছেন সবার কার্যকারিতায় একই বিধান জারী ছিল। ওলিদের বিধানাবলি যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বাদবাকি বিধান সম্পর্কে যারাই আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয় বা আলোকপাত করে তা সঠিক নয়। সবাই যদি এক ধারায় থাকে তাহলে বিভাজনের তো প্রক্রিয়ায় আসে না। বিভিন্ন দল, উপদল বা গোত্রের যে বিভাজন, সেটা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে হয়েছে। মূলের তো কোন বিভাজন নেই, আল্লাহ্‌র কোন বিভাজন কেউ দেখাতে পারেনি বা এইটা নিয়ে কোন মতানৈক্য হয় নি, দল বা গোত্রের বিভাজন হয় নি। রসূল (সাঃ) কে নিয়ে তো কোন মতানৈক্য বা বিভাজন হয় নি। রসূলের (সাঃ) (আঃ) সাহাবাগণ সবাই তাঁকে অবনত মস্তিষ্কে তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবেই মেনে নিয়েছে।

তাহলে বিভাজনের উৎপত্তিটা কোথায় ? বিভাজনের উৎপত্তিটা হলো এই দর্শন প্রক্রিয়ার সঙ্গে একে অপরের সমন্বয়হীনতা। এই সমন্বয়হীনতার কারণে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু

হয়েছে। কেউ আনুষ্ঠনিক সালাতে হাত বুকের উপর বাঁধে, কেউ বা আবার হাত নাভির উপর বাঁধে। আবার অনেকে হাতই বাধে না তারাও একটি দল। এভাবে আমরা ভিন্নতার বা দলাদলির অবয়বে চলে গেছি। যদি সত্যের দর্শন থাকতো তাহলে আমরা দলাদলিতে লিপ্ত হতাম না। আসলে এগুলোর কোন অস্তিত্ত্ব নেই। আপনি হাত রাখলে কি বা না রাখলেই কী ? কাজ তো হবে ভিতরগত ব্যবস্থায়। ভিতরে যদি মওলা না থাকে তাহলে তো আপনি লাশ, আপনার অস্তিত্ত্বই নেই। তাহলে ভিতরে যার কার্যকারিতা ফলে তাঁর বিষয়ে আমরা বেশির ভাগই অনুগামী না বা তাঁর বিষয়ে আমরা কেউ চৈতন্য না। যার কারণে এক অন্ধ আরেক অন্ধকে বলে "দে লাথি কোন সমস্যা নেই" লাথিটা কোথায় লাগবে সেটাই তো সে দেখে না, বলার কথা সে বলে দিয়েছে। এভাবে রূপক আকৃতির দল বা বিভাজন প্রক্রিয়া চলমান হয়েছে। যদি দর্শন থাকত বা পরস্পরের মধ্যে সত্যের প্রতিযোগিতা হত তাহলে এই বিভাজন আর থাকত না।

তাই এই আধ্যাত্মিকতার ধারাবাহিকতায় বর্ণনাটা হলো জামালিয়াত এবং কামালিয়াত। এই দুইটি ধারাই হলো স্রষ্টা কর্তৃক প্রণিত সনদের মাধ্যমে এটা হয়ে থাকে। জামালিয়াতের রহস্য যদি কেউ লাভ করতে চায়, তাহলে স্রষ্টার সান্নিধ্য ব্যতীত সেই রহস্য লাভ হয় না। যার কারণে এই জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপের পূর্বেই কালাম পাকে এসেছে:- ওয়াযুহু রব্বুকা, অর্থ:- তোমার রবের চেহারা। এই রবকে হাজির নাজির দ্বারা এই পথের কার্যাবলি সম্পন্ন হয়।

আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে একটা কথা বলে থাকি সেটা হলো, জামালিয়াতের রূপ হলো স্রষ্টার সন্তুষ্টি জ্ঞাপনকৃত একটি রূপ। আল্লাহ্ যদি দয়া করে, তাঁর দয়ার পর্বসে এই জামালিয়াতের রূপটা সে লাভ করতে পারে। এটা সবার জন্য নয়। সবাইকে দয়া করবে এমন না আহামরি ব্যবস্থা এটা না। সবাইকে দয়া করলে পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে আল্লাহ্ সবাইকে এই ব্যবস্থা জারী করে দিতে পারে। তাহলে আর কিছু লাগে না। কালাম পাকে আল্লাহ্পাক বলছেন যে:- আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সকল মানব মানবীগণকে মুসলমান করে দিতে পারি, কিন্তু না, রাখিয়া দেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

তাহলে আমি আপনি দুনিয়াতে এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এই পরীক্ষায় সফল হলে আমাদের জন্মের স্বার্থকতা হলো। আর পরীক্ষায় যদি আমি আপনি বিফল হই, তাহলে পুনঃরায় প্রবর্তিত ব্যবস্থায় যা লাভ করবেন সেটাই আপনাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্পাক বলেছেন:- কারো সাথে এক জার্‌রা পরিমাণ ইনজাস্টিস করা হবে না। যার যার উপার্জন

তাকেই দেওয়া হবে। আজকে আমি যা ভোগ করি, সেটা আমার পূর্ব জন্মের কর্মফলের অনুযায়ী প্রাপ্তি হয়েছে। আর এই জন্মে যা কামাই করি তা পরবর্তী জন্মে ভোগ করতে হবে। এই কথা গুলো বারবার বলার উদ্দেশ্য হলো সাবধান বা সতর্ক হবার জন্য। মূল ধারাকে লাভ করবার জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। যে উদ্দেশ্যে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই দিকে ধাবিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেন।

আল্লাহ্পাক কালামপাকে বলেছেন:- ওমা খালাকতুল জ্বীন্নি ওয়াল ইনসি ইল্লা লিয়াবুদুন। অর্থ:- আমি জ্বীন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার দাসত্ব করবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। এই কথাকে ঘুরিয়ে মোডিফাই করে বলা হয়েছে যে, জ্বীন এবং ইনসানকে আমার এবাদত বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথায় দাসত্ব আর কোথায় এবাদত বন্দেগী ? মূল ধারাই নাই। কারণ আল্লাহ্ এবং রসূল (সাঃ) (আঃ) এই দুইয়ের উদ্ধারকৃত যে পথ সেটাই তো দাসত্ব। সেটা যে প্রক্রিয়ায় হোক না কেন তাঁর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করাটাই হলো মূল বিষয়। তাই দাসত্ব করে এই পথে উপার্জনকৃত ব্যবস্থায় লাভ করতে হয়। যদি দাসত্ব মেনে নেয় তাহলে আহামরি ব্যবস্থাগুলো আর থাকেনা। এই গদি, আসন চেয়ার, সম্মান আর থাকে না। কারণ সবাইকে তখন দাসত্বের শৃংখলে বন্দী হয়ে এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে বের হতে হয়। এজন্য এটা সবাই মানতে পারে না। অহমিকা, অহংবোধ শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা তাদের মধ্যে কাজ করে।

এই ইবলিশের উৎপত্তি স্থল নিয়ে যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে তার কাছে পরিষ্কার একটি ধারণা কাজ করে। আদমকে সবাই সেজ্দা দিলেন একমাত্র অহকাংরী দিলেন না। এটাই হলো দাসত্বের স্বীকৃতি। আযাজিল অহংবোধ, অহংকার করার কারণে সে আদমকে সেজ্দা না দিয়ে শয়তানের খেতাব পেলেন। আল্লাহ্পাক আযাজিল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আদমকে কেন সেজ্দা দিলে না ? আযাজিল (আঃ) বললেন:- আনা খায়রুম মিনহু। অর্থ আমি আদম হইতে উত্তম। আযাজিল (আঃ) যে আদম হইতে উত্তম এইটাই হলো তার অহংবোধ বা অহংকার। যদি আদম হইতে সে নিজেকে ছোট ভাবতো তাহলে সে আদম (আঃ) কে সেজদা দিয়ে দিত। এই অহংকারবোধ পরিত্যাগ করতে পারেন নাই বলেই রূপকতার এত সম্প্রসারণ করা। আমরা সবাই এই অহং প্রিয়। তাই অহংবোধকৃত ব্যবস্থায় এই জামালিয়াতে রূপের কোন দর্শন হয় না। কারণ এটা হলো স্রষ্টার বিশেষ দানকৃত ব্যবস্থার পথ। এই পথে যদি সে কঠোর রিয়াজত বা সাধনার দ্বারা, সেই মাধ্যম দিয়ে যদি সে উপন্নিত হয় এবং মালিকের পক্ষ থেকে যদি তার উপর দয়ার

পর্বস হয়, তাহলেই সে এই জামালিয়াতের রূপের নিদর্শন লাভ করতে পারে।

আর কামালিয়াত এটা একটি দানকৃত ব্যবস্থার মধ্যে সমাসীন। অর্থাৎ তাঁর প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতার যে রেওয়াজ রয়েছে, সেই রেওয়াজ অনুযায়ী হাঁটলে এই যোগ্যতার মানদন্ডে এটা অবারিত ভাবে চলমান থাকে। কারণ এটা হলো একটি সিস্টেম্যাটিক্যাল বা পদ্ধতিগত ধারা। এজন্য প্রত্যেককে মুরিদ বা বায়াত হবার জন্য অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় তাগিদ করা রয়েছে। আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বলেছেন:- কুলুবিন মুমিনিন আরশে আল্লাহ্। অর্থ:- মমিনের কলবই হলো আমার (আল্লাহ্‌র) বসিবার স্থান। তাহলে বান্দায় যখন মমিনে পরিণত হয়, তখন মমিনের কলবটাই আল্লাহ্‌র ঘর হয়। তাহলে আমরা যে রূপক আকৃতির আল্লাহ্‌র ঘর দেখি, এই মমিনের কলব থেকেই সৃজনকৃত ব্যবস্থায় এটা রূপক ভাব ধারায় এসেছে এবং মমিনের কলব থেকেই কাবার উৎপত্তি হয়। সেই কাবা থেকে রূপান্তরবাদে মসজিদ হয়। এভাবে রূপকতার মানদন্ড পার হতে হতে যখন মূলের ধারায় পৌঁছায় তখন এই জ্যান্ত কাবা এভাবে হয়ে যায়। এজন্য সাধকগণ বলেছেন যে, আমি জ্যান্ত কাবার উপাসনাতে লিপ্ত থাকি। কারণ মানুষ তার শ্রম, কষ্ট সাধনার দ্বারা যে কাবা নির্মাণ করেছে ওটা হলো ইট শুড়কির বালুর কাবা। মৃত কাবার মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একজন মানুষ যদি মমিনে পরিণত হয়ে যায় তাহলে তাঁর কলব বা হৃদয় আল্লাহ্‌র ঘর বা জ্যান্ত কাবায় পরিণত হয়। এই সিস্টেম্যাটিক্যাল পদ্ধতিতে এটা সুসম্পন্ন হয়। এই সুসম্পন্নকৃত ব্যবস্থায় হলো কামালিয়াত। তাহলে এই কামালিয়াতে যিনি অবস্থান করেছেন বা নামটা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরই কামালিয়াতের ধারাবাহিকতা হলো অবিনশ্বর বা ধ্বংসশীল নয়।

তাহলে আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বলেছেন :- "কূল্লুমান আলাইহা ফান। ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম"। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ। তাই সাধকগণ এই রবের চেহারা উৎঘাটনের জন্য বছরের পর বছর আত্ম অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করে, ধীরে ধীরে ত্বরান্বিত হতে হতে এই পদে উপন্নিত হয়। এটাই ওলিদের দেখানো পথ। মোরাকাবা মোশাহেদা আর রিয়াজতকৃত অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে সবাই কামেল হয়, সবাই মমিনে রূপান্তরিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগুলো যদি স্থান করে, তাহলে জগতে যে সকল রূপক বিধি বিধান আমরা দেখে থাকি এগুলো কিছুই থাকবে না। এজন্য বাতেনির আগমন হলে জাগতিক বিলুপ্ত হয়ে যায়। এজন্য বাতেনি

ব্যবস্থাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। তাই তরিকত, হাকিকত, মারেফত এগুলো হলো গোপন পথ। আপনাদের মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এই পথগুলো গোপন কেন?

আসলে জাগতিক বিধি বিধানকে সুন্দর বা সমন্বয় রাখতেই গোপন ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। আজকের জামানায় ধর্ম নিয়ে যে বিভেদ, মতানৈক্য আর বিড়ম্বনা তৈরী হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওলি মাশায়েখগণ এ বিষয়গুলো আত্মপ্রকাশ না করে আর থাকতে পারে নি। যার জন্য ওলিদের বিভিন্ন কিতাবে বা কিতাবস্ত করে মানুষের দোরগোঁড়ায় তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। অর্থাৎ নাই মামার চেয়ে কাঁনা মামাই ভাল। যখন ধর্মের প্রতি মানুষ উদাসীন বা বিমুখতা হয়ে যায়, তখন ধর্মের কোন কার্যকারিতা ফলে না। এজন্য এই রূপকটাও তখন একটি বার্তা বহন করে কার্যকারিতার রূপ ধারণ করে রয়েছে। কারণ মূলের দিকেই তো কেউ যেতেই চায় না। তাহলে ধর্মটা সংরক্ষণকৃত ব্যবস্থায় থাকবে কী করে ? তাই রূপকটা কাঁনা রূপে রাখা হয়েছে।

মানুষ যদি প্রতিযোগিতায় জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের রূপ এভাবে উৎঘাটনের ব্যবস্থায় লিপ্ত থাকত, তাহলে এই বিধি বিধান কাঁনা ছেলের নাম পদ্মলোচন হত না। কাঁনা, কাঁনা হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়ে যেত। কারণ মুসলিম উম্মাহর পরষ্পরের যে দর্শন, সেটা হলো একজন মুসলিম অপর মুসলিমের দর্পন বা আয়না স্বরূপ হুবহু দেখা যাবে। এই দেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানান দেওয়া বা জ্ঞাত করা হয়েছে। তাহলে এই দেখা কী ? আসলে সত্যের উন্মেষ বা জাগরণ হলে এই দর্শনবাদ হাজির নাজির হয়। তাহলে সেই প্রক্রিয়াতে আমরা কেউ সহজে যেতে চাই না। কিন্তু মূল যেভাবে প্রাপ্তি লাভ হয় সেদিকে ধাবিত হতে হবে।

জগতে যা কিছু উপার্জন বা সংরক্ষণ করেন না কেন, কোন কিছুই স্থায়ী না। কারণ আল্লাহ্পাক কালামপাকে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন:- কূল্লুমান আলাইহা ফান। ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রূপ। তাই এই দুইটি রূপ হলো স্থায়ী রূপে থেকে যাবে, ইহার কোন ধ্বংস নেই। আর যা কিছু রয়েছে সকল কিছুই ধ্বংসশীল। মূল ধারার যা স্থায়ী বা ধ্বংসশীল নয়, সেই ধারার উপার্জন বা কামাইটুকু যদি আপনি করতে চান, তাহলে এই দুইটি রূপের সাধন ভজনে আপনাকে

জয়যুক্ত হতে হবে। আপনি যদি জয়লাভ করতে না পারেন তবুও তো আপনার বিবেকের কাছে সান্ত্বনা থাকবে।

যে আমি সফল হতে পারি নি কিন্তু আমার অনুশীলন বা পরিগমনের ভাবধারা ছিল এই দুইটি রূপকে লাভ করা। এই সকল বিষয় হলো আধ্যাত্মিক প্রণালীতে একটি দেহকে জাগরণকৃত ব্যবস্থা। তাই এই ব্যবস্থা সম্পর্কে যারা জ্ঞাত রয়েছে তাঁরা এই বিষয়ে সুশিক্ষাটা দিতে পারেন। আর যারা এ বিষয়ে জ্ঞাত নেই তাদের রূপক আকৃতি বা কাগজের কিতাব দ্বারা আপনাকে বলে দিবেন। কিন্তু কিতাবে তো শুধু লেখা থাকে। পুস্তগত বিদ্যায় মানুষ এত বেশি ঝুঁকছে যে মানুষ এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থা মানতেই চায় না। মানুষ যদি এই কাগজের কিতাব কিনে পাঠ করে, সে যদি কল্যাণকর হয়ে যেত বা আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যেত, তাহলে মানুষ ওলি বা মোর্শেদ প্রদত্ত্ব পথে যেত না। আল্লাহ্‌র ওলি বা মোর্শেদ প্রদত্ত সমস্ত বিধানাবলি আর দুনিয়াতে স্থান পেত না ? তাই যিনি অনুশীলনগামী প্রয়োগ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁর কাছেই এই সঠিক শিক্ষাটা থাকে। জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের রূপ প্রাপ্তির ব্যবস্থায়ন যাদের জারী হয়েছে, তাঁদের কাছে এই সমস্ত কাগজের বা পুস্তগত বিদ্যায় পূর্ণতা নেই। তাদের কাছে এই সমস্ত কথার কোন মূল্য থাকে না। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোরআন সংকলন করলেন, তখন এই বিষয়টা এক সাহাবী মওলা আলী (আঃ) কে জানালেন, তখন হযরত আলী (আঃ) বললেন যে:- রাখেন আপনার সংকলিত কোরআন, আমি আলী (আঃ) জীবন্ত কোরআন।

তাহলে কোরআন জীবন্ত হয়, এটা কিভাবে হয় ? এই প্রয়োগ পদ্ধতিতে আমরা হাঁটি না, যার কারণে এই মূল্যবান বাণী জাগতিক আলেম সমাজ প্রচার করেন না। ওলিরা এই কোরআনের আয়াতকে ঘষে ঘষে তাঁর দেহের উপরে কার্যকারিতার প্রতিফলন ঘটায়, এভাবেই এই জীবন্ত কোরআন হয়। এজন্য একজন সাধক তার বাণীতে বলেছেন যে:- "আল্লাহ্‌র দেওয়া কালামপাকের একটি হরফ যদি কারো নসিব হয়, তার জন্য দোযখ হারাম এই কথা কোরআনে কয়"। তাহলে এটা রূপক আকৃতিতে বলা হয়েছে। রূপক আকৃতিতে বলার কারণ হলো জাগতিক বিধি বিধানে যেন কারো আঘাত না লাগে। যার জন্য সাধকের রচনাবলি এমন কৌশলের হয়।

যিনি এই রাস্তায় চলমান রয়েছেন, তার মনের মধ্যে এটা উদ্ধারের জন্য চিন্তা আসবে। আর এই চিন্তা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা সে খুঁজবে। এই প্রক্রিয়াতে এই কার্যক্রমগুলো

সম্পন্ন করতে হয়। তাই সবাইকে এরকম মানসিকতা তৈরী করতে হবে। যেটা স্রষ্টার স্থায়ীত্বের রূপ, এই রূপকে উদ্ধারকৃত ব্যবস্থার যে পথ, এই পথ আমরা কী দিয়ে পাবো এবং এটা কী দিয়ে কার্যকারিতা ফলাবো, সেই বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। সেই শিক্ষাটা যেখানে আছে সেখানে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বা আঁকড়ে ধরতে হবে। আসলে যা চূড়ান্ত স্থায়িত্ব পাবে, সেই ব্যবস্থা গুলো যদি যথাযথ ভাবে কার্যকারিতা পায়, তাহলেই আমাদের এই বিধান বা ধর্মের কার্যাবলী পালনের স্বার্থকতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। জগৎ সংসার এবং সবার কল্যাণময় জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।

অর্থ:- আল্লাহ্‌র নামে শুরু আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা)

এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু)।

► ***খালাকাল্লাহু আদামা আলা সূরাতিহি।***

অর্থ:- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্‌র) নিজ সুরতে তৈরী করেছি।

(আল-হাদিস)

আমরা যারা মানবকূলে জন্ম নিয়েছি, সবাই আদম সন্তান হিসাবেই জেনে থাকি। কিন্তু মানুষের সংজ্ঞায় কোরআন অর্থ করেছে ইনসান। কালামপাকে কোথাও বলা নেই যে:- খালাকাল্লাহু ইনসান আলা সুরাতিহি। অর্থাৎ মানুষকে আমি আমার সুরতে তৈরী করেছি, এমনটা কিন্তু বলা নেই।

এখানে বলা হয়েছে:- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি। অর্থ:- আদমকে আমি আমার

(আল্লাহ্‌র) নিজ সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ আদমকে আল্লাহ্‌র নিজ সুরতে তৈরী করার কথা বলেছেন। তাহলে এটা একটি রহস্যময় এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তার বিষয়। সে বিষয়ে আমরা একটু ভাববাদি ব্যবস্থায় বুঝতে চেষ্টা করব।

সেটা হলো:- আদম অর্থ মানুষ এবং ইনসান অর্থও মানুষ বলা হয়। কিন্তু এই দুই মানুষের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছ, সেই তফাৎ বা ব্যবধানটাই কালামপাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে:- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি। অর্থ:- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্‌র) নিজ সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্‌পাক আদম বলেছেন, ইনসান বা মানুষ বলেন নি এবং সুরত বলতে আমরা আল্লাহ্‌র চেহারা বা অবয়বকে বোঝানো বা মেলে ধরা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ্‌পাকের নিজ চেহারা বা অবয়বে আদমকে তৈরী করেছেন। এই তৈরীর ধারা থেকে বিবর্তনবাদ হতে হতে আমরা ইনসান বা মানুষে রূপান্তর হয়েছি। তাহলে প্রশ্ন হলো আমরা মানুষ কতটুকু ? বিভাজনকৃত প্রকিয়া থেকে শুরু করে একত্রিত করণ সম্পাদন প্রক্রিয়ায় সমাসীন হলেই তবেই প্রকৃত মানুষ বা আদম হয়। তাছাড়া আমরা সবাই ইনসান বা রূপান্তরিত মানুষ, আদম নই। তাহলে এই সম্পাদন বা প্রকৃত মানুষ কি ভাবে হয় ?

আমরা জেনেছি মানুষের মধ্যে তিনটি সত্ত্বা বিরাজিত। সেগুলো হলো:- আল্লাহ্ সত্ত্বা বা রুহ, শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা এবং নফ্‌স বা আমিত্ত সত্ত্বা। এই তিনটি সত্ত্বা যদি একটি দেহতে বিরাজিত হয় তাহলেই তিনি মানুষ। সৃষ্টি রাজ্যে যত মাখলুক রয়েছে মানুষ ব্যতীত এই তিনটি সত্ত্বা একত্রে অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি। তাহলে এটা হলো প্রাথমিক ভাবে মানুষেকে চিহ্নিত বা চিত্রায়িত করণ একটি ব্যবস্থা। আমরা অনেকেই শুনে থাকি যে:- হুস আছে যার তিনি মানুষ, যার হুস নেই তিনি বেহুস অর্থাৎ মানুষের মত দেখতে হলেও প্রকৃত মানুষ নয়। তাই মানব রূপে জন্ম নিলেই সে মানুষ হয় না। মানুষ হতে হলে নিজের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হয়, এই বিকাশ ঘটলে তবেই সে মানুষ হয়। অর্থাৎ শ্রেণীর বৈষম্যের একটি ধারা।

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭৫০ কোটিরও অধিক। এই সকল মানুষের বিধান বা ধর্মীয় যে কাঠামো সেই কাঠামোটা আমাদের সবার এক নেই। মানুষ যার যার ধর্মের অবলম্বনে মনুষ্যত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে এবং এই মনুষ্যত্ত্বের বিকাশের মাধ্যমে তারা স্রষ্টাকে খুঁজে থাকে। কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিস্টান এভাবে ২৫০টির অধিক ধর্ম রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মের মূল যে ধারাবাহিক প্রণালী সেটা একই

ধারাতে রয়েছে। অর্থাৎ তারা স্রষ্টাকে খুঁজে থাকে সেই ধারা এক। অর্থাৎ স্রষ্টা কর্তৃক ব্যবস্থা দ্বারাই এই ধর্ম পরিচালিত হয় এবং ধর্মের অবলম্বনের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেরণকৃত ব্যবস্থায় সফলতা লাভ করতে হয়। এজন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য ধর্ম এসেছে। ধর্মের জন্য মানুষ আসেনি। তাই মানুষের জন্য যদি ধর্ম এসে থাকে তাহলে সেই ধর্মের আমল নীতি গুলো নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এগুলো দিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। যদি কেউ প্রকৃত বিধান সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তাকে প্রাথমিক ভাবে তিনটি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রথম চিন্তা হলো:- আমি কোথায় ছিলাম ? কোথায় আমাকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল! দ্বিতীয় চিন্তা হলো:- আমি কেন এখানে আসলাম ? কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে পাঠানো হলো ? অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টা আমাকে দেওয়া হয়েছে, এই সময়ের পর আমি কিন্তু আর এখানে থাকবো না। তাহলে এই সময়টা কিসের জন্য আমাকে দেওয়া হলো ? আমাকে যেহেতু ফিরে যেতে হবে, তবে এভাবে কেন দেওয়া হলো ? তৃতীয় হলো:- এখান থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, তাহলে এই বিদায় নিয়ে আমি কোথায় যাবো ? এই তিনটি বিষয় নিয়ে একান্ত ভাবে নিজের মনোরাজ্যে চিন্তা করবেন। তাহলে আপনি একটা সঠিক রাস্তা পেয়ে যেতে পারেন। সত্যের ধারক এবং বাহকের ব্যবস্থা কিঞ্চিত হলেও একজন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জাগরিত হবে। এই প্রক্রিয়াতে মানুষ মন্দকে ছেড়ে ভালোর দিকে অগ্রসর হয়। ভালোর দিকে অগ্রসর হলে এক সময় বণী আদম থেকে প্রকৃত আদমে রূপান্তর হলেই পূর্ণতা জারী হবে ।

সক্রেটিস বলেছেন:- জীবন তখনই স্বার্থক! যখন তুমি জানবে যে তুমি কি করছো, কেন করছো, কি উদ্দেশ্যে করছো। জ্ঞানহীন, কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন কেবল গবাদি পশুর জন্য, মানুষের জন্য নয়। কারণ মানুষ ইচ্ছা করলেই সে নিজে নিজে পৃথিবীতে আসতে পারে না। তাহলে আমরা কোথাও না কোথাও সংরক্ষণকৃত ব্যবস্থার মধ্যে ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রেরণের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময় যোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই সময়টা আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ রাখা হয়েছে।

এটা একটি রহস্যময় ব্যবস্থা। কারণ এই দুনিয়াতে আসবার পরে আমরা মোহ মায়ার জালে আঁটকে পড়লাম না কি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলাম! আমাকে পরীক্ষা স্বরূপ দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় যিনি সফল হবেন তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরষ্কার, আর যিনি বিফল হবেন তার জন্য রয়েছে শাস্তি।

আমাকে যেহেতু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তাহলে আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে আমার প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ স্রষ্টার কাছ থেকে যদি আমাদের আগমন হয় তাহলে স্রষ্টার কাছেই আবার ফিরে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ধর্ম পেয়েছি।

আমি মুসলমান অধ্যাসিত একটি পরিবারে জন্ম লাভ করেছি, ছোট বেলা থেকেই বাবা-মায়ের শিখানোকৃত ধর্ম জন্ম সূত্রে পেয়েছি। সেখান থেকেই আমার ধর্মীয় অনুসরণ অনুকরণের পালন তব্য যে সকল বিষয় রয়েছে, সেটা জন্ম লাভের পর থেকেই প্রচলিত ধারাতে পেয়েছি। মনের মাঝে প্রশ্ন উকি দিয়ে যায় যে, আমি যদি অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর পরিবারে আমার জন্ম হত, আমি হয়ত তাদের ধর্ম পালন করতাম ? তাই আমাদের সবার উচিৎ ধর্মীয় জীবনের সত্য লাভ করতে হলে ধর্মীয় আঙ্গিকগুলো নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, প্রজ্ঞা এগুলোকে জাস্টিফাই করে ধর্মের মূল উপাদেয় বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধর্মের পূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া। কারণ পৃথিবীতে যত মানুষই থাকুক, পরকালীন জিন্দিগিতে কেউ কারো নয়। অর্থাৎ যার যার হিসাব তাকেই দিতে হবে। সেখানে কেউ কারো হিসাব দিবে না। তাই সবাইকে সেই হিসাব দেবার জন্য তৈরী হতে হবে।

সেই তৈরীকৃত ব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথম একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। আমি যেহেতু প্রকৃত মানুষ না, তাই যিনি প্রকৃত আদম বা মানুষ হয়েছেন তাঁর কাছেই প্রকৃত মানুষ হবার কার্যাবলী শিখতে হবে। এটাই প্রকৃত মানুষ হবার সিস্টেম বা পদ্ধতি। নবী-রসূল, ওলিগণ এই নির্দেশনামা দিয়ে গিয়েছেন যে, তোমাকে একজন প্রকৃত মানুষের (আদম, পীর বা মোর্শেদ) কাছে বায়াত বা আত্মসমর্পন করতে হবে। এজন্য সুফিগণ বলে থাকেন, ইনসানে কামেল হলো আদম। কারণ বেলায়েতের পূর্বে নবূয়্যতির যে ব্যবস্থা ছিল সেটা হলো:- নবীগণ দুনিয়াতে আসবার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী মারফত যে সকল নির্দেশনামা মানুষের জন্য পেয়েছেন, সেটা তাঁর উম্মত বা জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচার করেছেন। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা ধর্মকে একটি পরিপূর্ণতায় দাঁড় করিয়েছেন। স্রষ্টার পক্ষ থেকে খাতামান নবূয়্যত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী প্রেরিত হবার ব্যবস্থা খতম বা শেষ করা হয়েছে কিন্তু কোরআনুল মাজিদের কোথাও খাতামান রসূল এই কথাটা আসেনি। আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বলেছেন যে প্রত্যেক জাতির জন্য আমি নির্ধারিত রসূল প্রেরণ করেছি। তাহলে খাতামান রসূল যদি

কোরআনুল মাজিদে না এসে থাকে তাহলে রসূল কনোস্টেন্ট নীতিতে অবারিত ভাবে চলমান রয়েছেন। তাহলে জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আপনার রসূলকে নির্বাচন করতে হবে। সেই নির্বাচিত রসূলের কাছ থেকে আপনাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আমি আরও একটু খোলাসা ভাবে মেলে ধরতে চাই সেটা সাধক বাউল লালন শাঁইজি তাঁর গানের ভাষায় বলেছেন যে:- যিনি মোর্শেদ তিঁনিই রসূল, ইহাতে নাই কোন ভূল, খোদাও সে হয়। অর্থাৎ একটি সিঁড়ী ধরে তাঁর (আল্লাহ্‌র) মূল চূড়ায় অবস্থান করবার যে সিস্টেম্যাটিক্যাল প্রণালীর শিক্ষা, সেই শিক্ষাটাই গুরুবাদ বা আহলে বায়াতের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়েই কার্যকারিতা পায়। তাই কোরআনুল মাজিদে আল্লাহ্‌পাক সূরা বাকারা'র ১৮৩ নাম্বার আয়াতে বলেছেন :- "ইয়াআইউহাল্ লাজিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম্ সিয়ামু কামা কুতিবা আলা আল্‌লাজিনা মিন্ কাব্‌লিকুম্ লাআল্‌লাকুম্ তাত্‌তাকুন্"। অর্থ:- ওহে তোমরা যারা ঈমান আনায়ন করিয়াছো, তোমাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হইয়াছে, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ববর্তী গণদের উপর। অর্থাৎ ঈমান আনবার পরে এই সকল আমল নীতির আহ্বান করা হয়েছে, যাহা পালন করতে হবে।

এজন্য পীর বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হওয়াই হলো আল্লাহ্‌র প্রতি প্রাথমিক ভাবে ঈমান আনায়ন করা। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, তুমি তাঁকে অনুসরণ কর যিনি হেদায়েত পাইয়াছে। যদি ঈমানই আনায়ন না করা হয়, তাহলে আপনার আমল গুলোর কার্যকারিতা কী করে ঘটবে ? মানুষের মধ্যে নফ্‌স সত্ত্বা রয়েছে। এই নফ্‌সকে বলা হয় আমি। এই নফ্‌সই সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা অর্থাৎ সকল কিছুর ভোগ এই নফ্‌স করে থাকে। কিন্তু ভোগে মুক্তি নেই, মুক্তিতে ভোগ নেই। সুখ-দুঃখ দুটোই ভোগ। এতকিছু ভোগ করবার পরেও নফ্‌সকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই নফ্‌সেরই শাস্তি হয়। কোরআনুল মাজিদে তিন প্রকার নফ্‌সের কথা বলা হয়েছে। প্রথম হলো:- নফ্‌সে আম্মারা। দ্বিতীয় হলো:- নফ্‌সে লাউওয়ামা। তৃতীয় হলো:- নফ্‌সে মুৎমাইন্না।

আম্মারা নফ্‌স হলো:- এটা শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বার দখলকৃত অবস্থা। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থায় একটি মানুষ যে দেহ খাঁচার আবরণকৃত কাঠোমোতে পরিচালিত হচ্ছে সেই ব্যবস্থাটাই হলো নফ্‌সে আম্মারা। এই নফ্‌সে আম্মারা থেকে যখন একটি মানুষ নফ্‌সে লাউওয়ামার দিকে অগ্রসর হয় তখনই তার একটি গাইডেন্স প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এই

গাইডেন্সটাই হলো একজন রসূলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু আমরা বর্তমান বেলায়েতকৃত ব্যবস্থায় গুরুবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বা সুফিমতে পরিচালিত তাই আমরা পীর বা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থাকেই এভাবে জানি। নফ্সে আম্মারা স্বাভাবিক ভাবে দুনিয়াতে কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে ধর্মের উপর পরিচালিত হওয়াই হলো নফ্সে আম্মারা কার্যাবলি। এজন্য ওলিগণ বলে গেছেন :- লা শাঁইখ ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- যার পীর নেই তার পীর শয়তান। অর্থাৎ নফ্সে আম্মারাকে বলা হয় শয়তানি নফ্স। তাই শয়তানি নফ্স থেকে যদি একজন মানুষ আল্লাহ্মুখী হতে চায়, তাহলে তার প্রথম শর্ত হলো একজন পীরের নিকট বায়াত বা মুরিদ হওয়া। মুরিদ বা বায়াত গ্রহণ করার কার্যটুকু যিনি সম্পাদন করবেন তখনই সে নফ্সে আম্মারা থেকে নফ্সে লাউওয়ামার দিকে পরিগমন করবেন।

আল্লাহ্পাক কোরআনুল মাজিদে এই লাউওয়ামা নফ্সের কসম খাচ্ছেন। লাউওয়ামা নফ্সকে বলা হয় জিহাদরত বা যুদ্ধরত নফ্স। তাহলে এই জিহাদটা কোথায় হয় ? এটা কোন মাঠে ময়দানের যুদ্ধ বা জিহাদ নয়, এটা আপন দেহ ভূবনের যুদ্ধ বা জিহাদ। তাই মিছে ধর্ম যুদ্ধ না করে নিজের ভিতরের খান্নাসরূপী শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে ভিতরের মন্দ সত্ত্বাকে হত্যা করতে হবে। নিজের সঙ্গে নিজেকে যুদ্ধ করে জয়লাভ করবার যে সাধন প্রক্রিয়া সেটাই নফ্সে লাউওয়ামা করে থাকে। নফ্সে লাউওয়ামার পথ হলো সুদূর প্রসারি। অর্থাৎ একটি মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ক্ষমতা হবার পর থেকে বছরের পর বছর, দীর্ঘ্য সময় অনেককেই এই যুদ্ধ বা জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। ইহা যেন শেষ হতে চায় না। অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর সাঁতরিয়ে পাড়ি দেবার মত। সেখান থেকে পরিপূর্ণতার সোপানে পৌঁছালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তখন আহ্বানের সারা পাওয়া যায়। তাহলে এই নফ্সে লাউওয়ামার সাথে জিহাদ বা যুদ্ধের সূচনা করতে হলে পীরের নির্দেশিত পথে ট্রেনিংগুলো বা পীরের দেওয়া আমল নীতি গুলো কার্যকারিতা করেই সে যুদ্ধে জয়লাভ করে পূর্ণতার অবগহনে পৌঁছাতে হবে।

তাই ঈমান আনায়নের জন্য সুফিমতের ধারাতে যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, সেটা এসেছে আমানুর সংজ্ঞায়। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন পীর বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হয়, তখনই সে আমানু হিসাবে পরিগণিত হয়। বায়াত বা মুরিদ হবার পর তাকে মোরাকাবা মোশাহেদার আমল নীতিতে দাঁড় করানো হয়। সেই আমল বা কর্মের সাধনা যিনি করেন এই কর্মটাই হলো নফ্সের সাথে জিহাদ বা যুদ্ধ। এই যুদ্ধরত অবস্থা থেকে

যখন একজন মানুষ সফলতায় পৌঁছায়। তখনই তৃতীয় স্তরে থাকে সফলতার আহ্বান। যেটা কোরআনুল মাজিদে আল্লাহ্পাক বর্ণনা করেছেন যে :- "ইয়াআইউহাল্ লাজিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম্ সিয়ামু কামা কুতিবা আলা আল্লাজিনা মিন্ কাব্লিকুম্ লাআল্লাকুম্ তাত্তাকুন্"। অর্থ:- ওহে তোমরা যারা ঈমান আনায়ন করিয়াছো, তোমাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হইয়াছে, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ববর্তী গণদের উপর। তাহলে এখানে আমরা জাগতিক ভাবে মৃত্যুর পর যে সকল বিধি বিধান শুনে থাকি, এই আয়াতে কারিমায় কিন্তু এগুলোর কোন চিহ্ন বা লেস রাখা নেই। এই আয়াতে জীবিত একজন মানুষও যদি মুৎমাইন্নাতে পরিগমন করে পূর্ণতা লাভ হয়, তখনই আল্লাহ্পাক তাঁকে আহ্বান করবেন। সেই মানুষটা তখন এই আয়াতে কালামের স্বার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবেন। অর্থাৎ নগদের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াতে এটা বাস্তবায়ন হবে।

এটা যদি প্রকাশিত ভাবে বলা হয় তাহলে জাগতিক যে ধর্মীয় বিধি-বিধান রয়েছে সেটার সৌন্দর্য আর থাকে না। তাই জাগতিক বিধি বিধান সুন্দর রাখতেই এই গুপ্ত ব্যবস্থার মাধ্যম রাখা রয়েছে। অর্থাৎ যেটা প্রকাশিত সেটা তো প্রকাশ হয়েই আছে কিন্তু গুপ্ত ব্যবস্থাকে যিনি খোঁজ করবেন, তিনি এই গুপ্ত ব্যবস্থার সন্ধান পেয়ে থাকেন। যিনি খোঁজ করবে না তিনি পাবে না। এজন্য এই প্রক্রিয়াতে যেতে হলে কোরআনুল মাজিদের আয়াতে কারিমার বাস্তবায়নের রূপ দাঁড় করতে হবে। এই বাস্তবায়নের রূপ দাঁড় করবার জন্যই সাধনা করতে হবে। সেই সাধনার শিক্ষা গুরুবাদী ব্যবস্থায় পীর বা মোর্শেদ দিয়ে থাকে। যিনি এই প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হন, তার কার্যক্রম স্বাভাবিক চলমান রীতিনীতি থেকে একটু ভিন্নতর হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে দেখা যায়। কারণ সে ফকিরি বা দরবেশের দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য হযরত বু-আলী শাহ কলন্দর (আঃ) বলেছেন:- যে ব্যক্তি ফকির দরবেশ হয়ে গেছে তার জন্য সুখবর যে, তিঁনি শরিয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান থেকে মুক্ত। তাঁর জন্য শরিয়তের জ্ঞান তাঁলাশ করার দরকার নেই।

সুফিমত নিতান্তই একটি ব্যতিক্রম ধারা মত। কেন ? কারণ ধর্মের যে মূল কাঠামো সেটা স্বাভাবিক প্রণালীতে আসেনি। স্রষ্টার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল, কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হন নি, ইতিহাস সাক্ষ্য। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই ধর্মের প্রবর্তকগণ এসে ধর্মের শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তাঁরা মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম লাভের পর

শিশুকাল থেকে তিল তিল করে বড় হয়ে ধর্মের পরিপূর্ণতা লাভ করবার পরেই তিঁনি ধর্মের শিক্ষাগুলো মানুষকে দিয়েছেন। তাহলে এই পরিপূর্ণতায় শিক্ষা লাভ তাঁরা কিভাবে করে ? তাই এই শিক্ষা লাভ করতে হয় আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা প্রণালীর মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক প্রণালীর শিক্ষাটা রসূলে পাকও (সাঃ) (আঃ) দেখিয়ে গেলেন জাবালে নূর পর্বতে বা হেরা গুহায়। আপনাদের পূর্বেই পরিজ্ঞাত করেছি যেঃ- রসূল (সাঃ) (আঃ) ২৫ বছর বয়স থেকে নবূয়্যত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত, সময় অসময়ে ১৫ বছর ১মাস ১৯ দিন হেরা পর্বতে এই শিক্ষার অনুশীলন দেখিয়ে গেছেন। আর এভাবেই নিজের আত্মার জাগরণ হয়। তাই জাগরণকৃত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে ধর্মের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এই পূর্ণতা লাভ করবার পরে স্রষ্টা যদি তাঁকে ধর্মের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, তাহলেই তিঁনি ধর্মের প্রবর্তক হন। যুগে-যুগে, কালে-কালে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার, তাঁরা সবাই দুনিয়াতে এই আধ্যাত্মিকতার বলয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। আজকে বর্তমান যুগে সেই শিক্ষাটা আমাদের সমাজের ধর্মীয় কারিকুলাম থেকেই ডাইভার্ট বা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই শিক্ষার কথাটা মানুষকে আর জানান দেওয়া হয় না। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের আঁখেড় গোছাতে চায় তারাই এটা বিলুপ্ত করছে।

তাই যারা প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা পরিচালনা করেন, তাঁরা এই অনুশীলনগামী মোরাকাবা মোশাহেদা বা ধ্যান সাধনার শিক্ষা গুলোই দিবেন। সকল ধর্মের প্রবর্তক এভাবে আধ্যাত্মিক প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করে, ধর্মের প্রবর্তক হয়েছেন। একটি প্রবাদ আমরা শুনে থাকি যেঃ- দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত মূল আমল নীতির কথা বলেন, সবাই মিলে তাকে তিরস্কার বা জোড় করে মিথ্যার আশ্রিত ব্যবস্থার মান্যতা স্বীকার করানোর প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র হাবীব বলেছেন যেঃ- আমার পরবর্তী ব্যবস্থায় নায়েবে রসূল ধর্ম শিক্ষা দেবেন। এই ধর্মীয় বিধানের তাৎপর্য হলো যুগে-যুগে যত নবী-রসূলগণ এসেছেন, তাঁদের সাথে ভার্সেস বা সমন্বয় করলে দেখা যায় প্রত্যেকের বিধান একই রূপে ছিল। এই বিধান আলাদা নেই। তাহলে যারা ধর্মকে ব্যবসায়িক প্রণালীতে দাঁড় করিয়েছে, তারাই অপকৌশলের মাধ্যমে রসূলের (সাঃ) (আঃ) মোরাকাবা মোশাহেদা বা ধ্যান সাধনাকে ডাইভার্ট করে দিয়েছে। যিনি মানুষের কল্যাণ বা মুক্তির ধর্ম দিয়েছেন তিঁনিই ধর্মের হেফাজতকারী। তাই তিঁনিই এই ধর্মকে মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন ওলিদের মাধ্যমে। আল্লাহ্‌পাক মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি

দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছন। স্রষ্টার ধর্মকে গ্রহণ বা বর্জন করা বান্দার ইচ্ছা। সেই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। যে যা করবে আল্লাহ্পাক বিচারিক ব্যবস্থা দ্বারা তাকে সে অনুযায়ী ফলদান করবেন। ভাল করলে পুরষ্কিত হবে, আর মন্দ করলে শাস্তি পাবে। এখানে কোন ছাড় নেই। কারণ আল্লাহ্পাক বলেছেন:- কারো প্রতি এক জার্‌রা পরিমাণ পারসিয়ালটি করবেন না।

তাই সুফিমতের আলোকে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণতা বা সফলতা লাভ করতে পারলেই সে বুঝতে পারে। তখনই এই কালামপাকের বাস্তবায়ন সম্পর্কে উপলব্দি করতে পারবেন। সূরা ফজরের ২৮- ৩০ নাম্বার আয়াতগুলো হলো :- "ইয়া আইওয়াতুহান নাফ্সুল্ মুত্ব্মায়িন্নাতু। ইর্জিইয়্যিলা রব্বিকি রদ্বিয়াতাম্মারদিয়্যাহ্। ফাদ্খুলী ফী ই'বা-দী। অদ্খুলী জ্বান্নাতী"। অর্থ:- "ওহে পরিতুষ্ট আত্মা। তুমি সন্তুষ্টি ভাজন হইয়া আসো। অতঃপর তুমি আমার দাসদের মধ্যে দাখিল হও। অতঃপর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"। এই আয়াতের প্রতিফলন হলো ঐ নফ্স তিনটির স্তর। যদিও ওলিগণ আরো দুইটি নফ্সের নাম বলে থাকে। একটা হলো নফ্সে মূল হেমার এবং অপরটি নফ্সে রহ্মানিয়া। তাহলে এগুলো ওলিদের বিশেষ বিভাজনকৃত ব্যবস্থা। পবিত্র কলেমাকে সৃজনশীল পৃথকীকরণ করতে আরও দুইটি ভাগকে ওলিরা সৃজন করে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ পাক পাঞ্জাতনের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে এই ভাগ গুলো সমন্বয় করে থাকে। এই নফ্স যখন মুৎমাইন্নাতে পরিগমন করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে তখনই একটি মানুষ এই প্রকৃত মানুষ হবে।

আর প্রকৃত মানুষ হবার পরেই ইনসানে কামেলের রূপ হলো আদম। স্বাভাবিক ভাবে যারা মানুষ তারা আদম নয়। আমরা হলাম বণী আদম। তাই এই স্তরে পরিপূর্ণতায় যিনি দাখিল হন, তিঁনিই আদমে পরিগণিত হন। তাঁকেই আল্লাহ্পাক বলেছেন যে:- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি। অর্থ :- আদমকে আমি আমার নিজ (আল্লাহর) সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ তাঁর সুরতটাই আল্লাহ্পাকের সুরত হয়ে যায়। আরেকটু আপনাদের বুঝবার জন্য বলি, সেটা হলো:- আল্লাহ্র সাথে রসূলের (সাঃ) (আঃ) মেরাজ পরবর্তী ঘটনায় সাহাবাগণ রসূল (সাঃ) (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইয়া রসূলআল্লাহ্ আল্লাহ্কে দেখতে কেমন ? তখন রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন তোমার মত। এভাবে চারজন সাহাবাকে আল্লাহ্র হাবীব বললেন, তোমার মত। এই চারজন সাহাবা যখন ফিরে গেল তখন কিছু সাহাবা বসে ছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া

রসূলআল্লাহ্ আপনি তাদের সবাইকে বললেন আল্লাহ্ দেখতে তোমার মত। তাহলে তারা সবাইতো এক রকম না। এটার ভেদ রহস্যটা কী ? তখন আল্লাহ্র হাবীব বললেন আল্লাহ্কে দেখতে তোমাদের মত। এর অর্থ হলো একজন মানুষ যখন ইনসানে কামেল হয়ে যাবেন তখন তার দৃষ্টিতে ভিন্নতার চেহারা আর পড়ে না। যার দলিল কোরআনুল মাজিদে আল্লাহ্পাক এভাবে দিয়েছেন যে:- রব্বুল মাশরেখে ওয়াল মাগরেবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাত্তাখিজু ওয়াকিলা। অর্থ পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই তাঁকাও আমি আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না, অছিলার অন্বেষণ কর। এই কালামপাকেও আল্লাহ্পাক অছিলা ধরবার কথা বলে দিয়েছেন। তাহলে যে দিকে তাঁকাবো সেদিকেই আল্লাহ্কে দেখতে পাবো। আমরা যে দিকে তাঁকায় শুধু দেখি তৌহিদ রাজ্যে যা কিছু দন্ডায়মান রয়েছে সেগুলোকে। কিন্তু আল্লাহ্কে দেখিনা। তাই আল্লাহ্কে দেখতে হলে এই আয়াতে কারিমাকে দেহ রাজ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য ইনসানে কামেলই হলো আদমের রূপ। তখনই এই আয়াতের কার্যকারিতা বাস্তবায়ন রূপে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তিঁনি এবং আল্লাহ্ একই। এখানে কোন ভিন্নতা থাকে না।

ধর্মীয় পটভূমিতে দর্শন রয়েছে, সুফিমতের আলোচনায় এভাবে আসছে। কিন্তু যারা বলে আল্লাহ্কে দেখা যায় না তাহলে তারা কোন ধর্মের পটভূমি নিয়ে চালিত হচ্ছে ? তাদের দর্শনটা কেমন ? তাদের হলো পুস্তগত বা মুখস্ত বিদ্যার জ্ঞান। এজন্য আল্লাহ্পাক কোন প্রতিনিধিকে পুঠিতব্য জ্ঞান দ্বারা শিক্ষা দিয়ে পাঠায় নি। তাই আল্লাহ্র যত প্রতিনিধি দুনিয়াতে এসেছেন সবাই এই ঐশি বা আধ্যাত্মিক প্রণালীতে পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যম দিয়ে বা দর্শনের মাধ্যম দিয়ে তাঁরা ধর্মকে প্রচার করেছেন। এজন্য আধ্যাত্মিকতা একটি রহস্যময় বিষয়। কারণ পবিত্র কালামপাকে যে সকল আয়াতে কারিমাগুলো রয়েছে এগুলোর বাস্তবায়ন করা হলো ওলিদের কার্যবলী। তাই কোরআনের আয়াতে কারিমাকে মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। যিনি প্রকৃত মানুষ তাঁকে বলা হয় ইনসানে কামেল। ইনসানে কামেল হলো আদম। আদমকে (আঃ) তৈরী করা আল্লাহ্র সুরত থেকে।

তাহলে আমরা রূপান্তরবাদে বনী আদমে এভাবে পৃথিবীতে এসেছি। পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে (একটা নাটকীয়তার মধ্যে)। আল্লাহ্র হুকুম ছিল আদম (আঃ) কে সেজ্দা দিতে, এই সেজ্দা না দেবার কারণেই সে আযাজিল (আঃ) থেকে শয়তান বা ইবলিশ খেতাবে ভূষিত হয়। কারণ শয়তান আল্লাহ্ ব্যতীত

সে অন্য কাউকে মানে না, সরাসরি আল্লাহ্‌কে ডেকে লাভ করতে চায়। ইবলিশ আদম বা গুরু মানে না, এজন্য সে আদম (আঃ) কে সেজদা দেয় না। আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মানুষই সরাসরি আল্লাহ্‌কে লাভ করতে চায়, তারাও অছিলা মানে না। এজন্য ওলিদের দর্শনে বলা রয়েছে:- লা শাঁইখ ইল্লাহ্ ইবলিশ। অর্থ:- যার পীর নাই তার পীর শয়তান। তাই যারা শয়তানের আশ্রিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যে যাই কিছু করছেন, তাদের ফলাফলটা তেমনই হবে।

আপনাদের আগেই পরিজ্ঞাত করেছি যে, শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা এই দেহের মধ্যেই থাকে। শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ খান্নাস এই চারটি নামের বিশেষণে পবিত্র কালামাপাকে আল্লাহ্ পৃথক পৃথক আয়াত নাজিল করেছেন। (১) আউযুবিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম। অর্থ বিতাড়িত বিদ্রোহ শয়তান হতে বা থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। (২) ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী সেজ্‌দা দিল না। অর্থাৎ ইবলিশ সেজ্‌দা দেয় না। (৩) আত্তালেবুদ্দুনিয়া মরদুদ। অর্থ:- যে কেবল দুনিয়া চাইল বলে দাও সে মরদুদ নামে শয়তান। (৪) মিনশার্‌রিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। অর্থ:- তুমি খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নাও।

মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বা সম্পর্কে আপনাদের একটু বলি:- প্রচলিত বা জাগতিক শয়তান যেটা রাখা আছে সেটা হলো সৌদি আরবের মিনা পর্বতের গুহাতে তিনটি স্থাপত্য বানানো রয়েছে। এটার নাম ছোট শয়তান, আরেকটার নাম মেজ শয়তান এবং অপরটির নাম বড় শয়তান। তাহলে কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক অর্থাৎ সেখানে কোরআনের আয়াতের প্রতিফলন নেই। প্রকৃত ধর্মকে পেতে হলে এই দেহ ভান্ডে খুঁজতে হবে। তাহলে মক্কায় ছোট, বড়, মেজ শয়তানের স্থাপত্য রয়েছে কিন্তু কোরআনুল মাজিদে ছোট, বড়, মেজ শয়তানের কথা তো বলা নেই। তাই এই শয়তান গুলো রূপক আকারে রাখা হয়েছে, তেমনি আমাদের বর্তমান ধর্মীয় ব্যবস্থাটাও রূপক আকারে চলমান রয়েছে। তাই রূপকতার চাকচিক্যের মোহতে পড়ে আমরা আসলকেই আর বুঝতে পারছিনা বা মানতে রাজি না। কোরআনে শয়তানে চারটি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেগুলো কোথায় ?

প্রথমত:- আউযুবিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম। অর্থ বিতাড়িত বিদ্রোহ শয়তান হতে থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আমি যদি সারাদিন আওউযু বিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম পড়ি, তবে কি শয়তান আমাকে ছেড়ে দেবে ? হয়ত সওয়াব পাওয়া যাবে কিন্তু

আমাকে ছাড়বে না। মনে করুন আমি কোন এক স্থানে গমন করে বিপদ গ্রস্থ হয়ে পরেছি, আমি ঐ স্থানে থাকতে পারছি না। তাই আমি লুকানোর জন্য যদি কোন বাড়িতে গিয়ে বলি যে, বাবা আমাকে একটু আশ্রয় দাও, আমি বিপদগ্রস্থ হয়েছি একটু পরে চলে যাবো। তিনি যদি আমাকে আশ্রয় দেন তাহলেই তো আমি নিরাপদ বোধ করব। বুঝতে পারছেন তো আপনারা ? তাই ওলিদের রাস্তায় ওসিলাকে ধরতে বলা হয়েছে এটাই শয়তানের হাত থেকে বাঁচার প্রাথমিক ব্যবস্থা। চূড়ান্ত ফায়সালা তো আপনার কাছেই। কারণ পীর বা মোর্শেদ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে। পীর আপনার রাস্তাটা বেঁধে দেয় আর এই বেঁধে দেওয়া পথ ধরেই আপনাকে অগ্রসর হয়ে পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে হয়।

দ্বিতীয় হলো:- ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী সেজ্‌দা দিল না। অর্থাৎ ইবলিশ সেজ্‌দা দেয় না। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করবার পর আল্লাহ্‌ বললেন তোমরা সবাই আদমকে সেজ্‌দা দাও। আযাজিল (আঃ) সেজ্‌দা দিয়ে দিলে শয়তানের উৎপত্তি হত না। এখানে রহস্য রয়েছে সেটা আপনাদের মাঝে একটু বলে রাখি:- আযাজিল (আঃ) আদম (আঃ) কে সেজ্‌দা দিলেন না কেন ? কারণ আযাজিল (আঃ) তো আল্লাহ্‌র হুকুমই মানতেন। যিনি ছয় লক্ষ বছর আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগী করতে করতে স্রষ্টার এত নিকটবর্তী হয়েছে যে, তাঁকে ফেরেশতা রাজ্যে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিঁনি আল্লাহ্‌র আদেশ মানতেন। তাই আদমকে (আঃ) সেজদ্‌া দেওয়ার হুকুমও তো আল্লাহ্‌রই আদেশ। ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী দিল না। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় সেটা হলো, আযাজিল (আঃ) এর আগে তো কোন শয়তান বা অহংকারী ছিল না। তাহলে আযাজিল (আঃ) কে ধোঁকা বা কূমন্ত্রণা কে দিয়েছিল ? এটাই একটি রহস্য। তাই এই সেজ্‌দা না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে মানুষকে আটকানোর জন্য শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা প্রচেষ্টা করে।

পীরের দরবারে যে ভক্তিটা রাখা হয় সেটা হলো তাজিম। প্রকৃত সেজ্‌দা আল্লাহ্‌র জন্যই। কিন্তু সেই প্রকৃত সেজ্‌দা দেওয়ার যোগ্য আমরা কি দিয়ে অর্জন করব ? যিনি কখনও ফুটবল খেলেন নি, তাকে বিশ্বকাপ ফুটবল মাঠে খেলায় নামিয়ে দিলে গোল করতে পারবেন ? প্রাকটিস থাকতে হবে, খেলতে খেলতে পাঁকা খেলোয়ার হতে হবে। তাই যিনি অনুশীলন করেন নি তাকে কি দিয়ে শিখাবেন ? তাজিমটা শেখাটা হলো প্রাকটিস যা পীরের দরবারের একটি আকিদা। অহংকারের যে মূল বিশেষণ সেটাকে ধ্বংস করবার

জন্য পীরের দরবারে এই তাজিম রাখা রয়েছে, আর এই আমলের দ্বারাই অহংবোধ দূরীভূত হয়। তাই তাজিমের যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে। রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- যে মানুষের মধ্যে তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ এই অহং বোধ থেকেই ইবলিশ সত্ত্বার উৎপত্তি হয়েছে। শয়তান সম্পর্কে তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে:- আত্তালেবুদ্দুনিয়া মরদুদ। অর্থ:- যে কেবল দুনিয়া চাইল বলে দাও সে মরদুদ নামে শয়তান। আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, একটু ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল পড়া এই বাসনা নিয়েই তো সাধারণত আমরা থাকি। তাই এই দুনিয়া চাইলে মরদুদ নামের শয়তান হয়। এই মরদুদটাও শয়তানের একটি নাম বা লকব।

শয়তান সম্পর্কে চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে:- মিনশার্‌রিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। অর্থ:- তুমি খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নাও। অর্থাৎ- খান্নাস সমস্ত জায়গায় খুব সূক্ষ্ম রূপে বিরাজিত। আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা কাবা বলেন যে:- রক্তের সবচেয়ে সূক্ষ্ম কণিকা হলো অণুচক্রিকা, যা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। অণুচক্রিকার সাথেও খান্নাসি সত্ত্বা মিশে থাকে। এজন্য বাবা একটি বাণী বলে থাকেন যে:- খান্নাস হতে মুক্ত হওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ। খান্নাস ছাড়া বাকী শয়তানি সত্ত্বা গুলো স্বল্প সূক্ষ্মার মধ্যে বিরাজ করে। একটি মানুষের ব্লাড সারকোলেশন সমগ্র শরীরের পরিমন্ডল ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাই এই খান্নাস মানুষের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম রূপে বিরাজ করে। খান্নাস হতে যদি কেউ মুক্তি নিতে পারে বা চারটি মন্দ সত্ত্বা থেকে যদি কোন মানুষ তার দেহ ভান্ড থেকে দূরীভূত করতে পারে তাহলে তিঁনি ইনসানে কামেল হন। তখন সেই মানুষটা মুৎমাইন্না নফ্‌সের অধিকারী হয়। ইনসানে কামেল হলে তিঁনি আদমে রূপান্তর হয়ে যায়।

তাই ধর্মীয় দর্শনের সূচনায় বা সিঁড়ীতে থাকে একজন পীর বা মোর্শেদ। এজন্য পীর বা মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রকৃত ধর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এটাকে কেউ অছিলা ধরা, আহলে বায়াতে দাখিল হওয়া, মুরিদ হওয়া, যে ভাষাতেই আমরা বলি না কেন, এখানেই মূল সিঁড়ীটা রাখা হয়েছে রসূলের (সাঃ) (আঃ) পরবর্তী ব্যবস্থায়। এই সিঁড়ীতে পাঁ দিলেই হবে না, এটাকে যথাযথ ভাবে ফলপ্রসূ করতে হবে। আপনাদের একটা কথা বার বার বলছি, সেটা হলো:- রসূলের (সাঃ) (আঃ) উম্মত হতে হলে রসূলকে (সাঃ) (আঃ) দেখতে হবে। এই দর্শনবাদের জারীকৃত ব্যবস্থাই হলো মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করা। যিনি মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে পারেণ, তিঁনিই সফল মানুষ হন। শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা চলে গেলে নফ্‌স এবং আল্লাহ্ সত্ত্বা থাকে। তখন নফ্‌স এবং

আল্লাহ্ সত্ত্বা মিলে একাকার হয়ে যায়। তখনই ওলিরা বলেন, যেমন মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন:- আনাল হক। অর্থ আমিই সত্য। জমদগ্নি মুনি বলেছেন:- সোহ্হম সোহ্মি অর্থ:- তিঁনিই আমি, আমিই তিঁনি। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব বলেছেন:- তুঁই মুঁই, মুঁই তুঁই। বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলেছিলেন :- লাই সালাফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্তাআলা। অর্থ:- আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই নেই। অর্থাৎ এই সকল ওলি এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বা বিভাজনকৃত ব্যবস্থা নেই।

তাই শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে হবে। মোহ মায়ার বন্ধনে থাকা অবস্থায় আমরা যতই সত্য শুনি বা পরিপূর্ণতার আহ্ববান শুনি, কিন্তু এই আহ্বানের কোন কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূ হয় না। এই মোহ মায়ার জন্য মানুষ পীর বা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় ধাবিত হতে চায় না। তাই মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় ধাবিত হওয়ার পর ইনসানে কামেল হলেই আদম লকবের পরিপূর্ণতা ফলপ্রসূ হয়। ধর্মের প্রকৃত কার্য হলো জানা, বোঝা প্র্যাকটিক্যাল উপলব্ধির মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করা। প্রতিটি আমলে যথার্থতা কার্যকারিতা ফলানোই হলো ধর্মের বিধান। শুধু করে গেলাম, সেটার কোন উপলব্ধি না পেলে পূর্ণতা ফলবে না। জাগতিক ভাবে কোন কর্মস্থলে আপনি যদি এক দিনও কর্ম করে থাকেন, তাহলে সে দিনের মুজুরীটাও আপনি নিয়ে নেন। আর স্রষ্টার প্রকৃত বিধানের আমলগুলো আপনি সারা জীবন ফ্রি করে যাবেন, সেটা শুধু আল্লাহ্ই জানবে, আমি জানতে পারবো না, এমন কর্ম বোকার স্বর্গে বাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ আপনি যে কর্মটুকুই করেন সেটার পূর্ণতাকে তো আপনার বুঝতে হবে। আজকে দুনিয়ার পরীক্ষার হলে যদি একটি প্রশ্নের উত্তরও লিখি, আমার সেই উত্তরের নিরূপণ করে আমাকে কত মার্কস দেবেন ? সেই রেজাল্টটাও আমাকে দিয়ে দেয়। তাহলে জাগতিক ভাবে যদি এরকম করে নিরীক্ষা করে রেজাল্ট দেওয়া হয় আর ধর্মের বিষয়ে আমরা উদাসীন বা বাকীর লোভে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম পালন করলাম, আল্লাহই জানবে। এমন বোকার স্বর্গে বাস না করে প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে জানবেন, বুঝবেন এবং সেটা মানার জন্য চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ্পাক সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন নূরে মোহাম্মদী। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস:- রসূল (সাঃ) (আঃ) এরশাদ করেন যে, যখন আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ্পাক তাঁর নিজ নূর হতে তাঁর হাবীব (সাঃ) (আঃ) এর নূর পৃথক করেন। অতঃপর প্রিয় নূরে মোহাম্মদী (সাঃ) (আঃ) এর নূর চার ভাগে ভাগ করে

প্রথম ভাগে কলম, দ্বিতীয় ভাগে লওহে মাহফুজ, তৃতীয় ভাগে আরশ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে তা আবার চার ভাগ করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেসতা, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে কুরসি বহনকারী ফেরেসতা, তৃতীয় ভাগ দিয়ে অন্যান্য দায়িত্বরত ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় চার ভাগের অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে জমিন (দুনিয়া) এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেস্ত ও দোযখ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত করে এর প্রথম ভাগ দিয়ে মুমিনদের নয়নের (দৃষ্টি শক্তি) নূর, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে আল্লাহ্‌র মারেফত (কলব-এর নূর) এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা কলেমা তাওহীদ সৃষ্টি করেন এবং অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে অন্যান্য জগত সৃষ্টি করেন (হাদিসে মাওয়াহেব)।

উক্ত হাদিসখানা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সৃষ্টির মূল হলো নূরে মোহাম্মদী বা নবী করিম (সাঃ) (আঃ) এর নূর। পবিত্র কালামপাকে সূরা ফাতাহ এর ৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেনঃ- ইন্নাআরসালনাকা শাহিদাওঁ ওয়া মুবাশ্বিরাওঁ ওয়া নাজিরা। অর্থঃ- নিশ্চয় আমি (মোহাম্মদ সাঃ আঃ) হাজির নাজির বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী; সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি। তাই তিঁনি আমাদের সকল কিছুর প্রত্যক্ষকারী এবং শেষতক সুপারিশকারী, সুতরাং নবী-নূর থেকে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তন।

সূরা আল-বাকারার ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেনঃ- আমি (আল্লাহ্‌) আদমকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিব। কোরআনুল মাজিদের দশটি সূরায় পঞ্চাশটির মত আয়াতে বাবা আদম (আঃ) এর নাম উল্লেখ রয়েছে। সূরা আল-ইমরানে, সূরা আল-আরাফ, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা আল-কাহফ, সূরা ত্বোয়া-হা তাঁর নামের গুণাবলীর আলোচনা রয়েছে। সূরা আল-হিজর, সূরা ছোয়াদে শুধু গুণাবলী এবং সূরা আল-ইমরান, সূরা মায়িদা, সূরা ইয়াসিনে আনুষ্ঠানিক রূপে শুধু নামের উল্লেখ রয়েছে।

কালামপাকে আরও উল্লেখ রয়েছে সৃষ্টির আদিতে প্রথম থেকে পঞ্চম দিসব পর্যন্ত সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং ৬ষ্ঠ দিবসে মানুষ সৃষ্টি করেন। পূর্বের সৃষ্টিতে পঞ্চম দিবস পর্যন্ত কুন-ফায়াকুন দ্বারা আর মানুষের সৃষ্টি হলো তাঁর (আল্লাহ্‌র) হস্ত দ্বারা।

পবিত্র কালামপাকের নির্ধারিত আয়াতগুলি অনুধাবন করার জন্য নিম্নে উপস্থাপন করা

হইল।

২ নাম্বার সূরা আল-বাকারা = ৩০ ,৩৪ নাম্বার আয়াত।

৭ নাম্বার সূরা আল-আরাফ = ১১ নাম্বার আয়াত।

১৫ নাম্বার সূরা আল-হিজর = ২৯ নাম্বার আয়াত।

১৭ নাম্বার সূরা বণী ইসরাঈল = ৬১ নাম্বার আয়াত।

১৮ নাম্বার সূরা আল-কাহাফ = ৫০ নাম্বার আয়াত।

২০ নাম্বার সূরা ত্বোয়া-হা = ১১৬ নাম্বার আয়াত।

২১ নাম্বার সূরা আল-আম্বিয়া = ৯১ নাম্বার আয়াত।

৩৩ নাম্বার সূরা আল-আহ্যাব = ৭২ নাম্বার আয়াত।

৩৮ নাম্বার সূরা ছোয়াদ = ৭২ , ৭৫ নাম্বার আয়াত।

৫৫ নাম্বার সূরা আর-রহ্মান = ৪ নাম্বার আয়াত।

৩৩ নাম্বার সূরা আল-আহ্যাব = ৭২ নাম্বার আয়াত।

৮২ নাম্বার সূরা আল-ইনফিতর = ৮ নাম্বার আয়াত।

৯৫ নাম্বার সূরা ত্বীন = ৪ নাম্বার আয়াত।

নির্যাতনের বর্ণনা

মানুষ প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত যদি কোন বা কোন প্রকার চালাকি নিয়ে দৌঁড়ায় একটি মানুষকে তুরূপের তাস হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু মূলে অবস্থান করে অন্য হিসাব মিথ্যাচার দ্বারা প্রতিনিয়ত এক কঠিন যাতনা সয়ে চলেছি। মূল মানবরূপে দানব এর চরিত্র এখানে উল্লেখ না করাই শ্রেয় মনে করলাম শুধু তাই নয় জগত সংসারে এসে সুফির দর্শনে ধাবিত হওয়াটা আমার জীবনে এতো বিপর্যয় গ্রহণ করিতে হইবে এটা ভাবিনি। তবুও শয়তানি শক্তির সাথে আপোষ না করাই ভাল বলে মনে করিলাম। কারণ জগত সংসার বিচার কাঠগড়া সবই চায় প্রমাণ আর সাক্ষ্য কিন্তু এই সাক্ষ্য আর প্রমাণকে আড়ালে রেখে তারা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যদি দয়াময় মাবুদ কখনও সময় দেন তা হলে আপন আপন কর্মের ফল একদিন যেন আল্লাহ্ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়।

আপন অনুভূতি

জীবন পথের গতি-জাগতিক ধারায় অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করায় সর্ব সময় যেটা পাওয়া গেল তা হলো চক্রান্তের ফাঁদগুলো এতো জটিল করে তোলা হচ্ছে যে জীবন নামের যন্ত্রণা কত সময় বা আর কতকাল এভাবে বয়ে বেড়াতে হবে এটা এক দুর্বিসহ আঁধার তৈরি করে চলেছে। বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যেন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন এ বিষয়টা মাথায় রেখে চলেছি। কিন্তু কার ভাবনা ভাবে শয়তানি শক্তি পর্যায়ক্রমে এক কাতারে সমাবেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পতাকা তলে আমাকেও দাঁড়াতে বাধ্য করার প্রয়াস সর্বদা অভিনয় আর একটি মানুষকে ফাঁদে ফেলানোর অবিরাম কৌশল পালন করে চলেছে। বুঝতে পারলেও নিজের বা একান্তজনদেরকেই বুঝানো সম্ভব হলো না। তাই একান্তভাবে মাবুদের নিকট প্রার্থনা করে গেলাম নিজের নিকট আত্মীয়রা যা করছে মাবুদ যেন এ বিচার করেন। এখানে দুইটা পথ উল্লেখ করলাম (i) হয় হেদায়েত করবেন (ii) নতুবা শাস্তিতে সমাসীন করবেন। আর আমার এই অনুভূতি যুক্তির নিরিখে নয় ধর্মীয় দর্শনের পটভূমিতে যেন জ্ঞানীগণ ভেবে দেখেন। আর যারা মূল বিষয় সম্পর্কে অজানা কিন্তু অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এক কাতারে সামিল হয়েছে কিন্তু বুঝতে পারেনি আল্লাহ্ পাক যেন তাদের মাফ করে দেন। সর্বশেষে এই ঘটনার বাইরে সকল মানুষের মুক্তির

জন্য মাবুদের কাছে প্রার্থনা রইল সকল মানুষ মুক্তি পাক। সকল মানুষ শান্তিতে থাক। সবাইকে যেন হেদায়েত দান করেন। আমার যত প্রকার যন্ত্রণা আছে সব সহ্য করার ক্ষমতা আমাকে প্রেরণ করেন।

পীর বা গুরু বিষয়ে আলোচনা

“পীর” হলো ফার্সি শব্দ, বাংলায় গুরু, আরবীতে ওলি মোর্শেদ, এছাড়াও সাকি, সারপ্রোভা, রেনেদা সহ বিভিন্ন ভাষাতে নামকরণ রয়েছে। গুরু হলো- অন্ধকার দূরীভূত করে আলোর দিশার সন্ধান দানকারী অভিভাবক। প্রচলিত ব্যবস্থায় যাহাকে বাবা বলে সম্বোধন করা হয়। আধ্যাত্মিক জগত বা বাতনি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সূচনা হলো, গুরুর নিকট বায়াত গ্রহণ বা আত্মসমর্পণ করা।

এখন কথা হলো অন্ধকার কি? যা দূরীভূত করে আলোর দিশা স্থাপন করবেন। অন্ধকার হলো মানবের মধ্যে নিহিত শয়তানি স্বত্ত্বাকে অন্ধকার বলে। শয়তান, ইবলিস, খান্নাস, মরদুদ এই চারটি স্বত্ত্বা একত্রে শয়তানি সত্ত্বা বুঝানো হয়ে থাকে। শয়তানি সত্ত্বা একটি দেহে ক্রিয়ারত হলে সেই দেহের অধিকারী মানব অন্ধকারভূত মানব। মূল স্বত্ত্বা হলো (রুহ) এর ক্রিয়ায় অচৈতন্য থাকে, ফলে কর্তব্য কর্মের সঠিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে ধর্মের মূল অনুশীলন ব্যবস্থা ব্যহত হয় যা খুবই সুক্ষ্ম বিষয় বা আত্মিক সাধনারত মানবগণ বুঝতে পারে এমন সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ খুব কমই দেখা যায়। তাই গুরুর দেওয়া অনুশীলনের মধ্যে সে এই শয়তানি স্বত্ত্বাকে একটি দেহ থেকে নিঃস্ক্রীয় করা বা মুসলমান বানানো ইহাই অন্ধকার দূরীভূত বলা হয়।

আলোর দিশা হলো (রুহ) প্রতিটি মানব দেহে মাওলা স্বত্ত্বা (রুহ) রূপে বিরাজিত এই রুহকে জাগ্রত করতে পারলেই আলোর দিশা বা দেহের চৈতন্য ঘটে। এমন দেহকেই আলোর দিশা প্রাপ্তির সুসংবাদ দান করে। এই কার্য সম্পাদন করতে কোরআন অছিলা অন্বেষণ করবার, একা হবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ জন্য এই নির্দেশনামার বাস্তবিক বা ব্যবহারিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যিনি পরিজ্ঞাত তাহাকেই গুরু বলে। যে জ্ঞান দ্বারা এই ব্যবস্থাপত্র পরিচালিত হয় তাহাকে এলমে লাদুনী বলে। এ বিষয়ে পীরাণে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, গাউসে সামদানী সেখ সৈয়দ মহিউদ্দীন

আব্দুল কাদের জীলানী বলেছেন, “যখন পীরের নিকট গমণ করিবে তখন জাহেরী বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে”। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (আঃ) বলেছেন, রুমি ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল হতে পারেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত সামসেত্তাব্রীজের গোলামী করেছে”। এই হলো গুরু এবং শিষ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা।

একজন মানব-মানবীকে প্রকৃত ধর্মীয় বিষয় অনুধাবন করতে গুরু ধরা আবশ্যিক। প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ্ (রুহ) রূপে বিরাজিত। এই রুহ স্বত্ত্বাই হলো প্রকৃত গুরু। এই গুরুর সন্ধান করতে কোরআন বিভিন্ন ভাবে অছিলা অনুসন্ধান করবার নির্দেশ দান করেছে। এই অছিলা-ই আজকের বেলায়েতী ব্যবস্থা, গুরুবাদ বা সুফিজম। প্রচলিত বিধি বিধানের সঙ্গে এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়ায় মানুষের বুঝতে কষ্টসাধ্য হতে চলেছে। এছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন দল বা ফেরকাবাজীর উপদল দিন দিন প্রবৃদ্ধি হওয়ার ফলে মানুষ মূলের ধারার অনুশীলন ভূলতে বসেছে। প্রকৃত পক্ষে একজন কামেল গুরুকে চিনতে ও বুঝতে হলে তাঁর দেওয়া “মোরাকাবা” “মোশাহেদা”র মাধ্যমে চেনা জানা সম্ভব। তাই কর্মযজ্ঞ দ্বারা নিজেকে চেনার প্রকৃত বিধান হলো গুরুবাদ। ইহাই আহলে বাইয়াতের বা মূলের অনুশীলনগামী ব্যবস্থা। কোন মানুষের একমাত্র চাওয়া স্রষ্টাকে মনে ও প্রাণে লালন করে এর কার্যফল ফলাতে গুরুবাদ প্রয়োজন। মেকির বোধোদয়, জ্ঞান এবং যুক্তির মানদন্ড এখানে অচল।

এখানে বা এই পথের পাথেয় জ্ঞানকে এলমে লাদুনী বলা হয়।।

“মানুষের জন্য ধর্ম এসেছে-

ধর্মের জন্য মানুষ নয়”

তাই এই মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে পরিগণিত হওয়া এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার সিঁড়িই হলো গুরুবাদ ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে মাওলা আলী (আঃ) বলেছেন, যারা আহ্লুল বাইয়াতকে ভালবাসেন তাদেরকে অনেক দুঃখ দুর্দশা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, যন্ত্রনা পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এজন্য মানুষ অতিশয় আরাম প্রিয় এবং ভোগবাদীর উপর আকৃষ্ট ভাবটা সর্বদাই দ্রুত কার্যকরী রূপদানে সচেষ্ট হওয়াতে আহলুল বাইয়াত কে গৃহীত চিন্তা চেতনা অমূলক

ভাবে এবং এটাকে বাতিল প্রমাণ করতে যুক্তির মানদন্ড দাঁড় করিতেও বিবেকে বাঁধে না। এ ভাবেই দিনের পর দিন মানুষ প্রকৃত সত্য বিধান থেকে দূরীভূত হতে চলেছে। মূল ধারার বিধান পেতে হলে মানুষকে গুরুবাদ ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে সকল কর্ম মোহগ্রস্থতার বাইরে অবস্থান করে কর্ম সম্পাদন করতে পারলে প্রকৃত গুরুবাদী ব্যবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। মূল ধারার অনুশীলনগামী ব্যবস্থা দ্রুত মানব সমাজে পালনতব্য করার প্রচেষ্টা থাকলেই ধর্মের প্রকৃত স্বার্থক রূপ মানব সমাজে চির সমুজ্জল ভাবে ফুটে উঠবে। স্রষ্টার সৃষ্টির যথার্থতা এবং ধর্মের প্রকৃত নির্দেশনামা বাস্তবায়ন পূর্ণতা পাবে। এটাই গুরুবাদ ব্যবস্থা।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদ এর নিম্ন লিখিত সূরার আয়াত গুলো অনুধাবন করিতে চেষ্টা করুন।

সূরা ইয়াছিন-২১

সূরা মায়েদাহ-৩৫,৫৫,৫৬

সূরা ফাতেহা-৬,৭

সূরা ফাতাহ- ১০

সূরা আল ইমরান- ৬৮

সূরা নূর- ৩৫

সূরা তওবা- ১১৯

সূরা নেছা- ৬৯

সূরা জাষিয়াহ- ১৮, ১৯, ২০

লেখকের কিছু কথা
(আধ্যাত্মিক প্রদীপ্ত হতে)

বইটি লিখতে গিয়ে অনেক নতুন বিষয় সামনে উঠে এসেছে যা আমার জানা নেই। তাই আমার মহান মোর্শেদসহ অনেক আউলিয়াগণের কিতাব হতে সহায়তা নিতে হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হুবহু কিছু বাক্যও তুলে ধরেছি। (সাঃ) (আঃ) এই লেখাটা পড়তে হবে "সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালাতু সালাম" কারণ কোরআন বলেছে, (সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার ১৫৪) :- "এবং তোমরা বলিও না, যাহারা নিহত হয় আল্লাহ্‌র পথের মধ্যে তাহারা মৃত, বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা জানো না"। বইটিতে একই কথা বার বার উঠে এসেছে এটা হয়ত অজ্ঞতারই চিহ্ন, তবুও লিখতে হচ্ছে। সাধকদের রীতি-নীতি ভাববাদী বিষয়ে নিহিত ধর্মের একটি মুক্ততার অবয়ব, মানুষ স্বাধীন ভাবে তার ধর্ম কার্য করবে। যে সকল বিষয় জাগতিক ভাবে প্রচলিত নেই সে আলোকে কিছু কথা বা চিহ্নিত বিষয়টি জ্ঞানীদের জন্য উপস্থাপন করে রাখা, যা হয়ত পৃথিবীর জ্ঞানীগণ একদিন এর সুন্দর গ্রহণযোগ্য মানদন্ড মানুষের কাছে পৌঁছে দিবে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর শেষ হতে না হতেই মানুষের কাছে ধর্মীয় উদাসীনতা, ধর্মের ব্যাপক দলাদলির প্রবৃদ্ধি ধর্মকে ব্যবহার করে আমিত্বের বড়াই পথভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে নিয়ে চলেছে। এর অর্থ হলো খোলসের আবরণে ঢাকা বিষয়গুলো আধুনিক জ্ঞান বিকাশের ধারায় উন্মুক্ত হতে চলেছে। ধর্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন পূর্বক শিখা অনির্বান প্রজ্জ্বলন ঘটানোর চাইতে রাষ্ট্রীয় ভোগ বিলাসে (উমাইয়া-আব্বাসী) নীতিতে ধর্ম ব্যবহারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ, মোহ, হিংসা, বিদ্বেষ, চাটুকারীতার করাল গ্রাসে আবদ্ধ হয়ে চলেছে। রসূল (সাঃ) (আঃ) এবং তাঁর বংশ ধর ও অন্যান্য মহা পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব গোপন রাখার চেষ্টায় লিপ্ত। এ অবস্থা থেকে মানুষকে প্রকৃত সত্য উপস্থাপনের জন্য সুফিরা কিছুটা লিখনির চেষ্টা শুরু করেছে। এ কারণেই সমস্যা বেশি তৈরী হতে চলেছে। সত্যের নূরময় পরিস্ফুটন সকল মিথ্যার আবরণকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রজ্জ্বলন শিখায় মানুষকে জানান দিতে সচেষ্ট হবে।

মোহাম্মদী ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার যে শিক্ষা এবং কার্যাবলী তা এখন রূপান্তর (প্রায়)। আদর্শিক ভাববাদী ধারায় স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের পথে অগ্রযাত্রা প্রচলিত ভাবধারার অন্তরায়

হিসাবে কাজ করে। রসূল (সাঃ) (আঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত আহলে বায়াতের ধারা অনুযায়ী নিজেকে সমর্পন, ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার সঠিক ভাবধারা তুলেধরা এবং রেবা কর্তৃক বর্জনীয় আদর্শই পারে প্রকৃত ধর্মের অন্তঃনিহিত মূল ধারায় পৌঁছাতে সহায়তা করতে। রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- "কিয়ামত কাল পর্যন্ত একটি দল আমার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে"। জ্ঞান প্রজ্ঞা দ্বারা উক্ত দলভূক্ত হিসাবে নিজেকে তৈরী করাই বর্তমান বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রকে সবার সমান বন্টন নীতির যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে তা উল্লেখ করলে এবং বর্তমান ব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে ইহা পাগলের প্রলাপ বৈকি আর কিছু নয়। কারণ হলো; রিপু তাড়িত চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তী মানুষ আকৃষ্টের ধারাতে আকর্ষিত হয়। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসন হতে চায় না।

রেবা (সুদ) কি ?

রেবার আভিধানিক অর্থ হলো সুদ, বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি , অধিক্য, অতিরিক্ত, বেশি, পরিবর্তন, স্ফীত, বিকাশ, বিক্রয়লব্ধ, লভ্যাংশ ইত্যাদি (ইংরেজীতে, ইন্টারেস্ট, ইউজারী, এক্সসেস, এডিশন, গেইন ইন সেলিং)। অর্থনীতির পরিভাষায় সুদ হলো অর্থ বা সম্পদ ধার নেয়ার জন্য প্রদানকৃত "ভাড়া"। জাগতিক ভাবে বলা হয় হলো:- কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ ধার বা ঋন দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করাকে রেবা বা সুদ বলে। এই নিয়োগকৃত অর্থ কম বা বেশী হইতে পারে কিন্তু সবই সুদ বা রেবা হিসাবে জাগতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোরআন যেহেতু ঐশী কিতাব এজন্য আধ্যাত্মিক ভাবে এই রেবাকে একটি সীমাবদ্ধ গন্ডী বা কম বেশি সমিচীন মনে করা সঠিক বলে প্রতিয়মান হয় না। এজন্য বলা হয় ইহার ব্যাপক অর্থবহ অবস্থা হলো মানুষিক হাল বা অবস্থা যা প্রয়োজনের চাইতে বা অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করাটাই রেবা। আগমনকারী ধর্ম রাশীতে সঞ্চয় ব্যয় না করিয়া মনের কোটায় মোহ রূপে থাকলে তা রেবা রূপে চিহ্নিত। কোরআনুল মাজিদে সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার ২৭৫ ও ২৭৬:- "যাহারা খায় সুদ তাহারা দাঁড়ায় না একমাত্র যেমন দাঁড়ায় যে, তাহাকে পাগল বানাইয়া দিয়াছে শয়তানের স্পর্শ হইতে। ঐটা নিশ্চয়ই তাহারা বলে, নিশ্চয়ই কেনা-বেচার মতই সুদ। এবং হালাল করিয়াছেন আল্লাহ্ কেনাবেচাকে এবং হারাম করিয়াছে সুদকে। সুতরাং যাহার কাছে আসিয়াছে তাহার রব হইতে উপদেশ। সুতরাং সে বিরত রহিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য যাহা অতীত হইয়াছে, এবং তাহার হুকুম আল্লাহ্র দিকে। এবং যে ফিরিয়া আসিল,

সুতরাং উহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহার মধ্যে অনেক দিন থাকিবে"। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬) :- "আল্লাহ্ ভালবাসেনা প্রত্যেক রেবাকারী, অকৃজ্ঞ পাপীকে"।

এ প্রসঙ্গে মহানবীর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে:- যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন (মরণের সময়) উদ্ভ্রান্ত এবং পাগলের মত হয়ে উঠে। রেবা সমাজ ও বিশ্বে সর্বদলীয় কোন্দলের মূল উৎস হিংসা এবং ঘৃণা রেবা হতে তৈরী হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ অসাম্য সৃষ্টি করিয়া সমাজে শত প্রকার ঝগড়া-বিবাদ রচনা করিয়া মানব সমাজে অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাহারা রেবা খায় তাহাদের সম্পর্কে কোরআন বর্ণনা করেন, তাহারা জীবনের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকে তাহা শয়তানের স্পর্শ প্রাপ্ত। ভূত গ্রস্থ পাগল ব্যক্তির মত ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহারা ধনের নেশায় আপন রব হইতে দূরে থাকে। এরা সুখিও নয় এবং সুখ দানে অক্ষম। এই জাতীয় লোক সমাজে রেবার ভাব সঙ্গে লইয়া আজীবন অযৌক্তিক ব্যবস্থা জারী করে থাকে।

আপন রবের সঙ্গে সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রেবার মত্ততা থেকে যায়। অতএব রেবা সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করিয়া সমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তি তাহারাই হইতে পারেন, যাহারা আপন রবের সংযোগ অবিরাম ভাবে সু-প্রতিষ্টিত করতে পেরেছেন। অর্থাৎ রেবা হইতে যিনি বিরত হইয়াছেন তাহার মোহ কালিমা অতীত হইয়া গিয়াছে এবং তিঁনি পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছেন। রেবা যাহারা ভোগ করে এরূপ চঞ্চল মতি লোকেরা সকলেই আগুনের অধিবাসী। আল্লাহ্ রেবা ধ্বংস করেন। অর্থাৎ রেবার উপর ভিত্তি করা মানব জীবন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চির ধ্বংসশীল। রেবা ত্যাগ না করা পর্যন্ত মানুষ জাহান্নাম হইতে উত্তরিত হইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে মন হইতে রেবা ত্যাগ করিলে সমাজে আর্থিক দান যেমন বর্ধিত হয় তেমন সত্যকে প্রত্যক্ষ করার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। রেবার পক্ষপাতী লোকেরা অবশ্যই সত্যে অবিশ্বাসী পাপী। তাই এই সকল অবিশ্বাসী পাপীকে আল্লাহ্ ভাল বাসেনা। রেবা ত্যাগ না করিলে কুফুরী হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অপর পক্ষে পাপী যখন ধর্মের সঠিক নিয়ম মেনে অনুশীলন করে তখন পাপের মোহ বন্ধন হতে ক্রমশ ধীরে ধীরে মুক্তিমুখী হইতে থাকে। সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার ২৭৯,২৮০:- সুতরাং যদি তোমরা না কর (রেবার শর্ত ছাড়িয়া না দাও) সুতরাং তোমরা জানিয়া রাখ আল্লাহ্ এবং তাহার রসূল হইতে একটি যুদ্ধের (ঘোষণা) এবং যদি তোমরা তওবা কর সুতরাং তোমাদের জন্য তোমাদের মালের মূলধন। তোমরা জুলুম করিও না এবং জুলুম করা হইবে না

(তোমাদের উপর)। "২৮০" এবং যদি অভাবওয়ালা হয় সুতরাং অবকাশ দাও স্বাচ্ছন্দের দিকে এবং যদি তোমরা সদকা করো তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে"। রেবা সম্পর্কে অত্যান্ত সূক্ষ্ম গভীর মাধুর্যময় তাৎপর্যপূর্ণ লিখনিতেও ফুটিয়ে তুলেছেন দাদাজান শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) তাঁর লিখিত কিতাব "কোরআন দর্শন" নামক বইটি পড়বার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। তৎসঙ্গে আয়াতে কারিমাগুলো পাঠকদের অনুধাবনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে আমার মহান মোর্শেদ কেবলা-কাবা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর "মারেফতের গোপন কথা" বইটি পড়বার জন্য বিনিত অনুরোধ করি। এই বইটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ধন-সম্পদ বা পুঁজীবাদী ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা একবার ভাবুন তো দুনিয়ার জিন্দিগির কোন অবস্থানে আজ আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি দন্ডায়মাণ ? নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করলে এর সদুত্তর মিলবে। এ যেন গাছের গোঁড়া কেঁটে আগায় পানি ঢালার মতই সৌন্দর্য বর্ধক ব্যতীত আর কিছু নয়। মানুষের মনোরাজ্যে প্রতি মুহূর্তে যে কত প্রকার চিন্তা চেতনা এবং কথার অবতারণা হয় তা থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া রেবা ত্যাগ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। মহিয়ান, গরিয়ান, সুমহান, সুপ্রভ, সুপ্রসন্ন নীতির মূল ধারায় আল্লাহ্‌পাক কালে-কালে তাঁরই (আল্লাহ্‌র) প্রতিনিধির দ্বারা মূলের বিধান মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন। অনেকেই আমাকে বলেছেন, বাবা জগত সংসারের চাহিদা মেটানোর তাগিদে "সুদ" ব্যতীত অসম্ভব আর আপনি বলেন মনের প্রবৃদ্ধি থেকে সরানো এসব পান কই ? ধর্ম আমরা পালন করে ৭০ বছরের জিন্দিগি পার করলাম, এমন নতুন নতুন বিষয়তো শুনিনি। "আমি বললাম" বাবা এটা তো কোরআনেরই কথা। আবার বলে উঠে "কোরআন কি আপনিই পড়েন ?" চিত্তির বিস্ময় বুকে নিয়ে চুপ হয়ে গেলাম। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলে ছিলেন, কম্বলের হুল বা সুতা বাছাই করলে থাকে কি! তাই প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান কারীর জন্য হয়ত উল্লেখিত বিষয়গুলো সহায়ক হিসাবে কিছুটা হলেও পথের দিশা দেখাবে।

আলোচ্য বইটিতে সব চাইতে বেশি আলোচনার তাৎপর্য এবং গুরুত্ব পেয়েছে সূরা ইয়াসিনের প্রথম হতে পঞ্চম আয়ত-এ উল্লেখিত রহস্য ভান্ডারের বা গুপ্ত লকবগুলি সহজ সাধ্য করে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। যেন মানুষ তাদের স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বিকাশের ধারাতে ধর্ম ধারণ বা আয়ত্ত্ব করতে শেখে। এই রহস্যময় ধারাগুলির পঞ্চম

আয়াতে রহিম রূপে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। যারা মনে করে আল্লাহ্ তো আল্লাহ্, কিন্তু কথা হলো এত নাম এবং গুণের পৃথক ধারার কার্যাবলীর কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতার আলোকে পাঠকের জন্য সহজ সাধ্য ভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে এসেছে "মুস্তাকিম" এটাকে সহজ সাধ্য হিসাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন উদাহরণ সম্বলিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেন পাঠকগণ সহজেই তা বোধগম্য করতে সচেষ্ট হয়। তৃতীয় আয়াতে এসছে "মুরসালিন" হায়াতে বা জীবদ্দশায় মানুষ যে অলৌকিক রূপ বৈচিত্র দেখতে পায় তারই আলোকে বিষয়টি বুঝতে একটু গভীর মনোযোগের সহিত আধ্যাত্মিকতার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এসেছে "কোরআনুল হাকিম"। পবিত্র কোরআন যে একটি বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ সেই আলোচনাটুকু বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ্পাক তাঁর কালাম বিজ্ঞানেরও অনেক উপরে সে কথাগুলো ভাববাদ বা আধ্যাত্মিকতার আলোকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিষয়গুলো মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পাঠকগণ যেন সহজে অনুমেয় হয় তারই চেষ্টা করা হয়েছে। আর প্রথমত "ইয়াসিন" বিষয়টা বিস্ময়কর একটি লকব বা হরফ, এ প্রসঙ্গে একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারণ হলো পূর্ববর্তী চারটি ধাপ বা যোগ্যতার উপরে এই মানদন্ড এ বিষয়গুলোকে মুক্তমনা চিন্তাশীল পাঠককুল হয়ত অনেক উপকার পাবে। তৎসঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ধ্যান-ধারণা কাজে লাগিয়ে হয়ত আরও সুন্দর ও মাধুর্যময় লেখা জ্ঞানীগণ মানুষের জন্য উপস্থাপন করবে। যা কর্ম পন্থায় বিশেষ সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখবে। পাঠের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির বোধদয় হতে সূক্ষ্ম চিন্তা চেতনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান হাসিল পূর্বক দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করবে। দুনিয়া বাসীর জন্য দর্শন ভিত্তিক ধর্মীয় বিধান জরুরী। কারণ হলো ধর্মীয় এত বিতর্কের অবসানে আধ্যাত্মিক নীতির আলোকে স্বীয় ধর্মকে কার্যকর এবং উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। মহিয়ান, গরিয়ান, সুমহান স্রষ্টা আমাদেরকে তাঁর প্রকৃত বিধান আয়ত্ত্বের মাধ্যমে মূল ধারার দিকে যেতে সহায় হবেন। তৎসঙ্গে প্রচলিত ভাবধারার বল পূর্বক পাঠের আয়ত্ত্বকৃত ব্যবস্থার বন্ধন থেকে উত্তরিত

হয়ে মাবুদের সাক্ষাত লাভের দিকে অগ্রযাত্রায় সামিল হলে এই লেখনিটুকো স্বার্থকতা পাবে।

হাজা হাবীবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ) বর্ণনা করেছেন:- "শা হাস্তে হুসায়েন, বাদশা হাস্তে হুসায়েন, দ্বীন হাস্তে হুসায়েন, দ্বীনে পানা হাস্তে হুসায়েন, সারদাদ নাদাদ দাস্ত দার দাস্তে ইয়াজিদ, হাক্কাকে বেনায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাস্তে হুসায়েন"। অর্থ:- হুসায়েন হলো ধর্মের সম্রাট, এবং দুনিয়ার সম্রাট (ঐশী যোগ্যতা প্রাপ্ত), হুসায়েন হলো ধর্ম এবং ধর্মের আশ্রয়দাতা হুসায়েন, দিলেন মাথা না দিলেন হাত ইয়াজিদের হাতে (জীবন দিলেন সন্ধি না করলেন ইয়াজিদের সাথে), সত্য ইহাই যে (লা-ইলাহা ইল্লালাহু) এর স্তম্ভ হইল হুসায়েন (আঃ) সকল নামের সাথে যুক্ত হবে। এই আদর্শ হলো প্রকৃত বিধান। সুতরাং উক্ত আদর্শের উপর স্বীয় ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করে যেতে হবে, এটাই প্রত্যাশা।

অতঃপর কোরআন সাত হরফে নাজেল বিষয়ে কিছু তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করা হয়েছে যা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়কে সমন্বয় সাধন কল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ বিষয় সম্পর্কে চলমান দুনিয়াতে কম সংখ্যক মানুষ জ্ঞাত রয়েছে। তৎসংলগ্ন বিষয়টির সঙ্গে সামান্য কিছু "১৯" সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে যা জ্ঞানীগণের দৃষ্টিতে একদিন হয়ত এর বিশদ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপনার লেখনি জাতিকে জানান দিতে সচেষ্ট হবে। অতঃপর কোরআনুল মাজিদের নাম সমূহ অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যা বর্তমান সময় পর্যন্ত কোরআনুল মাজিদের বিভিন্নতার সৌন্দর্যময় অবস্থান।

অতঃপর "লকব" বিষয়ে বাস্তবিক কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, যা দ্বারা অনেক ফেতনার অবসান হবে। এ বিষয়ে একটু উল্লেখ রাখতে চাই, আর তা হলো আমার নামের শেষে সুরেশ্বরী লাগানো এটা একটি "লকব"। কেউ চিশতীয়া, কাদরিয়া, হাসিমী, নকশাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, ওয়াইসিয়া ইত্যাদি "লকব" চলমান দুনিয়াতে প্রচারতব্য তরিকতের বিন্যাস। উক্ত ধারা সহজ ভাবে উপলব্ধির জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে পুস্তকটিতে। অতঃপর রহস্য জগতের আর এক নাম "সিরাজাম মুনিরা" বিষয় সম্পর্কে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক মত উপস্থাপন পূর্বক উক্ত ধারার নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধির

বিকাশ ঘটানোর আলোকে বন্ধন সমূহ নিপতিত করবার লক্ষে যুক্তিযুক্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বিষয়টি রহস্যময় বটে।

অতঃপর মেরাজ সম্পর্কে চলমান দুনিয়াতে প্রচার তব্য বিষয় যা লোক মুখে হর হামেশা শোনা যায়, এটাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সাধকের চিন্তা-চেতনার বিষয় সহ কিছু দালিলিক প্রমাণ এবং কিছু মত সহ সুন্দর সাবলীল ভাবে এবং সহজ সাধ্যে বুঝবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। মেরাজ সম্পর্কিত চলমান সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত মত যা দলিল খুঁজে পাওয়া বিরল এমন কথাও ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রকাশ করে যেমন :- হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সিনাছাক ৩ বার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এরকম বহু কথার সমারোহ ধর্মের আলোকে চলমান ধর্মীয় নীতিতে প্রচলিত। তাই উভয় মতকে (জাগতিক/আধ্যাত্মিক) উপস্থাপন প্রক্রিয়াতে লেখনিটুকো দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, যেন পাঠক বাবা-মায়েদের সহজে অনুমেয় হয়।

অতঃপর মোজেজা বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। মোজেজা বিষয়টি যেহেতু অলৌকিক তাই এ বিষয়ে কত রকমের যে গাঁজাখুরী গল্পের প্রচলন রয়েছে তা মাবুদ'ই ভাল জানেন। তবে বিজ্ঞ পাঠকদের জন্য মূল ধারার কথাগুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এমনও অনেক মতে রসূলগণের অলৌকিক ক্ষমতাকে মোজেজা বলে আর ওলিদের কার্যকে কারামত বলে। মোজেজা ও কারামত পৃথকীকরণ ব্যতীত একই ভাবধারাতে পুস্তকটিতে আলোচনা রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠক বাবা-মায়েরা কিছু নতুন বিষয় যা পূর্বে জানতে পারেনি এমন ধর্মীয় আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। সুন্দরের প্রত্যাশায় পরিবর্ধন পরিমার্জন সামনে রেখে উপস্থাপন করা হইল।

অতঃপর মোরাকাবা-মোশাহেদা সম্পর্কে - মূলধারার বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যা দ্বারা পাঠক বাবা-মায়েরা ধর্মের মূল বিষয় সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে মানুষ প্রকৃত বিধান অবলম্বনে তার স্বীয় ধর্মে কর্মে সুফল প্রাপ্তির ধারাতে অগ্রগামী হতে সচেষ্ট হবে। উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে অনেক মানুষেরই ধ্যান ধারণা না থাকায় বিরূপ চিন্তা চেতনায় লিপ্ত হবার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই আমল নীতির দিকে মনোনিবেশ করলে অবশ্যই সুফল ঘটবে (ইনশাআল্লাহ্)।

তুলনামূলক মত সহ প্রকৃত বিষয় অনুধাবন করতে পাঠক বাবা-মায়েরা সচেষ্ট হবে বলে আশা রাখি। পরিশেষে আল্লামা ইকবালের সেই মহান বাণী দিয়ে শেষ করব :-

"মুসলিম! সেতো কবে মরে গেছে
ইসলাম লেখা কেতাবে।
আকিদা আমল সবই চলে গেছে
মুসলিম আজ খেতাবে।
অন্তরে তাদের বাসা বাঁধিয়াছে
শুধু লাত-মানাতের দল,
মুশরিক আজ মুসলিম বেশে
করিতেছে কোলাহল"

সূরা ইয়াসিনের ৬টি আয়াতের উপর আলোচনা উচ্চারণ এবং অর্থ

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম্‌।

অর্থ:- আল্লাহ্‌র নামে শুরু, (আর-রহ্‌মান) যিনি দয়াল দাতা

এবং (আর-রহিম্‌) যিনি দয়ালু।

১) ইয়াসিন।

অর্থ:- হে প্রদীপ্তপ্রদীপ।

২) ওয়াল্‌ কুরআনুল্‌ হাকিম্‌।

অর্থ:- সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরআনের।

৩) ইন্‌না কালা মিনাল্‌ মুর্‌ছালিন্‌।

অর্থ:-আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} রসূলগণের মধ্য হইতে।

৪) আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্‌।

অর্থ:- আমাদেরকে মুস্তাকিমের (সত্য/সঠিক) পথে পরিচালনা করুন।

৫) তান্‌জিলাল্‌ আজিজুর রহিম।

অর্থ:- ইহা প্রবল ক্ষমতাবান রহিম হইতে নাজেল।

৬) লিতুন্‌জিরা কাওমাম্‌ মা উন্‌জিরা আবায়ুহুম্‌ ফাহুম্‌ গাফিলুন্‌।

অর্থ:- তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে এই হেদায়েতের বাণী পৌঁছানো হয়েছিল কিন্তু তারা গাফেল।

ইয়াসিন

পবিত্র কোরআনুল মাজিদের ১১৪টি সূরার মধ্যে ২৯টি সূরার প্রারম্ভে হরফ মদযুক্ত আয়াত রয়েছে। উক্ত আয়াতে কারিমাকে মোকাত্তাআতে্র হরফ যুক্ত আয়াত বা শুধু মোকাত্তাআতে্র আয়াতও বলে।

আয়াতে কারিমার শুরুতেই বলা হলো ইয়াসিন। অনেকেই মোকাত্তাআত্ এর হরফ যা আছে এর অর্থ তাই লিখে থাকেন তার আলোকে অর্থ দাঁড়ায় ইয়াসিন। কিন্তু ভাববাদী গবেষকদের অনুবাদ এবং তাফসির দেখলে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়। তাই ভাববাদীতে লেখনিটুকু এর ভাবার্থসহ ভাববাদী উপস্থাপনের চেষ্টা বা আলোচনার চেষ্টা থাকল।

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে "ইয়া-সিন" এর অর্থ "ইয়া ইনসানো" অর্থাৎ হে মানব বা হে মহামানব। ইয়াসিন নামটি মহান আল্লাহ্পাকের নিকট একটি প্রিয় নাম বা লকব। হযরত শাহ সুফি সদরউদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) এই ইয়াসিন মোকাত্তাআত্ বা শব্দের অর্থ করেছেন হলোঃ- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ। অনেকের মতে "ইয়া-সিন" প্রতীক দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) কে সম্মেধন করা হয়েছে। নূর মোহাম্মদ মানুষ মোহাম্মদের রব, এই হিসাবে সূরাটির সূচনা হয়েছে। "সিন" অক্ষরটি "সামস্" এবং "সিরাজাম মনিরা" শব্দদ্বয়ের প্রতীক। "সামস্" অর্থ সূর্য। ইহা রসূলের (সাঃ) (আঃ) একটি খেতাব এবং "সিরাজাম মনিরা" অর্থ আলোকিত প্রদীপ। তাই "সিন" অক্ষর দ্বারা রসূলের (সাঃ) (আঃ) গুণবাচক খেতাবী নামরূপেরই উল্লেখ। উক্ত আলোচনার আলোকে ইয়াসিন শব্দের অর্থঃ- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ। এটা এমন ধরনের প্রদীপ যা সেই প্রদীপেরও প্রদীপ। যার ভিতরে প্রজ্জ্বলনকৃত একটি ধারার ধারাবাহিক প্রজ্জ্বলন ঘটেছে, সেই প্রজ্জ্বলনকৃত ব্যবস্থায় হলো একটি প্রদীপ্ত ব্যবস্থা। শুরুতেই বলা হলো :- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ। প্রদীপ্ত বলতে আমরা একটি নূরময় ব্যবস্থাকেই জেনে থাকি। সমগ্র কোরআনুল মাজিদের মধ্যে মূল্যবান এবং ভাবার্থের দিক থেকে বিন্যাসকৃত আমল নীতিতে সূরা ইয়াসিনকে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাবান আসন দান করা হয়েছে। সাধকগণ বলেছেন সমগ্র কোরআনুল মাজিদের একটি বিস্ময়কর যে ব্যবস্থাপত্র সেটাই হলো "ইয়াসিন" অর্থাৎ নূরময় বা আলোকিত ব্যবস্থা। আমরা ধারণা করি যে, একটি মানব জন্ম লাভের পর

থেকে তার আলোকিত সত্ত্বাকে ধীরে ধীরে জাগরণ ঘটাবে। সেই জাগরণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তার উন্নত স্তর হবে, সেই স্তর ভেদ করে যেতে যেতে সে এমন একটি চূড়ায় বা আসনে অধিষ্ঠিত হবে, যে আসনটি প্রজ্জ্বলিত ধারা। এটাকে যদিও প্রদীপ বলা হয়েছে, নূরময় একটি ধারা থেকে সে সৃজন হবে যা নূরময় অবয়ব।

যখন জাগতিক কোন উদাহরণ উপস্থাপন করা হয় যেমনঃ- গুরুত্বপূর্ণ বা বিশেষ কোন ব্যবস্থাকে আমরা সোনা বা রূপার তৈরী কাঠামো দ্বারা নির্মাণ শৈলীতে আবদ্ধ করি, সেই আবদ্ধকৃত ব্যবস্থা হলো একটি ঢাকনার আবরণ। তার ভিতর সেই মূল্যবান বস্তু রাখা হয়। ধরে নিলাম, একটি কোহিনূর পাথরকেই আবরণকৃত শৈলীতে রেখে দেই। এর অর্থ হলো এই সুন্দর আবরণকৃত ব্যবস্থার মধ্যেও আরও সৌন্দর্যময় কোন ব্যবস্থা রয়েছে। ঠিক প্রদীপ্তের প্রদীপ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা থেকে যা আবির্ভাব হয়েছে সেটাকে প্রদীপ আকারে সন্নিবেশিত করবার পরে সেটা আবার স্রষ্টার সমাসীনকৃত ব্যবস্থায় লীন হয়ে তার চেয়েও বৃহত্তম কোন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকলে, যা জাগতিক ভাবে ভাষার শৈলীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঠিক সে রকম মানদন্ড “ইয়াসিন” সেই রূপ ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি হরফ দ্বারা। সেই হরফের প্রারম্ভেই ইয়া (হরফ) সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইয়া শব্দের অর্থ দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সম্মান সূচক ব্যবস্থা বুঝে থাকি। অর্থাৎ সমগ্র কালামপাকের সকল অবয়বকে একটি সৌন্দর্যময় এবং পরিষ্ফুটন মানদন্ডকে স্থীতিশীল বা দাঁড় করবার যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াতে সমাসীন হলে সেটা সম্মানিত হয়ে যায়। সেই সম্মাননা ভাষার শৈলীতে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি তবুও পূর্ণতা প্রকাশ পায় নি। তাই মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর কালামপাকের মধ্যে মহান বাণী “ইয়াসিন” হরফ দ্বারা এটাকে সন্নিবেশিত ও সম্মানিত করেছেন। ইয়াসিন হরফ দ্বারা যে বিন্যাস করা হয়েছে এর ভাবার্থ, দিক নির্দেশনা, উপসংহার, কার্যকারিতা সকল কিছুরই সমন্বয়ে উক্ত হরফের (ইয়াসিন) মধ্যে নিহিত।

উদাহরণ স্বরূপঃ- জাগতিক ভাবে সাঁটলিপি সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জেনে থাকবেন যে, একটি কথা বা বাক্যকে একটি চিহ্ন বা প্রতীক দ্বারা (সংক্ষেপে) লিপিবদ্ধ করা হয়। এই প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা ঐ শব্দ বা বাক্যকে বুঝিয়ে থাকে। ঠিক একই ভাবে

মূল ধারার বিষয়বস্তু বা মহান স্রষ্টার যে মূল অভিধানের ক্রিয়াকলাপ বা নূরময় রূপক ব্যবস্থার যে সারমর্ম, সেই সারমর্মেরই মূল চালিকা শক্তির বহিঃপ্রকাশ এই "সিন" হরফ দ্বারা। যেমন :- খনি থেকে লোহা উত্তোলন, এরপর তা একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডে ব্যবহারের উপযোগী করা এবং পরবর্তীতে সেটা দ্বারা বিভিন্ন নির্মাণ কাঠামো ও যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয় কিন্তু মূল হলো লোহা। তদ্রুপ "ইয়াসিন" লকব বা নাম। বিষয়টি আরও সুন্দর বুঝবার জন্য পরবর্তী আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্‌পাক সুস্পষ্ট ভাবধারাতে বর্ণনা করেছেন।

ভাববাদী ব্যবস্থায় যারা কোরআনুল মাজিদের তাফসীর বা অনুবাদ করেন, সেই তাফসীর বা অনুবাদের আলোকে মোকাত্তাআতে্র হরফ অর্থ হলো এই অর্থ দ্বারা সমস্ত প্রজ্ঞা বা বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়। যেমন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) বলেছেন :- এই কোরআন হইল সৃষ্টি রহস্য সম্বলিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং ইহা মানব জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি।

ইহার দর্শন প্রকাশের মৌলিক ভিত্তি ছয়টি :-

১. জন্মান্তরবাদ।

২. আধ্যাত্মবাদ বা সুফিবাদ।

৩. গুরুবাদ।

৪. দায়েমী সালাত। আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে শিরিক হইতে মুক্ত হইবার জন্য দায়েমী সালাত পালনের আহ্বান।

৫. রূপক ভাষা। ব্যাপক ভাবে রূপক ভাষা ব্যবহার ইহার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাব-গাম্ভীর্য সৃষ্টি করিয়া সর্ব সাধারণের চিন্তা-চেতনা হইতে অর্থাৎ ইতর জনতা হইতে কৌশলের সহিত ইহার তথ্য ও তত্ত্ব দূরে রাখিয়া ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৬. "মদ" নামক দুই প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ বহন করে। দীর্ঘায়িত করিয়া পাঠ করিবার ইঙ্গিত ইহাতে বহন করে"। এই ছয়টি বিষয়ে কোরআন প্রকাশের

ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার একটিও অস্বীকার করিলে কোরআনের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না।

হরফের বিন্যাসকৃত ব্যবস্থায় আমরা সাধারণত মোট ১৪ প্রকার সাংকেতিক (শব্দ) চিহ্ন বা মোকাত্তাআতে্র হরফ পেয়ে থাকি। এই ১৪টি সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক রসূল (সাঃ) (আঃ) এবং তাঁর বংশের ১৪ মাসুমের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মোকাত্তাআত্ বা সাংকেতিক (শব্দ) চিহ্নগুলো মহাপুরুষদের গুণাবলীর উল্লেখ্য বা তাঁদের গুণাবলীর প্রতীক। সাংকেতিক অক্ষরের সাথে সংশ্লিষ্ট সূরার প্রারম্ভিক কথাগুলো কিরূপ সম্বন্ধ রয়েছে সেগুলো পাঠক বাবা-মায়েরা উক্ত আলোচনার আঙ্গিকে আপনাদের দেখবার জন্য মত প্রকাশ করছি। বিষয়টিকে সংক্ষেপ করবার জন্য বিস্তারিত লিখলাম না।

উদাহরণ স্বরূপ:- নিম্নে কিছু সূরার নাম পাঠকের জন্য উল্লেখ রইল।

সূরা বাকারা, সূরা ইউনূস, সূরা মোমিন, সূরা হা-মীম, সূরা শূরা, সূরা জোখ্‌রুফ, সূরা শুয়ারা, সূরা সোয়াদ, সূরা ক্বাফ, সূরা নুন (কালাম), সূরা তা'হা, সূরা নমল, সূরা ইয়াসিন, সূরা আরাফ, সূরা রা'দ, সূরা মরিয়ম ইত্যাদি। ঐ সকল সূরার মধ্য থেকে একটি বিন্যাস অর্থাৎ একটি সূরার প্রারম্ভ করবার সূচনাতে এই মোকাত্তাআতে্র হরফগুলো জারী করা হয়েছে। তাহলে এই হরফ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ? কারণ মানুষের জন্য কোরআন নাজেল। তাই কোরআনের সবকিছুই মানুষের জন্য জ্ঞাতব্য। আমি হয়তবা বেশির ভাগ বিষয়ে বুঝতে অক্ষম, তাই বলে সাংকেতিক চিহ্ন বা মোকাত্তাআতে্র অক্ষরগুলির ইঙ্গিত আল্লাহ্‌পাক ছাড়া আর কেউ জানবে না, একথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু মানুষের জন্যই কোরআন প্রেরিত হয়েছে, এজন্য কোরআনে যা কিছু আছে সবকিছু মানুষের জানবার জন্যই নবী-রসূলগণের উপর নাজেল হয়েছে।

কোন কোন হরফের উপরে চার আলিফের টান রয়েছে, আবার কোন কোন হরফের সমন্বয় সাধন অর্থাৎ যোগসূত্রের সাথে আবার চারআলিফের টান রয়েছে। তাহলে এই চার আলিফের টানকে আমরা পুঠিতব্য বিষয়ে উচ্চারণ করার সময় দীর্ঘ সময় টেনে আওয়াজ করে পড়ে থাকি। কিন্তু ভাববাদী যে ভাবার্থ সেটা হলো দীর্ঘ মেয়াদী অবারিত একটি বিষয় সম্পর্কে বোঝানোর জন্য এই টান বা চিহ্ন (চার আলিফ) ব্যবহার করা

হয়। এই চিহ্নকে বলা হয় অবারিত বিন্যাসকৃত ব্যবস্থা। অর্থাৎ এটা সব সময় সমাসীন, কখনও বন্ধ বা থেমে নেই। তাই প্রদীপ্ত প্রদীপ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী আয়াতে কারিমাগুলো একটু অনুধাবন করতে চেষ্টা করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো যে, এই হরফের মূল মানদন্ড সমন্বয় সাধন করতে করতে সংক্ষেপে এই "সিন" হরফে এসে সমাপ্ত ঘটেছে। নূরময় বা আলোকময় প্রজ্জ্বলনকৃত ব্যবস্থা রূপক আকারে আল্লাহ্পাক তাঁর কালামপাকে ধারণ করে সন্নিবেশিত করেছেন। মুক্ত কথা এই নূরময় কালাম বা হরফের বহিঃপ্রকাশ হলো যিনি এই "সিন"-এ নিজেকে তৈরী বা রূপান্তর করেছেন তাঁর ভিতরেই এই প্রজ্জ্বলনকৃত ধারার প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ।

এখানে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা যেমন:- কোরআনুল মাজিদ সাত হরফে নাজেল হওয়ার বিষয়।

কোরআনুল মাজিদ সাত হরফে নাজেল হওয়া

আল্লাহ্র হাবীব রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- এই কোরআন সাতটি ভিন্ন হরফে নাজেল হয়েছে, সুতরাং কোরআন হতে যা তোমাদের জন্য সহজতর হয় তা পাঠ কর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

তিঁনি {(রসূল) (সাঃ) (আঃ)} আরও বলেছেন:- জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে একটি পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং আমি তা অনুশীলন করতে থাকা অবস্থায় সে আমাকে আরও পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আমি তার কাছে আরও প্রত্যাশা করতে থাকি এবং সেও বাড়াতে থাকে যতক্ষন না (সর্বমোট) সাতটি হরফ হয়। (বুখারী)

সাত হরফে কোরআনুল মাজিদের নাজেলের বিষয়টি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে একভাবে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত হরফে তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত:- রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন কোরআন সাত (৭) প্রকারে অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রত্যেক

আয়াতের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন উপায় আছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ)

আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- কোরআন ৫ প্রকারে অবতীর্ণ হয়েছে:-

(১) হালাল (বৈধ)।

(২) হারাম (নিষিদ্ধ)।

(৩) মুহকাম (স্পষ্ট)।

(৪) মুতাশাবিহ (রূপক)।

(৫) মিসাল (দৃষ্টান্ত)।

সাত হরফ-এর অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ উপনীত হয়েছেন, এটি মুতাওয়াতির পঠনে ভাষার প্রাঞ্জলতার মতভিন্নতা এবং সাতটি ভাষ্যে তা সংরক্ষিত হওয়া। যেমন, ইরাবের ভিন্নতা, (শব্দের) বেশি কিংবা কম হওয়া, কিংবা দ্রুততা কিংবা বিলম্ব হওয়া, পাক খাওয়া কিংবা পরিবর্তন হওয়া, শব্দের বিভিন্ন রূপ যেমন, সরু হওয়া কিংবা গুরুত্বারোপ করা, প্রবণ হওয়া কিংবা উন্মুক্ত হওয়া। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উপনীত হয়েছেন যে এগুলো আরব ভাষ্য যা মুতাওয়াতির পঠন দ্বারা সাব্যস্থ নয়।

অনেক গভীর পর্যালোচনা করার পর, অধিকতর শক্তির বিবেচনায় আমার উপলব্ধি অনুযায়ী সাত হরফ আরবদের বিভিন্ন গোত্রের উপভাষা (লাহাজাত) যা হতে মৌলিকভাবে আরবি ভাষাকে নেওয়া হয়েছে এবং যা কোরআন নাজেল হবার সময়ে আরবির প্রাঞ্জলতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এর কারণ হচ্ছে কোরআনুল মাজিদের পঠন মুতাওয়াতির হওয়া আরবদের গোত্রসমূহ হতে পৃথক কোনো বাস্তবতা ছিল না। কোরআন নাজেলের সময় সাতটি সুপরিচিত প্রাঞ্জল আরবি উপভাষা ছিল। যা হলো:-

১) কুরাইশ।

২) তামিম।

৩) কায়েস।

৪) আসাদ।

৫) হুযাইল।

৬) কিনানাহ।

৭) তা'ঈ।

সুতরাং এ বিষয়ে (সাত হরফে) উক্ত সাতটি গোত্রের উপভাষা। তবে এক্ষেত্রে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কোরআন এ সাত গোত্রের ভাষার যে কোন শব্দ দ্বারা পড়া যাবে এমনটি নয়, কেবলমাত্র যেসব বর্ণনা নবী (সাঃ) (আঃ) এর নিকট হতে মুতাওয়াতিরভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সেগুলোই পাঠ করা যাবে। কারণ মুতাওয়াতির বর্ণনার বাইরের কোনো বর্ণনার পঠন কোরআন বলে বিবেচিত হবে না।

অনেকেই সাবআতুল আহরুফ বা কোরআনের ৭ হরফ নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন এবং অভিযোগ করে থাকেন এটা নাকি কোরআনের বিভিন্ন ভার্সন বা সংস্করণ (নাউযুবিল্লাহ)। অনেক সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারী কিংবা নাস্তিক মুক্তমনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীন কোরআনের কপির কথা প্রচার করেন যেগুলোতে কিছু শব্দ ও বাক্য বর্তমানে প্রচলিত কোরআন থেকে কিছুটা ভিন্ন। এভাবে তারা কোরআনুল মাজিদের সংরক্ষণ ও সঙ্কলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তারা বলতে চান যে কোরআনুল মাজিদ ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি এবং সাহাবীগণ কোরআনুল মাজিদকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এসকল অভিযোগের স্বরূপ উপরোক্ত হাদিসের আলোকে কোরআনুল মাজিদ সাত হরফেই নাজেল হয়েছে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। হরফ বহুবচনে আহরুফ অর্থ কিনারা, তট, কূলভূমি ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ্ কোরআনুল মাজিদে বলেন (সূরা হাজ্জ ২২: ১১):- কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দ্বিধার (প্রান্তে দাঁড়িয়ে) আল্লাহ্র ইবাদাত করে।

কোরআনুল মাজিদের এই ৭ (সাত) হরফ আল্লাহ্ ও রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) কর্তৃক অনুমোদিত। এই সাত আহরুফ বা হরফসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী ? উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হরফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শায়খ সালিহ আল মূনাজ্জিদ বলেন:-

এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে, এই সাবআতুল আহরুফ কিরাতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে আলাদা হলেও অর্থের দিক থেকে এক, আর যদিও অর্থের দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্নও হয়, তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে একে অপরের বিরোধী নয়।

আমরা কোরআনের হরফ সাতটির সামান্য পরিচয় জেনে নিই। কোরআনে হরফ সাতভাবে ভিন্ন হতে পারে।

(১) ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশ।

(২) শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়া।

(৩) শব্দের যোজন-বিয়োজনে অর্থের অভিন্নতা।

(৪) শব্দে আগ-পিছ হওয়া ও অর্থের অভিন্নতা।

(৫) ইরাবের ভিন্নতা ও অর্থের অভিন্নতা।

(৬) ওয়াক্বফে ভিন্নতা।

(৭) উচ্চারণে ভিন্নতা।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, এই সাত ধরনের হরফের কিরাত সবগুলোই রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর অনুমোদিত ও তাঁর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত। এর প্রমাণ উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম (রাঃ) কে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরাত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাত পাঠ করেছেন’ অথচ রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্ধত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাঁদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যে ভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে ? সে বলল, রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ)-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা

বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর আমি তাকে জোড় করে টেনে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, "তুমি পাঠ করে শোনাও" তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) (আঃ) বললেন, এভাবেই নাজেল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিঁনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, এভাবেও কোরআন নাজেল করা হয়েছে। এ কোরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাজেল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর। এ রকমটা করা হয়েছে উম্মাতের জন্যে সহজীকরণের জন্যেই। নিম্নের বর্ণনা দুটিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম, এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরনের কিরাত করতে লাগল আমার কাছে অভিনব মনে হলো। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরাত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরাত করেছে যা আমার কাছে অভিনব লেগেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জন হতে ভিন্ন কিরাত পাঠ করেছে। তখন রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাদের উভয়কে (কিরাত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই কিরাত পাঠ করল। রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাদের দু'জনের (কিরাতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কোরআনের প্রতি মিথ্যা অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মেষ দেখা দিল। এমন কি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগে নি। আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে

রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহ্‌র দিকে দেখছিলাম।

রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমাকে বললেন:- ওহে উবাই! আমার কাছে (জিব্রাঈল (আঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কোরআনুল মাজিদ এক হরফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয় বার আমাকে বলা হলো যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয় বার আমাকে বলা হলো যে সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যত বার আপনাকে জবাব দিয়েছি তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি সাওয়াল! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখেছি সে দিনের জন্য, যে দিন সারা সৃষ্টি এমন কি ইব্রাহীম (আঃ) ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত যে :- রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বনূ গিফারের জলাভূমির (ডোবার) কাছে ছিলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরনের কোরআন পাঠ করবে। তখন রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার উম্মততো এ হুকুম পালনে সামর্থ্য হবে না। পরে জিব্রাঈল (আঃ) দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু'ধরনের কোরআন পাঠ করবে । রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার উম্মততো তা পালনে সামর্থ্য হবে না। তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মত তিন হরফে কোরআন পাঠ করবে। রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মত তো এটি পালনের সমর্থ রাখে না। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) চতুর্থ বার রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হরফে কোরআন পাঠ করবে এবং এর যে কোন হরফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থত হবে।

আর এই কিরাতগুলো আমরা বিভিন্ন ইমামদের নামে চিনে থাকলেও এর মূল সূত্র রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে। উল্লেখ যে, স্বল্পসংখ্যক রাবী দ্বারা বর্ণনাকৃত (মুতাওয়াতির নয় এমন), কোনো অপরিচিত (গাইরি মাশহুর), মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণিত, মাওদ্বু (জাল-বানোয়াট) সনদে বর্ণিত ও শায (বিরল) ধরনের কিরাত গ্রহণযোগ্য নয়। কিরাতের বিখ্যাত ইমামদের নাম নিম্নরূপঃ-

১। নাফিঈ ইবনু নুয়াইম।

২। আসিম বিন নুজুদ।

৩। হামযাহ বিন হাবীব আল কুফি।

৪। ইবনু আমির।

৫। আবুল হাসান কিসাঈ।

৬। ইবনু কাছির।

৭। আবু আমর ইবনু আলা।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- কোরআন যদি সাত হরফেই হয়ে থাকে তাহলে লাওহে মাহফুজে কোন হরফের কোরআন সংরক্ষিত আছে ? উত্তরঃ এর জবাব হাদিসেই আছে। রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে একভাবে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) মানুষের সুবিধার জন্যে জিব্রাঈল (আঃ) এর কাছে অন্যান্য হরফ শিখাতে অনুরোধ করেছেন তারপর জিব্রাঈল (আঃ) সাত হরফে কোরআন শেখান। অর্থাৎ, কোরআনুল মাজিদ প্রথমে যেভাবে নাজেল হয়েছিলো সেই কোরআনই লাওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করা আছে।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব তো আল্লাহ্ই নিয়েছেন তাহলে এই কোরআন নিয়ে এত মতপার্থক্য কেন হবে ? উত্তরঃ এগুলো মোটেই কোনো মতপার্থক্য নয়। এতে কোরআনুল মাজিদের চিরন্তন সত্যে একটুও ফাঁটল ধরছে না। আর পূর্বেই পরিষ্কার করা হয়েছে যে এই মতপার্থক্যের ধরন কেমন।

উপরে কোরআনুল মাজিদের ৭টি হরফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময় খ্রিষ্টান প্রচারক কিংবা নাস্তিকরা বিভিন্ন প্রাচীন কোরআনের আংশিক অংশ দেখিয়ে দাবি করতে চান যে, এগুলোতে সামান্য শব্দ ও বাক্যের পার্থক্য প্রমাণ করে যে কোরআন নাকি বিকৃত হয়ে গেছে! উপরের আলোচনা দ্বারা তাদের অপযুক্তির অপমৃত্যু হয়। যেসব খ্রিষ্টান প্রচারক এইসব ভিন্ন হরফ কিংবা কিরাত দেখিয়ে দাবি করতে চায় যে, কোরআনের ভিন্ন ভার্সন আছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলব, কোরআনুল মাজিদের ভিন্ন হরফগুলো আল্লাহ্ ও রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) কর্তৃক অনুমোদিত।

পরিশেষে বলব, কিরাতের কিংবা আহরুফের পার্থক্যের কারণে কোরআনুল মাজিদের বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করা অজ্ঞতা ও বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। বরং তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোরআন টিকে আছে পীর, মোর্শেদ, ওলি, নবী-রসূল বা আল্লাহ্র প্রতিনিধিগণের দ্বারা। যাঁরা কোরআনকে দেহ ভান্ডে ধারণ করেন। যাঁরা আজও জমীনের বুকে হাঁটেন। যাদের মধ্যে আরবির প্রাথমিক জ্ঞানও নেই এমনও অনেকে আছেন। আর কোরআনের হাফেজরা জাগতিক ভাবে মুখস্ত বিদ্যায় কোরআনকে পাঠ করছে। তবুও তারা সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষার একটি কিতাব আগাগোঁড়া মুখস্থ করে রেখেছেন, যার সামান্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত আর কোনো কিতাব এই ধরণীর বুকে পাওয়া যাবে না।

তাহলে উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দুইটি বিষয় সম্পর্কে বাস্তব সম্মত ধারণা পেলাম।

তাই প্রথম আয়াতে অর্থের বিন্যাস করা হলো :- “ইয়াসিন”। অর্থ:- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ।

বিজ্ঞানময় কোরআন

দ্বিতীয় আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ওয়াল্ কুরআনুল্ হাকিম্। অর্থ:- সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরআনের। হাকিম শব্দটির অর্থ আমরা জেনে থাকি জজ বা জাষ্ট্রিস, যাকে বিচারক বলে। আসলে এখানে বিজ্ঞানময় অর্থটাই বেশিরভাগ তাফসিরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেন বিজ্ঞানময় কোরআন ? জাগতিক ভাবে বিজ্ঞানের যে অবয়ব সেটা সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা এটা বুঝলে আমাদের জন্য সহজ হবে। বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ

হলো Science। বিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ বিশেষভাবে লব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান শব্দের বিশ্লেষিত রূপ (বি + জ্ঞান) "বি" অর্থ বিশেষ আর জ্ঞান অর্থ সম্মক ধারণা। ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ বিশেষ জ্ঞান বা প্রাপ্তফল অর্জনের প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞান বলে। তাহলে এখানে পরীক্ষাও থাকতে হবে, নিরীক্ষাও থাকতে হবে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেই হবে না সে পদ্ধতি বা সিস্টেম মাফিক যেন পরিচালনা হয় সেই ব্যবস্থাটাও থাকতে হবে। এই জ্ঞান স্বাভাবিক জ্ঞান নয়। যেটা ভাববাদী ব্যবস্থায় বা লব্ধ একটি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে নিহিত। সেই ব্যবস্থাপত্রকেই বলা হলো যে, একটি "হরফ" তার ভাবনা থেকে সৃজনকৃত ব্যবস্থা স্থানান্তরিত হয়ে এর কার্যকারিতার প্রতিফল ঘটিয়ে যে অর্জন সেটাই হলো বিজ্ঞানের অর্জন (কোরআনের ভাবধারার আলোকে আলোচ্য বিষয়)। অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে যারা সাধক তারাও কিন্তু ভাববাদী ব্যবস্থায় গবেষণার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা আল্লাহ্‌র নূরময় জারীয়া, আল্লাহ্‌র মাকাম বা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সৃষ্টির রাজ্যের যত কিছু রয়েছে সকল কিছু সম্পর্কে দৃশ্যায়নের দিকে ধাবিত হয়। তাহলে সেই প্রক্রিয়া মাফিক তাকে গমন করতে হয়।

এজন্য বলা হয়েছে সাক্ষী সেই বিজ্ঞানময় কোরআনের। নূরময় অবস্থাটা পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই এই আয়াতে প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোরআন। অনেকেই আবার নূরকে অস্বীকার করে যা যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ নূরের বিষয়টা উপলব্ধি হলো আধ্যাত্মিকতার। এটাকে স্বীকার করলে আধ্যাত্মিক বিষয় স্বীকৃত পায়। যিনি মানবে না তার জন্য বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া ভাল। বুঝবার জন্য দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন রইল। আল্লাহ্‌র নবী-রসূলেরা আল্লাহ্‌র নূরী কোরআন হতে যে জ্ঞান দান করে থাকেন, সেই জ্ঞানের ভাষা গুলোকেই এক একটি সহিফা বলে। যেমন তাওরাত একটি সহিফা, জবুর একটি সহিফা, ইঞ্জিল একটি সহিফা এবং সর্বশেষ কোরআনুল মাজিদ হলো বড় সহিফা। সব মিলে একশত চার খানা সহিফার কথা জানা যায়। তবে অন্যান্য সহিফার নাম গুলো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেহেতু অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ গুলোকে সুনির্দিষ্ট ভাবে সহিফা বলে উল্লেখ করতে চাই না কারণ ইহাতে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্কের প্রশ্নটি এসে যাবার প্রচুর সম্ভবনা থেকে যায়। তাই এটা কাগজ বা কালির বিষয় নহে। একজন মহাপুরুষ আলোকবর্তিকা প্রাপ্ত হয়ে সেই আলোর সুতা দিয়ে অন্যকে আলোকিত করেন। এই নূরময় অবস্থা ধারাবাহিক প্রণালীতে ধীরে ধীরে কার্যকারিতা, ফলপ্রসূ বা সফলতা এই ব্যবস্থাকে আয়াতে কারিমার

দ্বারা পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য দ্বিতীয় আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ওয়াল্ কুরআনুল্ হাকিম্। অর্থ:- সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরআনের। (সূরা নূর, আয়াত : ৩৫ দ্রষ্টব্য)

মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) রসূলগণের মধ্য হইতে

তৃতীয় আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ইন্না কালা মিনাল্ মুর্ছালিন্। অর্থ:- আপনি {(মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)} রসূলগণের মধ্য হইতে। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব মোহাম্মদকে (সাঃ) (আঃ) নির্দেশ করা হয়েছে যে, আপনি রসূলগণের মধ্য হইতে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যে অসংখ্য রসূল সৃষ্টিরাজ্যে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য হইতে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাই এখানে মুরসালিন শব্দের অর্থ রসূল করা হয়েছে। যদিও আমরা যারা ভাববাদী ব্যবস্থায় মানব-মানবীগণ দুনিয়াতে অবস্থান করে থাকি তাদের ভাষায়:- রসূলপাক (সাঃ) (আঃ) যদি কাউকে দর্শন দান করেন, তাহলে তা এই মুরসালিন রূপেই দর্শন দান করেন। এখন এই মুরসালিন হলো সকল অবয়বে। আমাদের মৃত্যুর ঘন্টা বেঁজে গেলে শেষ হিসাবে মনে করি কিন্তু আসলে এটা শেষ নয়, এটা রূপান্তর। কারণ এই দেহটার মৃত্যু ঘটে আত্মার নয়। আত্মা যদি এই দেহধারী ব্যবস্থার মধ্যে সৃজনকৃত অর্থাৎ স্থানান্তরিত ব্যবস্থায় জাগরিত হতে পারে তাহলে তার সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল হয় (যদিও বিষয়টি গুরুবাদ)। অর্থাৎ তাঁর জাগরণ এমন একটি প্রক্রিয়াতে যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সন্নিবেশিত হয়ে এক থেকে সে বহুতে রূপান্তর ভাবধারায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে পারে। তাঁকে ডাকলে সে সাড়া দেবার ইচ্ছা করলে সাড়া দেয়। সেই সাড়া দেওয়ার যে বাহন সেটাই আত্মা রূপের অবয়ব। কিন্তু আসলে দেহটা স্থানান্তরিত এভাবে খুব কমই হয়ে থাকে। তাহলে এই আত্মার ব্যবস্থায়ন সম্পর্কে যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ বিশেষত্ব ফকিরিতে এটা বলে থাকি সাধক তাঁর কালামে বলেন যেমন:- হায়াতে মুরসালিন কোরআনেতে লেখা দেখি, দ্বীনের রসূল মারা গেলে আমি কেমনে সুখে থাকি, রসূল রসূল বলে ডাকি! তাই এই মুরসালিন রূপেই রসূলপাক (সাঃ) (আঃ) হাজির নাজির বা দর্শন দিয়ে থাকেন।

এজন্য মুরসালিন রূপ পেতে বেশিরভাগ অনুবাদকগণ রসূল শব্দের অবতারণা করেছেন। কিন্তু আমরা যারা ভাববাদী আলোচনাকারী গণ এই মুরসালিন রূপে যে একজন রাসুলের (সাঃ) (আঃ) আগমন হয়, সেই আগমনটা আসলে Present বা বর্তমান। এটা অতীত

বা ভবিষ্যৎ নয়। অর্থাৎ পরবর্তীতে রূপান্তর যে ব্যবস্থা সেটা আরও দুইটি Subject ক্রিয়ার কাল বা সময়। তাহলে এই সময়কে সদা বর্তমান মুরসালিন হিসাবে এই আয়াতে প্রকাশ হয়েছে যে:- ইন্‌না কালা মিনাল্ মুর্‌ছালিন্। অর্থ:- আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) আঃ)} রসূলগণের মধ্য হইতে। এখানে নিশ্চয়ই যে তিঁনি রসূলগণের মধ্য হইতে। তাহলে রসূল (সাঃ) (আঃ) হিসাবে তাঁর মুরসালিন রূপের যে একটি স্বীকৃতি, এটা আত্মশুদ্ধিতে বিস্তৃত ভাবধারায় তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে। অর্থাৎ মানব আকৃতিতে তিঁনি দুনিয়াতে আসবার পরে সাধন-ভজন (মোরাকাবা মোশাহেদা) ক্রিয়াকলাপ বা তপস্যা, তপজপ যা কিছু কর্ম করেছেন সেই কর্মের দ্বারা তিঁনি এই যোগ্যতায় উপনিত হয়েছেন। ইনন্‌া অর্থ নিশ্চয়ই। তাই আয়াতে কারিমায় নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে:- নিশ্চয়ই আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} রসূলগণের মধ্য হইতে। তাহলে ঐ প্রক্রিয়াতে তিঁনি সমাসীন হয়েছেন। আল্লাহ্‌পাক যুগে-যুগে, কালে-কালে যত নবী-রসূলগণ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সেই সনদের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে এই তৃতীয় আয়াতে মুরসালিন শব্দ দ্বারা রসূলের স্বীকৃতি সনদে।

এগুলো হলো ভাববাদীর বিস্তারিত বর্ণনার ধাপে ধাপে সূরাটির একটি ব্যাপকতা পাচ্ছে কিন্তু সূচনাতে ছিল একটি হরফ দ্বারা। তাহলে একটি হরফ থেকে সন্নিবেশিত হতে হতে পর্যায়ক্রমে যখন নিচের দিকে আসছে তখন আল্লাহ্‌পাক ঐশি বাণী দ্বারা তাঁর হাবীবকে নির্দেশ করিতেছেন। তৃতীয় আয়াতে এই মুরসালিন শব্দের মাধমে রসূলের দলভুক্ত বা অন্তরভূক্তির সনদ দান করলেন। এটাই ছিল মূল ধারার অবয়ব যা কোন মানব-মানবী যদি তার ক্রিয়া বা কর্মের সম্পাদনের দ্বারা সে ঐ অবয়বের দলভূক্ত বা সনদে জারী হয় তাহলে সে জানতে পারে। এজন্য বিশেষ্যত্ব ফকিরিতে বা ভাববাদীতে অনেকেই বলে থাকেন শরিয়তে যেটা দ্বিধা বিভক্তকর একটি বয়ান সেটা হলো:- কোরআন নাজিল হয়েছে কিন্তু কোরআন নাজেল। কোরআন নাজিল হয়েছে এই কথার অর্থ হলো অতীত কিন্তু কোরআন নাজেল এই কথার অর্থ হলো কোরআন হাজির নাজির বা বর্তমান। নাজেল যদি বর্তমান হয় তাহলে এটা কনোষ্টেন্ট নীতিতে সমাসীন রয়েছে অর্থাৎ সকল সাধকগণের এটা বোধগম্য। যারা এই বিষয়ে সাধনা করেন নি তারা এই বিষয়টা বুঝবে না। তাই তাদের ভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছে আর যারা নাজেল প্রক্রিয়াতে অবগত তাঁরা এই বিষয়ে বর্তমানেও কার্যকারিতা রয়েছে। এজন্য মুরসালিন শব্দটাও এমন যে, কোন মাহফিলে রসূল (সাঃ) (আঃ) সমাসীন হয় তাহলে তিঁনি মুরসালিন রূপেই হয়ে

থাকে। কোন বান্দা বা বান্দী যদি রসূলের (সাঃ) (আঃ) সাক্ষাত পায়, সেটা স্বপ্ন যোগেই হোক, তন্দ্রা যোগেই হোক বা ভাব-বিষয়কই হোক, সেটা এই মুরসালিন রূপেই তিঁনি উম্মতকে দর্শন দান করেন। তাহলে এই মুরসালিন হলো রসূলগণের মধ্য হইতে। তাই আল্লাহ্পাক কালামপাকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। এখানে কোন দ্বিধা-দন্ড বা বিভক্তির অবকাশ নেই, যে আপনি রসূলগণের মধ্য হইতে। এজন্য আয়াতে কারিমায় এক বাক্যে বলে দেওয়া হলো:- ইন্না কালা মিনাল্ মুর্ছালিন্। অর্থ:- আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} রসূলগণের মধ্য হইতে।

মুস্তাকিম বা সত্য সঠিক পথ

চতুর্থ আয়াতে আসলো:- আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্। অর্থ:- আমাদেরকে মুস্তাকিমের (সত্য/সঠিক) পথে পরিচালনা করুন। "সঠিক রাস্তার উপরে" আল্লাহ্র পথ সমূহই সিরাতিম মুস্তাকিম। এই মুস্তাকিমের অনুবাদ করা হয় সহজ সরল পথ কিন্তু আদৌ এটা সহজ সরল পথ কি না যিনি ধ্যান সাধনা (মোরাকাবা মোশাহেদা) করেন নি তাকে বোঝানো দায়। "সুবুলানা" অর্থ পথগুলি, মানুষ নির্মিত পথ না আল্লাহ্ নির্মিত পথ। আল্লাহ্ নির্মিত পথ হলো তৌহিদ রাজ্য নিজের ভিতরে থাকা লোভ, মোহ, অহংকার, হিংসা, গিল্লা-গিবত, পরশ্রীকাতরতা এগুলোকে চিরতরে দূর করা বা আল্লাহ্মুখী করে চলমান রাখার যে বিদ্যা সেটাই "সুবুলানা" বা আল্লাহ্র পথগুলি। তাহলে এই তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে খান্নাসের কুমন্ত্রণার বাঁধার দেয়াল কিভাবে সরাতে হয় তা কেবলমাত্র মোরাকাবা মোশাহেদার বা ধ্যান সাধনা ব্যতীত হয় না। তাই আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব হেরা গুহায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর যে সত্যের জাগরণ হলো, তা নগদের বার্তা দিলেন উম্মতে মোহাম্মদীকে। আল্লাহ্পাক তাঁর কালামপাকে কাহাফের ঘটনা জানালেন। এই ভাবে মহামানবগণ কালে-কালে যে প্রকৃত পথ দেখান সেটাই মুস্তাকিমের পথ। দুঃখ জনক হলেও সত্য এই সকল মহামানবগণের আচার-আচরণ অন্যান্য নির্দেশ নামাগুলো শোভা পায় কিন্তু মোরাকাবা মোশাহেদার বিষয়গুলো ভাটা পরে যায়। আবার এই পথের কোন দিশা দানকারী এটাকে উন্মুক্ত না করলে বিলুপ্ত ঘটে যাবার সম্ভবনা হয়। এভাবেই আমরা ভাষার শৈলীতে মুস্তাকিম বা সহজ সরল পথ বুঝে থাকি। কিন্তু প্রকৃত মুস্তাকিম উদ্ধার হওয়া জটিল বটে। সূরা ফাতেহাতেও মুস্তাকিম শব্দটা আসছে। নাস্তাঈন থেকে মুস্তাকিম শব্দের উৎপত্তি। এ বিষয়ে পূর্বেই আমার লেখা বই আধ্যাত্মিক

লিপিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় নাম হলো মুস্তাকিম। আল্লাহ্‌র যত বিশেষণের পথ আছে সেই পথের মধ্যে উত্তম দিশা বা গাইড হলো এই মুস্তাকিমের পথ।

এই মুস্তাকিম শব্দকে যদি ভাঙ্গা হয় বা পৃথক করা হয় তাহলে নাস্তাঈন হয়, যার বাংলা অর্থ "মাস্তান"। জাগতিক ভাবে আমরা মাস্তান বলতে সন্ত্রাসীকে বুঝে থাকি। যারা বিধ্বংসী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনমনে ভীতির উদ্বেগ ঘটায়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা উপেক্ষা করে যিনি নিজের বড়াই, অহংকার, শক্তি দিয়ে আইন-কানুন রীতিনীতি না মেনে অবৈধ ভাবে মানুষের উপর বল প্রয়োগ করে থাকেন যা আইনের বহির্ভূত কার্যকলাপ। কিন্তু ভাববাদী ব্যবস্থায় মাস্তান আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় একটি নাম, এটা আমরা বাংলা ভাষাতে বুঝে থাকি। আসলে মাস্তান হলো (ঐশী প্রেমে মত্ত বা দিওয়ানা, প্রেম পাগল) যিনি বিষয় রাশির যত রকম ব্যবস্থাপত্র থাকুক না কেন সেটা ভোগ-মোহ বা নিজের অভিপ্রায় হোক সকল কিছুকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহ্‌তে যিনি সমাসীন রয়েছেন তিঁনিই মাস্তান। অর্থাৎ জাগতিক বিষয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়, কোন বিষয়কেই তিঁনি মূল্যায়ন করে নি আল্লাহ্ ব্যতীত। শুধুমাত্র স্রষ্টার মূল্যায়নে অধিষ্ঠ ব্যবস্থার দিকে তিঁনি ধাবিত বা নিজেকে মেলে ধরেছেন। তাঁর মনোরাজ্যে অন্য কোন অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার পরিস্ফুটন বা সন্নিবেশিত করতে পারে নি, তিঁনিই এই মাস্তান। আমরা হর-হামেশা তরিকতে অনেক মস্তানকেই দেখে থাকি। কিন্তু তাদের বিষয়রাশি, লোভ, মোহ বা কোরআনুল মাজিদের যে নির্দেশনামা এই নির্দেশনামার সাথে তাদের কার্য হুবহু মিলে না, অনেক সময় কম/বেশী দেখা যায়। এর অর্থ হলো তিনি চেষ্টায় রত আছেন কিন্তু প্রকৃত মাস্তানের যে খেতাব, সেই খেতাব হলো সকল বিষয়রাশিকে সে অবাঞ্ছিত করে সেগুলো থেকে ডাইভার্ট বা পৃথক হয়ে বের হয়ে এসেছেন। এজন্য আল্লাহ্‌র এত প্রিয়ভাজন সে হয়েছে। যার জন্য এই সরল সোজা পথকে বলা হয় মুস্তাকিমের পথ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিশার পথ বা যে পথে আল্লাহ্‌র প্রাপ্তি ঘটেছে, যে পথে আল্লাহ্‌র সকল কারিকুলামে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।

এই সৃষ্টি রাজ্যের যা কিছু রয়েছে একমাত্র মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সকল মাখলুক বা সৃষ্টি আল্লাহ্‌র তৌহিদ রাজ্যে বাস করে। আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টিরাজ্য এত বেশি অপূর্ব সৌন্দর্যময় করে সৃষ্টি করার কারণে আমরা স্বভাবতই এর মোহে পরে যাই। যার জন্য এই সৃষ্টির প্রতি মানুষ অত্যাধিক আকর্ষিত। এটাই স্বাভাবিক। এই আকর্ষিত হবার কথা ছিল স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের প্রতি বা স্রষ্টার প্রেমের প্রতি কিন্তু নিজের মোহগ্রস্থতা জাগরিত

হবার কারণে সুফল মিলে না। এই দুনিয়াবী আকর্ষিত ব্যবস্থাকে সরিয়ে যিনি পরিপূর্ণতার দিকে গমন করেন অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌কে প্রাপ্তির দিকে যিনি মনোনিবেশ করেছেন, সেই পথে বা ব্যবস্থাপত্রে ঝাঁপ দেবার পর স্রষ্টা যখন তার ঝাঁপ দেওয়াকে কবুল করে নেন, তখন তাঁকে উত্তরণ করেন, সেই পথে তার প্রাপ্তি ঘটিয়ে সুনিশ্চিত করে দেন। এই পথকেই বলা হয় মুস্তাকিমের পথ। এজন্য বলা হয় আমাকে তোমার সরল সোজা পথের দিশা দাও বা পরিচালনা কর, সেই পথে গ্রহণ কর, এভাবে প্রার্থনাতে বা সূরা ফাতেহাতেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মূল বিষয় হলো এই পথে পরিচালনা হবার আকুতি মহান আল্লাহ্‌পাকের নিকট, এই পথই আল্লাহ্‌র প্রিয় পথ। সকল অবাঞ্চিত ব্যবস্থাকে পথ হতে সরিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কে চাওয়া, আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জানা, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের পথ, আল্লাহ্‌কে প্রাপ্তি লাভের পথ, সেই পথের কার্যাবলি ফলপ্রসূ হলো আল্লাহ্‌ এবং বান্দার মিলনের একটি সহজ সরল ব্যবস্থা। সেই পথের দিকনির্দেশনা মুস্তাকিম হিসাবে গৃহিত হয়েছে। এজন্য মুস্তাকিমকে এত মর্যাদাবান করা হয়েছে।

সমগ্র কোরআনুল মাজিদে যে চারটি শ্রেণী রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌পাক সরাসরি থাকেন, তার মধ্যে মুস্তাকিম একটি। এই মুস্তাকিম হতে হলে আধ্যাত্মবাদের আলোকে বলা হয়েছে যে, বিষয় রাশির যত অবাঞ্চিত ভাবনা আছে সকল ভাবনা থেকে নিজেকে বের করতে বা উত্তোলন ঘটাতে হবে, একমাত্র আল্লাহ্‌তে লীন হওয়া এটা প্রমাণিত হতে হবে। কখন প্রমাণিত হবে ? মওলা যখন আপনার এই কার্যকে গৃহিত করবেন তখনই এটা কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূ হবে। তখনই এই পথের দিশা বা মুস্তাকিমের সনদ বহিঃপ্রকাশ হবে, তখনই পরিপূর্ণতার রূপ পাবে। এই লকব বা পথকে তুঁমি (আল্লাহ্‌) এত মর্যাদাবান করেছ সেই পথের দিকে পরিচালিত করুন। আমাদেরকে তোমার সেই সরল সঠিক পথ বা তোমার সেই প্রিয় ভাজনদের পথ বা মুস্তাকিমের পথ, সেই প্রক্রিয়াতে যাবার জন্য আল্লাহ্‌পাক সবাইকে নির্দেশ করেছেন। মুস্তাকিমের সনদ হলো যার সঙ্গে আল্লাহ্‌পাক সরাসরি থাকেন।

তাহলে আল্লাহ্‌পাক বান্দার সঙ্গে সরাসরি থাকবার পরেও আমরা আরও তিনটি স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র সন্নিবেশিত একটি প্রক্রিয়াতে, সেই তিনটি ধাপের সফল চূড়ায় রয়েছে “ইয়াসিন”। অর্থাৎ বান্দা যদি আল্লাহ্‌র সংযোগ প্রাপ্ত হয় তাহলে তিঁনি মুস্তাকিমের লকব প্রাপ্ত হয়, অতঃপর আরও তিনটি ধাপ অতিক্রম করবার পরেই এই “ইয়াছিন”। আল্লাহ্‌কে লাভ করবার পরেও যে স্তর বিন্যাস রয়েছে তার ধারাবাহিক প্রণালীর

বর্ণনাগুলো কোরআন এভাবে দিয়েছে। এই ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো যদি ধাপে ধাপে বুঝতে যাই, তাহলে ইহা লিখে শেষ করা যায় না। যার জন্য সংক্ষেপে রইল।

মূল ধারায় কোন ব্যক্তি যেতে চায় তাহলে তার সূচনাতেই তো গুরু লাগবে। এই গুরুবাদী মাধ্যম ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরবার কথা বলা হয়েছে। যেমন মুস্তাকিমের পথে আমি যেতে চাই বা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খা মেটাতে চাই, তো এটা শুধু শুধু ইচ্ছা করলেই হয় না। এই প্রক্রিয়াতে জাগতিক ভাবে ধর্মের কিছু বিধি-বিধানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন থাকে না। যার জন্য ধর্মের প্রাণ সঞ্চালন ব্যবস্থাটা জাগতিক ভাবে থাকে না। প্রাণ সঞ্চালন ব্যবস্থা থেকে থাকলে গুরুবাদী বা আহলে বায়াত বা ফকিরি ইত্যাদি মতবাদ স্বীকৃতি পেয়ে যায়। যারা কামেল ওলি মোর্শেদগণ রয়েছেন তাদের সৃজিত ভাবধারাতেই ধর্মের প্রাণ সঞ্চালন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। যার জন্য ওলিদের ভাবধারা একটু ভিন্নতার হয়ে থাকে। এজন্য আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা বলতেন:- পীর বড় নয়, সত্য লাভ করাটাই বড়। গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি, গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) বলেছেন যে :- "যখন তুমি কোন পীরের নিকট গমন কর, তখন জাহেরী বিদ্যা পরিত্যাগ করে যাইও"। এই জাহেরী বিদ্যা পরিত্যাগ করার অর্থ হলো এটা বাদ দেওয়া তা নয়। ওলিদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা একটু ভিন্নতার, তাই ভিন্নতার মানদন্ড সমুন্নত রাখতেই এমন নির্দেশনামা। এজন্য বড় পীর সাহেব হয়ত এমন দিক নির্দেশনা মূলক বাণী উল্লেখ করেছেন।

তাই মুস্তাকিমের পথে যেতে হলে প্রাথমিক সূচনাই হলো গুরু বা মোর্শেদ। সেই মোর্শেদের আশ্রিত ব্যবস্থায় নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পিত করাটাই হলো এই ধারার সূচনা। কারণ স্রষ্টাকে সরাসরি পাবার কোন বিধান নেই। এটার উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্‌পাক মুসা কালিমুল্লাহ্‌কে দিয়ে নিদর্শন দেখিয়েছেন। যার বর্ণনা সূরা কাহাফে সন্নিবেশিত হয়েছে। মুসা কালিমুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র জালুয়াতে তুর পাহাড় পুড়ে সুরমায় রূপান্তর হয়েছিল এবং মুসা নবী জ্ঞান হারিয়ে অচৈতন্য হয়েছিল। পাহাড়ের সন্নিবেশিত একটি স্থান বা জায়গা থেকে গায়েবী ভাবে আওয়াজ আসে, আমি তোমার মাবুদ বলছি। এই তুর পাহাড়ে মুসা কালিমুল্লাহ্'র ঘটে যাওয়া ধারণকৃত সাক্ষ্যতা। কিন্তু ওলিদের যুগে এসে আমরা পাই যে সন্নিবেশিত দেহ আত্মার সংমিশ্রনে এটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়

যেমন:- অদ্বৈতবাদী সুফি যাঁরা ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্তে রূপান্তর বা আল্লাহ্তে লীন ও আল্লাহ্ সত্ত্বায় অভিন্ন হয়ে যাওয়া সাধনা করেন তাঁরাই সিদ্ধিশেষে বলেন "আনাল হক" অর্থাৎ বাবা আবু মুসা ইবনে মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন "আনাল হক" অর্থ আমিই আল্লাহ্ বা আমিই সত্য বা আমিই পরম সত্ত্বা। বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলেছেন:- "লাই ছালাফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্তাআলা" অর্থ আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই নেই। অদ্বৈতবাদী সিদ্ধ সাধকরা বলেন :- "সোহ্হম" অর্থাৎ আমিই পরমব্রহ্ম। যার প্রমাণ হিসাবে এই ধারাকে সৃজনশীল বা কার্যকর করবার জন্য আবাদানের (খিজির আঃ) কাছে মুসা কালিমুল্লাহ্কে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেন।

অর্থাৎ সূরা কাহাফের বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি। মুসা কালিমুল্লাহ্ (আঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে কথোপকথনে বললেন যে, হে আল্লাহ্! দুনিয়াতে হয়ত আমাকেই আপনি অধিক জ্ঞানী করেছেন। আল্লাহ্পাক বললেন, তুঁমি এই ধারণা পোষণ করেছ! তাহলে তুঁমি যদি জ্ঞানের ধারা জানতে চাও, বুঝতে চাও বা শিখতে চাও, তাহলে একজনের কাছে পৌঁছাও। মুসা কালিমুল্লাহ্ বললেন, তাহলে আমার চেয়েও জ্ঞানী রয়েছে! আল্লাহ্পাক বললেন তুঁমি কি তাঁর সাক্ষাত পেতে চাও ? তখন মুসা নবী বললেন হ্যা, আমি তাঁর সাক্ষাত পেতে চাই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানানো হলো তুমি দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে পৌঁছাও এবং সেই দিকে গমন কর তাহলে তুঁমি আবাদানকে (খিজির আঃ) পাবে। কোরআনের বর্ণনায় এসেছে হলো আবাদান (বাংলায় আবদুহু বলা হয়) কিন্তু আমরা প্রচলিত ভাব ধারায় যাকে রূপান্তরে খিজির (আঃ)-এর নাম শুনে বা জেনে থাকি। এরকম অবস্থায় মুসা কালিমুল্লাহ্ আল্লাহ্পাকের কাছে বললেন, আমিতো যাবো কিন্তু আমার ভাই হারুনকে সঙ্গে নিয়ে যাই ? আল্লাহ্পাকের কাছ থেকে এজাযত নিলেন এবং বললেন আমি নিয়ে যাবো কিন্তু আমি আবাদানকে পেলেই আমার ভাইকে বিদায় দিব। বিভিন্ন তাফসিরে ব্যাখা করা হয়েছে যে, একটা জ্যান্ত কৈ মাছকে ভাজি করে ব্যাগ বা থলেতে ভরে সেই মাছটি নিয়ে যাওয়া হলো। এই মাছটি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য হলো দুই সমুদ্রের মিলন স্থল কোথায় এটা নির্ধারিত করবার জন্যই নেওয়া হয়। সেই স্থানে গেলে গায়েবী মোজেজায় কৈ মাছটি প্রাণ ফিরতেই সে যে দিক দিয়ে রওনা করবে সে দিকটাই হবে দুই সমুদ্রের মিলন স্থল।

দুই ভাই যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে মুসা নবী কিছুটা ক্লান্ত অবস্বাদ গ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ভাইকে বললেন আমি একটু বিশ্রাম নিব। তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ নিদ্রাগত হয়ে

বিশ্রাম করেন এবং তাঁর ভাই অতন্দ্র অবস্থায় পাশে ছিলেন। বেশ কিছু সময় পরে কৈ মাছটি প্রাণ ফিরে পেলে লাফিয়ে থলের মধ্য হইতে বের হয়ে গেল। হারুন জানে যে মুসাতো নবী বা পয়গাম্মর এজন্য নিজ থেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সেটা বেয়াদবি হয়ে যাবে। তো কিছু সময় পরে মুসা কালিমুল্লাহ্'র নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং আবার রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কিছু দূর যাবার পর মুসা কালিমুল্লাহ্ ভাই হারুনকে বললেন, দেখি ব্যাগটা দাও তো। ব্যাগটা নিয়ে প্রশ্ন করলেন ব্যাগের মধ্যে মাছ তো নেই ? তখন ভাই হারুন বললেন, আপনি যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ঐ দিকে মাছটি প্রাণ ফিরে পেয়ে চলে গেছে। তখন মুসা নবী বললেন, তাহলে আমরা অনেকটুকু পথ সেই স্থান হতে চলে এসেছি, তাই আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে। কারণ এই মাছের দিশাটাই হলো আমার পথের দিক নির্দেশনা সনাক্ত করবে। যেহেতু বালুময় পথ তাই মাছটি যে দিক দিয়ে চলে গেছে সেদিকে মাছটির চলে যাবার রেখা বা দাগ অঙ্কিত হয়ে আছে। মুসা নবী তাঁর ভাইকে বললেন তুমি তোমার গন্তব্যে চলে যাও আর আমি আমার পথে যাই।

মুসা নবী সেই দিকনির্দেশা মত যাবার পর দেখতে পেলেন যে, আবাদান হাতে একটি লাঠি এবং সমস্ত শরীর কাপড়ের আবৃত্তে ঢাকা নয় এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এ বিষয়টা কোরআনে এভাবে উল্লেখ নেই এটা আসলে ভাববাদী ব্যবস্থায় শোনা যে, আবাদান একটি আশা বা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবাদান বললেন আপনি মুসা ? মুসা কালিমুল্লাহ্ বলালেন, হ্যাঁ। আবাদান আবার জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আমার জ্ঞানের পরিমাপ জানতে এসেছেন কিন্তু আপনিতো ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না! মুসা কালিমুল্লাহ্ বললেন আল্লাহ্ যদি আমার সহায় হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পাবেন। তখন আবাদান বললেন আপনার সাথে আমার চুক্তি হলো আপনি যদি তিন বার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটান, তাহলে আপনার রাস্তায় আপনি এবং আমার রাস্তায় আমি। একথা শুনে মুসা কালিমুল্লাহ্ একটু বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন এই কারণে যে, যার জ্ঞানের তারতম্য পরিমাপ করবো, বুঝবো, জানবো সেই নিয়তেই তো এখানে এসছি কিন্তু আবাদান প্রথমেই শর্ত দেয় যে তিন বার যদি ধৈর্যের ত্রুটি ঘটে তাহলে আপনার রাস্তায় আপনি আর আমার রাস্তায় আমি। মুসা কালিমুল্লাহ্ আবাদানের সঙ্গে কথোপকথনে শর্ত মেনে নিয়ে তাঁরা লোকালয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

যাত্রার প্রারম্ভেই যেতে যেতে একটা নদী পার হতে হবে। নদীর ঘাটে মুসা কালিমুল্লাহ্কে দেখে মাঝি (মুসা আঃ উম্মত) খুবই খুশি বা আনন্দিত এই ভাবনাতে যে আমার রসূল

বা আমার নবী আজকে আমার এই নৌকাতে উঠে পার হবেন এর চেয়ে আনন্দময় ক্ষণ আর কি আছে ? অর্থাৎ একটি যুগে যখন নবী বা রসূলের আগমন ঘটে তখন তাঁর বহিঃপ্রকাশ বা তাঁর কাছে যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তখন তাঁর নীতি, আদর্শ বা ধর্মীয় আঙ্গিক যারা মেনে নেয় তারা উম্মত হয়ে যায়। ঐ নৌকার মাঝি ছিলো মুসা নবীর উম্মত। মুসা কালিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে আবাদান ছিলেন তাঁকে তো মাঝি চিনে না। মুসা নবী আবাদানকে বললেন হুজুর আপনি আসুন বা উঠুন। তখন ঐ নৌকায় তাঁরা উঠলেন এবং যিনি নৌকার মাঝি সে তো মুসা কালিমুল্লাহ্‌রই ভক্ত। মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলেন এবং নদী পাড় হতে লাগলেন। যেতে যেতে নৌকাটি যখন কিনারার কিছুটা দূরে তখন মুসা (আঃ) নবীর উম্মত বললেন যে, হুজুর আমি এই নৌকাটা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি এবং এটা থেকেই আমি এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চাহিদা মিটিয়ে থাকি। আমাকে একটু দোয়া করে দিন, আমি যেন এটার অবলম্বনে সুন্দর ভাবে চলতে পারি। তখন মুসা কালিমুল্লাহ্‌ আবাদানের দিকে চেয়ে বলেন, হুজুর আপনিই একটু দোয়া করে দিন। আবাদান বললেন দোয়া করে দিব ? মুসা (আঃ) বললেন হ্যাঁ। তখন আবাদান লাঠি দিয়ে নৌকার তলা ফুটো করে দিলেন এবং নৌকায় পানি উঠতে উঠতে তারা কিনারায় পৌঁছালো। সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হতেই নৌকাটি পানিতে ভরে ডুবে গেল।

এই ঘটনাটি দেখে মুসা কালিমুল্লাহ্‌র মনে প্রশ্নের উদয় হলো যে, এই কাজটা একজন ভাল মানুষ করতে পারে না, তাঁর কাছ থেকে আমি কি জ্ঞান শিখবো! এই ধরনের জালিমকৃত জ্ঞান যে, যার নৌকায় পাড় হলাম তাকে টাকা কড়ি দেবার বালাই তো নাই-ই আবার উল্টো তার নৌকাটাই ফুটো করে ডুবিয়ে দিল। এটা কোন ধরনের জ্ঞান ? নিশ্চয়ই এটা জালিমদের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। মুসা কালিমুল্লাহ্‌ ভাবেন যে, আমার তো শর্ত হলো তিনবার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটলে তাঁর রাস্তা তাঁর আর আমার রাস্তা আমার। তাই একবার অন্তত জেনে দেখি এর কারণ বা ব্যাখ্যাটা কি ? তখন মুসা কালিমুল্লাহ্‌ আবাদানের কাছে জানতে চায় যে, আমার উম্মত যার নৌকায় পাড় হলাম সে দোয়া চাইল তার পরিবর্তে আপনি তার নৌকাটি ফুটো করে ডুবিয়ে দিলেন, যা দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করে। হুজুর আপনি এটা কেন করলেন ? তখন আবাদান বললেন আপনি কিন্তু একবার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটিয়ে ফেললেন আর দুইটি বার ঘটালে আপনার পথে আপনি আর আমার পথে আমি। তখন মুসা কালিমুল্লাহ্‌ ভাবলেন যে, এ কেমন ধরনের

মানুষের পাল্লায় পরলাম। জানতে চাইলেই কিছু বলে না শুধু শর্ত ভঙ্গ করার বিষয়টাই বলেন যে, আপনি কিন্তু একবার শর্ত ভঙ্গ করলেন।

অতঃপর সেখান থেকে যেতে যেতে লোকালয়ের মধ্যে চলে গেলেন এবং সেখানে কিছু বালক মাঠের মধ্যে খেলা করছিল এমন অবস্থায় আবাদান মুসার (আঃ) দিকে দৃষ্টি দেয়। আবাদান দেখতে পেলেন মুসা (আঃ) রেগে আছে কারণ প্রথমবার ধৈর্যহারা হবার পর ঐ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা পান নি। এরপর আবাদান মাঠের মধ্য থেকে একটি বালককে ধরে এনে উঁচু করে আছাড় দিয়ে সেই বালকটিকে মেরে ফেলেন। এটা দেখে মুসা কালিমুল্লাহ্ রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে যে, এ কাজও কি একটি ভাল মানুষের দ্বারা সম্ভব ? যিঁনি একটি ছোট বাচ্চা বা বালককে আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন ? তাঁর কাছে আমি জ্ঞানের কি শিখবো! তাই এই ফায়াসালাটা আমি নিতে চাই। আবাদানকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনাকে এই বিদ্যা কে শিখিয়েছে ? নিশ্চয় এটা কোন ভাল বিদ্যা নয়। আবাদান বললেন, আপনি কিন্তু দুইবার ধৈর্যের ক্রুটি ঘটালেন।

তারপর ঐ স্থান থেকে আবার সামনের দিকে রওনা দিলেন। মুসা কালিমুল্লাহ্ একটু বিব্রতকর অবস্থা বোধ করলেন। কারণ তাঁর এই কার্যগুলোর দিকনির্দেশনা সে ভেঙ্গে দেয় না বা বলে না। শুধু শর্ত ভঙ্গের কথা বলে যে আপনার কিন্তু দুই বার ধৈর্যের ক্রুটি হলো। মুসা কালিমুল্লাহ্র চিন্তা হলো যে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে যেহেতু আমি আবাদানের সাথে এসেছি, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটাই দেখবার বিষয়। কারণ আবাদানের এই সকল কর্মকান্ডের ভাবধারাটা কি সেটা তো আমাকে বুঝতে হবে! তাই আবাদানের পিছনে মুসা কালিমুল্লাহ্ যায় আর ভাবে কিন্তু মুসার (আঃ) শরীরে এত বেশি ক্রোধ বা রাগান্বিত হয়েছেন যে নিজেকে কন্ট্রোল করা দায়। তাঁরা যেতে যেতে যখন গঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো। তখন একটা বাড়িতে হাক ছেড়ে বললেন যে, আমরা দুইজন মুসাফির এসেছি আমরা একটু পিপাসায় কাতর হয়েছি তাই একটু পানি পান করতে চাচ্ছি। সেই বাড়ির ব্যক্তি বললেন পানি-টানি দেওয়া যাবে না আপনারা বিদায় হউন। অর্থাৎ ঝাড়ি মেরে তাদেরকে বের করে দিলেন। এ কথা শুনে বের হয়ে আসতেই তাঁরা দেখতে পেলেন যে, ঐ বাড়ীর পাশে একটি প্রাচীর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রাচীরটি এমন সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হচ্ছে। তখন আবাদান প্রাচীরের দিকে বার বার দৃষ্টিগোচর করেন এবং মুসা কালিমুল্লাহ্কে বলেন এই প্রাচীরটা আমাদের দু'জনকে

মেরামত বা ঠিক করতে হবে। তাই তুমি কোন কাজটা করবে ? হয় তুমি কাজে লিপ্ত হও আমি সহযোগিতা করি আর না হয় আমি কাজে লিপ্ত হই তুমি সহযোগিতা কর।

মুসা কালিমুল্লাহ্ এবার আরও বেশি ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ আগে থেকেই আবাদানের দুটি কর্মের পিছনে তাঁর রাগ ছিল, আর এখন যে বাড়িতে পানি চেয়ে পানি পাওয়া গেল না সেই বাড়ীর প্রাচীর ঠিক করতে হবে ? আবাদানের সঙ্গে যেহেতু মুসা কালিমুল্লাহ্ আছেন তাই তাঁর কথা অস্বীকার না করে সম্মতি জানিয়ে প্রাচীরটি ঠিক করবার কাজে লেগে পরলেন। মুসা কালিমুল্লাহ্ প্রাচীর ঠিক করছেন আর ভাবছেন এর সঙ্গে আমি আর থাকবো না। তাই তৃতীয় বার মুসা কালিমুল্লাহ্ ধৈর্যহারা হয়ে আবাদানের কাছে বললেন যে, আমি যেহেতু শর্ত রাখতে পারিনি যার জন্য আপনার রাস্তায় আপনি যাবেন এবং আমার রাস্তায় আমি কিন্তু যাবার আগে আপনার এই সকল কর্মকান্ডের ব্যাখ্যাগুলো জানতে চাই। তখন আবাদান বললেন:- প্রথমত হলো আমরা নৌকাযোগে যে নদীটা পাড় হই, সেই নদীটা হলো জালুত নামের এক রাজার রাজ্য সীমার ভিতরে। সেই রাজা হলো বদমেজাজি। তার রাজ্যের এরিয়াতে বা এলাকাতে যত নতুন নৌকা হয়, তার রাজ দরবার হতে নৌকার বহর আসলে ঘাটে যার নতুন নৌকা দেখবে তারই নৌকা রাজ বহরের সঙ্গে যোগ করে নিয়ে নেন। ধনী বা গরীবের বাছ বিচার করেন না। সেই জালুত রাজার বহর এই নদী দিয়েই সেদিন আসতেছিলো। (অর্থাৎ তিঁনি (আবাদান) দেখতে পেলেন যে, আমরা নৌকা থেকে নেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সেই রাজ বহর আসবে আর আসলেই রাজ্য সৈন্যরা তার নৌকাটা নিয়ে নিবে যদি নৌকা নতুন বা ভাল থাকে)। তাই আমি লাঠির আঘাতে নৌকাটাকে ফুটো করে দেই। কারণ তারা ফুটো নৌকা নিবে না। ঐ রাজ বহর চলে যাবার পর আপনার ভক্ত হয়ত অল্প কিছু টাকা কড়ি দিয়ে নৌকাটি ঠিক করতে পারবে কিন্তু যদি নৌকাটাই নিয়ে নেয় তাহলে আপনার ভক্তের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে, তার সংসারে অভাব অনটন এসে যাবে। তাই আপনি আমাকে যখন বললেল, হুজুর আপনি দোয়া করে দিন। তাই আমি লাঠির আঘাতে নৌকাটাকে ফুটো করে পানিতে ডুবিয়ে দেই। তাহলে আমি এই কাজটি করে তার ক্ষতি করেছি না কি ঠিক কাজটাই করেছি ? মুসা কালিমুল্লাহ্ ব্যাখ্যাটি জানার পর বললেন আপনি উত্তম কাজ করেছেন।

দ্বিতীয় হলো:- মাঠের মধ্যে যে বালকগুলো খেলা করছিল তার মধ্য হইতে যে বালকটিকে আমি আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছি, সেই বালকটি বড় হলে জালিম হবে। কিন্তু তার

বাবা-মা উভয়ই মুমিন মুমেনাত। তাই তাদের সেই মুমিনত্বের ধারাকে খন্ডন করতে করতে এই বালকটি তার বাবা-মাকেও সে জালিমের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই এই বালকটিকে আমি শেষ করে মালিকের কাছে সুপারিশ করেছি যে, তাদের ঘরে যেন একটি নেক সন্তান দান করেন। তাহলে আপনিই বলুন এই কাজটি করে আমি কি ভাল করি নি ? তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ বললেন, হুজুর আপনি উত্তম কাজ করেছেন।

তৃতীয় হলো:- যে বাড়ীতে গিয়ে আমরা পানি না পেয়ে প্রাচীরটা ঠিক করলাম। এই প্রাচীরটা ঠিক বা মেরামত করবার কারণ হলো, এই বাড়ীতে দু'জন এতিম রয়েছে। এই এতিমদের যে আমানত সেই আমানতটা এই প্রাচীরের নিচে রাখা রয়েছে। (অর্থাৎ যে রকম আগের যুগে মানুষ মাটির নিচে গর্ত করে গুপ্তধন রাখত ঠিক তেমনই এই প্রাচীর নিচে তাদের আমানত রাখা ছিল)। আবাদান বললেন, আমি দেখতে পেলাম প্রাচীরটা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এভাবে প্রচীরটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে গুপ্তধন বা আমানতকৃত এতিমদের হক অন্য কারো হাতে চলে যেতে পারে। কারণ এই এতিম বাচ্চাদ্বয় বড় হতে কয়েক বছর সময় লাগবে। তাই আমরা প্রাচীরটা মেরামত করলাম যাতে এই আমানকৃত হক থেকে তারা বঞ্চিত না হয় বা অন্য কেউ না পায়। যার জন্য এটা মেরামত করেছি যাতে তারা বড় হওয়া পর্যন্ত প্রাচীরটি অক্ষত থাকে এবং তাদের হক তারা বুঝে নিতে পারে। তাই আমরা দুজন মিলে এই কাজ সম্পন্ন করেছি। তাহলে এই কাজটা আমরা ভাল করেছি, না কি মন্দ করেছি ? এবার মুসা কালিমুল্লাহ্ বলেন হুজুর আপনি উত্তম করেছেন। তিনটি কাজই আপনি উত্তম করেছেন। মুসা (আঃ) নবী হবার পরেও এই ভাবধারা সম্পর্কে তিঁনি বুঝতে পারেননি।

তাহলে আবাদান কোন জ্ঞানের জ্ঞানী ছিলেন ? যে জ্ঞানের দ্বারা এই ঘটনা প্রবাহ পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং জানতে পেরেছেন! সেই ভাবধারার যে জ্ঞান, যে বহিঃপ্রকাশ, সেটার কার্যকারিতার যে রূপ, সেই ধারাবাহিকতাই হলো এই আধ্যাত্মিক একটি প্রণালীতে। এবার মুসা কালিমুল্লাহ্ বলেন হুজুর! আবাদান বলেন না, আপনি আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তাই আপনার রাস্তায় আপনি গমন করেন আর আমার রাস্তায় আমি চললাম।

এজন্য মুস্তাকিমের পথ বা যারা জাগতিক ভাবে এই সমস্ত পথকে অবলোকন করে পরিচালিত হয় তাদের ভাবধারা হয়ত সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না। যার জন্য ভ্রান্তির দিকে পড়ে যায়, তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আসলে

এই উল্লেখিত ব্যবস্থা, যদিও ঘটনাটা কোরআনুল মাজিদের সূরা কাহাফের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। তাই এই ঘটনার অবতারণা করা হলো এই মুস্তাকিমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হবার জন্য। জগত সংসারে অনেক মানুষই রয়েছে যেটা রসূলপাক (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে :- "কিয়ামতকাল পর্যন্ত এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে যারা আমার হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদেরকে কেউ কোন ভাবেই হক থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না। তাই সেই দলটাই হলো এই মুস্তাকিমের দল। তাঁরা জগত সংসারে কোথাও না কোথাও তাদের নিয়োজিত কার্যের মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। এজন্য আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। আমাদেরকে মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত কর, আমরা বলে থাকি কিন্তু মূলধারা হলোঃ- আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্। অর্থঃ- আমাদেরকে মুস্তাকিমের (সত্য সঠিক) পথে পরিচালনা করুন। তাহলে এটা হলো ফরিয়াদ কিন্তু আলোচ্য সূরাটিতে এই মুস্তাকিমের দিশা সম্পর্কে অর্থাৎ সেই পথে ধাবিত হবার জন্যই নির্দেশ করছেন।

আল্লাহ্‌র রহিম নাম বা লকব

পঞ্চম আয়াতে বলা হলোঃ- তান্‌জিলাল্ আজিজুর রহিম। অর্থঃ- ইহা প্রবল ক্ষমতাবান রহিম হইতে নাজেল। আজিজ শব্দটি প্রবল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ হলো আল্লাহ্‌ই একমাত্র ক্ষমতাবান। আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে। সুতরাং একমাত্র ক্ষমতাবান আল্লাহ্। যদিও মানুষ এবং জ্বীনকে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করা হয়েছে। এর বাইরে কাহারও কোন প্রকার ক্ষমতা নেই। সর্বোচ্চ পর্যায়ে দর্শন করলে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই। অতি ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণাও বলবার উপায় নেই আল্লাহ্ হতে সে সম্পূর্ণ আলাদা। ধূলিকণাটি যতই ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এই ক্ষমতা পেলে অতি ক্ষুদ্রতম ধুলিকণাটিও শেরেক করিত। বলিত আল্লাহ্ আপনি যত বড়ই হউন না কেন, আপনার মত আপনি আর আমি যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, আমার মত আমি। তাহলে শেরেক হত। আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্বের বিষয়ে ঘোষণা থাকতো।

এজন্য বলা হয় "লা শরীক-আলা" অর্থাৎ নাই কোন শরীক আল্লাহ্ ছাড়া। আপন নফ্‌সের সঙ্গে মোহ-মায়ার খান্নাসটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই খান্নাসই মানবজাতিকে অনেক রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে শেরেকের পথে নিয়ে যায় তথা অংশীদারিত্বের

পথে নিয়ে যায়। এজন্য জাগতিক ভাবে শেরেক কবিরা (গুনাহ)। দুই এর মাঝে তৌহিদ থাকে না, এক এর মাঝে শেরেক থাকে না। সুতরাং কোরআন দর্শন (ফিলোসফি) খান্নাস যুক্ত দুনিয়ার বুনিয়াদের উপর বলা হয় নি। তৌহিদের পথে কেমন করে আসা যায় তার ভিত্তিটি হলো কোরআনুল হাকিম। সেরাতাল মুস্তাকিমের যে বুনিয়াদ উহাতে খান্নাসযুক্ত মোহ-মায়ার দুনিয়াটি থাকতে পারে না। তাই এখানে রহিম রূপি আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে। রহিম রূপটি আল্লাহ্‌র বিশেষ দান।

বান্দা জন্ম লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে সে কি খাবে, কি করবে ? সকল কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে রহ্‌মানের দানে কিন্তু রহিমের দানটা হলো বিশেষ। এই বিশেষ দানের কারণ হলো:- আল্লাহ্‌পাক যদি কোন বান্দাকে ক্ষমা করে দেন এই ক্ষমার পরের দানটি হলো রহিম রূপে। অর্থাৎ এই ক্ষমার লকবটাই হলো রহিম রূপে। এজন্য সমগ্র কোরআনুল মাজিদের কোথাও গাফুরুর রহ্‌মান নেই, আছে হলো গাফুরুর রহিম। ক্ষমা প্রাপ্তির একটি সনদ। সেখানে মন্দের কোন লেস নেই, পরিপূর্ণ একটি সনদ। সেটাই রহিম রূপের অবয়বে প্রকাশ করা হয়েছে। বান্দার তার কৃতকর্ম বা মোরাকাবা মোশাহদা দ্বারা যদি সে ক্ষমার ধারাতে সমাসীন হয় এবং আল্লাহ্‌ যদি তাকে ক্ষমা করে, এই ক্ষমার রূপটাই হলো রহিমের। তাই রহিম রূপের ক্ষমার স্তর থেকে যদি আমরা শুরু করি যেমন, আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, আরাধনা, মিনতি, যে সুর, যে চাওয়া সেটাকে বার বার উপস্থাপন করছি, সেই উপস্থাপন যখন গৃহিত হবে, সেই গৃহিত রূপ রেখাই হলো এই রহিম।

তাই রহ্‌মান এবং রহিম এই দুই দানের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এই বিষয়টা সবার চোখে ধরা পড়ে না। আর ধরা না পড়বারই কথা, কারণ এগুলো জানবার পরেও অনেকেই তো ধ্যান সাধনার (মোরাকাবা মোশাহেদা) মাধ্যমে খান্নাসমুক্ত তৌহিদ বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করা জীবন দর্শনটিকে গ্রহণ করার মানসে এগিয়ে আসে না। এই আসেনা বা পারেনা এই না আসাটাই তকদির। এই না পারাটাই আল্লাহ্‌র লীলাখেলা। এই না পারার জন্যই দুনিয়ার বুকে যত অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল, শঠতা, ধোঁকাবাজি, হীন স্বার্থ উদ্ধারের মত্ততা, হিংস্র প্রতিযোগিতা, আস্ফালনের কুৎসিত অহংকার ইত্যাদি বিষয়গুলো আছে বলেই এত আয়োজন। ইট ইস সায়েন্স বিয়ন্ড সায়েন্স, বিজ্ঞান বহির্ভূত আরও একটি বিজ্ঞান ধ্রুব সত্য রূপে স্থান করে আছে।

মূল ধারার আলোচনায় প্রথমে ১) ইয়াছিন ২) ওয়াল্‌ কুরআনুল্‌ হাকিম্‌ ৩) ইন্‌না কালা মিনাল্‌ মুর্‌ছালিন্‌ ৪) আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্‌ ৫) তান্‌জিলাল্‌ আজিজুর রহিম। অর্থাৎ

আল্লাহ্পাক যখন আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, তখন থেকে ৫টি স্তর বা ধাপে ধাপে উচ্চতার অবগাহন হলে "ইয়াছিন"। এজন্য কোন এক সাধক তার রচনাতে উল্লেখ করেছেন:- নিরানব্বই নামের মাঝে ফুল ফুটিল ইয়াছিন, তক্তে বসা রাব্বুল আলামিন।

হেদায়েতের বাণী গ্রহণ করা বা না করা

এর পরে ৬ষ্ঠ আয়াতে আসলো হলো:- লিতুন্‌জিরা কাওমাম্ মা উন্‌জিরা আবায়ুহুম্ ফাহুম্ গাফিলুন্। অর্থ:- তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে এই হেদায়েতের বাণী পৌঁছানো হয়েছিল কিন্তু তারা গাফেল। আল্লাহ্পাক প্রতিটি জাতি বা কওমের নিকট সতর্ককারী রূপে রসূলদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এই কথাটির উপর ভিত্তি করে অনেকেই কোরআনের মাঝে আত্ম বিরোধী কথা অস্বীকার করতে চায় কিন্তু ইহা মোটেও আত্ম বিরোধী নয়। কারণ প্রতিটি কওম বা জাতির জন্য আল্লাহ্পাক রসূলদেরকে তাদের সঠিক পথ দেখাবার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, এই কথাটি যেমন সত্য তেমনি আবার ইহাও একটি সত্য কথা যে, যদি কোন কওমের বা জাতির জন্য একান্তই রসূল পাঠানো না হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর অজ্ঞতার অন্ধকার তাদের উপর থেকে যায়। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করার দরুন সেই জাতি মানুষের রূপে অনেকটা পশুরতুল্য তথা জীব-জানোয়ারের মত। প্রশ্ন হলো যদি সত্যিই কোন কওম বা জাতির জন্য রসূল আল্লাহ্পাক না পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের বিচার ব্যবস্থা থাকে না। তাই আল্লাহ্পাক প্রত্যেক জাতির জন্য তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

যেহেতু তরিকতে আহলে বায়াতের ভাবধারাতেই ভাববাদী ব্যবস্থার আলোচনা রাখছি, তাহলে এই আলোচনার উৎস হলো হেদায়েতের বাণী। প্রত্যেক যুগে-যুগে, কালে-কালে নবী-রসূল থেকে শুরু করে আল্লাহ্‌র যত প্রতিনিধিগণ এসেছেন, সবাই এই মূল ধারা সম্পর্কে আহ্বান করেছেন বা দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু যারা গাফেল, তারা এটা গ্রহণ করে নি বরং এটা থেকে পিছু পা হয়েছে। এই দিকে নিজেদের দস্তাবেদ বা নাম লেখান নি। তারা এই হেদায়েতের রাস্তাতে কার্যকারিতা করে নি। ৬ষ্ঠ ধাপে তারা গাফেল ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে বা তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে মূলধারার কথা গুলো জানানো হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে কিন্তু তারা কেউ গ্রহণ করে নি, তারা গাফেল।

কোরআনুল মাজিদের অপর একটি সূরা, সূরা কাহাফে ১৭ নাম্বার আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন যে:- "ওয়া মান্ ইউদ্‌লিল্ ফালান্ তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম্ মুরশিদান্"। অর্থ :- তুমি পাইবে না তাদের জন্য কোন ওলি এবং মোর্শেদ যারা পথভ্রষ্ট। তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে হেদায়েতের বাণী ওয়াকিবহাল করা হয়েছে কিন্তু তারা সবাই গাফেল, হেদায়েত নেই। তাহলে হেদায়েত গ্রহণ করবার পরেই উচ্চ ধারাতে উত্তরণ হতে হতে এই ইয়াছিনের পরিপূর্ণতার ফল দাঁড়ায়। তাই এই হেদায়েত নামক ব্যবস্থা হতেই সূচনা করতে হবে। সুতরাং প্রথমেই এই হেদায়েত খাতায় নামটা লিপিবদ্ধ করতে হবে বা হেদায়েত গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর সেই আমল নীতির দ্বারা রহিমের ক্ষমার প্রাপ্ততা সুনিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর ক্ষমা থেকে উত্তরণ হয়ে মুস্তাকিমে আসতে হবে এবং মুস্তাকিম থেকে মুরসালিনে যেতে হবে, অতঃপর মুরসালিন থেকে কুরআনুল হাকিমে যেতে হবে আর হাকিম থেকে ইয়াসিনে পৌঁছাতে হবে। তাহলে এই পথের যে সূচনা, সেই সূচনা হলো গুরু। কারণ আমরা যারা মহান স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি তারা সবাই মহান স্রষ্টাকে চাই। স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির প্রকাশ আর বিকাশ। তাহলে এই প্রকাশ আর বিকাশকে সমন্বয় সাধন করবো কি দিয়ে ? তাঁকে তো পাওয়া যায় না। তাই স্রষ্টাকে লাভ করার যে প্রক্রিয়া বা কারিকুলাম সেটাই আল্লাহ্‌পাক তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁকে পেতে হলে তাঁর প্রতিনিধিকে অনুসরণ করবার কথা বলা হয়েছে বা একটি মাধ্যম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে লাভ করবার কথা বলা হয়েছে। অছিলা ধরতেই হবে, একা একা আল্লাহ্‌কে লাভ করা যায় না। যুগে-যুগে, কালে-কালে যত ওলি আওলিয়াগণ এসেছেন তাঁরা সবাই গুরু মাধ্যম বা অছিলার মাধ্যমেই স্রষ্টাকে লাভ করেছেন।

আল্লাহ্ বলেন:- আমাকে পেতে চাইলে আমার হাবীবকে অনুসরণ কর আর আল্লাহ্‌র হাবীব বললেন:- আমাকে পেতে চাইলে আমার আহলে বায়াতকে অনুসরণ কর। এটাই এই আহলে বায়াত বা গুরুবাদী ভাবধারায় স্থানান্তরিত হয়েছে। যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সকল কার্যক্রমগুলো তরান্বিত করতে চেষ্টা করি। তাই মূল ধারার ভাবধারাকে বুঝতে হলে বা এটাকে সন্নিবেশিত করতে হলে এটা ভাষার শৈলীতে আসলে প্রকাশ করা যায় না। যে কারণে সাধকগণ এভাবেও বলে থাকেন যে:- "কালাম বাণী জিব্রাঈল আনিতেছে হরদম" মূল বিষয় জিব্রাঈল (আঃ) তার এই কার্যাবলীতে সমাসীন রয়েছে। এজন্য কোরআন নাজেল (বর্তমান) হয়ে থাকে। তাহলে সেই ভাবধারাগুলো এখনও

চলমান প্রক্রিয়াতে রয়েছে। এটা সাধকদের রাস্তায় বলা হয়, সেখানেই মূল ধারার পরিপূর্ণতার উদ্ভাসন রয়েছে। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) বলেছেন:- "সাধকের নিকট নিজ ভাষায় যাহা অহি হইয়া আসে তাহাই তাঁহার কোরআন"। তাই যাই কিছু বলা হোক দুনিয়ার আপেক্ষিকতার যে রঙ, রূপ, শৈলী, কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে সেটাও যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়। তার মধ্য হতেই আমাদেরকে মূল ধারার কথাগুলো বলে যেতে হবে এবং সেই ভাবধারাতে আমল নীতিগুলো পরিচালনা করতে হবে। যা এমন একটি প্রক্রিয়া শৈলীতে যেন কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সত্য, সঠিক, সুপথ এবং মূলধারা বুঝবার তৌফিক মওলা সবাইকে দান করুক। আমিন।

কোরআনুল মাজিদ

(ভাবগত)

"আল্লাহ্‌র পথে যাঁরা কতল হয়, তোমরা তাঁদের মৃত বলো না বরং তাঁরাই জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না"। (আল-কোরআন)

প্রথমত :- সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআনুল মাজিদ ইসলাম ধর্মের সংবিধান, মানুষের মুক্তির সংবিধান। ইহা একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কিতাবও বলা হয়।

দ্বিতীয়ত :- ১১৪ টি সূরা রয়েছে।

তৃতীয়ত :- ৬২৩৬ টি আয়াত, কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের মুখে মুখে এই আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ টি প্রচার হয়ে আসছে।

বিভিন্ন জ্ঞানী ও মাশায়েখের দর্শনকৃত কিতাব হতে জানা যায়, অনেক আয়াতের কিছু অংশ রহিত এবং কিছু অংশ সংযোজিত, অতঃপর অনুবাদকৃত বাংলা অর্থ এক একটি আয়াত বা শব্দমালার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। কোন কোন অনুবাদকের অর্থ এবং বাক্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। অনেক বড় বড় জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত সনদ যাদের রয়েছে তাদের অনুবাদ তাফসীরে সূক্ষ্ম কিছু নমুনা দেখা যায়। (যেমনঃ- আমানু অর্থ মানুষ, মোমিন, ঈমান আনয়নকারী ইত্যাদি) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাবগত অর্থ

একই হবার কথা কিন্তু বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানমূলক গবেষণা চালিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, কোরআনুল মাজিদ রসূলের (সাঃ) (আঃ) কাছে নাজেলকৃত ব্যবস্থা জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেস্তা মারফত অহী রূপে প্রেরণ হয়।

উক্ত নাজেলকৃত অহীতে জের, যবর, পেশ এগুলো সংযোজন ছিল না, রূপান্তরবাদে এগুলো সংযোজিত হয়েছে। রসূলের জীবন দর্শায় কোরআন সংকলিত হয় নাই, ওফাত বা পর্দা গ্রহণের পর এগুলো সংকলিত করা হয়, এ প্রসঙ্গে যে সাহাবা দায়িত্ব পালন করেন তার নাম হযরত ওসমান (রাঃ)। প্রকাশ থাকে হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআন সংকলনের পর কোন এক বিশিষ্ট সাহাবা হযরত আলী (আঃ)- এর নিকট উক্ত খবর পৌঁছানোর পর মওলা আলী (আঃ) বলেন, ওগুলো সংগৃহীত সংকলিত মুদ্রণকৃত কোরআন, আমি আলী জীবন্ত কোরআন।

গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি যেন একটু ভাবিয়ে তোলে, এই জীবন্ত কোরআন কি ? কিভাবে এই জীবন্ত কোরআন অর্জন বিষয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়? কিভাবে তা অর্জন সম্ভব? এই মতাদর্শ সম্পর্কে মানুষকে ধ্যান-ধারণা দিয়ে চলেছে সুফিবাদ অনুসরণকারী বা এক কথায় আহলে বায়াতের পথ। কেবলমাত্র এই আহলে বায়াতের পথই জীবন্ত কোরআন এর মূল নিশানা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে চলেছে। তাহলে আমরা জীবন্ত কোরআনকে হাকিকী এবং মুদ্রণকৃত কোরআনকে মেজাজী বলতে পারি, গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুঝবার সহজ উপায় অবলম্বনের জন্য। যদিও কোরআন সম্পর্কিত কোন বিষয় দ্বিমত হবার নয়। চলমান বাস্তবতার নিরিখে যা উল্লেখ করা হলো এমন হবারও তো নয়, যার প্রমাণগুলো কোরআন নিজেই বর্ণনাতে রেখেছে। শুধু তাই নয় এই কোরআন সংরক্ষণকারী আমানতদারীও স্বয়ং আল্লাহ্ রেখেছেন। আর একটু সংযোজন না করিলে যেন কোথাও কম থেকে যায় তা হলো, “কোরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষণকৃত”। এখন কথা হলো এই লওহে মাহফুজ কোথায় ? আত্মার বিজ্ঞানী বাবা সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) মাথাতে লওহে মাহফুজের স্থান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

তাই সুফির অনুশীলন থাকে দেহেতে, বাহ্যিক আচরণ বা বর্ণনা এখানে অমুলক। যিনি বা যে এই বিষয়ে গবেষণা করবে তথা (ধ্যান, মোরাকাবা, মোশাহেদা) গুরু নির্দেশিত

ব্যবস্থায় নিজেকে উন্নীত করতে পারবে তবেই সে জানতে পারবে, শুধু জানা নয় দেখার বিষয়টিও এখানে সংযোজিত রয়েছে।

সুতরাং ভ্রান্তি বা অবজ্ঞায় পরবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে না। তবে ইহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুশীলন ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত সনদ রয়েছে, এটাই ভিন্নতার রূপ বা চিত্র। চৈতন্য ধারার আলোকে কোন মানুষ গুরু নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে নিজ দেহটাকে মুবারক করবার অনুশীলন বা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে এই কালাম পাকের জাগরণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়, তবে সে দেহ মুবারক হয়। অনেক সাধকগণ এমন পর্যায়কে কিতাবস্থ দেহ বলেও উল্লেখ করেন। এভাবে হাকিকী শিক্ষার বাতেনী ব্যবস্থা সালেক, মজ্জুব, অলীদের মাঝে বেশী পাওয়া যায়। মানুষ আমরা পঠিত জ্ঞান দ্বারা সকল কিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এজন্য নিরেট সত্যটা অনেক সময় জাগ্রত হয় না। প্রকৃত সত্য উৎঘাটনকারী সমাজের কাছে লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি এবং নাজেহাল হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। জাতের মূল ধারাতে যাদের নামগুলো স্থায়ী হয়ে আছে তাহাদের জীবনীগুলো উৎঘাটন করলে এমন চিত্রগুলোই বেশী পাওয়া যায়। তাই আজকের জামানায় ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানী রক্তপাতের যে বিভৎস চিত্র, এর থেকে পরিত্রাণকৃত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত্বে সমসাময়িক যুগ শ্রেষ্ঠ বুজুর্গানে দ্বীনদের কাছে আকুল আবেদন, কোরআনুল মাজিদের উক্ত আলোচনা গুলোর প্রকৃত সত্য নিরূপন সহ সঠিক সুরাহা নিশ্চিত করা। কারণ হলো সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআনুল মাজিদ সম্পর্কিত এমন চিত্র যেন আর ফুটে না উঠে, এজন্য জাগ্রত আত্মার অধিকারীগণ সমাধান কল্পে সচেষ্ট হবেন।

কোরআন সম্পর্কে কিছু কথা

শুরুতেই আমার মহান মোর্শেদ ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর লিখিত কোরআনুল মাজিদ হুবহু অনুবাদ এবং কিছু ব্যাখ্যা প্রচলিত অনুবাদ এবং তাফসীর এর সাথে তুলনা করলে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে সঠিক মানদন্ড জরুরী বলে মনে করি। কিতাবখানি অধ্যায়নের জন্য পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ রাখলাম। বর্তমান কম্পিউটার গণিত, বিজ্ঞান এবং মেডিটেশন সাক্ষ্যতা বহন করে

চলেছে কোরআনুল মাজিদ আল্লাহ্‌র বাণী। দুনিয়াতে যখনই কোন পয়গাম্বর প্রকাশিত ভাবধারায় আল্লাহ্‌পাকের বাণী দুনিয়াবাসীকে জানান দেন, তখন এ বাণীর সত্যতার জন্য প্রমাণ দাবী করা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী। এরূপ আখেরী পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) যখন স্বীয় মাবুদের একত্ত্ববাদ এবং স্বীয় রিসালাতের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছানো শুরু করেন তখনই প্রমাণ স্বরূপ যুক্তি উপস্থাপন শুরু করে। যেমন সূরা আনকাবুত-এর ৫০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে:- "এবং লোকে বলে- তাঁহার ওপর তাঁহার রব হইতে (অলৌকিক) নিদর্শনাবলী নাজেল কেন হয় না ? বলিয়া দিন নিদর্শন সমূহ তো আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী"। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়াতে কারিমাটি উল্লেখ্য রাখলাম। অতঃপর লোকেরা রসূলের (সাঃ) (আঃ) নিকট বলল যে, আপনি আসমান পর্যন্ত সিঁড়ি লাগান এবং আমাদের সামনে এর উপরে আরোহন করে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ নিয়ে আসুন, তখন আমরা ঈমান আনব।

এখন বুঝবার বড় বিষয় হলো আল্লাহ্‌র কালামপাক রসূলের (সাঃ) (আঃ) পাক জবান থেকে প্রকাশ ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) মাধ্যম যোগে কিন্তু বিষয় সমূহ সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা না থাকায় এমন মন্তব্য। কারণ এ বিষয় সম্পর্কে বুঝতে হলে আধ্যাত্মিক সাধনা বা মোরাকাবা মোশাহেদায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু মানুষ গাফেল হবার কারণে বা আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে নিরুৎসাহিত হবার কারণে পয়গাম্বর গণের আবির্ভাব। আল্লাহ্‌পাক কোরআনুল মাজিদের সূরা আনকাবুতের ৫১ নাম্বার আয়াতে বলেন :- "ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নয় আমরা আপনার উপর আল-কেতাব নাজেল করিয়াছি যাহা তাহাদের উপর তেলোয়াত হয় ? নিশ্চয় উহাতে অবশ্য একটি রহমত ও সংযোগ রহিয়াছে বিশ্বাসকারী একটি কওমের জন্য"। তাই চিন্তাশীল এবং বিশ্বাসীগণ তাদের জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষা অন্তে পয়গাম্বরগণের নিকট বিশ্বাস স্থাপন করে দ্বীন গ্রহণ করেছে। রসূল (সাঃ) (আঃ) কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র হতে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এজন্য এই মহান কিতাব তাঁহার পক্ষে রচনা অসম্ভব বটে (জাগতিক)। কারণ জাগতিক বিষয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা থাকে না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সূরা আনকাবুতে, ৪৮ নাম্বার আয়াতে জানান দেওয়া হয়েছে যে :- "ইতিপূর্বে আপনি কোন কিতাব তিলোয়াত করেন নাই এবং আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা লিপিবদ্ধ করেন নাই' সেই রূপ করিলে বাতিল ব্যক্তিরা সন্দেহ করিত"। প্রচলিত ভাবধারায় রসূল (সাঃ) (আঃ) লেখাপড়া শিখতেন, পূর্ববর্তী জ্ঞানী কিতাব অধ্যায়ন পূর্বক নিজের জ্ঞান বিকাশের সুষ্ঠ ধারায় তা

লিপিবদ্ধ করতেন কিন্তু তা নয়। কারণ হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে তিঁনি নিজের থেকেও একটি কথাও বলেন না, যত সময় না প্রত্যাদৃষ্ট হয়। এটাই আধ্যাত্মিক প্রণালী। যেমন বিষয়টি সম্পর্কে কোরআনুল মাজিদের ভাবধারা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন (সূরা বাকারা, আয়াত নাম্বার ২৩ হতে ২৮ দ্রষ্টব্য)। ইহা আল্লাহ্‌র কালাম যা অস্বীকার কারীদের চ্যালেঞ্জ করছেন:- তোমরা পূর্ণ কোরআনুল মাজিদ কিংবা কমপক্ষে একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আসো, যদি তা ও না পারো তবে একটি আয়াত (অনুরূপ) তৈরী করে নিয়ে আসো, কিন্তু পৃথিবীতে তারা সে বিষয়ে অক্ষম কারণ ইহা আল্লাহ্‌র কালাম। আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান জ্ঞান গবেষণার উন্মুক্ত ধারাতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে ইহা একটি ঐশী কিতাব এবং স্থায়ী মোজেজা স্বরূপ। দুনিয়াতে অনেক অমুসলিম পন্ডিত ব্যক্তিগণও এ কিতাব সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দু-একজনের উদাহরণ তুলে ধরা হলো, যেমন পাদ্রী বাসভার্থ বলেন:- নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনুল হাকীম বর্ণনা, বীরত্ব ও সত্যবাদীতার এক বিরাট মোজেজা। ইংরেজ এ. জে. বেরী লিখেন :- কোরআনুল মাজিদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার স্বর মাধুর্যের আনন্দ এবং হৃদয়ের কম্পন শ্রবণ করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান গবেষণায় পৃথিবীর আনুমানিক বয়স ধরা হয় ছয় হাজার কোটি বছর। জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয় পানি থেকে সূচনা আরও অনেক রয়েছে যেমন :- প্রথম প্রাণী ডাইনোসর উল্লেখ করা হয় অথচ আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামে সুস্পষ্ট ভাবে সূরা ইয়াসিনের ৩৬ নাম্বার আয়াতে জানিয়ে দিলেন :- “যিনি মহিমান্বিত (তিঁনি) সৃষ্টি করিয়াছেন সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় যাহা জন্মায় জমিতে এবং তাহাদের নফ্‌স সমূহ (রুহ বলা হয় নাই) হইতে এবং যাহা তাহারা জানে না”। তাই মহান স্রষ্টার সৃষ্টি যে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞানময় তা সুস্পষ্ট হিসাবে বা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখিত। যা নিয়ে গবেষণা এখনও চলমান। পৃথিবী বাসীর জন্য এই কালাম সর্বপরি দৃষ্টান্ত রেখেছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এটা বার বার প্রমাণ করে চলেছে।

কোরআনুল মাজিদের মোজেজা বুঝবার জন্য আরবি ভাষা জানা জরুরী নয়। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ এই মোজেজাকে দেখার জন্য পদ্ধতিগত চোখ রাখবে। কালামপাকের ধারা অহি নাজিলের ধারাবাহিকতায় নয় বরং বর্ণনা অনুযায়ী করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) (আঃ) হায়াতে তাইয়েবায় এ ধারা বর্ণনা করেছেন। কোরআনুল মাজিদের আয়াত প্রয়োজন অনুসারে নাজিল হতে থাকে। প্রথম অহি হেরা গুহায় রমজানের ২৬

তারিখ (দিবাগত রাত্রে) যখন জিব্রাঈল (আঃ) সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন। রসূল (সাঃ) (আঃ) এ অস্বাভাবিক ঘটনায় পেরেশান হয়ে ঘরে ফিরে এসে মা খাদিজাতুল কুবরাকে (রাঃ) সব খুলে বলেন। তিনি রসূলকে (সাঃ) (আঃ) সান্ত্বনা দিলেন, অতঃপর রসূল (সাঃ) (আঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের একত্ত্ববাদ, তাঁর রিসালাত এবং পরকালের উপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত শুরু করেন। যা মক্কার কাফিরদের নিকট গৃহিত হলো না। প্রতুত্তরে মক্কার কাফিরগণ প্রচার করতে লাগল যে মুহাম্মাদ (সাঃ) (আঃ) দিওয়ানা ও পাগল (নাউজুবিল্লাহ্)। মক্কার কাফিরদের এ উক্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সূরা "আল কলম" নাজেল হয়। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে :- তিঁনি পাগল নন বরং সাথে রসূল (সাঃ) (আঃ) কে উসওয়াতুন হাসানা (উত্তম আদর্শ) এবং মর্যাদাশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অহি সূরা মুজামমিল এর কয়েকটি প্রাথমিক আয়াত আকারে এসেছে। ৫ নং আয়াতে:- আমি শীঘ্রই আপনার উপর ভারী কালাম নাজিল করব। দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন রসূলকে (সাঃ) (আঃ) মানুষেরা ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে থাকল। আল্লাহ্র বাণী কালামকে মেনে নিতে থাকল তখন কাফেররা বলতে লাগল মোহাম্মদ জাদুকর (নাউজিবিল্লাহ্)।

চতুর্থ অহি আসে সূরা মুদাস্সির এর ৩০ আয়াত হিসেবে নাজিল হয়:- "তাঁর উপর রয়েছে ১৯ (উনিশ)"। ২০তম এবং ২৫তম আয়াতে মক্কার কাফিরদের সে মিথ্যা প্রচারণা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকে বলা রয়েছে রসূল (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেন তা জাদু এবং এই কোরআনুল মাজিদ নবী করিম (সাঃ) (আঃ) এর নিজের বাণী এবং ২৬তম আয়াতে মক্কার কাফিরদের কর্মের উপর আল্লাহ্তাআলার নিজের রাগ ও গোস্সার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং বলেছেন যে, "আপনার উপর এরূপ অভিযোগ কারীদের অতি সত্বর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"। ২৮নং এবং ২৯ নং আয়াতে জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মানুষের রং হবে কালো এবং এরপরে ৩০নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭৪ নং সূরা ৩০ নং আয়াত "এরপর ঊনিশ"। জিব্রাঈল (আঃ) যেখানে সূরা মুদাস্সিরের ৩০তম আয়াত পর্যন্ত থেমে গেলেন এবং এরপর তৎক্ষণাৎ ইকরা (সূরা আলাক) এর বাকী ১৪ আয়াত রসূল (সাঃ) (আঃ) কে প্রদান করলেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তাশীলদের জন্য "এর পর উনিশ" হোয়াট ইজ দ্যা ম্যাটার ? এই বিষয়টা কি ? মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ রেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নামের উল্লেখের পর এই আয়াত এসেছে। এজন্য

এর উদ্দেশ্য ঐ ১৯ ফেরেশতা যারা জাহান্নামের পাহারাদার। কেউ লিখেছেন ইহা ইসলামের ১৯টি মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু সবাই একটি বিষয়ে একমত এর মূল বিষয়টি মহান আল্লাহ্পাক ভাল জানেন। সূরা মুদাস্সির-এর "এরপর ঊনিশ" বলার পর সূরা আলাক ১৯ আয়াতে পূর্ণ হয়ে গেল। সূরা মুদাস্সির ৩০তম আয়াতে রয়ে গেল।

১৯ এর বিষয় সম্পর্কে গাণিতিক কিছু রূপ রেখা দেওয়া হইল অবশ্য জ্ঞানীদের লেখনি থেকে।

* সূরা আলাক এর ১ম ৫ আয়াতে ১৯টি শব্দ এবং ঐ ঊনিশ শব্দের মধ্যে ৭৬টি অক্ষর যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য। ৭৬ ÷ ১৯ = ৪ । গুণের উদাহরণ:- ১৯ × ৪ = ৭৬।

* কোরআনুল মাজিদে ১১৪টি সূরা আছে, এ সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। ভাগের উদাহরণ:- ১১৪ ÷ ১৯ = ৬। গুণের উদাহরণ:- ১৯ × ৬ = ১১৪।

* কোরআনুল মাজিদে ১১৪টি সূরা নিচের দিক থেকে গণনা করলে ১৯ নং সূরা আলাক। উপর থেকে গণনা করলে ৯৬ সবই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

* কোরআনুল মাজিদের প্রথম শব্দ ১৯ বার. দ্বিতীয় শব্দ ২৬৯৮ বার, তৃতীয় শব্দ ৫৭ বার, চতুর্থ শব্দ ১১৪ বার। সবই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, চিন্তাশীলদের জন্য দৃষ্টান্ত।

* কোরআনুল মাজিদে হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে ২৯টি সূরা। অর্থাৎ হরুফুল মুকাত্তাআত্ ইহাও গভীর রহস্যপূর্ণ অর্থ বহন করে।

এছাড়াও সাধকদের মত হলো "বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহিম" ইহাতে মোট ১৯টি হরফ সন্নিবেশিত আছে। কলেমাতে দুইটি অংশে মোট ২৪টি হরফ রয়েছে কিন্তু এই ২৪টি হরফে কোন ফোঁটা বা নুক্তা নেই। তাই কলেমার ২৪ হরফ থেকে ৫ বাদ দিলে থাকে ১৯। দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা এই ২৪ থেকে ৫ বাদ দিলে ১৯ ঘন্টার সমাধান। বাকী ৫ ওয়াক্ত নামাজ (পাক পাঞ্জাতন)। বাকী ৫ ঘন্টা এভাবেও অনেকে মত প্রকাশ করে থাকেন। মূল কথাগুলোর আসলে প্রকৃত সমাধান কালে-কালে মানুষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে হয়ত এই রহস্যপূর্ণ "১৯" সহ কোরআনুল মাজিদের (যা আল্লাহ্পাক ভাল জানেন) এ কথার সঠিক সদুত্তর মানুষের কাছে পৌঁছাতে সচেষ্ট হবে। কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য মহা গ্রন্থ রূপে জাগরিত থাকবে। "দ্যা কোড অফ লাইফ হলি কোরআন"।

কোরআনের নাম নিয়ে কিছু কথা

কোরআন মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এই কিতাবের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ওলি-মাশায়েখগণের কিতাবেও এ বিষয়ে মত প্রকাশ রয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় যে বিষয়টা সর্বপ্রথম উপস্থাপন জরুরী তা হলো মওলা আলী (আঃ) বলেছেন:- "আনা আল-কুরআন নাতেকুন ওয়া হাজাল কুরআন সামেতুন" অর্থ এবং উহা (কাগজে লিখিত কোরআন) মুক বা নির্জীব কোরআন আর আমি (আলী) জীবন্ত কোরআন।

তাহলে প্রশ্ন হলো জীবন্ত কোরআন কিভাবে হয় ? ধর্মীয় আলোকে তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োগ পদ্ধতি বা আমল নীতিগুলো চলমান সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া বিরল। আবার এই প্রসঙ্গ না জানবার কারণে ভ্রান্ত বলে মনে উদয় হয়। তাহলে এ বিষয় সম্পর্কে নিজ গুরুর নিদের্শনা মোতাবেক আমলগুলি চলমান হলে প্রকৃত রহস্য জানা সম্ভব হয়। "বাল-হুওয়া কুরআনুম মাজিদ, ফি লাওহিম মাহফুজ" (সূরা বরুজ, আয়াত নং: ২১,২২)। অর্থাৎ কোরআন লৌহ মাহ্ফুজে সংরক্ষিত। এখন কথা হলো সংরক্ষণকৃত কোরআন আর কাগজে লিখিত কোরআন উভয়ের সন্ধান লাভ করা ব্যতীত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এতটুকুই বলবো আধ্যাত্মিক ভাবে আসল রহস্যের উৎঘাটনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। কিতাব সম্পর্কে আরও জটিল মনে হয়। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) লিখিয়াছেন:- নূরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টি রূপে স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানকে কেতাব বলা হয়। মূল কথা হলো প্রতির্ষ্ঠিত মহামানবকে কেতাব বলা হয়।

জাগতিক ভাবে কিতাব অর্থ গ্রন্থ আর কোরআন অর্থ পাঠ্য করা হয়, দুই মিলে পাঠ্য-গ্রন্থ্। এ বিষয় টুকোই উপস্থাপন করলাম। কারণ আমার মোর্শেদ বলতেন:-"একই ষ্টীলের তৈরী চাকু দিয়ে ডাক্তার বা সার্জন কাটেন মানুষকে বাঁচাবার জন্য আর কসাই কাটেন মাংস বিক্রি করবার জন্য। তাহলে উভয়ের নিয়ত জ্ঞান, প্রজ্ঞা কেমন তা আপনার বিবেকের উপর ছেড়ে দিলাম। আলোচনার বিষয় নামসমূহ:- তাই পৃথকীকরণ নাম সম্পর্কে উপস্থাপন ভাবার্থ লিখে শেষ করা যাবে না। এজন্য বিজ্ঞ পাঠক বাবা-মায়ের

বিবেকের কাছে ক্ষুদ্র পরিসরে একটু উপস্থাপন রাখলাম। মহান স্রষ্টা সবার প্রতি সহায় হউন।

নাম সমূহ:- অর্থসহ

ক্রমিক নং :-	নাম :-		অর্থ :-
(০১)	আল-কোরআন	=	পাঠ সমূহ
(০২)	আল-ফোরকান	=	পৃথক
(০৩)	আল-কিতাব	=	গ্রন্থ
(০৪)	আজ-জিকির	=	স্মরণ
(০৫)	আত-তানজিল	=	অবতীর্ণ
(০৬)	আল-মাসহাফ	=	গ্রন্থ সমূহ
(০৭)	আন-নূর	=	জ্যোতী
(০৮)	আল-হুদা	=	পথনির্দেশক
(০৯)	আল-কওল	=	কথা
(১০)	কালামুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র বাণী
(১১)	মুবারক	=	মহিমান্বিত
(১২)	হিকমাতুন বালিগ	=	পরিপূর্ণ
(১৩)	আল-হাকিম	=	প্রজ্ঞামময়
(১৪)	হাবলুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র রুজ্জু
(১৫)	রুহ	=	রুহ (পরম)
(১৬)	আল-ওয়াহি	=	প্রত্যাদেশ
(১৭)	আল-ইলম	=	পরমজ্ঞান

(১৮)	আল-হাক্ক	=	মহাসত্য
(১৯)	আল-বাসির	=	সুসংবাদ দাতা
(২০)	আন-নাজির	=	সতর্ককারী
(২১)	আল-মাজিদ	=	মর্যাদাবান
(২২)	আদল	=	সুষম
(২৩)	আমরুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র নির্দেশ
(২৪)	মুহাইমিন	=	সংরক্ষক
(২৫)	বুরহান	=	প্রমাণ
(২৬)	মুবিন	=	সুস্পষ্ট
(২৭)	শিফা	=	নিরাময়
(২৮)	মাওয়ায়েজ	=	উপদেশ
(২৯)	আলী	=	সুউচ্চ
(৩০)	রিসালাতুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র বার্তা
(৩১)	হুজ্জাতুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র প্রমাণ
(৩২)	আল-মুসাদ্দিক	=	সত্যায়নকারী
(৩৩)	আল-আজিজ	=	শক্তিময়
(৩৪)	সিরাতুল মুস্তাকিম	=	সঠিক পথ
(৩৫)	ফাইয়ুম	=	সুদৃঢ়
(৩৬)	আল-ফাজল	=	মিমাংসাকারী
(৩৭)	আল-হাদিস	=	বাণী

(৩৮)	আহ্সানুল হাদিস	=	সর্বোত্তম উক্তি
(৩৯)	নাবউল আজিম	=	মহা সংবাদ
(৪০)	মুতাশাবিহা	=	সাদৃশ্যময়
(৪১)	মাছানি	=	পুনরাবৃত্ত
(৪২)	তানজিল	=	অবতীর্ণ
(৪৩)	আরবি	=	আরব্য
(৪৪)	বাসিয়ার	=	প্রজ্ঞা
(৪৫)	বয়ান	=	বিবরণ
(৪৬)	আয়াতুল্লাহ্	=	আল্লাহ্‌র নির্দেশ
(৪৭)	আজব	=	চমৎকার
(৪৮)	তাসকিরা	=	স্মারক
(৪৯)	উরওয়াতুল উসকা	=	(ছয় অবলম্বন)
(৫০)	আসসিদক	=	অতীব সত্য
(৫১)	মুনাদি	=	আহ্বানকারী
(৫২)	আরার বুশরা	=	আনন্দ বার্তা
(৫৩)	বাইয়িনাত	=	প্রমাণ পঞ্জি
(৫৪)	বালাগ	=	বার্তা
(৫৫)	আল-কারিম	=	মর্যাদাবান
(৫৬)	আল-মিজান	=	ন্যায়দন্ড
(৫৭)	নিয়ামাতুল্লাহ্	=	আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

(৫৮)	হুদাল্লাহ্	=	আল্লাহ্‌র নির্দেশ
(৫৯)	কিতাবুল মুবিন	=	সুস্পষ্ট কিতাব
(৬০)	কিতাবুল হাকিম	=	বিজ্ঞানময় কিতাব
(৬১)	কোরআনুল মুবিন	=	উজ্জ্বল কোরআন
(৬২)	কিতাবুর মাসতুর	=	ছত্রলিপি গ্রন্থ
(৬৩)	কিতাবুল আজিজ	=	প্রিয় পুস্তক
(৬৪)	জিকরুল হাকিম	=	কৌশলপূর্ণ
(৬৫)	মাতলু অধিক	=	অধ্যায়ন যোগ্য
(৬৬)	লুদাল্লিন নাস	=	মানবজাতির দিশারী
(৬৭)	জিকরুললিল আলামিন	=	জগত সমূহের জন্য স্বারক
(৬৮)	নুরুল্লাহ্	=	আল্লাহ্‌র আলো
(৬৯)	জিকরুল্লাহ্	=	আল্লাহ্‌র স্মরণ
(৭০)	নুরুল মুবিন	=	সুস্পষ্ট আলো
(৭১)	কালিমাতুল্লাহ্	=	আল্লাহ্‌র বাণী
(৭২)	মুহাইমিন	=	সংরক্ষক

লকব

লকব অর্থ সম্মান সূচক খেতাব, উপনাম, উপাধি, ডাক নাম ইত্যাদি। পরিভাষাগত সংজ্ঞা:- কোন ব্যক্তি নামের সহিত সংযুক্ত বর্ধিত কলেবর থাকলে তা "লকব" হিসাবে বিবেচিত। পূর্বে বা পরে যেমন, মোঃ কামাল বি. এ.। অর্থাৎ এখানে বি. এ. হলো "লকব"। ধর্মীয় দর্শনের উপর মানুষ উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে বিভিন্ন খেতাব বা "লকব" সম্বলিত নাম প্রচলিত। আধ্যাত্মিক দর্শনের আলোকে এরও গুরুত্ব রয়েছে। মানুষ তার গুরুর দেওয়া সাধনা বা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়। আবার জাগতিক ভাবে গুরুগণ তাঁর অনুসারীদের যোগ্য ভেবে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেন। এই সবই "লকব" হিসাবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলবো, আবু হুরায়রা নামের তাৎপর্য হলো আবু অর্থ বাবা এবং হুরায়রা অর্থ বিড়াল, মূল অর্থ দাঁড়ায় বিড়ালের বাবা। উক্ত সাহাবী বিড়ালকে খুবই ভালবাসতেন। এজন্য রসূলপাক (সাঃ) (আঃ) এ নামে ডেকেছিলেন। (কথিত সূত্রঃ উল্লেখ করতে পারলাম না)।

জীলানী. জান শরীফ। জীলানী একটি জায়গার নাম, জান অর্থ জীবন, শরীফ অর্থ পবিত্র। মূল অর্থ দাঁড়ায় "জীলানী পবিত্র জীবন" (জাগতিক)। আরও একটু সহজ ভাবে বলতে গেলে পবিত্র কোরআনুল মাজিদ মুসলিম অধ্যুসিত পরিবারে প্রায় সবার বাড়িতেই আছে। এই মহা মূল্যবান গ্রন্থটি হেফাজত করতে কাপড় দিয়ে আবরণ বানানো হয়, তার নাম জোজদান। একই কাপড় দিয়ে দরজার পর্দা বানানো হলো। তাহলে উভয় কাপড় একই কিন্তু মূল বিষয় হলো কোরআনে আবৃত থাকা কাপড়ের উপরে আমরা চুমু খাই কিন্তু পর্দাতে কেহ চুমু খায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে জাগরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত হলে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো ভাষার মাধুর্যে তাহা উপস্থাপন অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। কারণ ধর্মীয় বিষয় জাগতিক ইরাদা বিপন্ন হলে জগতের বিড়ম্বনার সম্ভবনা থেকে যায়।

গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদান শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) নামটা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো, মূল নাম ছিল "আব্দুল কাদের"। তিঁনি তাঁর কর্ম এবং সাধনা দ্বারা এখানে

উল্লেখিত পদ বা পদ-মর্যদা ছাড়াও অনেক খেতাব বা লকবে ভূষিত। মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে উল্লেখিত মহামানবের দর্শন, কথোপকথন এবং দয়া পরবশ হয়ে কিছু দান করলে উক্ত বিষয় প্রচারের এজাজাত বা অনুমতি থাকলে তিঁনি তা “লকব” হিসাবে প্রকাশ করতে পারেন, যদি দয়াল গুরুর নিষেধ না থাকে। আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতা হলো যুক্তির বাহিরে যে যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে, যাহা যুক্তিতে জানা যায় না। সেটা-ও আধ্যাত্মিক ভাবে জানা যায়। দুনিয়ার জমিনে যত তরিকতের নাম রয়েছে, তাহা কোন না কোন শায়েখ থেকেই শুরু এবং সেখানেই স্থানান্তরিত প্রক্রিয়ায় উহা সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ মূল থেকে স্থানান্তরিত। অনুরূপ ভাবে “জান শরীফ” একটি “লকব”। তাই “জীলানী. জান শরীফ” লকবটি উল্লেখিত বিষয়ের সাদৃশ্য স্বরূপ।

আমার আপন পীর ও মোর্শেদ কেবলায়ে কাবা তাঁর নাম হলো:- “চেরাগে জান শরীফ ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী (আঃ)” (আরও অনেক লকব আছে)। বাবার পবিত্র জবানে শুনেছি, দাদা জান হুজুর কেবলা চেরাগে জান শরীফ “লকবটি” দিয়েছিল। চেরাগ অর্থ প্রদীপ বা আলো বা নূরময়। এটাকে আরও উচ্চ মার্গের ভাষায় প্রকাশ করলে প্রদীপ্ত হয়। জান শরীফ অর্থ পবিত্র জীবন, প্রদীপ্ত পবিত্র জীবন বা নূরময় আলোকিত পবিত্র সত্ত্বা। যে আলো থেকে বহু আলোর সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর প্রক্রিয়া। চেরাগে জান শরীফ “লকবটি” একটি প্রকাশিত এজাজাত প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর, তাই মহান মোর্শেদ এই লকব জীবদ্দশায় যাকে দান করবেন তিঁনি এই লকবের উত্তরসুরী।

উচ্চ পরিষদ সম্পর্কে একটু বলতে চাই:- মহান মোর্শেদের সাথে সুরেশ্বর দরবারে গমন করি, দেখলাম জামানার মোজাদ্দেদ শাহ সুফি আহাম্মদ উল্লাহ ওরফে জান শরীফ (আঃ) ওরফে জানু বাবার নাম থেকেই সুরেশ্বরী নামের বিস্তার। কিন্তু সুরেশ্বর একটি ইউনিয়নের নাম। তাহলে এখানে এই মহান মহামানবের আগমন আলোকিত হওয়ায় উক্ত স্থানের নাম “লকব” হিসাবে পরিচয় ঘটেছে। মহান সুরেশ্বরী বাবার রওজার পাশে একটি ঘর বন্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। এ বিষয়ে কৌতুহল জাগল এবং বিষয়টি জানবার পরে জানতে পারলাম, উক্ত ঘরে বেশ কয়েকটি আসন সংরক্ষিত। হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) সহ ছয়টি আসন (বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত)। বর্তমানে উক্ত ঘরটা নামাজের জন্য উন্মুক্ত দেখতে পাই।

হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- “আমি যার মওলা, আলীও (আঃ) তার মওলা”। এই মওলা লকবটি অন্য কোন সাহাবীর সঙ্গে যুক্ত নয়, শুধুমাত্র মওলা আলী (আঃ)-এর

সঙ্গেই যুক্ত। মওলা আলীর (আঃ) জীবদ্দশায় উক্ত লকবটি কাউকে দান না করিলে ধীরে ধীরে তা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যম হিসাবে স্থানান্তরিত হতে চলেছে। উপযুক্ততার বিষয়টি বড় আধ্যাত্মিক দর্শনে। পরিশেষে ওলি, পীর, ফকির, গাউস, কুতব, আবদাল, আরিফ সহ সকল ওলিদের পাক পবিত্র কদম মুবারকে ভক্তি রইল।

সিরাজাম মুনিরা

সিরাজাম মুনিরা অর্থ উজ্জ্বল, জ্বলজ্বলে, দীপ্ত, আলোর প্রদীপ, দীপ্তিমান আলো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর। সিরাজ অর্থ চেরাগ, প্রদীপ। মুনিরা অর্থ উজ্জ্বল, আলোকজ্জ্বল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ দীপ্ত নূরময় অবস্থা হলো সিরাজাম মুনিরা।

আল্লাহ্‌পাক সূরা আল-আহজাবের ৪৫ ও ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন:- "হে নবী- আমি (আল্লাহ্‌) আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী রূপে"। (৪৬) "আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসাবে। কালামপাকে (সূরা নূহ আয়াত নাম্বার ১৬) বলা হয়েছে:- এবং চাঁদকে বানাইয়াছেন উহার মধ্য নূর এবং সূর্যকে বানাইয়াছেন প্রদীপ রূপে। অপর একটি সূরায় (নাবা, আয়াত : ১৩) আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- এবং আমরা বানাইয়াছি উজ্জ্বল প্রদীপ।

অর্থ বিন্যাস যেমনই হোক না কেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে (সাঃ) (আঃ) এই খেতাবে ভূষিত করেছেন "সিরাজাম মুনিরা"। এটাই মূল কথা। দুনিয়াতে আলোর প্রধান উৎস হলো সূর্য। এই সূর্যের আলোতে আকাশ মন্ডল এবং ভূ-মন্ডল আলোকিত হয়। প্রাণী জগত থেকে শুরু করে সকল জীব-বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। এই আলোর মূল কেন্দ্র হলো সূর্য বা সকল প্রাণের উৎস চেতনা। সূর্যের আলো ছাড়া কোন কিছুরই প্রকাশ পেত না। এই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে সকল জীব-বৈচিত্র হয়েছে। যে কারণে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন চন্দ্র-সূর্যের উদাহরণ হিসাবে আয়াতে কারিমাগুলোতে উল্লেখ করেছেন। তাহলে মূল বিষয় সম্পর্কে শুধু সিরাজাম, "সিরাজাম মুনিরা" বলা রয়েছে। তাই বিষয়টা উপস্থাপনের ইঙ্গিত স্বরূপ কিছু কথা উপস্থাপন করতে গিয়ে কেন জানি বার বার বন্ধন তৈরী হচ্ছে। কারণ হলো এক শ্রেণীর জ্ঞানীগণ এখনও (বর্তমান সময়) পর্যন্ত হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) নূর এটা মানতে পারে নি, তারা রসূলকে (সাঃ) (আঃ) বলে

থাকে তিঁনি আমাদের মত মানুষ (নাউজুবিল্লাহ্)। যেখানে তাফসিরে জালালাইন থেকে শুরু করে বহু মাশায়েখগণের তাফসিরে হুজুরপাকের (সাঃ) (আঃ) "নূর"-এ বিষয়টা স্পষ্ট উঠে এসেছে। এছাড়াও বুখারী শরীফে বিজলীর আলোর ন্যায় এবং মুসলিম শরীফে নূর বা আলোকময় উপস্থাপন করেছে, তবুও তারা মানতে রাজি না। এজন্য আমার মোর্শেদ বর হক বলতেন :- বাবা যে মানবে না তাকে হাজারো দলিল দিলেও মানবে না, কারণ এটা তার তকদির, এজন্য চরম পর্যায়ে কোন গালি থাকে না।

দীপ্তমান প্রদীপ হলো যে আলোতে নিজেই প্রজ্জ্বলন হয়ে অন্যতে আলো বিচ্ছুরণ ঘটায়। যে নিজেই আলো বহন করে। জাগতিক ভাবে বিতরণ যোগ্য ব্যবস্থা বুঝালেও আধ্যাত্মিক হলো আলোতে আলোকিত করে এবং এই আলোর এমনি ধারা যার কোন কমতি বা ঘাটতি হয় না। অর্থাৎ অন্যকে আলো দান করলে আলো শূন্য হবার মত নয়। কোটি কোটি সূর্য-চন্দ্র হইতে অধিক আলোময় অবস্থা। বিজ্ঞানীরা সূর্য সম্পর্কে বলেছেন ১০০ বছর পরে সূর্যের আলোক শক্তি বহুলাংশে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই আলোক ধারা হারাবার নয়। হযরত ওয়ায়েছ করনীকে (রহঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেমন আছেন ? জবাবে বলেছিলেন কেমন আবার থাকবে সে লোক, যে প্রাতে উঠে জানতে পারে না যে মৃত্যু তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবকাশ দিবে কি না! এদিকে দীর্ঘ পথ পড়ে আছে সামনে, পথের সম্বল কিছুই নেই, কাজেই কেমন আছি তার কি বলি। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে বলেছেনঃ- "উচ্চ আসন তালাস করেছিলাম, বিনয় দ্বারা তা লাভ করেছি। সরদারী তাঁলাশ করেছিলাম, সত্যের মধ্যে তা পেয়েছি। গৌরব তাঁলাশ করেছিলাম, দারিদ্রতার মধ্যে তা পেয়েছি। শরীফি তাঁলাশ করেছিলাম, খোদা ভীতির মধ্যে তা পেয়েছি। মহত্ব তাঁলাশ করেছিলাম, তুষ্টিতে তা পেয়েছি। নির্ভরতা তাঁলাশ করেছিলাম, একমাত্র মাবুদের নির্ভরশীলতায় তা পেয়েছি"।

তাই আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (সাঃ) (আঃ) ১৫ বছর হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যা প্রাপ্তি নবুয়্যত সহ কোরআনুল মাজিদের বর্ণনায় বিভিন্ন "লকব" বা খেতাবী উপাধি ঘোষণা করেছে। তেমনি ঘোষিত লকবের একটি হলো "সিরাজাম মুনিরা"। যার পূর্বের ধারণামুলক খেতাব গুলি হলো সাক্ষী, সতর্ককারী, সুসংবাদ-দাতা রূপে প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) খোদাভীতি, আল্লাহ্র একত্ত্ববাদ, পথ ভ্রষ্ঠতার অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর যে দিশা বাস্তবায়ন করেছিলেন বা সমুজ্জ্বল সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তাঁর যে নূরময় প্রজ্জ্বলন সেই "সিরাজাম মুনিরা" থেকেই এই আলোকময়

উৎস। আধ্যাত্মিক ভাবে বললে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) হলো সকল আলোর মূল উৎস হিসাবে প্রকাশিত। এজন্য ওলিদের ভাষায় বর্ণনা হয়েছে যে:- *"দোনে হিকা শেকেল এক হায়, কিছকো খোদা কাহু" অর্থ দুইজনকে দেখতে একই রকম, কাকে খোদা বলব!*

স্রষ্টার সহিত মিলিত রূপের পূর্ণ অবয়বের প্রকাশ হলো মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)। যে কারণে আকাশ, তারকারাজী, চন্দ্র-সূর্য সকল কিছুই তাঁরই আলোতে আলোকিত। তিঁনি ভিন্ন কোন আলোরই অস্তিত্ব নেই, সেটার প্রকাশিত ভাষা হলো "সিরাজাম মুনিরা"। যেমন, হুজুরপাকের (সাঃ) (আঃ) কোন ছায়া জমিনে পরে নি। সূর্য-চন্দ্র, তারকারাজী, বিজলীর চমক কিছুই তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি বলেই তাঁর ছায়া মুবারক দেখা যায় নি। আবার হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে কেঁটে দ্বিখন্ডিত করলেন অর্থাৎ তাঁর অনুগত বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল, অনুগত না হলে কর্তৃত্ব সম্ভব হত না। তাই মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন পূর্বক এমন সান্নিধ্যে বা নিকটবর্তী হওয়াতে আলোচিত খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তরিকতের মাশায়েখগণ বলেন, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) যখন আলম-ই শাহাদতে পদার্পন করলেন তখন ঐ আলোর উদ্ভাসন সকল আলোকে স্তমিত করে দিলেন।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো এই আলোক প্রদীপ বা চেরাগ জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এর কোন পতনের সম্ভবনা নাই, এটাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে জাহেরী, বাতেনী, হাকিকি, মারেফতি এবং আরও উর্ধ্ব জগতের যে সকল স্তর রয়েছে, সকল স্তরের উর্ধ্বে অর্থাৎ মূল সাদৃশ্য সম প্রকাশিত ভাবধারায় "সিরাজাম মুনিরা" হিসাবে বা খেতাবে প্রকাশিত হয়েছে। যা দ্বারা সৃষ্টি কূলের সবাইকে উদ্ধার বা দান করিলেও এই ভান্ডারের কোন কমতি হবে না। তাই হলো "সিরাজাম মুনিরা"। তবে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো উজ্জ্বল, দীপ্ত, আলোর প্রদীপ, চেরাগ, নূর, দীপ্তমান আলো যত বিশেষণই উল্লেখ করা হোক না কেন, এসবই রূপক ভাষাগত উপস্থাপন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি কেন্দ্রিক আমল নীতির মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে স্বরূপ সম্পর্কিত বিষয় আপন দেহ ভূবনে জাগরিত করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হলো প্রকৃত বিষয় উদ্ঘাটনের প্রকৃত পথ। মহান রাব্বুল আলামিন স্বদয় হলে এবং উপযুক্ত যোগ্যতায় নিজেকে সমর্পিত উপস্থাপন করতে পারলেই কেবল উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব। ইশক আর প্রেমের অবারিত ধারার বর্ষণ নিজের মধ্যে উদ্ভাসন করে মানব-মানবীর কল্যাণ সাধিত করে, স্রষ্টার মিলনে একাকার হওয়া। ইহা তো ভাষার

শৈলীতে বোঝা দায়। এজন্য প্রকৃত আল্লাহ্‌মুখী প্রেমই পারে সকল পর্দা ভেদ করে মাবুদের মিলন উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাসনকৃত ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রকৃত চাওয়াকে পূর্ণ করতে। হযরত শাইখ ইসমাইল হাক্কী (রহঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে সিরাজাম মুনিরা রসূলকে (সাঃ) (আঃ) তুলনার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

(১) হাবিবের স্মরণাপন্ন হওয়াতে মানুষ তার মূর্খতা ও গোমড়াহীর অন্ধকার হতে পরিত্রান লাভ করত জ্ঞান ও সৎ পথের সন্ধান লাভ করবে। যেমন চেরাগের আলোতে মানুষ রাত্রির অন্ধকারে পথ চলে আপন গন্তব্যে পৌঁছে যায়। (২) রাত্রির অন্ধকারে কোন বস্তু হারিয়ে গেলে চেরাগের আলো দ্বারা তা খুঁজে বের করা যায়। তদ্রুপ সৃষ্টির যে সকল হাকিকত মানুষের অজানা ও তাদের জ্ঞান হতে গোপন ছিল, নূরে মোহাম্মদীর (সাঃ) (আঃ) প্রভাবে অন্তরের চোখ দ্বারা মানুষ ঐ গুলি উপলব্ধি করতে পারবে। (৩) পার্থিব চেরাগ দ্বারা গৃহবাসী নিরাপত্তা ও আরাম লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে চোর, ডাকাত, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি হতে নিজেদের হিফাজত করে থাকে। পক্ষান্তরে হাবিবের (সাঃ) (আঃ) নূরী প্রভাবে মানব জাতি আখিরাতের ভীষণ বিপদ হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে। জগতে অন্তর চক্ষু দ্বারা ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হবে। (৪) একটি চেরাগ হতে জগতের লোকেরা হাজার হাজার চেরাগ প্রজ্জ্বলন করলেও ঐ মূল চেরাগটির আলো কিঞ্চিৎ পরিমান হ্রাস পেতে দেখা যায় না। তদ্রুপ আল্লাহ্‌তাআলার হাবিবের (সাঃ) (আঃ) নূর দ্বারা নিখিল বিশ্বের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন অথচ হাবিরের (সাঃ) (আঃ) নূর একটুওহ্রাস পায় নি। তাই প্রকৃত ভান্ডার যাকে প্রজ্জ্বলন করে তাঁর কি আর কোন কিছুতে কমতি থাকে!

এমন ধারাবাহিকতার আল্লাহ্‌র ওলির বা ওলিদের শান কিছু কিছু উল্লেখ দেখতে পাই। যেমন বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলেছেন:- "লাইসালা-ফি-জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্‌তাআলা" অর্থ আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কিছুই নাই। বাবা মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন:- "আনাল হক" অর্থ আমিই সত্য বা আল্লাহ্‌। বাবা বায়েজিদ বোস্তামীর পীর হলেন ইমামে আজম বাবা জাফর সাদিক। ইমাম আবু হানিফার পীর হলেন বাবা জাফর সাদিক। সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় অনেকে পীর মানেন না। সত্যিই বিরল মানুষের ভাবলেশ একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ এসে গেল যাহা পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ রইল। হযরত শাহ সুফি মওলানা আঃ আজিজ দেহলভী (আঃ) "ছায়েফুল মোকাল্লেদীন" কিতাবে উল্লেখ। "শরহে ফিকহে আকবার" কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা

বলেছেন যে:- আমি ৯৯ বার আল্লাহ্‌কে দেখেছি। উক্ত বিষয় সমূহ উল্লেখ রাখলাম যারা মানেনেই না যে আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। তাঁর সৃষ্টি জগত ও রহস্যপূর্ণ ভান্ড সম্পর্কে বলা পাগলের প্রলাপ বৈকি আর কিছু নয়।

প্রথম বইটি প্রকাশ হবার পর আমার স্বীয় মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন, বাবা কিছু লিখতে গেলে পর্যাপ্ত দলিল সহ উপস্থাপন করিও। সবার কাছে উপস্থাপনকৃত বিষয়টা তোমার মত করে বললে মানুষ শিখতে চাইবে না। বার বার মনে পড়ে এমন বিষয় উপস্থাপিত করি যা উপমা ব্যতীত কিছুই তুলে ধরা সম্ভব হয় না। পরিশেষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানীদের কাছে আকুল আবেদন, দর্শন ভিত্তিক ধর্মীয় উপস্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের সকল ধোঁয়া-কুয়াশাকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রকৃত একত্ত্ববাদের ধারাতে মানব জাতিকে হিংসা, ঘৃণা দলাদলির ধ্বংসযজ্ঞ বিধি-বিধান হতে উৎরাইতে সহায়ক ভূমিকা পালনে ব্রতী হউন। তদ্রুপ ধর্মীয় মূল আলোচনা হলো “সিরাজাম মুনিরা” উল্লেখিত লকব বা ধর্মীয় দর্শনের আলোকে, মানুষকে ধর্মীয় ধারার শিক্ষা ও মুক্তি যে শিক্ষা রসূলে পাক (সাঃ) (আঃ) দেখালেন তাঁর ধারাবাহিকতা অনুসারে মানুষকে মোরাকাবা-মোশাহেদাতে আগ্রহীশীল হিসাবে গড়ে তুলতে ধর্মীয় প্রতিনিধিগণের অনুরোধ রাখলাম। স্বীয় আধ্যাত্মবাদের অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে জাগ্রত করে মানবের মুক্তির মূল ধারা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে মহান স্রষ্টার অনুমতিক্রমে প্রকৃত ধর্মের প্রতিনিধিত্ব স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান হলেই কেবল ধর্ম নিয়ে এই বিড়ম্বনার অবসান হবে বলে মনে করি।

তাই হুজুর পাকের (সাঃ) (আঃ) আধ্যাত্মিক প্রকাশিত একটি “লকব” হলো এই “সিরাজাম মুনিরা”। ইহা দ্বারা মানবিক বিকশিত গুণ ও আদর্শ দেখে মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেকে তৈরী করতে তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান নিয়েছিল। উক্ত কার্যকরী ক্ষমতার দ্বারা মানুষকে উদ্ধার করে গোটা দুনিয়ার বুকে সকল ধর্ম-বর্ণের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন বা আজও বিশ্বের সকল জ্ঞানীর নিকট চির অম্লান। মহান রাব্বুল আলামিন প্রকৃত বিষয় বুঝবার তৌফিক দান করুন। সবার মঙ্গল কামনায় এ বিষয়ে এতটুকুই সংক্ষেপে রাখলাম।

মেরাজ

(৫১ বছর : ২৭ রজব)

মেরাজ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ উর্ধ্বগমন বা উপরে উঠা, ভ্রমন করা, আরোহণ করা। আরাজা হতে মেরাজ (আরবি) শব্দ এসেছে।

ইতিহাস অনুযায়ী নবুয়্যত প্রকাশের একাদশ বৎসরে (৬২০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬শে রজব তারিখের দিবাগত রাত্রে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) প্রথম কাবা শরীফ থেকে জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা গমন করেন। সেখানে তিঁনি জামাতে ইমামতি করেন এবং উক্ত স্থান হতে বোরাক নামক বিশেষ বাহনযোগে আসীন হয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করেন। উর্ধ্বাকাশে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেস্তা তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদের সূরা বনী ইসরাইলের ১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে :- "পবিত্র মহান সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, তিঁনিই সর্বশ্রোতা সর্ব দ্রষ্টা"। সাইয়্যেদুল আম্বিয়া নবী-রসূলদের সর্দার, আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামপাকে এরশাদ করেন:- "হে রসূল আমি আপনাকে মানব জাতির জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি" (সূরা সাবা, আয়াত : ২২)। মহানবীর (সাঃ) (আঃ) নবুয়্যতকে শক্তিশালী করবার জন্য অন্যান্য প্রতিনিধি বা নবী-রসূলগণের মত তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল অগণিত মোজেজা, তার মধ্যে মেরাজ অন্যতম।

শবে মেরাজ

শব ফারসি শব্দ যা অর্থ রাত বা রজনী। মেরাজ আরবি শব্দ এর অর্থ সাক্ষাত। কিন্তু বেশির ভাগ তাফসীর বা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে উর্ধ্ব গমন। যেহেতু সাক্ষাত এবং উর্ধ্বগমন দুইয়ের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে যারা বিচরণ করেন তাদের সবাই সাক্ষাত হিসাবে প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে রসূলেপাক (সাঃ) (আঃ) মেরাজ হতে ফেরার পর যখন মেরাজের বর্ণনা দিলেন, তখন সাহাবাগণ বলিল ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাহলে আমাদের কি সাক্ষাত হবে না! তখন হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলেছিলেন:- মমিনের জন্য দিনে ৫ (পাঁচ) বার সাক্ষাত" (আস্‌সালাতু মেরাজুল মুমিনিন)।

নিম্নে কোরআনুল মাজিদ থেকে আরও কিছু আয়াতে কারিমার উল্লেখ রইল পাঠকদের অনুধাবনের জন্য।

সূরা নজম, আয়াত : ১ থেকে ১৮।

১. এবং তারকা সমূহ (ওয়ান নাজমে) যখন নিজ প্রবৃত্তির অধীন হয় (ইজা হাওয়া)।

২. তোমাদের সাথী (সাহেবুকুম) বিপথগামী নহেন (মাদাল্‌লা) এবং বিভ্রান্তও নহে (ওমা গাওয়া)।

৩. এবং তিঁনি কথা বলেন না (ওয়ামা ইয়ানতেকু) নিজ প্রবৃত্তি হইতে (অনিল হাওয়া)।

৪. যদি উহা (ইনহুয়া) হুকুম করে (ওয়াহয়ুই) অহি ছাড়া নয় (ইল্‌লা ইউহা)।

৫. তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় (আল্লামাহু) অনেক শক্তিশালী (কুয়া) শক্তির মাধ্যমে (শদ্দিদ)।

৬. তিঁনি নিজেকে দেখিয়াছেন (হুমেররাতিন) সুতরাং তিঁনি স্থীর হইয়াছেন (ফায়তাওয়া)।

৭. এবং তিঁনি ছিলেন সর্বোচ্চ (ওয়া হুয়া আলা) আকাশ দিগন্তে (বিল উফুকে)।

৮. তার পর (তিঁনি) নিকটে আসিলেন (সুম্‌মাদানা) সুতরাং অতি নিকটে (ফাতাদাল্‌লা)।

৯. সুতরাং (তিঁনি) ছিলেন (ফাকানা) দুই ধনুকের ব্যবধানে (কাবা কাওসাইনে) অথবা আরও নিকটে (আও আদনা)।

১০) সুতরাং অহি করিলেন (ফা আওহা) তাঁহার বান্দার দিকে (ইলা আবদেহী) যাহা অহি করিবার (মা আওহা)।

১১) তাঁহার অন্তঃকরণ (ফুয়াদ) অস্বীকার করে নাই (মা কাজাবা) যাহা তিঁনি দেখিয়াছেন (মা রাআ)।

১২) তোমরা কি তাঁহাকে অপবাদ দিবে (সাফাতু মারুনাহু) যাহা উপরে তিঁনি দেখিয়াছেন (আলা মা ইয়ারা)।

১৩) এবং অবশ্যই তিঁনি দেখিয়াছেন (ওয়ালাকদ রাআহু) নাজেল (অবতীর্ণ) অবস্থায় (নাজলাতান) দ্বিতীয় বার (উখরা)।

১৪) নিষিদ্ধ (মুনতাহা) কূল বৃক্ষের (বরই) নিকটে (এনদা সেদরাতে)।

১৫) উহা ছিল জান্নাতুল মাওয়ার নিকটে।

১৬) যখন কূল বৃক্ষটি অন্ধকারেই অবস্থিত ছিল (এজ ইয়াগশাস সিদরাতা) যে ভাবে অন্ধকারে আচ্ছদিত হবার (মা ইয়াগশা)।

১৭) (তাঁহার) দৃষ্টিশক্তি ঢাকিয়া ছিল না (মাজাগাল বাসারু) এবং তিঁনি সীমা অতিক্রমও করেন নাই (ওয়া মা তাগা)।

১৮) অবশ্যই (তিঁনি) দেখিয়াছেন (লাকাদ রাআ) তাঁহার রবের (নিকট) হইতে বড় আয়াত (নিদর্শন) (মিন আয়াতে রাব্বেহির কুবরা)।

৫ম (পঞ্চম) আয়াতে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক শক্তিশালী শক্তির মাধ্যমে। তাহলে সেই শক্তি কি! চিন্তাশীলদের জন্য ভাববার বিষয়। অনেকে এই আয়াতে ফেরেস্তা উল্লেখ করেন এবং সরাসরি জিব্রাঈল (আঃ) এর নাম সর্বস্ব উল্লেখ করেন।

৯ম (নবম) আয়াতে দুই ধনুকের ব্যবধান এর চাইতেও নিকটে। একটি ধনুক সমান অর্ধ বৃত্ত, আর দুই ধনুক সমান বৃত্ত। আওয়াদনা অন্যত্র বলা আছে বৃত্ত না হইলে বৃত্ত বানিয়ে নাও। আলোচ্য আয়াতে বৃত্ত যাই হোক তা লাগানো বা কম্প্যাক্ট বোঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করি। জাগতিক ভাবে উল্লেখ করলে খুবই নিকটে মেরাজের সাক্ষাতের ব্যাপারে বহু বছর থেকেই প্রচলিত আছে, আল্লাহ্ সত্তর হাজার পর্দার আড়াল থেকে রসূল (সাঃ) (আঃ) সঙ্গে দেখা করেছেন কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর কালামপাকে উল্লেখ, কোন পর্দা বা আবরণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ আমাদের সাথেও সাক্ষাত দিবেন, তাঁর (আল্লাহ্) সাক্ষাত থেকে বিমুখ থাকলে কাফের বা পথভ্রষ্ট হয়। কাজেই সাক্ষাত বিষয়ে শিক্ষা লাভ জরুরী।

অনেক ফকিহগণ মেরাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশ ইসরা যেমন সশরীরে, সজ্ঞানে, জাগ্রত অবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ) বিশেষ বাহন বোরাকের মাধ্যমে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হয়ে আসমান থেকে একে একে সপ্তম স্তর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছায়। সেখান থেকে একাকী রফ্রফ্ বাহন যোগে আরশে আজিমে পৌঁছায় এবং মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ হয়। জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করে ফিরে আসেন। বিশেষত রাত্রিকালীন বায়তুল্লাহ্ হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলে এবং দ্বিতীয় অংশকে মেরাজ বলে।

মেরাজ সফরে যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ)।

দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)।

তৃতীয় আসমানে হযরত ইফ্সুফ (আঃ)।

চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আঃ)।

পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ)।

ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আঃ)।

সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

সালাম কালাম ও কুশলাদী বিনিময় শেষে তিঁনি বায়তুল মামুরে গেলেন, সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা আসেন এবং প্রস্থান করেন, দ্বিতীয় বার আসার সুযোগ হয় না। অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহার কাছে গেলেন এবং সেখানে চারটি নদী দেখলেন, দুইটি প্রকাশ্য এবং দুইটি অপ্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য নদী দুইটি জান্নাতের এবং প্রকাশ্য নদী দুইটি নীল ও ফোরাত। তারপর বায়তুল মামুরে পৌঁছালে এক পেয়ালা শারাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু পেশ করা হলে তিঁনি (রসূল সাঃ) দুধ পান করলেন। এটাই স্বভাব সুলভ ইসলাম। (বুখারী শরীফ ৩৬৭৪ খন্ড, ১ম পৃষ্ঠা, ৫৪৮ থেকে ৫৫০)।

এছাড়াও রয়েছে বায়তুল মোকাদ্দাসে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করার পর সিঁড়ী আনা হয়। যাহাতে নিচ থেকে উপরে যাবার জন্য ধাপ তৈরী করা ছিল। তিঁনি সিঁড়ীর সাহায্যে প্রথম আকাশে অতঃপর অবশিষ্ট আকাশগুলিতে গমন করেন।

প্রতিটি আকাশে ফেরেস্তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। প্রত্যেক আকাশে পয়গাম্বরগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। আসমান ৭ম স্তর বা আকাশ শেষে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শুনতে পান। সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি বিভিন্ন রঙের অসম্ভব ছোটাছুটি করছে, ফেরেস্তারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছে। রসূলকে (সাঃ) (আঃ) সেখানে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তার স্বরূপ দেখান "তার ছয়শত পাখা এবং সেখানে তিঁনি একটি দিগন্ত বেষ্টিত সবুজ রফ্‌রফ্‌ দেখতে পান, এটাকে পালকির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এত কিছুর বর্ণনা কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো গমনের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন রসূল (সাঃ) (আঃ) এর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্ন ফেকরার অনুসারীগণ বিভিন্ন দিবসে পালন করে থাকে। তদ্রুপ হযরত মুসা ইবেন ওকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হিজরতের ছয় মাস আগে সংঘটিত হয়। ইমাম নববী ও কুরতুরির মতে, নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মেরাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন আরবের সকল গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল"। ইমাম হরবি বলেন, রবিউস সানি মাসের ২৭ তারিখ রাতে হিযরতের এক বছর আগে ঘটেছিল। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন, নবুয়ত প্রাপ্তির ১৮ মাস পর সংঘটিত হয়েছে। বেশির ভাগ মতে নবুয়্যতের ১০ম বর্ষের রজব মাসের ২৭ তারিখে মেরাজ সংঘটিত হয় ইত্যাদি ভাবে উল্লেখ। প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা ভাবুন আপনার বিবেকের চিন্তা-চেতনায় যেমনটা কার্যকারিতা পাবে।

জাগতিক আলোচনা আরও কিছু বিষয় তুলে ধরা জরুরী :-

মেরাজ রজনীতে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব একান্ত সাক্ষাতে ১৪ বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে।

১) আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও এবাদত না করা।

২) পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

৩) নিকট স্বজনদের অধিকার নিশ্চিত করা।

৪) মিসকিন ও পথ সন্তানদের অধিকার দেওয়া।

৫) অপচয় না করা।

৬) কৃপণতা না করা।

৭) সন্তান হত্যা না করা।

৮) ব্যভিচার না করা।

৯) মানব হত্যা না করা।

১০) এতিমের হক (সম্পদ) নষ্ট না করা।

১১) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।

১২) মাপে কম না দেওয়া।

১৩) পৃথিবীতে গর্ব ভরে না চলা।

১৪) যে বিষয়ে জ্ঞান নাই তা থেকে অবস্থান সরানো।

এই সকল মন্দ রবের নিকট অপছন্দনীয়। এছাড়াও জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির বিবরণ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে এবং মাশায়েখদের কিতাবে সুস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক বর্ণনার মূল ধারাবাহিকতা হলো "মেরাজ"। ভাবগত অর্থ যেটাই হোক না কেন এর মূল কিন্তু সাক্ষর রেখেছেন:- হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) আম্মাজান উম্মে হানীর ঘরে শায়িত ছিলেন, বিছানা গরম, ওজুর পানি গড়াইতেছিল। আরও উল্লেখ হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) কে আম্মাজান উম্মে হানী এই মেরাজের বর্ণনা দিতে অসম্মতি করেছেন ইত্যাদি। এ সবকিছুর আলোকে "মেরাজ" ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) মেরাজের বর্ণনা দিলেন এবং সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করলেন হযরত আবু বকর। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) উক্ত সাহাবাকে "সিদ্দিক" উপাধিতে (লকবে) ভূষিত করলেন। তারপর থেকে নাম "হযরত আবু বকর সিদ্দিক"। উনি হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন :- ইয়া রসূলাল্লাহ্- আল্লাহ্ দেখতে কেমন! নবী করিম (সাঃ) (আঃ) জবাব দিলেন তোমার মত। অতঃপর উসমান (রাঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্ দেখতে কেমন! নবীজী জবাব দিলেন তোমার মত। অতঃপর ওমর (রাঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন এবং একই কথা নবীজী জবাব দিলেন "তোমার মত"। তাহলে তিনজন সাহাবার প্রশ্নের উত্তর একই।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা, এ বিষয়ে বুঝতে চাইলে আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন ব্যতীত বোঝা দায়। এজন্য অনেকে এ সকল আলোচনা থেকে দূরে রাখে। এরও পূর্বে জিব্রাঈল

(আঃ) এর জানতে চাওয়া একই প্রশ্ন সে বিষয়টা হয়ত উল্লেখ নাই করি। দৃঢ় ও দীপ্ততার সহিত এতদ বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, সেখানকার ধারাবাহিক প্রণালী অনুযায়ী কালামপাকে আল্লাহ্পাক বর্ণনা করেছেন:- "আস্সালাতু মিরাজুল মুমিনিন" অর্থাৎ নামাজ (সালাত) মমিনের মেরাজ। ইহা সকল মানব-মানবীর জন্য। জ্ঞান হবার পর থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম ধর্মের ক্রিয়াশীল আমলের ধারাতে, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে মেরাজ ভাগ্যে হলো না। আবার ধর্মের এত শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিক্ষকগণ মানুষকে মমিনে উপনীত করে কালামপাকের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর (মমিনের) নিরীক্ষা অন্তে শিক্ষার সমাপন ঘটবে এমন স্থান বা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া বিরল। কারণ জ্ঞান গবেষণা দর্শন ভিত্তিক না হলে যা হয়। আল্লাহ্পাক তাঁর কালামপাকে আমাদের দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থার কথা বার বার উল্লেখ করলেও আমরা সে দিকে মনোনিবেশ করতে চাই না। জ্ঞান বিকাশের ধারা অনুযায়ী বিদ্যার কচকচানিতে নিজেকে বড় দেখানোর প্রচেষ্টায় আহামরি ভাব খানাতে (আমার মত) বেশি ব্যস্ত। ধর্মের জঞ্জাল অপসারণে এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরী বলে মনে করি।

সাধকদের ভাষ্য হলো মেরাজ ভাবের ভূবন। এ প্রসঙ্গে গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) একই সঙ্গে কয়েকজন অনুসারীর বাড়িতে ইফতার করলেন সশরীরে হাজির হয়ে। তাহলে ভাবের ভূবনে বিচরণ আত্মিক ও দেহ সহ উভয় প্রক্রিয়াতে এটা সম্ভব হতে পারে। কারণ নিজ আমল নীতির কার্য প্রণালীর উপর তা নির্ভরশীল। আত্মিক সাধনার বহু দৃষ্টান্ত দুনিয়ার বুকে স্বাক্ষর রেখেছে। যোগ-সাধনার বলে মানুষ দেহ সহ উপরে আরোহণ করবার ভিডিও চিত্রগুলি বর্তমান টেলিভিশন চ্যানেল বা ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের দোঁড় গোড়ায় পৌঁছেছে। তাই এ বিষয়ে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। বাউল সাধক লালন ফকির তাঁর গানের ভাষায় বলেছেন :-

"মেরাজ সে ভাবেরই ভূবন
গুপ্ত আলাপ হয়রে দু'জন
কে পুরুষ আকার কি প্রকৃতি তাঁর
শাস্ত্রে প্রমাণ কি রেখেছে ! "।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি তাঁর ভিতর থেকে কিভাবে ধর্মের এ সকল বিষয় উপস্থাপন করেন, বিষয়গুলো ভাববার জন্য উপস্থাপন রাখলাম। সাধনার দ্বারা মানুষ লব্ধ জ্ঞান হাসিলের মাধ্যমে জানতে পারে, দেখতে পারে, বলতে পারে, নিজেকে পরিভ্রমন করতে সক্ষম হয়। এগুলো তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে হাজা হাবীবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ) বলেছেন :- "একজন গন্ড মূর্খও যদি ফানা ফিল্লাহ্‌র স্তর অতিক্রম করে তাহলে সে দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানীর চাইতে বেশী জানে (জ্ঞানী)"। এখন ফানা ফিল্লাহ সম্পর্কে যার জানা নাই এমন জ্ঞানী যিনি আপন স্বকীয়তায় স্বীকার করে নেবে এমন ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুরূহ, উল্টা ভিন্ন ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। ভিত্তিহীন নির্ভরযোগ্য কোন দালিলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কিছু কথা আমরা লোক সমাজে প্রচলিত ভাবে শুনে থাকি, মেরাজ সম্পর্কিত এমন সময়ে ফেসবুকে দেখি মেরাজের সময় ১১ সেকেন্ড উল্লেখ।

এছাড়াও নবী (সাঃ) (আঃ) জিন্দিগির ২৭ বছর সময়ে মেরাজ সংঘটিত হয়েছে বা অতিবাহিত হয়েছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্মের আলোচনা শুনে শিক্ষার ধারাবাহিকতায় প্রচারতব্য রয়েছে। এছাড়াও মেরাজ ঘটনার অস্বীকার করায় জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী মাছ কাঁটতে বসেছে, সে নদীতে গোসল করতে গেছে, নদীতে ডুব দেবার পর এক সুন্দর রমণী হয়ে উঠল। অতঃপর এক বণিক যাইতে তাকে নিয়ে গেল এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। সেখানে তিনটি সন্তান হলো, অতঃপর একই ভাবে একদিন পুনরায় গোসল করতে এসে ডুব দেবার পর পূর্বের অবস্থা ফেরত হয়ে সে দেখতে পেল, সে যে স্থানটিতে গোসল করতে এসেছিল সেখানেই সে গোসলের বসন ঠিক রয়েছে। বাড়ীতে এসে দেখল বিবির মাছ কাঁটা চলমান। অথচ তার জীবনে ঘটনা প্রবাহ এমন (সংক্ষিপ্ত)। এমন অনেক ঘটনা মেরাজ সম্পর্কে চলমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত।

নবী (সাঃ) (আঃ) জিন্দিগির "মেরাজ" বিষয় সম্পর্কে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করতে গেলে, এটা একটি মোজেজা। দালিলিক নির্ভরতার বাইরে বিষয় সম্পর্কে অনুধাবনে এর পরিপূর্ণতা জ্ঞাত হবার বিষয়ে সচেষ্ট হবে বলে মনে করি। এ বিষয়ে একটু ধারণা রাখতে চেষ্টা করলাম। সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌র নূর থেকে সৃজিত হলো বা বিকাশ ঘটলো তা হলো নূরে মোহাম্মদী। এই নূরে মোহাম্মদী নূর থেকে সকল কিছু সৃষ্টির বিকাশময় ধারা

চলমান। এই নূরসহ মানব জগত থেকে মূল সত্ত্বার সাক্ষাত বা লীন হবার প্রক্রিয়া হলো "মেরাজ"। তাহলে যা থেকে সকল কিছুর বিকাশ বা চলমান, তা কেন্দ্রে সমাসীন হলে সকল কিছু দাঁড়ায় বা থেমে যায়। এই অস্তিত্বে চলমান ব্যবস্থা স্থীর প্রক্রিয়া দলিল দ্বারা কি ভাবে বোঝানো সম্ভব! তা আমার জানা নাই।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা, কোন কিছুর সুইচ অফ বা বন্ধ করলে তার কার্যকারিতাও বন্ধ হয়ে যায়। সময় চলমান থাকার কারণে আমরা তা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হই। তদ্রুপ সকল কিছু বলতে সৃষ্টিতে যা কিছু রয়েছে সকল কিছুর কেন্দ্র "নূরমোহাম্মদ" দ্বারা চলমান এবং এটা মূল প্রথম ধাপের বিভাজন প্রক্রিয়ার অংশ, সে কারণে প্রকাশিত ভাবধারাতে এটাই প্রথম ধাপ হয়। মূল ধাপ তো মহান স্রষ্টা। এই ধাপের বর্ণনা না থাকাটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে "সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে" আমার লেখা "সেই সত্ত্বা" বইটি পড়তে অনুরোধ রাখলাম।

এ বিষয়ে কোন কোন আলেমগণ বলে থাকেন, মালাকাল মউত আজরাঈল (আঃ) যখন জিব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে গিয়ে হুজুরপাকের (সাঃ) (আঃ) নিকট আসলেন, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলিলেন আমার সময় পূর্ণ হয়েছে তখন ফেরেস্তা জিব্রাঈল (আঃ) জানালেন মেরাজে অতিবাহিত হবার ২৭ বছর, এমন বর্ণানা শ্রবণ করে থাকি। মূল কথা হলো সিদরাতুল মুনতাহা থেকে ফেরেস্তা রাজ্য অচল। মূল বা মূলের প্রথম ধাপের সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া হলো চূড়ান্ত প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু। তাই ইহা বিভিন্ন জ্ঞানীগণের সংযোজিত মত বৈকী। মূল বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত অনুধাবন প্রক্রিয়া হলো নিজেকে স্রষ্টার দর্শন সাপেক্ষে পূর্ণ জ্ঞাত হবার আহ্বান। বিষয়টা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে সমাসীন বটে। এজন্য কালাম পাকে বর্ণনা এসেছে :- "আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন" অর্থ নামাজ মুমিনের জন্য মেরাজ স্বরূপ। তাই দর্শনবাদ সম্পর্কে যারা মানতে চায় না তাদের দ্বারাই এত বিভিন্নতা লোক-সমাজে চলমান। কোন এক সাধক তাঁর রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন:- "যে নামাজে মেরাজ হয় না, সেজদা তুমি দিলে কারে, নামাজে নামাজিকে সরল পথে আনতে পারে!"। সকল চৈতন্য ধারার মূলনীতি হলো "দর্শন"। তাই আধ্যাত্মিক ভাবে ধর্মের কার্যাবলী দর্শনে পূর্ণতা রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে ইহা বোঝা দায়।

কোন এক (জাল) হাদীসে উল্লেখ, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) ৫০ ওয়াক্ত নামাজ বরাদ্দ নিয়ে রওনা হলেন। (অন্যান্য নবীগণের সুপারিশে তা কমাতে কমাতে ৫ ওয়াক্ততে এসে স্থীর হলো। এমন বয়ান হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-কে অন্যান্য নবীদের চাইতে খাট করা,

এহেন রচনা শৈলী দ্বারা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বুঝতে পারে নি যে তাঁর উম্মতের কষ্ট হবে, তারা পালন করতে পারবে না)। যারা এমন বয়ান প্রচার করে তাদের বিবেক দ্বারা ভাববার অনুরোধ রইল। কারণ দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একজন মানুষের (বিশ্রাম, গোসল, খাওয়া-দাওয়া অন্যান্য বিষয়ে মোট ব্যয় হয় ৮ ঘন্টা আনুমানিক) বাকী ১৬ ঘন্টা ৫০ ওয়াক্ত দ্বারা ভাগ করলে দাঁড়ায় ১৯ মিনিট ২০ সেকেন্ড পরপর এক-একটি ওয়াক্ত তাহলে কাজকর্ম তো কিভাবে জীবন চলে জ্ঞানীদের জন্য এই উদাহরণ টুকু উপস্থাপন করিলাম। তাহলে সরকারে দোআলম, সরদারে হাসমী এহেন বিষয় ভেবে ছিল না বা আল্লাহ্‌পাক এমন বিধান হুজর (সাঃ) (আঃ) উম্মতদের জন্য মনোনীত করলেন।

তাই আজকের দুনিয়াতে ধর্মের অবাঞ্ছিত তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষার জন্য মওলা আলীর (আঃ) বাণী হলো :- "তোমরা যখন কোন হাদিস শোন তা জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষা করিও, কেননা হাদিস বর্ণনাকারী লোকদের সংখ্যা অনেক কিন্তু হাদিসের সঠিকতা রক্ষা করা লোকের সংখ্যা খুবই নগন্য"।

স্রষ্টার প্রতিনিধিগণের কিছু মোজেজা ও কারামত

মুজেজা :- মুজেজা শব্দের অর্থ হলো অলৌকিক ঘটনা বা অসম্ভব নিদর্শন অক্ষমকারী। মোজেজা শব্দের আভিধানিক অর্থ "কোন কাজ সম্পাদনে অথবা কোন বিষয় প্রদর্শনে অক্ষম করা, অভিভূত করা"। স্রষ্টার প্রেরিত নবী-রসূলগণ দ্বারা (আল্লাহ্ কর্তৃক) যে সকল কর্ম যা প্রকৃতি বিরোধী অলৌকিক, অস্বাভাবিক, অসাধারণ, নিদর্শনীয় কাজ প্রকাশ পায় তাই মোজেজা। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়া, হযরত শীস (আঃ) মায়ের গর্ভ ব্যতীত জন্মলাভ, হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্ম লাভ ইত্যাদি অলৌকিক কার্যের মাধ্যমে হুজুরপাকসহ (সাঃ) (আঃ) অন্যান্য নবী-রসূলগণ বা মহাপুরুষদের আগমনের আগে এবং পরে বহু অলৌকিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা মোজেজা হিসাবে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

কারামত :- "কারামত" শব্দটি আরবি একবচন। বহুবচনে "কারামাত" এর অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান ইত্যাদি, ধর্মীয় পরিভাষায় এর অর্থ আল্লাহ্র দেওয়া দান, যা সম্পূর্ণ মুক্ত, অবারিত অনুগ্রহ। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে কারামত হলো :- মহান আল্লাহ্তাআলা তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের থেকে এমন কিছু কাজ প্রকাশ করেন, যা দ্বারা তিঁনি তাদের সম্মানিত করেন, যা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। নবী-রসূলদের পরেই এই বান্দাদের মর্যাদা- যাদের ওলি, পীর বা মোর্শেদ, আওলিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারামত কখনও বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা বা ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাঁর ক্ষমতায় বান্দার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বান্দা উপলক্ষ মাত্র। মূল ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ্তাআলার। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হয় এবং তাঁর থেকে অস্বাভাবিক কোন কারামত প্রকাশিত হয়।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদে আল্লাহ্পাক সূরা ইউনুসের ৬২ নাম্বার আয়াতে বলেছেন :- জেনে রাখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র ওলি তাঁদের নেই কোনো ভয় এবং নেই কোনো চিন্তা। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) 'আল ফিকহুল আকবর'-এ ওলির সংজ্ঞায় বলেছেন :- ওলি ওই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্ তায়ালার জাত ও সিফাতগুলোর মারেফত তথা পরিচয় লাভ করেছেন। সাধ্যানুযায়ী এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত রয়েছেন। যাবতীয়

কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও আনন্দ-উপভোগ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করেন এবং যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দা অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র ওলি তাদের কারামত আল্লাহ্ পাকের জাত, সিফাত ও ইলমে মারফতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তাআলা ওলিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা তওবার ১১৯নং আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। এখানে সত্যবাদী বলতে ওলিদের বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্তাআলার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ নিদর্শন 'মোজেজা' ও 'কারামত'। মোজেজা প্রকাশ পায় নবী ও রসূলদের মাধ্যমে, আর কারামত হক্কানি পীর, ওলি, আওলিয়ায়ে কেরামদের জন্য নির্ধারিত। তাই মুজেজা এবং কারামত উভয় আল্লাহ্র প্রতিনিধিগণ বা যত পীর বা ওলি-আওলিয়া, নবী-রসূলগণ সহ যুগে-যুগে, কালে-কালে যত মহাপুরুষগণ এসেছেন বা আসবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত। যেহেতু খাতামান নবুয়্যত বা নবীর আগমন আর ঘটবে না কিন্তু খাতামান রসূল এই কথা কোরআনের কোন আয়াতে আসে নাই। তাই বেলায়েতের যুগে এখন আল্লাহ্র ওলি, আওলিয়া রসূলগণের মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয় প্রকাশ ঘটে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোন ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে শরিয়তের খেলাপ করে সে যদি চেষ্টা-সাধনা করে কোনোরূপ অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করে তবে এটিকে কারামত বলে না। তাই যে অস্বাভাবিক কাজ প্রদর্শিত জাদুবিদ্যা, কাফের বা আমরা প্রচলিতভাবে দাজ্জালে যে অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে থাকি সেগুলো মোজেজা বা কারামতের অন্তর্ভূক্ত নয়। এসবকে 'এসতেদরাজ' বলে। জেনে রাখতে হবে, যাবতীয় ঐন্দ্রজালিক (ইন্দ্রজাল, ভেলকি, জাদুবিদ্যা, মায়াবিদ্যা, ভোজবিদ্যা, ম্যাজিক ইত্যাদি) উক্ত বিষয় থেকে ভিন্নতর।

তাহলে মোজেজা প্রকাশ পায় নবী ও রসূলদের মাধ্যমে আর কারামত হক্কানি পীর বা মোর্শেদ, ওলি, আওলিয়ায়ে কেরামদের মাধ্যমে। অর্থাৎ যুগের ধারাহিকতার কারণে একটা থেকে আরেকটায় রূপান্তরিত ব্যবস্থা। নবী-রসূলগণ থেকে ওলি, আওলিয়া, পীর বা মোর্শেদ ইত্যাদিতে রূপান্তর এবং মোজেজা থেকে কারামতে রূপান্তর। জ্ঞানীগণের মতে যদিও ওলি আওলিয়াদের অলৌকিক কার্যাবলীকে কারামত বলে আর নবী-রসূলদের অলৌকিক কার্যবলীকে মোজেজা বলে কিন্তু সুফিদের আকিদা একেশ্বরবাদ হওয়াতে মোজেজা হিসাবেই উপস্থাপন রইল। মূলে উনাদের তেমন পার্থক্য নেই। এটাকে দ্বৈত

নীতিতে কল্পনা করা যায় না। ইমাম গাজ্জালী (আঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে :- "আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেই নিজের রূপে বিভোর হলাম। আমি কখনও ঈসা, কখনও মুসা, কখনও জাকারিয়া সর্বশেষ মোহাম্মদ রূপে অবতার হয়ে ধর্মকে সুন্দর সুশীল রূপে পরিচালিত করে আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে এই দুনিয়াতে সমাসিন হয়েছি। কত মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি বহন করে চলেছি।

তাই ওলিগণ যদি উক্ত মতের অধিকারী হোন তাহলে কিভাবে তাঁদেরকে নবী-রসূলগণ থেকে পৃথক করা যাবে ? আল্লাহ্পাক বলেছেন জ্ঞানীর জন্য নিদর্শন রয়েছে, তাই জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট। নবী-রসূলগণের আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরে অর্থাৎ স্রষ্টার একত্ববাদের কারিকুলামের বা হেদায়েতের বাণী প্রচার করতে এসে অসংখ্য মোজেজা স্থাপন করেছেন। যুগের ধারাবাহিকতায় ওলি, আওলিয়াগণের মাধ্যমে (মোজেজার রূপান্তরিত রূপ) কারামত পৃথিবীবাসীর নিকট উপস্থাপন হয়েছে। ইতিহাস এবং কালের সাক্ষীতে তা স্থানান্তরিত হয়েছে। মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিগণ (স্রষ্টা কর্তৃক) ঐশী ক্ষমতা দ্বারা মানুষকে অলৌকিক ভাব ধারাতে জ্ঞাত করেছেন। যা পরবর্তীতে কেউ করতে পারে নি এবং অক্ষমও বটে। এই ক্ষমতা সার্বজনীন বিদিত নয়। যুগের ধারাবাহিকতায় যেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তেমনি মোজেজাও পরিবর্তশীল দেখতে পাই। এই সকল ক্ষমতার উৎস মহান রাব্বুল আলামিন যাকে প্রদান করেন তিঁনিই এসকল দৃষ্টান্ত জানান দিতে সক্ষম হন। ওলিগণের কারামাত সুফি দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। তিঁনি তদানীন্তন রসূল (সাঃ) (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় আইনের অনুশাসন মানতে বাধ্য থাকেন। কারামাত মোজেজার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং মোজেজার পৃষ্ঠপোষকতা করে। মনে রাখতে হবে যে, ওলিগণের কারামাত সেই নবীর (সাঃ) (আঃ) মোজেজারই প্রমাণ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া কারামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন, "পূর্ণতা মূলত তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১. ইলম বা জ্ঞান ২. কুদরত বা ক্ষমতা। ৩. গিনা বা অমুখাপেক্ষীতা। এই তিনটি বিষয়ের পরিপূর্ণতা একমাত্র আল্লাহ্র রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা তাঁর ইচ্ছায় কোন বান্দাকে এই তিনটি বিষয়ের কিছু অংশ কারামত হিসেবে দান করে থাকেন। ইলম বা জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট কারামতের উদাহরণ হলো, কেউ এমন কিছু শ্রবণ করা যা অন্য কেউ শোনে না। জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় এমন কিছু

দেখা, যা অন্যরা দেখে না। অহি (নবীদের ক্ষেত্রে) বা ইলহাম (ওলিদের ক্ষেত্রে) এর মাধ্যমে এমন কিছু জানা, যা অন্যরা জানতে পারে না। অথবা কারও উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম অবতীর্ণ হওয়া। অথবা এমন বিচক্ষণতা যা আল্লাহ্‌তাআলা দান করে থাকেন। এগুলোকে কাশফ ও মোশাহেদা (অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয় অবলোকন), মোকাশাফা (অদৃশ্য বিষয় উন্মোচন), মোখাতাবা (অদৃশ্য কথোপকথন) ও বলা হয়ে থাকে। কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট কারামতের উদাহরণ হলো, কোন কিছুর উপর তা'সীর বা ক্ষমতা প্রয়োগ। কখনও এটি মনোবল, সত্যবাদীতা বা দোয়া কবুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কখনও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাজটি সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাব থাকে না। যেমন, কোন ব্যবস্থা নেয়া ছাড়াই শত্রু মৃত্যুবরণ করা। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, যে আমার ওলির সাথে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। একইভাবে কোন বুজুর্গের প্রতি কারও মনকে আকৃষ্ট করে দেয়া বা তার মহব্বত কারও অন্তরে সৃষ্টি করা। এসকল ক্ষেত্রে বুজুর্গের কোন নিজস্ব প্রভাব থাকে না। একইভাবে কাশফের কিছু বিষয়ও কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন বুজুর্গের বিভিন্ন হালত অন্যের সামনে প্রকাশিত হওয়া"। (আল-মোজেজা ওয়াল কারামত, পৃঃ ৯-১০-১১)

দার্শনিক ইবনে সীনার দৃষ্টান্ত থেকেও কারামতের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব "অপরিহার্য ও আত্মসচেতন ইচ্ছাসম্পন্ন" উদ্ভবের অস্তিত্বমূলক অদৃশ্যবাদের মধ্যে মোজেজা ও কারামতকে তিনি স্থান দিয়েছেন। নবীগণ তাদের মানবীয় প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও বাহ্যিক বস্তুনিষ্ঠার উপর প্রকৃতিগত আত্মিক প্রভাবেই মোজেজা দ্বারা তাঁদের আগমনকে নিশ্চিত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ইবন রুশদ তার "তাহাফুতুত তাহাফুত" গ্রন্থে একটি পার্থক্য উল্লেখ করেছেন তা হলো, যার মধ্যে গুণগত পার্থক্য নিহিত শুধু সেগুলোই অলৌকিক ঘটনা। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব। তার রিসালা ফি আকসামিল উলুম গ্রন্থে ইবনে সিনা বলেন, কারামাত প্রকৃতিগতভাবে মোজেজার সমার্থক। তার ইশারাত গ্রন্থে তিনি এ কথা সমর্থন করেন যে, আধ্যাত্মিক গভীরতার কল্যাণে যার আত্মা জাগতিক বস্তুর উপর প্রভাবশীল এবং যিনি এই প্রভাব কল্যাণকর ও নীতিসিদ্ধ পন্থায় ব্যবহার করেন, যদি তিঁনি নবী হোন তাহলে আল্লাহ্'র দান হিসেবে তিঁনি তা লাভ করেন, সেটিই মোজেজা। আর যদি তিঁনি ওলি হোন, তাহলে তিঁনি কারামাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কোরআনুল মাজিদ থেকে এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু আয়াত পেশ করা হলো ঃ-

কোরআনুল মাজিদের সূরা মমিনের ৭৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করি নি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়, যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে তখন ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। এবং অপর আরেকটি সূরায় (আনআম-এর ১০৯ নাম্বার আয়াতে) আল্লাহ্‌পাক বলেন :- তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন! অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ, তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই ?"। উক্ত আয়াতে কারিমাতে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর নিকট বিভিন্ন সময়ে কাফেররা এসে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বিভিন্ন আবদার রাখত যাহা অলৌকিক মোজেজা ছাড়া কার্যকর সম্ভব নয়। এমন ধারাবাহিকতায় প্রিয় হাবীবকে (সাঃ) (আঃ) অহির মাধ্যমে জানান দিলেন যে, অলৌকিক বিষয় বা মোজেজা তো আল্লাহ্‌র কাছেই বা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিঁনি যখন মোজেজা দেখানোর দরকার মনে করবেন তখনই তা দেখানো হবে। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্ম বা সত্যকে তুলে ধরার প্রমাণ হিসেবেই সাধারণত মোজেজা দেখানো হয়ে থাকে। জনগণের খেয়াল-খুশি বা কল্পনা-বিলাসকে পরিতৃপ্ত করার জন্য মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয় না। খোদাদ্রোহী মহলের মিথ্যাবাদীরা যত কঠিন শপথই করুক না কেন তা তাদের কথায় কুফরির মূল উৎস হলো, অন্ধ-বিদ্বেষ ও গোড়ামী। তাই কাফেররা সব ধরনের অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেজা দেখার পরও সত্যকে মেনে নিতে রাজি হয় না।

সূরা আল-ইমরান (আয়াত নাম্বার ৩৭) :- "যখনই হযরত জাকারিয়া (আঃ) মারিয়মের কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেতেন। তিঁনি বলতেন হে মারিয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে ? সে বলতো এগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন"। সন্দেহাতীতরূপে ঘটনাটি ছিল বিস্ময়কর, অলৌকিক। ঈসা (আঃ)-এর মা মারিয়াম নিজে কোন নবী ছিলেন না, নবুয়্যতের দাবীদারও ছিলেন না, অথচ তার কাছে পাওয়া

যেতো অসম মৌসুমে মৌসুমী ফল। নারীও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতদূর উন্নতি লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র নবী পর্যন্ত তাতে বিস্মিত হন।

সূরা আল-কাহাফের ৯ নাম্বার আয়াতে আলাহ্‌পাক বলেছেন :- "তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ?"। অর্থাৎ এই একটাই বৃহৎ ও বিস্ময়কর নিদর্শন নয়, বরং আমার প্রতিটি নিদর্শনই বিস্ময়কর। আসমান ও জমীনের এই সৃষ্টি, তার ব্যবস্থাপনা, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রকে আয়ত্তাধীন করা এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন ও অন্যান্য অসংখ্য নিদর্শন কি কম বিস্ময়কর ? যারা একটি পার্বত্য গুহাতে একাধারে তিনশত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, তাঁরা নবী-রসূল নন! অথচ এ সকল ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘটনা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শন।

সূরা আন-নামল-এর ৪০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো একজন বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন সিংহাসনটি তার সামনে দেখতে পেলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ"। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আঃ) অল্প সময়ের মধ্যে বিলকিসের সিংহাসন ইয়েমেন থেকে সিরিয়ায় আনতে বললে দরবারে উপস্থিত দু'জন এ কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরমধ্যে একজন ছিল জ্বিন এবং ওই জ্বিন হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে কাজ করতো। সে বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই বিলকিসের সিংহাসন আপনার সামনে এনে দেব এবং অন্য একজন ছিলেন সুলায়মান (আঃ)-এর মন্ত্রী, যিনি সুলায়মান (আঃ)-এর পর্দা গ্রহণের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন আনতে পারবেন বলে জানান। সুলায়মান (আঃ) ঐ মন্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রীকে বিলকিসের সিংহাসন আনার নির্দেশ দেন। আর ঐ মন্ত্রী অল্প সময়ের মধ্যেই বিলকিসের সিংহাসন সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হাজির করেন। মানুষ ঐশী জ্ঞান ব্যবহার করে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যারা কোন নবী ছিলেন না যিনি চোখের পলকে রানী বিলকিসের বিরাট সিংহাসন এনেছিলেন অনেক দূর থেকে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল হাজা হাবীবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ)-এর

রওজাতে একজন আশেক থাকতেন। তিনি তার মেয়ের বিবাহের বাবদ ৫০০ রুপিয়া খাজা বাবার রওজাতে বিনয়ের সহিত চাইতে লাগলো, এদিকে বিয়ের দিনক্ষণ উপস্থিত কিন্তু টাকা না পাওয়াতে আশেকের মনে সংশয় সৃষ্টি হলো। তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে একটি লাঠি দ্বারা রওজা শরীফে ৩টি আঘাত করলো এবং বলতে থাকলো তুমি দাতা নও, আমার ফরিয়াদ তোমার কাছে পৌঁছায় নি! এভাবে ধৈর্যহারা হয়ে তিনি রওজা ত্যাগ করিল এবং কিছুদূর যাবার পর তিনি দেখতে পেলেন এজন মজযুব ছালা গায়ে তার নিকট এসে বলিল বাবা তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য এই নাও ৫০০ রুপিয়া। মজ্‌যুবের কথাতে তিনি বিষ্ময়ে আঁতকে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং গায়ের ছালাটি সরিয়ে দিয়ে দেখতে পেলেন ৩টি আঘাতের চিহ্নে লাল আবরণে ফুটে উঠেছে তাঁর পিঠ মোবারকে, তখন আশেকের বুঝতে আর বাকী রইল না (সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ রাখলাম)।

কোরআনুল মাজিদে উল্লেখ শত, সহস্র মোজেজা দেখালেও যারা ইমান আনবে না তারা ভিন্নতার যুক্তি উপস্থাপন করে পাশ কেঁটে যাবে। যেমন আবু জাহেল ৩৬০ জন জাদুকরের উদ্দেশ্য বলেছিলো :- তোমাদের জাদু জমীনে চলে আর মোহাম্মদের জাদু আসমানেও চলে (নাউজুবিল্লাহ্)। এজন্য কালামপাকে উল্লেখ করা হয়েছে যে :- কে বলিল যে তারা ইমান আনিবে বা বিশ্বাস স্থাপন করিবে। অর্থাৎ এভাবে বিভিন্ন সময়ে মুশরিকগণ প্রিয় হাবীব (সাঃ) (আঃ)-কে জ্বালাতন করেছেন, যে কারণে আয়াতে কারিমা দ্বারা আল্লাহ্‌পাক রসূল (সাঃ) (আঃ)-কে জানান দিলেন। এ প্রসঙ্গে কোন এক সাধক তাঁর রচনাতে উল্লেখ করেছেন :- "ভালাবাসো সকলেরে কোরো না বিশ্বাস, বিশ্বাসের ভিতরে থাকে বিপদের আভাস"। তাই একনিষ্ঠতা ব্যতীত বিশ্বাসের কার্যকারিতা খুবই কম, সবাইকে ভালবাসতে অগ্রগামী হওয়া সাধকের জন্য বাঞ্চনীয়।

মূল কথা হলো পানি যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। গ্লাসে রাখলে - গ্লাসের পানি, বালতিতে রাখলে বালতির পানি, পুকুরে রাখলে পুকুরের পানি, নদীতে রাখলে নদীর পানি, সমুদ্রে রাখলে সমুদ্রের পানি। স্রষ্টার সান্নিধ্যে অবস্থান এবং একনিষ্ঠতা অর্জন বিষয়ে স্রষ্টার সঙ্গে সাধকের মিলিত কার্যকরি রূপের প্রকাশ স্রষ্টা কর্তৃক মোজেজার মাধ্যমেও বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। একেরেই প্রকাশ, একেরেই বিকাশ, একেরেই ছুটে চলা বহুগুণের বিকাশ, সকল কিছুতে স্রষ্টার কার্যকরি রূপ প্রকাশ তাঁর প্রতিনিধির দ্বারা, সেটাই মোজেজা বা কারামত হিসাবে যুগে-যুগে, কালে-কালে সাক্ষ্যতা

বহন করে চলেছে। আধ্যাত্মিকতা যে অস্বীকার করা যায় না তা মোজেজার মাধ্যমে প্রকাশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সবার ভাগ্যে এটা মিলে না, আবার মিললেও কার্যকারিতার দিকে মনোনিবেশ করতে পিছু পা হয়। এটাই হয় তো তকদির। সৃষ্টি কর্তারই অমোঘ লীলা-খেলাতে সমাসীন।

এভাবে অসংখ্য মোজেজা বা কারামত ওলিদের দ্বারা রচিত হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র যাঁরা বন্ধু হন তাঁদের দ্বারা আল্লাহ্‌ অলৌকিক নিদর্শন সমূহ দর্শন করান এটা কালামপাকের কথা। তাই ওলি, আওলিয়াগণকে আল্লাহ্‌র থেকেই মোজেজা বা কারামাত উপস্থাপন হয়ে থাকে।

নিম্নে আরও কিছু মোজেজা ও কারামত তুলে ধরা হলো ঃ-

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন "আল্লাহ্‌র ওলি-আওলিয়াদের মধ্যে দুইটা অতি ধারালো খোলা তরবারি আছে। একজন হলো :- গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) এবং আরেকজন হলো তাঁহার নাতি আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরী (আঃ)।

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)

লৌহে-মাহফুজ বিষয় এর স্বাক্ষরতা :-

এক বর্ণনায় লেখা আছে যে শায়খ আবুল হাফস (রহঃ) বলেছেন :- "আমাদের শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (আঃ) বাতাসে উড়াতেন এবং বলতেন, 'আমার দরবারে সালাম উপস্থাপনের আগে সূর্য ওঠে না। আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও সম্মানের কসম! সমস্ত ভাল মন্দ লোক আমার দৃষ্টির সামনে। আমার চোখ দৃঢ়ভাবে লৌহে-মাহফুজের উপর স্থির। বারবার আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুগ্রহ করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমুদ্রে নিমজ্জিত করি এবং আমি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন (নিশান) এবং আমার পূর্বপুরুষ নবী মুহাম্মদের বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধি, আর আমি তাঁর দাস এই পৃথিবীতে।

একজন চোর আবদাল হয়ে ওঠেন :-

একবার শাইখ আবদ বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন চুরির অভিপ্রায় নিয়ে, ঘরে ঢুকেই সে অন্ধ হয়ে গেল এবং সে কিছুই দেখতে পেল না। তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না এবং অবশেষে তিনি বাড়ির এক কোণে বসলেন। সকালে ধরা পড়ে গেল শাইখ আবদ। যখন বড় পীর সাহেব তাকে দেখে, তিঁনি তাঁর হাত চোরের চোখের উপরে রেখেছিলেন চোরের দৃষ্টি অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। শায়খ আবদ তখন বলেছিলেন যে, "তিনি বস্তুবাদী (পার্থিব সম্পদ) চুরি করতে এসেছিলেন। বড় পীর সাহেব বলল! আমি তোমাকে এমন ধন দিয়ে আশীর্বাদ করব যে তা চিরকাল তোমার কাছে থাকবে। পরবর্তীতে বড় পীর সাহেবের দোয়ায় উক্ত ব্যক্তি আবদাল হয়ে উঠেন।

যুবতী মায়ের (ভক্তের) আর্তনাদে সাহায্য করা :-

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর অনুসারী ছিলেন এক যুবতী তিনি সিলেনে বাস করত। একদিন একাকী একটি স্থানে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, উক্ত ব্যক্তি যখন তাকে অসম্মান করতে চেয়েছিল, তখন অসহায় হয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমাকে বাঁচান হে আমার শায়খ আবদুল কাদির!" সেই মুহূর্তে শায়খ বাগদাদে ওযূ করছিলেন। লোকেরা তাঁকে থামতে দেখে। বড় পীর সাহেব ক্রোধে তাঁর কাঠের জুতোটি ধরে নিক্ষেপ করেন। সেই জুতো উক্ত ব্যক্তির মাথায় পড়েছিল (যে সিলেনে মেয়েটিকে আক্রমণ করেছিল) এবং তাঁর জুতার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে উক্ত ব্যক্তি মারা যায়। সেই জুতোটি এখনও রিলিক হিসাবে সিলেনে রাখা রয়েছে।

সূর্যের রশ্মির আড়ালে লুকিয়ে থাকা :-

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর লালন-পালনের দায়িত্বরত জনৈক মহিলা হতে বর্ণিত যে, সে যখন শিশু ছিল, তখন সে তাঁকে তার কোলে নিয়ে যেত কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেত যে সে আর নেই। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বড় পীর সাহেব আকাশে উড়ে এসে সূর্যের রশ্মির আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। যখন বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) বড় হয়েছিলেন, তখন উক্ত মহিলা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিঁনি এখনও ছোটবেলায় যেমন করতেন তেমনি এখনও করেন, অর্থাৎ সূর্যের আড়ালে এখনও কি লুকিয়ে থাকেন ? শায়খ বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) জবাব দিয়েছিলেন যে,

"তখন আমি শিশু ছিলাম, এবং এটি দুর্বলতার সময় ছিল এবং আমি সূর্যের রশ্মিতে লুকিয়ে থাকতাম। এখন আমার শক্তি এত বিশাল, যদি হাজার হাজার সূর্য আসতে হয় তবে তারা আমার দ্বারা লুকিয়ে থাকার চেয়ে তারা সমস্তই আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকত"।

ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত :-

একবার গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) একটি সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই সমাবেশে বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর সামনে শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) বসেন। মহান গাউসে পাকের বক্তৃতার সময় শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) এটি দেখে মিম্বার থেকে নেমে ঘুমন্ত শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'হাত শ্রদ্ধার সাথে জড়িয়ে ধরেন। কিছুক্ষণ পর শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) ঘুম থেকে উঠে দেখলেন বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)- তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শ্রদ্ধায় তাৎক্ষণিক ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) হেসে বললেন :- "আমি তাঁর সামনে যে কারণে দাঁড়িয়ে আছি তা হলো, তিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্বপ্নে দেখছিলেন এবং আমি নবীকে (সাঃ) (আঃ) আমার শারীরিক চোখ দিয়ে দেখছিলাম"।

আল্লাহ্‌র ফেরেস্তাদের গায়েবী আওয়াজ :-

ইসলামী পন্ডিতদের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও জানা যায় যে, তাঁকে প্রথমে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্তবে পাঠানো হলে যাত্রাপথে একদল ফেরেশতা এসে তাঁকে বেষ্টন করে রইলেন এবং তাঁকে বেষ্টন করে শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। এ কথাও অনেকে বলে থাকেন যে, গাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-কে যখন মক্তবে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মক্তবে ছাত্রদের সংখ্যা অনেক ছিল। বসার কোনো স্থান না থাকায় তিঁনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁর সঙ্গী ফেরেশতারা গায়েব হতে আওয়াজ দিলেন, "তোমরা বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দার বসার জন্য জায়গা করে দাও। সত্যি এহেন অদৃশ্য বাণী শুনে শিক্ষক-ছাত্ররা চমকে উঠেছিলেন। পরবর্তীতে ছাত্ররা গাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-কে জায়গা করে দিলেন।

স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের আগাম সংবাদ :-

তিঁনি শৈশবকালে যখনি খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে আগ্রহী হতেন তখনি একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেতেন, "হে মুবারক শিশু আমার দিকে এসো! অন্যত্র বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) নিজে বর্ণনা করেন, "রাত্রিকালে যখনি আমি অসাবধানতাবশতঃ নিদ্রায় অভিভুত হয়ে পড়তাম তখনি এ বাণী আমার অন্তরে প্রতিধ্বনি হত যে, হে আব্দুল কাদের, ঘুমাবার জন্য তুমি দুনিয়াতে আসনি বরং ঘুমন্ত ও মোহান্বিত মানবকুলকে জাগ্রত করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত আলাউদ্দিন আহমদ কালিয়ার সাবেরী (আঃ)

বাবা হযরত আলাউদ্দিন আহমদ কালিয়ার সাবেরী (আঃ)-এর জীবনেও অনেক বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। বাবা হযরত আলাউদ্দিন আহমদ কালিয়ার সাবেরী (আঃ) বড় পীরের পর সবচেয়ে জালালি ফায়েজের আওলিয়া। বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর আপন নাতি। তিঁনি বড় পীর আব্দুর কাদের জীলানী (আঃ)-এর পর তিঁনি হলেন সর্বাধিক জালালি তবীয়তের আওলিয়া। তাঁহার কিছু অলৌকিক ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগা :-

বাবা সাবেরী (আঃ) সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এজন্য চারপাশে কি ঘটছে তা তাঁর কোন খেয়াল থাকতো না। একবার বাবা সাবেরী (আঃ)-এর মায়ের অনুরোধে তার মামা শেখ ফরিদ (আঃ) তাঁহার নিজের কন্যার সাথে বাবা সাবেরীর (আঃ) বিয়ে দেন। কিন্তু বাসর রাতে যখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকট গমন করলে বাবা সাবেরী (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?" তাঁহার স্ত্রী বললেন, "আমি আপনার বিবি"। এই কথা শুনার পর বাবা সাবেরী (আঃ) জালালি হালে শুধু এতটুকু উচ্চারণ করলেন যে, "যে আল্লাহ্ লা-শারিক তাঁর আবার স্ত্রী কিভাবে থাকতে পারে" আর ইহাতে সাথে-সাথেই তাঁহার বিবির গায়ে আগুন লেগে যায়। ফলে তাঁহার বিবি আগুনে ঝলসে মারা যান। এতে তাঁহার মামা খুব কষ্ট পেলেও তাঁহার করার কিছুই ছিল না।

১২ বছর অনাহার :-

বাবা সাবেরী (আঃ)-কে তাঁহার মামা লঙ্গর খানা পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তিঁনি একটানা ১২ বছর সেই লঙ্গর খানা থেকে কোন খাবার গ্রহণ করেন নি। ইহাতে তাঁর দেহ কঙ্কাল-সার হয়ে গেলে তাঁর মামা শেখ ফরিদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আমি পুরো লঙ্গর খানার দায়িত্ব দিলাম, তবুও তোমার শরীরের এই বেহাল অবস্থা কেন ?" উত্তরে বাবা সাবেরী (আঃ) বললেন, আপনি আমাকে কেবল লঙ্গর খানা দেখা শুনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু সেখান থেকে খাবার খাওয়ার কোন অনুমতি দেন নি। তাই আমি এত দিন না খেয়ে কাটিয়েছি"। এই উচ্চ পর্যায়ের সততার কথা শুনে শেখ ফরিদ (আঃ) খুব অবাক হয়ে পড়েন।

সম্পূর্ণ কালিয়ার শহর ধ্বংস :-

তাঁহার পীর কেবলা অর্থাৎ আপন মামা হযরত শেখ ফরিদ (আঃ) তাঁকে খিলাফত দিয়ে কালিয়ার শহরের কুতুব (প্রধান ধর্মীয় নেতা) নিযুক্ত করেন। কিন্তু কালিয়ার শহরের কাজী তবারক তাঁকে সাধারণ এক রাস্তার ফকির ভেবে খুব তাচ্ছিল্য করে এমন কি মসজিদে নামাজ পড়ার সময় তাঁকে ঘাড় ধরে বের করে দেন। এতে বাবা সাবেরী (আঃ)-এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তিঁনি কেবল এতটুকুই উচ্চারণ করেন যে, "সব ধ্বংস হোক"। ফলে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পে সমগ্র কালিয়ার প্রদেশ ৫ মিনিটে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সেদিন ঐ কালিয়ার শহরে একটি গাছ ছাড়া আর কিছুই অক্ষত ছিল না। ভূমিকম্পে সেই গাছ অক্ষত থাকার কারণ হলো, সেই গাছের নীচে কালিয়ার আসার পর বাবা সাবেরী (আঃ) কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে ছিলেন। আজও সেই গাছকে মানুষ পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে।

পূর্বে মাজার শরীফে কেউ প্রবেশ করতে পারত না :-

বাবা সাবেরী (আঃ)-এর পর্দা গ্রহণের পর তাঁহার মাজার শরীফের চারপাশে তিন গুন জালালি ভাব প্রকাশিত হতে শুরু করে। কেউ যদি মাজারে যাওয়ার চেষ্টা ১ মাইল দূর থেকেও করতো, তাহলে সাথে সাথে আকাশ থেকে বজ্র পাত হয়ে সে খন্ড বিখন্ড হয়ে যেত। কথিত আছে তাঁহার পর্দা গ্রহণের ৪০ দিন পর্যন্ত তাঁহার মাজার সিংহ পাহাড়া দিতে দেখা যেত। পরবর্তীতে তাঁর এক বংশধরের অনুরোধে তিঁনি তাঁহার জালালি ভাব ক্ষান্ত করে তাঁহার মাজার শরীফ সবার জন্য জিয়ারতের উপযুক্ত করে দেন।

মৃত ছাগলের কথা বলা :-

কাজী তবারক হিংসার বশবর্তী হয়ে বাবা সাবেরী (আঃ)-কে পরীক্ষা করবার জন্য জন সম্মুখে বাবা সাবেরী (আঃ)-কে বললেন যে, "আমার তিন মাস আগে একটি ছাগল হারানো গেছে, তুমি যদি তার খবর বলতে পার তাহলে আমি মেনে নিব তুমি সত্যি আল্লাহ্‌র ওলি"। বাবা সাবেরী (আঃ) এই কথা শুনে কেবল এই বলে ডাক দিলেন যে, "যারা কাজী সাহেবের ছাগল খেয়েছ তারা আমার সামনে হাজির হও", সাথে-সাথে ২৭ জন লোক আপনা-আপনি বাবার সামনে হাজির হন। এরপর বাবা সাবেরী (আঃ) কাজী সাহেবকে তার ছাগলের নাম ধরে ডাক দিতে বললে, কাজী সাহবের ডাকে ২৭ জনের পেট থেকে ছাগল কথা বলা শুরু করে দিল। এই আশ্চর্য কারামত দেখে কাজী তবারক হিংসায় তাঁকে জাদুকর বলে আখ্যা দিলেন। এতে বাবা সাবেরী (আঃ) কিছুই মনে করলেন না।

কেউ সামান্য বেয়াদবি করলে তার নির্ঘাত মৃত্যু :-

আল্লাহ্‌পাক তাঁকে এতই জালালি স্বভাব দান করেছিলেন যে তিঁনি যদি মুখে একবার উচ্চারণ করতেন যে লোকটির আচরণ ভাল না, তাহলে সাথে সাথেই সেই লোকটি দুই খন্ড হয়ে যেত, তার আর প্রানে বাঁচার উপায় থাকত না।

জ্বীন-পরীর গায়ে আগুন লাগা :-

তাঁহার মাজার শরীফের ওপর দিয়ে জ্বীন পরীও যদি ভুলে অতিক্রম করে তাহলে তাদের গায়ে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যেত।

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ (আঃ)-এর জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে তাঁর কিছু বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরা হলো।

উট রক্ষকদের সাথে আজমির শরীফের অলৌকিক ঘটনা :-

খাজা সাহেব (আঃ) যখন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে আজমির পৌঁছেছিলেন এবং অন্দরকোটের নিকটে শহরের প্রাচীরের বাইরে একগুচ্ছ ছায়াময় গাছের নীচে শিবির

স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তখন রাজা পৃথ্বীরাজের উট-রক্ষীরা অহংকার করে তাঁর সেখানে থাকার বিষয়ে আপত্তি জানালেন। তারা জোড় দেখাচ্ছিল যে জায়গাটি রাজার উটের জন্য ছড়ানোর জায়গা, এখানে উটেগুলোই বসে থাকবে। তাই আপনাদের অবশ্যই অন্য কোনও জায়গায় চলে যেতে হবে, খাজা বাবা (আঃ) বললেন, তাহলে উঠগুলোই বসে থাক! তিঁনি আনাসাগর হ্রদের নিকটে অন্য জায়গায় সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে যখন রাজার উটগুলি তাদের চলাচল করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উঠেনি, তখন সমস্যাটা রাজা পৃথ্বীরাজের নজরে এলো। উট রক্ষীরা সমস্ত ঘটনা রাজাকে জানালেন এবং তিনি বিষয়টা বুঝতে পারেন। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং খাজা গরীবে নেওয়াজকে (আঃ) রাজার উক্ত জায়গা থেকে সরানোর জন্য তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন খাজা সাহেব বললেন : "যাও, উটগুলি উঠে যাবে"। ফিরে এসে উটগুলি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

মাশকিজায় (জল বাহনের জন্য ছোট ব্যাগ) আনাসাগর :-

একবার আজমিরে, রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সৈন্যরা তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের ফলে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)-এর অনুসারীদের আনাসাগরের হ্রদ থেকে জল দিতে অস্বীকার করেছিল। এর পরে খাজা সাহেব একজন অনুগামীকে হ্রদ থেকে একটি মাশকিজায় (জল বহনের জন্য একটি ছোট ব্যাগ যাকে আমরা প্রচলিত ভাবে ঘটি জেনে বা বলে থাকি) কিছু জল আনতে বললেন। তিনি মাশকিজা ভরাট করলে পুরো আনাসাগর হ্রদের জল অলৌকিকভাবে এতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই অলৌকিক ঘটনাটি শহরের এক অভূতপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) তখন আনাসাগর হ্রদ এর নিকটবর্তী একটি মন্দিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেখানে গিয়ে প্রতিমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। সবাই তাঁকে বলেছিল একে বলা হয় দেবী দেবতা। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিমা তাদের সাথে কথা বলেছে কিনা ? নেতিবাচক জবাব পেয়ে তিঁনি মুর্তিটি কলেমার আবৃত্তি করেন এবং এটিকে স্যাদি নামকরণ করে একটি মানুষের রূপে পরিণত করেন। এতে শহরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

মৃত দেহতে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া :-

একবার আজমিরের শাসক একজন নিরীহ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে তার মাকে একটি বার্তা পাঠালেন যাতে তিনি এসে তার ছেলের লাশ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তার মা সেখানে যাওয়ার পরিবর্তে অসহায় হয়ে শান্তির আশ্রয়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)-এর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, "আহ! আমার সম্বল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, আমার সংসার নষ্ট হয়ে গেছে, ইয়া গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ), আমার একমাত্র ছেলে ছিল, সে নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্মম শাসক ফাঁসি দিয়েছেন। এই কথা শুনে তিঁনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাকে আপনার পুত্রের দেহের কাছে নিয়ে যান, অতঃপর তিঁনি সেই ছেলের মৃতদেহের কাছে এসে তার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, "হে মৃত ব্যক্তি! যদি শাসক আপনাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় তবে আল্লাহ্‌র আদেশে উঠে দাঁড়ান"। তারপর শরীরে কিছুটা আন্দোলিত বা সঞ্চালন হয়ে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি অর্জন করা :-

কথিত আছে যে একবার আওরঙ্গজেব আলমগীর হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের (আঃ)-এর গৌরবময় মাজারে গিয়েছিলেন। সীমানার মধ্যেই একজন অন্ধ ভিক্ষুক চিৎকার করছিলেন, ইয়া খাজা গরীবে নেওয়াজ! আমার দর্শনের জন্য চোখে দৃষ্টি পুনরুদ্ধার করুন। তিনি এই ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! দর্শনের জন্য খাজা গরীবে নেওয়াজের (আঃ)-এর গৌরবময় মাজারে এরকম করে কতদিন বলেছেন ? তিনি বলেছিলেন যে এটি যুগে-যুগে হয়েছে তবে আমার ইচ্ছাটি এখনও পরিপূর্ণ হয় নি। তিনি বলেছিলেন যে পবিত্র মাজারে শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করার পরে আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসব, যদি আপনার চোখ খুব ভালভাবে দৃষ্টি অর্জন করলে করবে, অন্যথায় না করলে আমি আপনাকে হত্যা করব। এই কথা বলার পরে রাজা ভিক্ষুকের দিকে নজর রাখার জন্য রক্ষীদের নিযুক্ত করলেন, এবং ভিক্ষুক তার শ্রদ্ধা জানাতে মাজারের ভিতরে গেলেন। ভিক্ষুক তার বিলাপ শুরু করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করলেন, "ইয়া খাজা! প্রথমে চুক্তিটি কেবল চোখের ছিল কিন্তু এখন এতে জীবন জড়িত, আপনি দয়া না দেখালে আমাকে হত্যা করা হবে"। রাজা যখন তার শ্রদ্ধা জানার পরে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর চোখ দৃষ্টি শক্তি বা দর্শন পেয়েছিল। রাজা হেসে বলেছিলেন যে, এখন অবধি আপনি হৃদয় ও মনোনিবেশ ব্যতীত খাজা বাবা

(আঃ)-এর কাছে বলেছিলেন, এবং এখন জীবনের ভয়ে আপনি হৃদয় থেকে বলেছিলেন, তাই আপনার প্রার্থনা গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনউদ্দিন (আঃ) পূর্ণ করেছেন।

একজন আশেকের জন্য দয়া :-

একদিন খাজা সাহেবের 'মুরিদ' (শিষ্য) তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, নগরীর গভর্নর খুবই অসহনীয় হয়রানির দ্বারা আমার জীবনকে অতি দুর্বিষহ করে তুলেছেন যে, আজ সে শহর থেকে আমায় বিতাড়িত করার আদেশ দিয়েছে"। জবাবে খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) বললেন, "তবে এখন সে কোথায়, তাকে ইতিমধ্যে আল্লাহ্পাক শাস্তি দিয়েছেন"। ঐ গভর্নর নিজের বাড়িতে ফিরে এসে, শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে।

অপরিপক্ক গরুর থেকে দুধ পান :-

একবার খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) আজমীরের আনাসাগর হ্রদের তীরে বসে ছিলেন। একজন রাখাল ছেলে তার আগে আগে গরুর একটি পাল নিয়ে যাচ্ছিল, গরুপাল এখনও তাদের পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেনি। খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) ছেলেটিকে তার পালের গরু থেকে কিছু দুধ চেয়েছিলেন। ছেলেটি এটাকে রসিকতা হিসাবে নিয়ে বলল, "বাবা তারা সবাই অপরিণত বয়সের বাছুর; তারা এই বয়সে কোনও দুধ দেয় না। খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) হাসলেন এবং একটি গরুর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমি ঐ গরুর দুধ পান করতে চাই, তার কাছে গিয়ে দুধ খাব"। ছেলেটি দ্বিধায় পরে গেল। তারপরে যখন তিঁনি এই নির্দিষ্ট গাভী থেকে দুধ খেতে গেলেন, তখন তিঁনি কেবল তার দুধগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকাশিত এবং দুধের সাথে অতিরিক্ত প্রবাহিত পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। ছেলেটি দুধের সাথে বেশ কয়েকটি অভ্যর্থনা পূর্ণ করেছিল যা ৪০ জন তাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে পান করেছিলেন। ছেলে এই অলৌকিকতায় অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) মহান ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)-এর একটি দর্শন :-

একদিন মহান খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতারা লক্ষ্য করেছেন যে তিঁনি যখনই তাঁর ডানদিকে ঝুঁকছেন, তখন তিঁনি কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন এবং তারপরে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। এটি অনেকবার ঘটেছিল।

বক্তৃতার পরে, কিছু ভক্ত তাঁকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তিঁনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর পীর-ও- মোর্শেদের সমাধিটি সেই পাশে ছিল এবং যখনই তিঁনি সেই দিকটি দেখেন তখন সমাধিটি তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হত, তাই তিঁনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শ্রদ্ধা জানাতে।

মওলা আলী (আঃ)

রসূল (সাঃ) (আঃ) আমি এবং আলী (আঃ) একই নূরের দুইটি টুকরা। মওলা আলী (আঃ)-এর জীবনে অনেক বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। তাঁর কিছু অলৌকিক বিষয় তুলে ধরা হলো :-

পবিত্র কাবা ঘরে জন্ম :-

পবিত্র কাবা ঘরকে আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। একমাত্র মওলা আলী (আঃ)-এর জন্ম পবিত্র কাবা ঘরে। হযরত আলী (আঃ) মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের প্রসব বেদনা উঠলে তিঁনি পবিত্র ক্বাবা গৃহে চলে যান এবং কাবা গৃহের দেয়ালের নিকট বসে পড়েন এবং আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন :- হে প্রভু! আমি তোমার প্রতি, তোমার পক্ষ থেকে নাজেলকৃত সকল কিতাবের প্রতি এবং এ ঘরের পুনঃনির্মাতা মুসলমানদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর কথার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখি। হে প্রভু! এ ঘরের নির্মাতার সম্মানে এবং আমার পেটে যে শিশু আছে তাঁর ওসিলায় এ শিশুর জন্মদান আমার জন্য সহজ করে দাও"। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর পবিত্র কাবা গৃহের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হলো এবং তিনি ঐ ফাটলের পথ দিয়ে কাবা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই ফাটলটি পুনরায় জোড়া লেগে গেল। তখন ওখানে উপস্থিত অন্যান্যরা কাবা গৃহের দরজা শত চেষ্টা করেও খুলতে পারলেন না। সবাই বুঝে গেলেন যে, এটা মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ হিকমত।

অবশেষে চারদিন পর পবিত্র কাবা গৃহের পূর্বের ফাটলকৃত জায়গার মধ্য দিয়ে হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ এক পবিত্র নবজাতকসহ পবিত্র কাবা গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন। নবজাতক সহ বের হয়ে আসা মাত্র পুনরায় কাবা গৃহের ফাটলকৃত অংশটি

পূর্বের মত জোড়া লেগে গেল। মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শিশুটির নাম ঠিক হলো "আলী"। যে নাম জগতে ইতিপূর্বে কেউই রাখে নি। পবিত্র কাবা গৃহের অভ্যন্তরেই ইমাম আলী (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। (সূত্র-কাশাফুল গ্‌বাম্মাহ, ১ম খন্ড, পৃ- ৯০)।

ভূমিকম্পকে থামিয়ে দেওয়া :-

একবার বেশ কিছু সময় ধরে ভূমিকম্প হতে থাকলে ও পাহাড়গুলো কাঁপতে থাকলে লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মওলা আলী (আঃ)-এর স্মরণাপন্ন হন। মওলা আলী (আঃ) সে সময় খলিফা ছিলেন না। তিঁনি ভূমিকে লক্ষ্য করে বলেন; "তোমার কি হলো ? শান্ত হও"। ফলে ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বিস্মিত লোকজনকে লক্ষ্য করে তিঁনি বলেন: "আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন:- "যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো ? আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন জমিনকে বলবো, তোমার কি হলো? (এরপর কোরআনে এসেছে) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ফলে আমার জন্য খবরগুলো বর্ণনা করবে জমিন।"

সাধারণ পাথরকে মূল্যবান পাথরে রূপান্তর করা :-

একবার আলী (আঃ) একদল সঙ্গীসহ কুফার মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি ইমাম আলী (আঃ)-কে বলেন; আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি বিস্মিত যে এই দুনিয়া দুই গ্রুপের হাতে রয়েছে এবং আপনি এই দুনিয়া থেকে কিছুই পাচ্ছেন না! আলী (আঃ) বললেন, তুমি কি মনে কর আমরা {(বিশ্বনবীর (সাঃ) (আঃ) আহলে বাইত)} যদি দুনিয়াকে চাইতাম তাহলে কী আমাদের দেয়া হত না ? এরপর তিঁনি এক মুঠো পাথরের কণা হাতে নিয়ে সেগুলোকে মূল্যবান পাথরে পরিণত করে প্রশ্ন করেন, এসব কি ? লোকটি বলল: সবচেয়ে মূল্যবান পাথর। আমরা দুনিয়া চাইলে তা দেয়া হয়, কিন্তু আমরা তা চাই না। এ কথা বলে তিঁনি সেগুলো দূরে ফেলে দেন এবং সেগুলো আবারও সাধারণ পাথরের কণায় পরিণত হয়!

কবরস্থানের পর্দা উন্মোচন :-

মওলা আলী (আঃ)-এর একদল সঙ্গী তাঁকে বললেন :- মুসা ও ঈসা নবী জনগণকে অনেক মোজেজা দেখিয়েছেন। আপনিও যদি সে ধরনের কিছু দেখাতেন তাহলে আমাদের হৃদয় সুনিশ্চিত হত। মওলা আলী (আঃ) বললেন; তোমরা এ জাতীয় নিদর্শন

দেখা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু তারা বার বার একই অনুরোধ করতে থাকায় তিঁনি এক শুষ্ক উপত্যকায় একটি কবরস্থানের দিকে তাদের নিয়ে যান। সেখানে তিঁনি দোয়া পড়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, তোমার পর্দা সরিয়ে ফেল। ফলে হঠাৎ কিছু বাগান ও নহর বা খাল দেখা গেল একদিকে এবং অন্যদিকে জাহান্নামের আগুন দেখা যাচ্ছিল। একদল বলে উঠলো জাদু জাদু। কিন্তু অন্য একদল এই মোজেজাকে বিশ্বাস করে বললেন, বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন :- কবর হচ্ছে বেহেশতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত।

বৃষ্টি বর্ষণ :-

একবার জনগণ বৃষ্টির অভাবে মওলা আলী (আঃ)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করায় তিঁনি দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। এতো বৃষ্টি হলো যে এবার জনগণ বলতে লাগলো খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তিঁনি আবারও দোয়া করায় বৃষ্টি কমে যায়। (সূত্রঃ বিহারুল আনোয়ার)।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা :-

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য মোজেজার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো আঙুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা। এটি কুরাইশদের সামনে ছিলো নবীজির নবুয়্যতের প্রমাণ এবং নবী বিদ্বেষীদের জন্য তাঁর উচ্চ মর্যাদার দলিল। অন্য কোন নবীর পক্ষ থেকে এর চেয়ে বিস্ময়কর কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ-

হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে আবু জাহেল, ওলিদ বিন মুগীরাহ এবং আ'স বিন ওয়ায়েল প্রমুখ কাফিররা তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিখ্যাত জাদুকরদের সঙ্গে করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তুমি যদি সত্য নবী হও, তবে আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখাও। কারণ জাদু - জমিনে চলে কিন্তু আসমানে চলে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা ঈমান আনবে ? উত্তরে তারা বললো- হ্যাঁ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যেন চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবের দোয়া কবুল করলেন। অতঃপর

জিব্রাঈল মারফত তিঁনি চাঁদের দিকে আঙ্গুলি ইশারা করতেই তা দুই টুকরা হয়ে গেল। এবার তিঁনি কাফিরদের এক একজনের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন, হে অমুক, সাক্ষী থাকো। সকল কাফিররা চাঁদের দ্বিখন্ডন ভালোভাবে দেখতে পেলো। চাঁদের খন্ড দুইটি পরস্পর থেকে এতো দূরে চলে গেলো যে এটার মধ্যদিয়ে হেরা পর্বত দেখা যাচ্ছিল। জাদুকরেরা সাথে সাথে রসূলের (সাঃ) (আঃ) প্রতি ঈমান আনল কিন্তু কাফেরগণ অর্থাৎ আবু জেহেল এই ঘটনাকে অস্বীকার করলো, এটাকে নিছক জাদুক্রিয়া বলে মন্তব্য করলো এবং জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলল; তোমাদের জাদু জমিনে চলে কিন্তু মোহাম্মদের জাদু আসমানেও চলে। (নাউজুবিল্লাহ্)

ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা :-

উর্দ্ধাকাশে নবীজির মোজেজার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা। ইমাম তাহাভী ও তাবরানী আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের কাছাকাছি সাহবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় তাঁর উপর অহি নাজেল হয়। তিঁনি হযরত আলী (আঃ)-এর জানুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আলী (আঃ) তখনও আসরের নামাজ পড়েন নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায় তিঁনি নড়া চড়া করছেন না। সূর্য অস্ত গেলো। নবীজি নিজেই জাগ্রত হয়ে হযরত আলী (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আলী! আসরের নামাজ পড়েছো ? তিঁনি বললেন, না। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহ্! তোমার আলী, তোমার এবং তোমার রসূলের আনুগত্যে ছিলো। অথচ আলী (আঃ)-তো শুধু নবীরই (সাঃ) (আঃ) আনুগত্য করছিলেন। অতঃএব, একথা পরিষ্কার যে রসূলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য, রসূলের প্রতি ভালবাসাই আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা, রসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণই আল্লাহ্র প্রতি শত্রুতা পোষণ। এটা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একক মর্যাদা যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। নবীজির মোনাজাতের সাথে সাথে সূর্য আকাশে উদিত হলো। হযরত আলী (আঃ) তখন আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন আমি সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি, তারপর আবার সে সূর্যকে আকাশে উঠতেও দেখেছি। সূর্যের রশ্মি তখন পাহাড়ের চূড়ায় এবং জমীনে পতিত হয়েছিলো।

হযরত জাবেরের মৃত সন্তানদেরকে জীবিত করা :-

একবার সাহাবী হযরত জাবের দয়াল নবীজি কে ঘরে দাওয়াত করলেন। নবীজি সাহাবীর দাওয়াত কবুল করলেন। হযরত জাবের খুশীতে আত্মহারা হয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে খুশির খবরটা দিলেন আর মেহমানদারির জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। বড় ছেলে আবদুল্লাহকে নিয়ে খাসী জবাই করে অন্য কাজে যখন হযরত জাবের ঘর থেকে বাহিরে গেলেন, ইতিমধ্যে হযরত জাবের এর ছোট ছেলে ঘুম থেকে উঠে খাসী তাঁলাশ করতে লাগলো। বড় ভাই তাকে জানায় যে খাসীটিকে জবাই করা হয়েছে। ছোট ভাই বায়না ধরলো খাসী কিবাবে জবাই করে আমাকে তা দেখাও । বড় ভাই তাকে ঘরের পেছনে নিয়ে গিয়ে বললো, এখানে খাসী জবাই করা হয়েছে। ছোট ভাই জানতে চাইলো কিভাবে ? বর্ণনা করে বোঝতে না পেরে অবশেষে অজ্ঞতা বশত বড় ভাই বললো, তাহলে তুমি মাটিতে শুয়ে পড়, আমি তোমাকে দেখাই। ছোট ভাই মাটিতে শোয়ার পর বড় ভাই তার গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করার নমুনা দেখাতে গিয়ে ছোট ভাইকে সত্যি সত্যি জবাই করে ফেললো। বড় ভাই যখন দেখলো- ছোট ভাইয়ের গলা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, সে ছটফট করতে করতে এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেছে, তখন বুঝলো ব্যাপারটি কি ঘটেছে। আতঙ্কিত হয়ে সে নিকটবর্তী এক খেজুর গাছের চূড়ায় উঠে আত্মগোপন করে রইলো।

এদিকে হযরত জাবের পুত্রদের খোঁজে বাড়ীর পেছনে এসে ছোট ছেলের অবস্থা দেখে থমকে গেলেন। অতঃপর তাকে বুকে করে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি একটি কম্বল নিয়ে এসো, বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিই। স্ত্রী রক্তমাখা সন্তানের লাশ দেখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু স্বামী হযরত জাবের তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আজ আমাদের শোক প্রকাশ করার দিন না, আমাদের দুঃখ দেখলে নবীজিও দুঃখিত হবেন । অতএব ধৈর্য ধারণ করো। কষ্ট হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলো। তারপর তারা দু'জনে মিলে ছোট ছেলেকে কম্বল মুড়ে রান্নাঘরের পেছনে রেখে আসলেন । স্ত্রী রান্নার কাজে মন দিলেন। হযরত জাবের বের হলেন বড় পুত্র আবদুল্লাহর খোঁজে। বাড়ীর পেছনে গিয়ে ছেলের নাম ধরে জোরে ডাক দিলেন। গাছের উপর আত্মগোপন করে বড় ছেলে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল আর ভয়ে কাঁপছিল। পিতার ডাক শুনে ভাবলো এখন পালাতে না পারলে আব্বার হাতে ধরা পড়তে হবে। ধরা পড়লে আর রক্ষা থাকবেনা। পালানোর উদ্দেশ্যে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। পিতা কাছে গিয়ে দেখেন, আবদুল্লাহর দেহে আর প্রাণের স্পন্দন নেই! বড় ছেলেকে

কোলে তুলে তিনি বাড়ীর ভিতরে আসলেন। স্ত্রীকে বললেন, আরও একটি কম্বল নিয়ে আসার জন্যে। বড় ছেলের এই অবস্থা দেখে দরদী মা পুনরায় আর্তনাদ করে উঠলেন। স্বামী তাকে পুনরায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন; ধৈর্য ধরো, আজ আমাদের দুঃখ প্রকাশের দিন না। আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন। দয়াল নবীজি (সাঃ) (আঃ) অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ঘরে তশরিফ আনবেন।

তারপর দু'জনে মিলে বড় ছেলের লাশও কম্বলে মুড়ে ছোট ছেলের লাশের পাশে রাখলেন। স্বামী-স্ত্রী তাদের চোখের পানি মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেন। হযরত জাবের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে নবীজির (সাঃ) (আঃ)-এর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে নবীজি (সাঃ) (আঃ)-কে উটের পিঠে করে আসতে দেখা গেলো। হযরত জাবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে নবীজির (সাঃ) (আঃ) আগমনের সংবাদ দিলেন। এবং পুনরায় তিনি দৌড়ে বাড়ীর সামনে চলে এলেন। নবীজির উটের কাছে গিয়ে তাঁকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে আনলেন নবীজি জাবের এর ঘরের সামনে উট থামিয়ে তাঁর ডান পা মুবারক মাটিতে রাখলেন, বাম পা মুবারক এখনো নামাতে বাকী। এমন সময় জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্দেশ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌ আপনাকে জাবেরের ছেলেদেরকে সঙ্গে নিয়ে খানা খেতে বলেছেন।

অতঃপর নবীজি (সাঃ) (আঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে জাবের এর ঘরে তশরীফ নিলেন। তাদের সামনে জাবের দস্তর খানা বিছিয়ে দিলেন তার স্ত্রী খাবার পাত্রে দিলেন আর তিনি সেগুলো এনে মেহমানদের সামনে হাজির করলেন তারপর তিনি নবীজিকে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! দয়া করে খানা শুরু করুন নবীজি (সাঃ) (আঃ) বললেন, হে জাবের ! তোমার ছেলেরা কোথায় ? তাদেরকে ডাক হযরত জাবের বললেন, ইয়া হাবীবাল্লাহ! আপনি দয়া করে খেয়ে নিন ছেলেদেরকে আমি পরে ডাকবো হযরত রসূল (সাঃ) (আঃ) পুনরায় বললেন তোমার ছেলেদের ডেকে নিয়ে এসো তাদেরকে সাথে নিয়ে খানা খাবো। হযরত জাবের ও তার স্ত্রী হাত জোড় করে পুনরায় আরজ করলেন , ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি খানা খেয়ে নিন আমরা তাদেরকে ডেকে দিচ্ছি। তখন নবীজি বললেন, হে জাবের ! এইমাত্র জিব্রাঈল ফেরেশতা আমাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ জানিয়ে গেলেন, আমি যেন তোমার ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে খানা খাই। নবীজির একথা শুনে হযরত জাবের ও তার স্ত্রী আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন

না । তারা চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন, তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) হযরত জাবেরকে বললেন, তোমার ছেলেদের কাছে গিয়ে বল, আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) (আঃ) তাদেরকে ডাকছেন। হযরত জাবের নবীজির নির্দেশ মোতাবেক ছেলেদের লাশের সামনে গিয়ে তা বললেন, সঙ্গে তারা দু'জন আল্লাহু আকবর বলে উঠে নবীজির কাছে দৌড়ে চলে গেল। অতঃপর নবীজি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক হযরত জাবের এর দুই সন্তানকে নিয়ে খানা খেলেন। সুবহানাল্লাহ (সূত্রঃ মাদারেজুন্নাবুয়াত - মোজেজাতুর রসূল)

মহানবীর অলৌকিক মোজেজা দেখে ইহুদী পরিবারের ইসলাম গ্রহণ :-

মদীনার বুকে একজন জনসম্মুখে প্রিয় নবীজি হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ)-কে অপদস্থ করার এক কু-বাসনা নিয়ে নবীজির কাছে এসে বললেন, 'হে মোহাম্মদ, তুমি দাবি করেছো, তুমি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী এবং তোমার কাছে নাকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহি (আল্লাহ্‌র বাণী) আসে। তুমি যদি তোমার দাবীতে সত্য হও, তাহলে এমন কিছু করে দেখাও যা সাধারণ কারো পক্ষে সম্ভব না"। এই কথা শুনে তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) বললেন, ঠিক আছে কি দেখতে চাও তুমি-ই বল ? তখন সেই ইহুদী দূরের একটা গাছ কে দেখিয়ে বললো, দেখি এক মূহুর্তে কোন হাতের স্পর্শ ছাড়া গাছটিকে এখানে হাজির করে দেখাও তো। তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) মুচকি হেসে বললেন, আমি কোন কিছুই বলবো না, তুমি-ই সেই গাছটির কাছে গিয়ে শুধু এতটুকু বল যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল (সাঃ) (আঃ) তোমাকে ডাকছেন। কথামত সেই ইহুদী তার মনের সেই কু-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে, গাছটির কাছে গিয়ে বললো, তোমাকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল (সাঃ) (আঃ) ডাকছেন। ইহুদী এই কথাটি বলার সাথে সাথেই, গাছটি কম্পন করতে আরম্ভ করে দিলো এবং মাটির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে লাফিয়ে লাফিয়ে নবীজির (সাঃ) (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করলো। গাছের এই অবস্থা দেখে সেই ইহুদী অবাক হয়ে আবার বললো, দেখি গাছটিকে আবার তার সেই আগের জায়গায় প্রতিস্থাপন করে দেখান। তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) গাছটিকে বললেন, যাও তুমি তোমার নিজের স্থানে ফিরে যাও। সাথে সাথে গাছটি আবার তার পূর্বের স্থানে ফিরে গেলো। নবীজির এই অলৌকিক মোজেজা দেখে ইহুদী লোকটি সাথে সাথে উচ্চস্বরে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। এবং পরে তার

পরিবারের সকল সদস্যকে মুসলমান করালো। (আবু দাউদ- নুজহাতুল মাজালিছ- হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন- ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

উটের সেজদা দেওয়া :-

ইমাম আহমদ এবং নাসায়ী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদিস বর্ণনা করেছেন :- আনসার গোত্রের প্রত্যেকেই উট পালন করতো। এক বাড়িওয়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, আমার একটি উট রয়েছে যার পিঠে করে আমি পানি এনে থাকি। উটটি বড় বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে, সে বোঝা বহন করতে চায় না। আর এদিকে আমার খেজুর বাগান পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উটটির কাছে গেলেন। তিঁনি বাগানে পৌঁছালেন এবং একস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগানের এক কোণে বসা ছিলো উটটি। আনসারী লোকটি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটাই আমার উট, যে কুকুরের মতো মানুষকে কামড়াতে চায়। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আপনাকেও সে কামড়ে দেয়। নবীজি (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমার ব্যাপারে ভয় করো না। তিঁনি উটের সামনে গেলেন। উটটি তাঁকে দেখা মাত্র মাথা উঠালো এবং তাঁর সামনে গিয়ে কদম মোবারকের কাছে মাথা নত করে সেজদা করলো। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির মাথার পশম ধরে টান দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

নবী (সাঃ) (আঃ) আঙ্গুলি মুবারক হতে পানির স্রোত :-

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়াতে একবার সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় কাতর হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, সহযাত্রীদের কারো নিকট পান করার মতো পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি ওজু করার পর বদনাতে যে সামান্য পানি পড়ে আছে এখন তাই শেষ সম্বল। একথা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্ত মুবারক বদনার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুলী হতে পানির স্রোত বইতে লাগলো। সকল সাহাবা তৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে ওজু করলেন। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিলো ? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা পনেরশ ছিলো

বটে কিন্তু এই সংখ্যা যদি লক্ষও হতো তথাপি সকলের প্রয়োজন মিটাতে ঐ পানিই যথেষ্ট ছিলো।

সামান্য আহারে বরকত :-

খাবারে বরকত সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এসেছে। তার মধ্যে একটি হলো :- হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। কিন্তু যথা সময় নবীজি তাকে বললেন, বড় বড় দেখে ত্রিশ জন আনসারীকে দাওয়াত কর। নবীজির হুকুম অনুযায়ী ত্রিশজন আনসারী এসে খেয়ে গেল। অবশেষে দেখা গেল, ঐ দু'জনের খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী তৃপ্তি সহকারে আহার করবার পরও খাবার বেঁচে গিয়েছে (বায়হাকী)। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঐ সামান্য খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী পেট ভরে আহার করলো এবং এই মোজেজা দেখে সকলে ইসলাম কবুল করে রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলো। তিনি আরো বলেন, সেই দিন ঐ খাবার দ্বারা সর্ব মোট একশত আশিজন তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলো।

গাছ বা বৃক্ষের কান্না বিষয়ে :-

আবদুল্লাহ উমর বর্ণনা করেছেন যে :- নবী খেজুর গাছের কান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর খুতবা প্রদান করতেন। একজন মহিলার অনুরোধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন যে তাঁর জন্য তিনটি ধাপের একটি ছোট মিম্বর নির্মাণ করো যাতে তিঁনি আরও বেশি দৃশ্যমান হন এবং ক্রমবর্ধমান শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর কণ্ঠ আরও বিস্তৃত করতে পারেন। পরের শুক্রবার নবীজি (সাঃ) (আঃ) যখন নতুন মিম্বরে আরোহণ করলেন, তখন এই গাছের কান্ড থেকে কাঁদতে কাঁদতে জোরে জোরে শব্দ করে উঠল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচে নেমে এসে তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কেউ তার আপন সন্তানের শান্ত করার জন্য যেমন ভাবে তার উপর হাত বুলায় ঠিক তেমন করে হাত বুলাতে শুরু করলেন। অনেকে এর কান্নাকাটি শুনে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ইবনে আব্বাস যোগ করেছেন, "তিঁনি গিয়ে এটিকে জড়িয়ে ধরলেন যতক্ষণ না শান্ত হয়, সেই গাছটি শান্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) (আঃ)

আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি যদি তার কান্না গ্রহণ না করতাম তবে কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকতো"।

মোরাকাবা মোশাহেদা

মোরাকাবা অর্থ ধ্যান, মোশাহেদা অর্থ কোন সত্ত্বাকে পাওয়া। অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে কোন সত্ত্বাকে পাওয়া বা উপলব্ধি করার নাম মোরাকাবা মোশাহেদা। মোরাকাবা বলতে আকার আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু, মোশাহেদা বলতে ঐ বস্তুর উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি। মোরাকাবা বস্তুর প্রতি গভীর ধ্যান বা মনোযোগ বুঝায়।

"মোরাকাবা" দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মোর শব্দটি মোর + আ (প্রত্যয়) যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায় আমার। আর কাবা অর্থ মক্কার অবস্থিত আল্লাহ্‌র ঘর তোলা অস্থাবরণ, আধ্যাত্মিক ভাবে শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল বা গন্তব্য স্থল। দুনিয়া বাসীর চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে স্রষ্টার দর্শনের আশায় একাগ্র চিত্তে নিমগ্ন বা ধ্যানস্ত হওয়ার নাম মোরাকাবা। আর ধ্যান করতে গেলে সুরত বা চেহারা প্রয়োজন, তাই পীরের চেহারা বা সুরতে মশগুল থাকা মোরাকাবা। মোশাহেদা অর্থ দর্শন বা দেখা পীরের রূপ ব্যতীত কিছুই থাকে না (আমিত্ব হাস্তির)। কিছুই না থাকলে তখন বিশেষ কিছু আলামত বা নিদর্শন দেখা যায় তা হলো মোশাহেদা। মোরাকাবা কাবায় মৃত্যু বরণ করা। এখন কথা হলো কাবা দুই প্রকার, জাহেরী কাবা মক্কায় অবস্থিত আর বাতেনি কাবা হলো গুরু বা মোর্শেদ। মওলা আলী (আঃ) বলেছেন, "আমি ঐ আল্লাহ্‌র এবাদত করি না, যাকে আমি দেখি না"। রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন, "মওতা কাবলা আনতা মুতু" অর্থ তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া যাও। উক্ত বাণীর আলোকে আপন মোর্শেদের মধ্যে ফানা বা বিকশিত হওয়াই হলো মোরাকাবা আর এমন অবস্থায় সামনে দৃশ্যায়ন যা কিছু উপস্থাপিত হয় তাই দেখা হলো মোশাহেদা। অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুকে সামনে উপস্থাপন প্রক্রিয়া হলো মোশাহেদা।

কোরআনুল মাজিদের সূরা আল-ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- "বলুন (হে মোহাম্মদ) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে চাও, সুতরাং আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং (তিঁনি) তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ অত্যান্ত ক্ষমাশীল (এবং) পরম দয়ালু"। একই সঙ্গে সূরা

আল-ইমরানের “১৯০” নাম্বার আয়াতে উল্লেখঃ- “নিশ্চয় আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি এবং দিনের পরিবর্তন অবশ্যই উলীল আলবাবদের (বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের) জন্য আয়াত (নিদর্শন) রহিয়াছে”। সূরা সাবা, ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছেঃ- “(হে নবী) তুমি বলো, আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি তা হলো তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার জন্যই (সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে যাও। দু-দু’জন করে (দু’জন না হলে) একা একা, অতঃপর ভাল করে চিন্তা কর”।

তাহলে সূরা আল-ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক উল্লেখ করলেন, আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাইলে মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) এর আনুগত্য করতে হবে, তবেই সেই আনুগত্য’র মূল্যায়ন হিসাবে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসবে। তাহলে রসূল (সাঃ) (আঃ) ১৫ বছর হেরা পর্বতের গুহায় মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত ছিলেন বাংলায় ইহাকে ধ্যান বলে। এটাই উম্মতের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন, তাঁর এমন আমল দরকার ছিল না। কারণ হাদিস শরীফে আসছে, “আদম যখন কাদা ও পানিতে মোশানো তখনও আমি নবী”। আলোচ্য আয়াতে গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিবেন তিঁনি অত্যান্ত পরম দয়ালু। একই সঙ্গে উক্ত সূরার ১৯০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক উল্লেখ রাখলেন :- “নিশ্চয় আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি এবং দিনের পরিবর্তন অবশ্যই উলীল আলবাবদের (বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের) জন্য আয়াত (নিদর্শন) রহিয়াছে”। তাহলে উলিল আলবাব বা বিচক্ষণ ব্যক্তির যোগ্যতায় সমাসীন হওয়ার যে প্রক্রিয়া তা হলো এই মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমের মানুষ বিচক্ষণ ব্যক্তিতে পরিনত হয়। সূরা সাবার ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে একটি উপদেশ তা হলো সত্যের উপর দন্ডায়মান হবার নির্দেশ দিচ্ছে কোরআন, সেটা আবার দু-দু’জন করে তা না হলে একা একা এবং সঙ্গে চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে তাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার খেতাব জগতের সর্বশ্রেষ্ট নবী সরকারে দো আলম ইমামে কেবলা তাঈনে সরদারে হাসমি রহ্‌মাতুল্লিল আলামিন সাইয়্যেদুল কাউনাইন শফিউল মুজনাবিন ইমামুল মুরসালিন হাবীবুল্লাহ্ হুজুর আবুল কাশেম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম অর্জন করলেন “আল-আমিন” খেতাব সবার কাছে গ্রহণীয় ইহাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধারা।

অতঃপর ভাল করে চিন্তা কর, এই চিন্তা হলো থিসিস বা গবেষণার একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট হবার বা নিমগ্ন হওয়ার চিন্তারই উল্লেখ। মুর্শিদ রূপের ধ্যানে পূর্ণতা পেলে আধ্যাত্মিক ভাবে রসূলের সংযোগ হয়। তখন সাধক রসূলের (সাঃ) (আঃ) সুরত ধরিয়া ফানাফির

রসূল হাসিল করেন। যা কলেমার বিভাজনে উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপঃ- মোরাকাবা দ্বারা আশেক যখন খুব উপরে (উঁচু স্তরে) আরোহণ করে তখন পীরের সুরত ইলমে লাদুনী অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের খবর পেতে থাকেন, এমন পর্যায়ে পীরের মাধ্যম ব্যতীত কিছুই গ্রহণীয় নয়। আফতাবে এলাহী আবুল হোসেন খেরকানী (আঃ) বলেন, "এবাদত যখন তোমার (মাশুকের) উদয় হয় তখন আমি থাকি না আর আমার উদয় হলে তুমি থাক না"। তিনি আরও বলেন, "এবাদতে হয় তুমি থাক, না হয় আমি থাকি দুই যেন না হয়"।

রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেনঃ- যদি আয়নায় মানুষের চেহারা দেখা না গিয়ে চরিত্র দেখা যেত তাহলে মানুষ তার চেহারা সুন্দর না করে চরিত্র সুন্দর করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকত। কোরআনুল মাজিদের সূরা ইউনুসের ৪৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেনঃ- "যাহারা আল্লাহ্র সাক্ষাত অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না"। আল্লাহ্কে দর্শন করতে তিঁনি স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী কর্ম বা সাধনা করতে বলেছেন সূরা ইনশিকাকের ৬ নাম্বার আয়াতে :- "ওহে মানুষ, নিশ্চয় তুমি মেহনতকারী তোমার প্রতিপালকের দিকে মেহনতে, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাতকারী "। রসূল (সাঃ) (আঃ) বলেনঃ- "আল্লাহ্র ধ্যান তথা মোরাকাবা-মোশাহেদায় নিমগ্ন একটি মুহূর্ত ৭০ বছর এবাদত বন্দেগী থেকে উত্তম" (সিররুল আসরার পৃঃ ১৭)। অপর একটি হাদিসে আসছেঃ- "আল্লাহ্র জাতের ধ্যানের একটি মুহূর্তের মর্যাদা হাজার বছর এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ" (বোখারী-৬৯৭০, মুসলিম-২৬৭৫)।

হযরত হামীদুদ্দীন নাগরী (রহঃ) তার "নাহাক্কাতুল" গ্রন্থে লিখেছেনঃ- কেবলা ৪ (চার) প্রকার।

১) মক্কায় অবস্থিত সকল মুসলমান নামাজ আদায় করে।

২) মমিনের নিজের কলব বা দিল যার দিকে তরিকত অবলম্বীদের লক্ষ্য।

৩) কেবলা মুর্শিদ যার দিকে মুরিদের সকল এরাদা থাকা উচিৎ।

৪) কেবলা ওয়াজহুল্লাহ্ যা সকল কেবলা বিলীনকার।

বাবা হযরত নিজামউদ্দীন আওলিয়ার (আঃ)-এর ভক্ত প্রেমের কবি বাবা আমির খসরু (আঃ) গেয়েছেন:- "যখন প্রনয়নীর রূপ ব্যতীত অন্য কেবলা ছিল না, তখন প্রেম এসে অন্য সকল কেবলাকে বিলীন করে ফেলল। কথিত আছে, একবার নিজামউদ্দীন আওলিয়া (আঃ)-এর দরবারে উপবিষ্ট তাঁর মাথার টুপি তেরছি ভাবে একদিকে হেলানো তা আমীর খসরুর (আঃ) চোখে বড় সুন্দর লাগল। তিঁনি বলে উঠলেন, সকল জাতির জন্য এক-একটি পৃথক পন্থী ধর্ম ও দিক (কেবলা) নির্দিষ্ট আছে। আমি আমার কেবলা তেরছি টুপির দিকে নির্ধারণ করলাম।

কথিত আছে যে, একবার কোন এক অপরাধে শেখ আজল তাবরেজীকে কতল করার জন্য জল্লাদের হাতে অর্পণ করা হয়। জল্লাদ তাকে কতলের স্থানে নিয়ে কেবলামুখী করিয়া দাঁড় করায়। তখন শেখ আজল তাবরেজী দেখল তাঁর পীরের মাজার তাঁর পিছনে পড়ে। তিঁনি কেবলার দিক হতে ঘুরে মুর্শিদের মাজারের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। জল্লাদ তাঁকে বলল, তুমি এখন যে অবস্থায় পতিত তোমার কেবলার দিকে মুখ করা কর্তব্য। জবাবে তিঁনি বললেন, তোমার তা দিয়ে কি কাজ। তুমি তরবারি উত্তোলন কর এবং আমার ঘাড়ের উপর মারো, আমি আমার নিজ কেবলার দিকেই তাকিয়ে আছি। এ বিষয় নিয়ে জল্লাদের মধ্যে তাঁর তর্ক বেঁধে গেল। এ তর্ক থাকতে থাকতে শাহী ফরমান এলো, ফরমানে উল্লেখ দরবেশকে ক্ষমা করা হলো, তাঁকে মুক্তি করে দাও। ফাওয়ায়েদুস সালেকীন কেতাবে লিখিত আছে হযরত বখতিয়ার কাকী (আঃ) যখন এই ঘটনা বিবৃতি করছিলেন। তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ চোখে বললেন, সেই ফকিরের এই প্রকার নেক আকিদা তাঁকে কতল হতে মুক্ত করেছিল।

হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্পাক তিনটি এবাদত শিখিয়েছিলেন:- "জিকির, মোরাকাবা, মোশাহেদা। এই তিনটি এবাদতই ছিল তাঁর নামাজ। হযরত আদম (আঃ) সালেহা, সালেহা, সালেহা বলে জিকির করতেন" (তথ্যসূত্র: ইটিভি ২ মে, ২০১৮ [২৩:১৯])। এছাড়া হযরত আদম (আঃ) গর্দান ঝুঁকিয়ে মোরাকাবায় বসে থাকতেন, ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। তাছাড়া হযরত আদম (আঃ) তৃতীয় সাধনা ছিল মোশাহেবা। রাতের গভীরে একাকী নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে নিজের বিচার করাই হলো মোশাহেবা। তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে উল্লেখ হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) বলেন:- "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুর পূর্বে নিজের বিচার করে নেয়"। রসূল (সাঃ) (আঃ)

বলেন:- "তোমরা যখন আল্লাহ্‌র এবাদত করবে তখন হয় ভাববে তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ, না হয় ভাববে আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।

মোরাকাবা-মোশাহেদা বুঝবার জন্য উল্লেখিত সনদ গুলো তুলে ধরা হলো। এই আমল নীতির দ্বারা মানুষ স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। মহানবী (সাঃ) (আঃ) তাঁর হায়াতের জিন্দিগিতে ১৫ বছর (জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সময়) হেরা পর্বতের গুহায় কাটালেন। তাঁরই উম্মত আমরা স্বীয় ধর্মের চলমান মানদন্ডে এই মোরাকাবা-মোশাহেদার (জাহিরি ভাবে) স্থান হলো না। প্রচলিত ব্যবস্থায় ধর্মে এই আমল নীতির কোন তাগিদ পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে ধর্মের বিতর্কের অবসান গুলি কি দিয়ে নিঃষ্পত্তি হবে ? মূল ধারার বিধান কোন ধারাতে প্রতিষ্ঠিত হবে! তাই জ্ঞানীদেরকে চিন্তিত করে। এহেন অবস্থা উত্তরণের জন্য সুফিরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক এই আমল নীতির সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাই মানুষ মুক্তির ধারাতে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে একটি পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত হতে হলে অবশ্যই তাকে মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত হতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্ কর্তৃক সকল প্রতিনিধিগণের আমল নীতি ছিল এই মোরাকাবা-মোশাহেদা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচাইতে বেশী জরুরী হলো "গুরুবাদ" ব্যবস্থা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো, আপন মোর্শেদের ভিতর ফানা বা বিকশিত হবার ধারা থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের বা আমল নীতির কার্যকারিতা মেলে। জ্ঞানীগণের উক্তি, "মোর্শেদ হলো রসূল (সাঃ) (আঃ) দেখার আয়না, আর রসূল (সাঃ) (আঃ) হলো আল্লাহ্ দেখার আয়না"। এজন্য মূল কথা দাঁড়ায় মোর্শেদ হলো সূচনা বা সিঁড়ি। মোর্শেদ ছাড়া এসকল বিষয় কিছুই সম্ভবপর নয়। ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত আশেক যার ইহকাল ও পরকালের সকল আশা পরিত্যাগ করে মাশুকের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে। আবার বলা হয়েছে, সত্যিকারের আশেক সেই ব্যক্তি যিনি মাশুকের দেওয়া সকল দুঃখ-কষ্ট ও মসিবতকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন এবং উহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না।

কথা কম, খাওয়া কম, ঘুমানো কম মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের অবশ্যই পালনীয় কাজ।

এ প্রসঙ্গে কোরআনুল মাজিদের সূরা আনফাল আয়াত নং ২৮ উল্লেখ :- "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অকল্যাণের সম্মুখীনকারী, বস্তুত আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা কল্যাণ"।

আলোচ্য মোরাকাবা-মোশাহেদা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সার সংক্ষেপ দিয়ে শেষ করব। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার এল. জন বেয়ার্ড সংক্ষেপে লে. জি. বেয়ার্ড বলা হয়। তিনি টেলিভিশন আবিষ্কার করেন তার এই আবিষ্কারের কার্য-করণ তিনি উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, প্রথম আমি একটি মানব দেহ নিয়ে গবেষণা শুরু করি যার নাম দিয়েছি ম্যান্টাল বডি (মানব দেহ)। দীর্ঘকাল গবেষণার পর এটা রূপান্তর হয়ে গেল, রূপান্তরিত যে দেহ সেটাকে নাম দেওয়া হলো অষ্ট্রাল বডি (জ্যোতির দেহ)। এটা নিয়ে কৌতুহল সৃষ্টি হলো আমার মধ্যে, তাই আমি এটা নিয়ে আরো গভীর ভাবে গবেষণায় লিপ্ত হই। পরবর্তীতে এটা আবার রূপান্তর হলো, যার নাম দিলাম অকেশনাল বডি (নিমিত্ব দেহ)। এই নিমিত্ব দেহ হতেই আমার এই আবিষ্কার (সংক্ষিপ্ত)।

এখানে বুঝবার বিষয় হলো, সাধক যখন আপন মোর্শেদের ধ্যান বা মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত থাকেন তখন পরিবর্তিত রূপ হতে হতে পর্যায় ক্রমে তা মূলের ধারাকে উদ্ভাসন এবং মিলন প্রক্রিয়াতে পৌঁছে দেয়। এজন্য আধ্যাত্মিক প্রদীপ্ত আকারে তা সাধকের মাঝে প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ঘটায়। এই প্রদীপ্ত অবস্থাটাই হলো মোরাকাবা-মোশাহেদার পরিপূর্ণতার প্রাপ্তি। সাধনা বা মোরাকাবা-মোশাহেদা সম্পর্কে আরও ভাল করে বুঝতে আমার মোর্শেদ কেবলা-কাবা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর "সুফিবাদ আত্ম পরিচয়ের একমাত্র পথ (১ম খন্ড)" কিতাবখানা পড়তে পাঠক বাবা-মায়েদেরকে অনুরোধ রাখি। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ' সবাইকে যেন মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে অবগত করবার তৌফিক দান করেন। আমিন।

জঙ্গীবাদের উত্থান

(ধর্ম)

ধর্ম ব্যবহার করে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সরল সহজ কাঁচা গলা মানুষের ঈমানী শক্তিকে হরণ করে ধর্মের মূল ধারা থেকে বিচ্যুতি ঘটায়ে মানুষকে মানুষ হত্যার ব্যবহারিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা তা হলো যে, মহান ধর্মীয় শিক্ষা শান্তির বিধান, যে আদর্শ শান্তির বিধানকে খোদাতালা শ্রেয় বলে স্বীকৃতি

দান করেছেন। সেই উত্তম পুরুষ রসূলে করিম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) তাঁর জীবন দর্শায় কোন একজন সাহাবীকে আমল নীতির কৈফিয়্যত তলব করেছেন এমন হাদিস চোখে মেলে না। অথচ বাংলার জমিনে প্রতিটি গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত কৈফিয়্যত তলবের চাটুকারিতার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মাঝে স্থান করে চলেছে। রসূলে পাক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)- এর জিহাদ নীতি আর বর্তমান জঙ্গী মতাদর্শের জিহাদ নীতি এজিদী নীতিকে হার মানায়। যেখানে ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠি একই ধর্মের বিশ্বাসে বলীয়ান, সেখানে কার সঙ্গে যুদ্ধ? কেন এই মানুষ হত্যার ষড়যন্ত্র? কি তাদের চাওয়া? এজিদী শিক্ষাতে অনুপ্রাণীত হলেই এমন হওয়াটা অবাস্তব কিছু নয়। এসব যারা করে চলেছে তাদের মধ্যে মোনাফেকী আচরণ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। লোভ এবং মোহ দ্বারা ধর্মের ব্যবহার সুনিশ্চিত করবার অপকৌশলে লিপ্ত।

ধর্মীয় শিক্ষার মূল সোপান :-

* সত্যবাদীতার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

* পোশাকী সভ্যতাকে পরিহার করে আত্মিক অনুশীলনকৃত ব্যবস্থাকে

সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া।

* ধর্মের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে কোরআন এবং হাদীসের সংযোজন ও

বিয়োজনকৃত অর্থ সংস্কার সহ মূল অর্থের স্থলে মনগড়া অর্থের

সংযোজন সংশোধনসহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঠিক নজরদারী।

* আদর্শকে মুখে প্রচারতব্য না রেখে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে

চেষ্টা করা।

* সুফি এবং ভাববাদী মানুষের কর্মকে সুন্দর করতে সুযোগ দেওয়া।

* গণ জোয়ারের চাইতে জ্ঞানীদের মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

* ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, অন্যের পালনকৃত ধর্ম-কর্ম বিষয়ে খবরদারী না করা, আদর্শ এবং সঠিক আকিদা উপস্থাপন অনুযায়ী বোঝানো।

মন

মন বলতে হৃদয়কে বোঝায় যার আবিধানিক অর্থ হলো চিত্ত বা অন্তঃকরণ, এই অন্তঃকরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণগামী করতে কিছু ধ্যান-ধারণা রাখা আবশ্যক। মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টাকারী সাধকগণ এই মনের সাথে যুদ্ধে জয় লাভের মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ করেছেন এজন্য গুরুবাদ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

* ভোগ :- ইহকাল ও পরকাল উভয় ভোগ থেকে বৈরাগ্য হওয়া।

* নিয়মানুবর্তিতার নীতি বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করা।

* মনের ক্রিয়া বা চিন্তা চেতনা বারবার পরীক্ষা করা।

* প্রাথমিকভাবে মনের উদয়কৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী না চলা।

* মনকে সৎকাজে সবসময় সংযোজন করা।

* মনকে পরম- এর সহিত নিযুক্ত করা। বারবার নিরুৎসাহিত হবার পরও এটাতে কঠিনভাবে স্থায়ী হওয়া।

* একমাত্র লক্ষ্যকে স্থির করা।

* নাভিমূল এবং নাসিকারন্ধ্রে প্রবাহমান বায়ুর চলাচলের উপর খেয়াল করা। (গুরু নির্দেশিত ব্যবস্থা সংযোজিত)

* বন্ধ কর্ণে শোনার অভ্যাস চালু করা।

* ধ্যান বা মোরাকাবায় ব্রতী হওয়া।

* জীবের প্রতি দয়া ও সুখীদের প্রতি প্রেম, দুঃখীদের প্রতি দয়া, পূণ্যাত্মাদের প্রতি প্রসন্নতা এবং পাপীদের প্রতি উদাসীনতা সবসময় মনকে প্রসন্ন রাখে।

* তাসাউফ সহ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের গবেষণামূলক পুস্তক অধ্যয়ন ও চিন্তা চেতনায় নিমগ্ন হওয়া।

* নাকের বায়ু চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রন আনয়ন করতে সচেষ্ট হওয়া।

* শ্বাস দ্বারা জিকির পরিচালনা করা। গুরু নির্দেশিত ব্যবস্থা গ্রহণ অধিক ফল লাভ হতে পারে।

* স্রষ্টার সান্নিধ্যে নির্বাণপ্রাপ্ত ভাবনাতে নিয়োজিত হওয়া।

* মনের সকল কার্য বারবার পরীক্ষা করা কৃতকার্য অনুযায়ী।

* একমাত্র স্রষ্টার ধ্যান এবং তাঁর নামজপ আরাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া।

চাঁদ

প্রথমত :- চাঁদ মহান স্রষ্টার নিয়ামত। উক্ত নিয়ামতকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইহা একটি গ্রহ বা উপগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এ বিষয়ে গবেষণা চলমান। প্রশ্ন জাগে আরবি বার মাসের নামকে গণনা পঞ্জি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে পৃথিবীর উদয়কৃত চন্দ্র ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং সংকোচন দেখা যায়, মাঝে পূর্ণিমা বা পূর্ণ চাঁদের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অমাবশ্যা হলে চন্দ্র থাকে না, ইহা কোথায় যায়? এবং প্রতিটি মাসে চাঁদের এই পরিবর্তন এর মূল বিষয় কি?

দ্বিতীয়ত :- সাধক জীবন অনুশীলনগামী ব্যবস্থাকে সাধক চন্দ্রকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাপ্তির উদয়কৃত ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে লালন সাঁইজীর কিছু গানের কলি তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম :-

*** স্বর্গচন্দ্র মনিচন্দ্র হয়**
তাহাতে বিভিন্ন কিছু নয়
এ চাঁদ সাধলে সে চাঁদ মেলে
লালন কয় সাধো নির্জনে।।

*** নব লক্ষ ধেন চড়ায় রাখালে**
চাঁদের খবর সেই জানে
চাঁদ ধরেছে বৃন্দাবনে
শ্রী রাধার কমল ভান্ড ভেঙ্গে ননী খায় গোপালে
লালনের ফকিরী করা নয় ফকিরী
দরবেশ সিরাজ সাঁই যদি ছায়া দেয়।।

*** চন্দ্র-সূর্য যে গড়েছে**
ডিম্ব রূপে সেই ভেসেছে
একদিন হিল্লোল এসে
নিরঞ্জনের জন্ম হয়।।

*** নিচের চাঁদ রাহুতে ঘেরা**
গগন চাঁদ কি পাব ধরা ?
যখন হয়রে অমাবস্যে
তখন চন্দ্র রয় কোন দেশে ?

লালন ফকির হারায় দিশে
চোখ থাকতে হয় কানা।।

* চাঁদে চাঁদে চন্দ্র গ্রহণ হয়
সে চাঁদের উদ্দিশ পাওয়া
যে জানে সে রসিক মহাশয়।।

* লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা
তাহার মাঝে অধর চাঁদের আভা
ও সে চাঁদের বাজার দেখে, চাঁদ ঘুরানী লেগে
দেখিস যেন হসনে জ্ঞান হারা।।
আলেক নামে শহর আজব কুদরতী
রাতে উদয় ভানু দিবসে বাতি
যে জন আলোর খবর জানে, দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে সে চাঁদ দেখেছে তাঁরা।।

* চারি চাঁদে দিচ্ছে ঝলক মনি কোঠার ঘরে
চেয়ে দেখ নারে মন দিব্য নজরে।।

উল্লেখিত বয়ান চাঁদ সম্পর্কিত রূপকতার আশ্রয়ে বর্ণনা খুঁজে পাই কিন্তু বর্তমান ইন্টারনেট ব্যবস্থাতে যেভাবে মুক্ত আলোচনা আমরা আশা করছি তাতে আড়াল বা আবরণের লেশ মাত্র থাকে না, এজন্য যাদের কার্যক্রম সাধনা রাজ্যের ছোঁয়া পায়নি তারা বিরূপ মন্তব্য করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

উল্লেখ্য মহান স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য নিয়ে যারা অনুশীলন করেন তারা প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আর যারা এ বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য অমূলক ধারণা ব্যতীত কিছু নয়। একটি দেহ কাঠামোকে চৈতন্য ধারার ধারণা দিতেই সাধকের রচনাবলী কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান দুনিয়াতে ধর্মের বিষয়ে যত দলমত সৃষ্টি হয়েছে তাতে একেশ্বরবাদ বলা এবং বোঝানো কঠিন। অর্জন বিষয়কে সামনে নিলে নিজেকে অনুপ্রাণীত করে নিজেরই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, তবে অবশ্যই গুরু নির্দেশিত হতে হবে। তাই চাঁদ বিষয়ে গবেষণার মানদন্ডে একটু বিস্তারিত জানবার ও বুঝবার নিমিত্ত্বে লেখনি টুকো সবার স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যম ব্যবস্থায় প্রকাশ করলাম।

আশা করি নতুন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে মানুষ একটি সুন্দর ধারণা পাবে। সকল মানব-মানবীর কল্যান কামনা করে সুন্দরের প্রত্যাশা রাখলাম।

নিবেদক

বাবা দেলোয়ার

সাক্ষাত

"ইয়া আইউহাল্ ইন্সানু ইন্নকা কাদিহুন ইলা রাব্বিকা কাদ্হান ফামুলাকিহি"। অর্থ :- "ওহে মানুষ, নিশ্চয় তুমি মেহনতকারী তোমার প্রতিপালকের দিকে মেহনতে, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাতকারী "।

(সূরা ইনশিকাক ৮৪- আয়াত- ৬)

হুজুর পাক (সাঃ) বর্ণনা করেন, "মান আরাফা নফ্সাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহু"।

অর্থঃ- "যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে"।

মেরাজ পরবর্তীতে হাদিসে পাওয়া যায়, "মান রা আনি ফাকাদ রা আল হাক্কা"।

অর্থঃ- "যে আমার প্রকৃত রূপ দেখেছে অবশ্যই সে আল্লাহকে দেখেছে"।

আজ ধর্ম পথের অনুশীলনকারী গণ মহান স্রষ্টাকে দেখা বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে থাকে এটা সত্যিই লজ্জাজনক। উপরোক্ত কালামপাক এবং হাদিস শরীফের আলোকে মহান আল্লাহ্র দর্শন বা দেখা বিষয়ে দ্বিমতের কোন প্রকার স্থান নেই। যদিও গায়ের জোর এবং প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে কেহ বলে থাকেন আল্লাহকে দেখা যায় না, এটা ব্যক্তির বিভ্রান্তকর বয়ান।

উপরোক্ত আলোচনা টুকোর আলোকে দর্শনবাদ বিষয়ে যারা দ্বিমত পোষণ করে থাকেন, তাদের জ্ঞাতার্থে সংশোধন এবং সংযোজন (যদি থাকে) প্রেরণ করা হইল। সত্যের মানদন্ড চিরস্থায়ী করতে আল্লাহ্ সহায় হউন।

দরবেশী কোরআন

দরবেশী কোরআনের দু'টি বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "পাছে তোমরা যা পাওনি তার জন্য নিজে নিজে দুঃখ করো না এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন সেজন্য অতি উল্লাসিত হয়ে পড়ো "(কোরআন ৫৭ ঃ ৩২)। যে ব্যক্তি

হারানো বিষয়ে দুঃখ করে না এবং যা পায় তাতে বিদ্রোহ করে না সেই প্রকৃত দরবেশী অর্জন করেছে।

কবর

আরবি "কুবর" অর্থ কবর। যা একজন মানুষের মৃত্যু পরবর্তী ব্যবস্থাকে প্রচলিত "কার্যাবলীর অন্তরগত বলে প্রতিয়মান হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় কবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সমাধী বা গোর, এটাকে প্রচলিত ভাবে কোথাও কোথাও বিসর্জন বা সমাধী করণ বলে থাকে।

প্রচলিত ব্যবস্থায় একটি লাশকে যে প্রক্রিয়ায় দাফন সম্পন্ন করা হয় উহাই মূলতঃ কবর প্রক্রিয়া বলে সর্ব সমাজে প্রচলিত ধারা হিসাবে বিবেচিত মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে একটু ভাবনাতে মনোনিবেশ করলে কিছুটা ভিন্ন চিন্তার উদয় ঘটে। যেমন কোন মানুষকে যদি জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলে তাহলে তার লাশের কবর বা সমাধির কি ব্যবস্থা থাকে ? আরো বলতে গেলে পানিতে ডুবে যারা নিখোঁজ হয় তাদের লাশের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না ? নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, স্টিমার ইত্যাদী নৌকায় ডুবে অনেক মানুষই নিখোঁজ হয়ে থাকে। তাদের লাশের অস্তিত্ব কি ? এ ছাড়াও বড় বড় ঝড়, জলোচ্ছাসে এক সাথে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে থাকে, যাদের লাশের কোন চিহ্ন টুকোও পাওয়া যায় না। তাদের কবর কি ? এছাড়াও অনেক বড় বড় অগ্নিকান্ডের ঘটনা পরিলক্ষিত হয় যা কোন প্রকার লাশের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না তাদের কবরের কি ব্যবস্থায়ন ? এ ছাড়াও আরও অনেক প্রক্রিয়াতে মানুষের লাশের কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকেনা তাদেরই বা কবর বা গোরের কি ফায়ছালা ? বিজ্ঞ পাঠক বিষয়গুলো নিজের মনোরাজ্যে নিরপেক্ষ মানদন্ড দ্বারা ভেবে দেখবার এবং সঠিক জবাব টুকো উদ্ধারের নিমিত্ত্বে প্রচেষ্টা টুকো চালিয়ে যাবার আহবান রইল।

কারণ হলো ধর্মের আঙ্গিকে যা কিছু মূল বা আসল বলে আমরা জেনে থাকি তা প্রতিটি মানুষের জন্যই সমান ব্যবস্থা হিসাবে পরিগনিত হবার কথা। যাহা অপরিবর্তনীয় বলে বিবেচিত। ধর্মের মূল বিষয়গুলো রূপকতার সজ্জাতে সমাসিন রাখা হয়েছে যা দ্বারা

মানুষ রূপকতার বলয় থেকে আপন চিন্তা-চেতনা ও সাধনা দ্বারা আসল বা মূলকে উদ্ধারিতে সচেষ্ট হবে।

সুফি মতের আলোকে :- জ্যান্ত দেহকেই কবর বলা হয়। আর কবর বিষয়টির সঙ্গে কেয়ামত বিষয়টা সংযুক্তকরণ হলো এই মতে একজন নফ্‌সধারী মাখলুকের মৃত্যুটাই কেয়ামত আর এই কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত নফ্‌স একটি দেহকেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নফ্‌স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে দেহটি লাশ নামের একটি খেতাবে ভূষিত হয়। তাই মাটির গর্তকে লাশের কবর বলা হয়। জ্যান্ত দেহকে মূল কবর বলা হয়। এখানে একটু বলে রাখা প্রয়োজন অনুভব করছি আর তা হলো (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) এই চারটি জৈবিক উপাদান দ্বারা দেহ গঠন যদিও আধ্যাত্মিক আলোচনায় আরো অনেক বিষয়ই একটি দেহেতে সমাসিন থাকে যা এখানে আলোচনা থেকে দূরে রাখা হলো। তাহলে দেখা যায় যে দেহের বিলুপ্ত ব্যবস্থাটাও এই চারটি জৈবিক উপাদানে মিশ্রিত হয়ে যায়। যাকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে নিঃশেষ বলে থাকি। জন্মিলে মরিতে হয় চিরায়িত এই সত্য বাক্য টুকো আমার উপর কার্যকরীতা সম্পন্ন হলে আমার নামের সাথে লাশ নাম সংযুক্ত হয়। আর মাটির গর্তে এই লাশেরই দাফন সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুফির পরিভাষায় এটাকে মেজাজী কবর বলে খ্যাত করা হয়।

কোরআনুল মজিদে “কবর” সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :-

<u>**সূরা নং :-**</u>

- ২০ সূরা তোহা আয়াত ৫৫
- ৪ সূরা নেছা আয়াত ৪৩
- ৫ সূরা মায়েদা আয়াত ৬
- ১৮ সূরা কাহাফ আয়াত ৮
- ১৮ সূরা কাহাফ আয়াত ৪০
- ১০২ সূরা তাকাসুর আয়াত ২
- ৯ সূরা বারাত আয়াত ৮৪

উল্লেখিত আয়াতগুলো অনুধাবন করার জন্য উল্লেখ রইল।

শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ)- দর্শন থেকে :- জ্যান্ত দেহকেই কবর বলে। কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত নফ্স ইহাতেই আশ্রয় লইয়া থাকে। কবরের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অধিক জ্বালা যন্ত্রণা আর কোথাও নাই (আসলে সালাতের গভীর অবস্থাটাই কবর)

সাঈদান তাইয়েবা :- সাঈদ অর্থ মাটি, উত্তম মাটি, কবর। জ্যান্ত মনের দেহকে কবর বলে। মানব দেহ উন্নত পর্যায়ের মাটি বিশেষ রূপক অর্ধে সাঈদান তাইয়েবান পবিত্র একজন মানুষ কামেল একজন মোর্শেদ বা সৎগুরু। (৪:৪৩) (৫:৬)

সাঈদান জালাকা :- তৃনহীন কবর, গাছপালাহীন উন্নত মাটি। অর্থাৎ সেই রূপ মানবদেহ যাহা হইতে বা যেখান হইতে সমস্ত গাছপালা, তৃণাদি বা উৎপাদন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। অর্থাৎ নবজাত নিস্পাপ মানব শিশু। ইহা একটি সুন্দর রূপক ব্যবহার। (১৮:৪৪)

সাঈদান জুরুজা :- ইহার অর্থ আহত কবর, নিঃস্ব কবর। জ্যান্ত মানবদেহ যাহা আঘাত খাইয়া বা আহত হইয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে, পূর্ববর্তী উপার্জন এবং সঞ্চয় সমূহ হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী জীবনের সকল সঞ্চয় ও উপার্জন যাহা মস্তিস্কের স্মৃতির মধ্যে ধারন করিয়া রাখিয়াছিল মাতৃগর্ভে আসিবার পূর্বক্ষনে জন্মচক্রের আঘাত খাইয়া সকলই হারাইয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব স্মৃতির কিছুই মনে অবশিষ্ট নাই এমন একটি নবজাত মানবদেহকে অর্থাৎ নবজাত একটি শিশুকে সাঈদান জরুজা বলা হইয়াছে (যেমন ১৮:৮)

সাঈদান জালাকা কী এবং সাঈদান জরুজা এই দুইটি কথা একই রূপ বহন করে জালাকা অর্থ আহত অবস্থা প্রাপ্ত এবং নিঃস্ব হইয়া যাওয়া।

মহানবী বলেছেন, "মাওতা কাবলা আনতা মুতু" অর্থ- মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা মরিয়া যাও। এই মৃত্যু নামক ব্যবস্থায়ন একটি দেহে অনুশীলনগামী ব্যবস্থা যা দ্বারা মানুষ প্রকৃত সত্য লাভ করতে সচেষ্ট হতে পারবে। বৈষয়িক ভোগ বিলাস মোহ-মত্ত্বতার নামান্তর ছেড়ে একজন কামেল মুর্শিদের দেয়া মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে দেহের

চৈতন্য ধারা বা মানব সত্ত্বার জাগরণ ঘটানো হাকিকী বা আসল শিক্ষার নামান্তর বলে জানি এটাই সুফির প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ একটি দেহ-প্রতিনিয়ত দুঃখ শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা,-সুখ ভোগ করে চলেছে, এটাই সুফির পরিভাষায় কবরের আজাব বলে সাধক মহলে প্রচলিত। আবার অনন্ত সুখ বলেও বিবেচিত এর প্রকৃত বিষয় হলো সুফির কার্যাবলীর মূল সোপান হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক। তাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুশীলন কার্যের মাধ্যমে সুফির পরিভাষাগত বিষয় কবর সম্পর্কে অবস্থার উত্তম স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। কোরআনে এই স্তরের তিনটি ধারা উল্লেখ রয়েছে, সাঈদান তাইয়েবা, সাঈদান জালাকা এবং সাঈদান জরুজা। জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যা সমন্বয় সাধন বা মিলানো দুরুহ হয়ে পরে। তাই নিরেট সত্য উন্মুক্ত করতে গবেষনার পর গবেষনা চালিয়ে যেতে হবে। গবেষনার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যের উম্মেষ সম্ভব বলে মনে করি। তাই এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত যারা প্রকৃত গবেষনার সনদ রেখেছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি প্রদর্শন করি। ভোগ মোহ দ্বারা রিপুর আমিত্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ করিতে পারাটাই কবরের একমাত্র নির্দেশ নামা। সাধক রাজ্যে অনেকেই বলে থাকেন রাগ-অনুরাগ যিনি চিরতরে বিদায় জানাতে পারে তার বন্ধন থাকে না। আর বন্ধন না থাকলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উৎগীরন তার জন্য কঠিন হয় না।

কবর সম্পর্কিত বিষয় প্রচলিত নিয়ম ধারা মতে মানুষের একটু দুর্বলতা বা (Simpathi) থাকে যে কারণে প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত কোন কিছু শুনতে বা জানতে সে বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পিছুপা হয়। কোরআনুল মজিদের আলোকে সঠিক বিষয়টি অনুধাবনের নিমিত্তে উপরোক্ত লেখনিটুকো সবার মুক্ত চিন্তার মানসিকতার জন্য উপস্থাপিত করা হলো। মহান রব্বুল আলামিন সবাইকে সত্য ও সুন্দর বুঝবার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

মূলের বিষয়ে আহ্বান

(Simply)

মানবতা বিপন্ন ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বীয় ধর্মকে বড় করতে ধর্মের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে চলেছে। এমন কোন ধর্ম গ্রন্থে নেই যেখানে মিথ্যাকে পরিহার ব্যতীত সত্যের আহবান ত্বরান্বিত করেনি। অসহায়, নিপিড়িত, নির্যাতিত, দূর্বল মানুষ গুলোকে ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করে চলেছে। মহান স্রষ্টার প্রণীত বিধান মানব আত্মার মুক্তির সবচাইতে বড় এবং মূল বিধান। এই বিধানকে পরিপূর্ণ করতে সুনির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় কাঠামোতে নিজের স্বীয় অনুশীলন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা করা। সত্য শুধু কথাতে নয়, স্বীয় অনুশীলনের মাধ্যমে দৃশ্যায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে কুদরতি প্রক্রিয়া জাগিয়ে রেখেছেন মহান স্রষ্টা। এই পথ ও মতকে অনুশীলনের মাধ্যমে জাগরিত করতে পারলে ধর্মীয় বিড়ম্বনা আর বিভেদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

দুনিয়ার সকল মানব-মানবীর কাছে আবেদন, স্বীয় ধর্মকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্মের পূর্ণতা লাভে সচেষ্ট হই। এই কার্য সম্পন্নকারীর দ্বারা ধর্মের মূল শিক্ষা-দীক্ষা সহ সকল প্রকার বিভেদ ও বিড়ম্বনার অবসান সম্ভব। এমন প্রক্রিয়াতে যুক্তি অচল, মান্যতা ও প্রেমময়ীতা দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সৃষ্টির মূল ধারা এক হতেই বিকাশ এবং প্রকাশের সূচনা হয়েছে। তাই একটি মানব অনুশীলনের মাধ্যমে এই এক পর্যন্ত পৌঁছানোর দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। মানবতা বিপন্ন জাতিতে হানাহানি, ধর্ম অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, শান্তিপূর্ণ দুনিয়া অশান্তিতে রূপান্তর ইহাই কালের সাক্ষ্য বহন করেছে। ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে আমরা দূরে অবস্থান নেবার কারণে স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির আবির্ভাব ইতিহাস যেন সেই সাক্ষ্যই বয়ে চলেছে। তাই আত্মিক অনুশীলনের জন্য সকল মানব-মানবী সচেষ্ট হতে চেষ্টা করবে এটাই প্রত্যাশা রইলো। মুসলিম অধ্যূষিত জাতি আমরা আল্লাহ্ এবং রসুল (সাঃ) (আঃ) কর্তৃক বিধানের পূর্ণতা দুনিয়ার একটি রাষ্ট্রেও নেই, কোথাও কোথাও কিছু নিয়মনীতি- যা দেখানো, পূর্ণতা নেই বিপর্যয় ঘটেই চলেছে।

ইয়া ইমাম হুসায়েন তুমপার লাখো সালাম

রাজার রাজা হুসায়েন
বাদশাহর বাদশাহ হুসায়েন,
শত কোটি ভক্তি জানাই
তোমারই পাক কদমে।।

পীরানের পীর দস্তগীর করেন বয়ান
রসুল থেকে আপনার স্থান,
পূর্ববর্তী নবীগণকে জানালেন বিধি
কারবালার ব্যাপার।।

ধুলির ধরায় অশ্রু সিক্ত
নয়ন বারী সকল মাখলুকে,
মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক উপস্থাপন
মানতে হবে মনুষ্যত্ব থাকলে ভিতর।।

আসিলে মহরম ন্যায়ের দৃষ্টান্ত জাগে আশেক হৃদয়ে
শোক-মাতম-বিলাপ কত কি করে মন,
ন্যায়ের ধারা রাখেন বিধি
এমন দৃষ্টান্ত করিয়া স্থাপন।।

আকাশ-বাতাস-তরুলতা
সকল মাখলুক কাঁদে তোমারই ধ্বনিতে,
কোটির মাঝে গুটি স্থাপন
মূলের কার্য হয়ত এমন।।

ভাবিলে শিহরণ
বলা যেন অনত পায়,

করুণার ভিখারী এই দাসকে
করোনা বঞ্চিত চরণ থেকে।।

আহলে বায়াত মূলের ভিত্তি
তোমার আদর্শ সদাই মূলে,
করুণাময়ের ভাগ্য বিধান
বহু পূর্বেই প্রকাশ রীতি।।

ভেদের পর্দার আস্ফালন
পবিত্রতার কত পর্দায় জনম?
বলতে গেলে বাঁধ সাধে
বাবা জাহাঙ্গীর বলে পাখা গজিয়েছে।।

রবিউল আওয়াল উপলক্ষে উচ্ছ্বাস

(Self Meditation)

মৌক্তিক মুক্ত হৃদয় করো
স্বয়ম মোরাকাবা হরে প্রতি
তন্ত্র মন্ত্র লাগবে না তোর
তপন ভাসিবে নয়ন জুড়ায়ে
তম করা রসুল দেখা
তপ মূর্তি সামনে খাড়া।।

আহলুল বাইত প্রথম ধারা
জ্ঞানের জীবন অজ্ঞতার মৃত্যু
প্রজ্ঞা আর নিরবতা প্রকাশ
ধৈর্য ধর্ম ন্যায়ের গতি

মূল স্তম্ভ প্রথম খুঁটি
কলেমা দ্বারা সত্যায়িত।।

মুলাকাত মুহাম্মদ মোস্তফা
মুরোদ মুক আমিত্ব ত্যাগী
ধীয়ান রাখ বরজোখ লীলা
গুণ সত্ত্বা তম করা ভূবন মাঝে
রণিবে যখন হায়াতুন নবী
ভক্তি ভরে সালাম জানাবে।।

একেশ্বরবাদী গুরু কার্য
সদয় হলে পাইবে মুক্তি
গুরু দ্বারা নিরীক্ষা অন্তে
প্রাণ জুড়াবে হৃদয় পটে
দাঁড়িয়ে সম্মান করবে তুমি
বলবে ইয়া নবী সালামুআলাইকা.....।।

চাহিতে জানে না চাহে শুধু দুনিয়া
জানিলে দূর্গতি করো মোরে প্রতি
ওহে দিনবন্ধু কৃপা সিন্ধু
যারা করছে উম্মতের দাবী
তাদের জন্য সাল্লাল্লাহু আলাইকা
সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম।।

পাখালা

তৃপ্তির আরাধনা হারিয়ে খুঁজিফিরি কাকে
মন বিবাগী সকল হারিয়ে ক্ষান্ত নিতে চায়
কেবলই প্রণয় করে ও যে ধরা দেবে না বলে
ইচ্ছাতেই যেন ছাড়ছিনা কার্য সিদ্ধিতে।।

কোথায় তৃপ্তি বাবা তোমার কি মনে পড়ে?
কত নাটকিয়তার ভীরে উৎগীরণ কাহিনী
এটা ঢেকে লাভ কি? আমি কি চাইব কিছু
একটা নিজের করে পেতে............?

সে সংযুক্ত অবয়ব বর্ণনাতে
কোথায় তাহার কার্য সিদ্ধি
ফলাতে করো না বিঘ্নতা দেরী
সদাই সফল কার্য হলে।।

মন আমার চঞ্চল রাঙিবে
মাতিয়া উঠিবে মানব সত্ত্বা
অমানুষ গুলো ঝোরে যাবে
মুক্তির স্বাদ আস্বাদনে।।

তরণ তুমি তরতীব করাও
বাহুল্য কথা দূরে হঠাও
ত্যাগের মহিমা সদাই জাগ্রত
তাকেই তুমি বরণ করো।।

নুড়নুরী হলো তোমার মোকাম
নিহার করে রেখ সদাই

নীলাঞ্জন করে খেই হারানো
অবোধ বচনে সময় গেল।।

সাধন

(self)

ভেটকি দিয়ে চেটকী করে কত জঞ্জাল ধারণ করো মন
সকল কিছু দূরে হটাতে পারনি কেন সর্বক্ষণ?
নিদারুণ দূঃখ-জ্বালা সহিবে কেন দেহ ভূবন
তুমি সুন্দর সকল সুন্দর এইতো হলো মনোরম।।

কুটম্বীতে সদাই ব্রতী মোহ মাখা মন আমার
কবে ছাড়বে রাসকেল কার্য দেহ হবে পবিত্র
উপাসনার মাধ্যম ধরো তাতে তুমি ফানা করো
তবেই হবে কার্য সিদ্ধি আরাধনার পূর্ণতা মেলে।।

সকল জ্বালার দহন দাহ দেহখানি সহন করে
ফিরে ফিরে খির করে প্রভূর কার্য আটকে ধরে
এমন জ্বালা সয়েও তুমি ধৈর্য ধরো সকাল-সাঁজে
দয়াবানের দয়া ভিক্ষা ক্ষম অপরাধ পূর্বাপরে।।

সকল কথা বন্ধ রাখ চৈতন্যকে আঁকড়ে ধরো
জীর্ণ আর শীর্ণ তা সদাই ফেরে বিড়ম্বনাতে
এমন পথের সহায় তুমি পথও তুমি
কি দিয়ে আর বুঝাই মোরে নিজের করে শূণ্য হওয়া।।

সাধন বস্তু মাধ্যম ছাড়া মিলবে না তোর ভাগ্যে কিছু
কালো ব্যাটা টের পেয়েছে থাকে সদাই পিছু পিছু

উচাটন মন ফাঁকি ঝুঁকির বালাই ছাড়ো
সকল কার্যে মাধ্যম রাখ তবেই তুমি পূর্ণতা।।

প্রেমোদগম

ভক্তি বাদের ভালোবাসা
ভগ্নাবশেষ খেতাব ধরা,
ভবানীর ভবন পরম সম
বুঝিবার উপায় নাই দরদী,
ভবদীয় চেনা কর্ম যজ্ঞে
প্রার্থনা করি সদাই এলাহী।।

প্রভূত্ব প্রভা প্রমদা সম
হারিয়েছি খেই পেঁজগি করা,
পুশীদা এড়িয়ে পুষ্পাঞ্জলী
পূজা নিবেদনে সদাই ব্রতী,
হইবে আলিঙ্গন মধুরও আলাপন
থাকিবে সদাই নিশ্চুপ নিরুত্তাপ।।

রুচির রূপায়ন রূপ
রূপমাধূরী নিজ পটে আঁকা,
বলিতেই যেন মুছে যায়
কি এক চমকপ্রদ কারবারী....?
রুহানী রীতি রেওয়াত
অনুমোদন প্রার্থনাতে এলাহী।।

কালামবাণী আবরণে
রূপান্তরের ভান ধরে,

সহন মাত্রা যাই যে ভূলে
প্রকাশ করি অগোচরে,
কত নিয়ম গড়েন বিধি
কারোটাই মোর নয়।।

নিয়ম প্রথা দূরে হটাও
মিলন করতে শূণ্য হও,
তাঁরই প্রেম প্রমাণ হলে
শিখা প্রজ্বলন হবে ঘরে,
এমন বলায় সাজা পাব
তাঁরই সাজা গায়ে নিব।।

সকল পর্দা ছেদন করি
আসলকে আঁকড়ে ধরি,
থাকে না মোর প্রজ্বলন ধারা
আমি তো তাই কানার কানা,
ফরিয়াদ করি মানব মুক্তি
সব হারিয়ে এটাই আর্তি।।

নামা

(self)

জ্ঞান এত সহজ হয়েছে, বিদ্যা শিক্ষার বাহাদুরীতে
শিক্ষা শুধু পাটে রাখ, নিপুণ ভাবে উদয় করো
দৃশ্য দেখা চেতন জ্ঞানী, আছি তো তাই কানা রূপে
বলবো কি আর মর্মবাণী, দুশমনী বিদ্যা বাতিল হবে।।

ধর্ম বাণী পৈত্রিক বিধান, জায়েজ করি যুক্তি খন্ডন
মওলার বিধান পরীক্ষা সম, স্বাধীনতাই অভাব হলো
কথা পেলেই আটকে ধরি, পালন করতে গরিমসি
সবার মাঝেই রয়েছেন মাবুদ, উদয় করো নিরিক্ষান্তে।।

জ্ঞান অর্জন আবশ্যিক বটে, চৈতন্য ধারায় ভাটা পড়ে
আভিজাত্যের খোলস, কন্টক রূপে আটক রাখে
চেতন স্বভাব সদাই ফলানো, উপমা দিয়া বুঝানো
সকল গুটি কাঁচা রইলো, হতাশাতে জনম গেল।।

পাগল চিনতে পর্দা হটানো, ভূলে ভরা জীবন হলো
সাঁই এর লীলা চমকপ্রদ, গোপন ছাড়া ভিন্ন কিছু
বুঝতে চাইলে হবে না তো, কার্য করে প্রমাণ করো
দয়াবানের দয়া হবে, যোগ্যতাতে প্রমাণ করে।।

সারেং বাজিবে নাসিরাতে, দেহ তোমার মুবারক হলে
হুঁশ রাখো তাঁরই ধীয়ানে, কালামবাণী লৌহ মাহফুজে
সবই মিলবে চৈতন্য জ্ঞানে, চাওয়া পাওয়া একেশ্বর হলে
বরজখ ধীয়ান খেয়াল রাখো, পাগলামী হয় তাও ভাল।।

হু প্রকাশ

(self)

হু হু হুঁশ জাগেনী সখা
কি প্রতীক্ষা প্রেম অপূর্ণ
হাল ছেড়ো না সানু-নাসিক
সাবলীল জড়ানো মোহ
প্রেমদানীতে কাঁটাই জুতি।।

জগতি রূপান্তরে ভক্তি
নির্দয়কে দয়ার প্রেমিক
করতে হারিয়েছি শক্তি
প্রজ্ঞা ধারণের ক্ষমতা টুকো
থাকতো আর চোখের চাহনি সম্বল করে জয়গান।।

মূলের ধারার নেইতো গরল
দিগন্তর জমাতে পাড়ি আগমনে নাড়ী
দিক দর্শনে আচানক কারবারী
খেই হারিয়ে হলাম পঙ্গু
মোহ মুক্তাই পরিনতির মূল মন্ত্র।।

আড়ালের আবরণে কারুকাজ
সূক্ষ্মতার স্থিতি সদাই অস্থির
চাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে
পটের পরিবর্তন পরিশেষে
মূলের প্রজ্জ্বলন হু এর হুঁশ।।

প্রণামকে দূরে ঠেলে একত্রে সৃজন করে
পক্ষ পতিপত্তি যায় ভুলে প্রতিফলন দেহে
হা এর কারিগরি সৃজিত হলে
দিব্য দৃষ্টি বাঁধ সাধিবে সদাই
হুঁশ-বেহুঁশ কোনটাতে বাঁকী সময় কাটাবে?

চক্ষুদান

ওরা মুসলিম সেজেছে
ধর্মকে পুঁজি করে ধর্মান্ধতা
শিখিয়ে মসনদ কায়েম করেছে
ধর্মাবতা শিখায় যাহা
ওরা মোদের ভূলায় তাহা
ধর্মোপদেশ দিবে কে?
শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারেফত
সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হলে
তবেই তুমি শিক্ষা দিবে।।

ধর্মা ধর্ম দূরে ঠেলে
বিত্ত বৈভব আপন করে
ধর্ম কর্তার জবাব কৈ?
সাজা ধার্মিক অভাব নেই
হর হামেশাই পেতে পার
ধর্মাত্মা মেলানো দূরহ
আল্লাহ্ দেখায় আসমানে
নরকাগ্নি পাবে পরকালে
নিষ্পাপ ভোগে ভাবায় ?

এমন খেলা খেলছেন মাবুদ
ভিন্নতার মাঝে উৎগীরণ
বলতে গেলে মস্তক ছেদন
(আল+লা) মিললে পূর্ণতা
মানুষ ছাড়া কার্য নহে
এইতো বিধির কারিগরি

ধর্ম মেনে কর্তা পাওয়া
তবেই তোমার মুসলিম হওয়া
কলেমার সত্যায়িত প্রমাণ।।

আবেগী বিরহী মন আমার
জ্ঞান সিন্ধু খুঁজনা এক বিন্দু
তরী ত্বরাইতে বেয়ে যাও সাঙ্গপনে
তোমার তুমিকে চিনলে ভবে
অবগাহন সিক্ত দর্শনে প্রমাণ
তপবনে আরাধনের পূর্ণতা
তপস্যা যেন বড় তফসীর
দেলোয়ার পাগলার বোঝা দায়
তম্বিহ রাখে সদায় গায়।।

দর্পণ

হায়রে মুসলিম পরষ্পর এক আত্মা
রক্তাক্ত ছোবল হানায় টুকরো টুকরো
তবু কেন জানি ব্যাথা হয় না
জাতিকে দমিয়ে ধর্মের চাটুকারীতা
রাহুগ্রাসের শৃঙ্খলে যেন বেঁধে নিয়েছে।।

হায়রে অভাগা দেশ জাতি কবে
হবে শুভ বুদ্ধি অন্যের ভাল তে
নিজের ভাল একথাও যেন আজ
ভুলতে বসেছে? সামনে ঘটে নিপিড়ন
বিবেক যেন নিশ্চুপ মোর কিছু হয়?

দূরদৃষ্ট জনম পেয়ে বাঁধা হয়েছে জ্ঞান চর্চাতে
আত্ম শুদ্ধির চর্চা ফেলে মেকিতে মন মজায়ে
দুরাত্মাকে চেতন করে সেজেছি দুনিরীক্ষা হরি
দর্পন কি আর সহজ কথা দূর্লভ কর্ম
সফল করা জ্ঞান চর্চায় মেলে না তো?

দূরন্ত দূর্বার গতি ভাবধারাকে
আয়ত্বে করা ভাবের গতি সুমতি হলে
দুই এর সৃজন সংশুদ্ধিতে মিলন
ভিতর মাঝে উদয় হবে চেতন সংকেত
দর্পন জারী দর্শন কারী উত্তম।।

সংশয় সংহার পরিত্যাগ করা
মানব কূলকে ত্বরাইতে ধারা
সমসাময়িক চেতনা জাগাতে
জাতির মানদন্ড সমকূলের প্রার্থনা
সৌহার্দ সম্প্রীতি দর্পনকারী সদাসর্বদা।।

তকদির

ভাগ্য নিয়ে মানুষের চেতনা
বিধির লিখন খন্ডন হয় না
মুহরী রেখে তত্ত্বাবধায়ন তদ্দিন
তবিয়্যত গড়ে ধীর কিছেমে
আত্মশুদ্ধির প্রেরণা জোগায়

দিয়েছে তো ইচ্ছা শক্তি
কোথায় যেন ভাটা পড়েছে।।

প্রাণ সঞ্চার যার দ্বারা উদয়
তাঁরই প্রাদুর্ভাব দেহের প্রাঞ্জল
চৈতন্য প্রাখর্য প্রাংশু করা
প্রাপন প্রেমী পক্ষেই পাওয়া
লাগবে না তোর লিখন যোজন
সদাই উৎগীরণ কলেমায় প্রমাণ
লিখনীর ধারা উত্তীর্ণ ফকির।।

সবার বিধান সমান করো
ইমাম তুমি কারে মানো
কর্তা ভজা কর্ম ফেলে কর্বূর
সাজা সহজ হওয়া কঠিন
দ্বৈত ধারায় মিলন মেলা
সত্ত্বার সহিত সাঁই এর জোড়া
পূর্ণতায় ইমামতি সমাপ্ত।।

শিকড়

পড়লে সওয়াব মানলে জানা
মান্যতাতে পাগলপারা
শিখায় যিনি গুরু তিনি
ভাববাদীতেই শুরু করি।।

ভেবেছিল দ্বীনের রসুল
হেরাতে হলো পূর্ণ মকবুল
কলেমা পেলেন হেরাতে
দ্বীনের দাওয়াত অনুমোদনে।।

শিক্ষা দাও তুমি দ্বীনের
দ্বীন থাকে না চমক চড়া
চতুর চড়ান চক্ষু কানা
চক্ষুদানে বাঁধন করা।।

শরার দায়ে শরীক হারা
শরীক বিহীন শরীফ পাওয়া
মালাইকাতের নির্দেশ নামা
আদম পূঁজায় ব্রতী হওয়া।।

মূলকে চাইলে হেরা মান
সকল জঞ্জাল দূরে রাখ
অভাগার সময় গেল
দর্শন কার্য অপূর্ণ রইল।।

মোর্শেদ কর্তৃক প্রদত্ত সালাম, সাজরা, অজিফা,
পাঠঅন্তে প্রার্থনা মোনাজাত

প্রার্থনা

" সকল প্রসংসা আল্লাহ্‌র "

ইয়া ইলাহী, প্রণয় করি
সাল্লাল্লাহু আলাইকা, সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম
সালাম জানাই পাক পাঞ্জাতন, স্বরণ করি ঈমামগণ
সিলসিলাকে সামনে রেখে, নত শিরে জাহাঙ্গীর নাম
আহলে বাইত তোমার বিধান জারী করে
উঠায়ে নিলে হাবীবকে, নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান ॥

ইয়া এলাহী,
মর্মস্পর্শী রুবুবিয়াতের স্তর থেকে উর্ধ্বগামী
সকল স্তরকে সুশোভিত স্তর করে রেখেছ
আর নিম্নগামী প্রহেলিকায় ত্বরান্বিত করেছ,
কত দাসকেই প্রেরণ করেছ ত্বরাইতে
সফলতা দিয়েছ সামান্য,
সকল (মানব-মানবীর) অজ্ঞতা আমাকে দাও
আর হেফাজত তুমি নাও ॥

ইয়া এলাহী,
আহাদ, আহম্মদ, মুহাম্মদ, আবাদান
সকল কর্তৃক একত্র করণে
পূর্ণতার ঘোষণা দিলে,
(মানব-মানবী) কিয়দংশ টেনে
গাফেল হতে চলেছে বিধানে,

গাফেল টুকো আমায় দাও
কল্যাণ সুনিশ্চিত করে দাও ॥

ইয়া এলাহী,
কলেমার মর্ম তুমি,
ভেদের বয়ান তোমায় বলি
কালিমা লেপন কল্প বিধানে
সাবেত ধারায় জানলে....... ॥

রহিল আজি নত শিরে আর্জি
অমানুষকে মানুষ করে দাও,
নফছের জিহাদ ত্বরান্বিত কর,
দাসগণের শিক্ষা বেগবান কর,
আত্মার মুক্তি তোমার তোমারই
তোমারই দ্বারে ফরিয়াদ
ইয়াজুল জালালুহুল ইকরাম ॥

স্বভাবে সুরত

Self

শোন মন তোরে বলি
আপন সূরতে সমাক্রান্ত হবি
করিলে পরছিদ্রান্বেষণ হইবি
তখন বানর রূপের জনম ॥

করিবে উৎকোচ অবৈধ উপার্জন
পাইবি তখন শুকুর রূপ জনম
সুদখোর তুমি বাদুর সমান

পা উপরে মুখ নিচে আকার সার ॥

হও তুমি অন্যায় বিচারকারী
রয়েছে যত আদেশধারী
অন্ধ রূপে জনম তোমার বরাবরী
সতর্ক হও (মন-জ্ঞান) তোমায় বলি ॥

মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারী
উপার্জন করে অর্থ কড়ি
এমন জনম হবে রে মন
থাকবে না তার মুখের মাংস
রূপটা কি?

স্বীয় সৎ কার্য গৌরব থাকিলে
বোবা হয়ে সৃজন হবে
অহংকার ও আত্মগরিমা হলে
কঠিন দুর্দশার জনম হবে ॥

হায়রে মন গীবত কারী
ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ নিকৃষ্ট জনম
জগত বিধানে চোরা কারবারী
হাত নেই সুরত কি?

স্বীয় কর্ম না করে তুমি
আদেশ দানে ব্রতী হলে
জিহবা পড়বে বুকেতে
বাহির হবে রক্ত পুঁজ
আকারটা কি? ॥

কারো গুপ্ত কথা অত্যাচারীর
নিকট প্রকাশে ক্ষতি হলে

চড়বে তুমি অগ্নিময় শূলে
জাতীর উৎপীরণ পা হারানো ॥

সাবধান হও মন আমার
এমন কার্য উদয় চৈতন্য
না ঘটে প্রভু নিরঞ্জন সাঁই
এর কাছে আরাধনা রেখে সমর্পন ॥

★ আহাদ বা এককের আর্জি ★

আত্ম প্রত্যয়

আল্লাহ্‌র যত নাম রয়েছে
সকল নামের ফল দাঁড়িয়েছে
ভিন্ন নামের ভিন্ন ফল
অবস্থান তবে এক বল ক্যান ॥

ভাবতে বললে তিড়িং বিড়িং
ধর্মে যেন বাঁধা রয়েছে
শরায় শিখায় এক আল্লায়
কি করে তাহা সৃজন হয় ॥

ভাবখানা মোর মনে উদয়
প্রভু নিরঞ্জন সাঁই বলেন, আহাদ
আহাদ স্বত্ত্বা পরিশুদ্ধ হবে
সয়ম্ভু স্বত্ত্বা কারে বলে ?

মুখের প্যাঁচাল দুরে রাখা
রূপ খানা দেখত ব্যাটা

মায়ের দ্বারে ভক্তি রেখে
বিনয় করে জানতে চাই যে..... ॥

স্বয়ম্ভু স্বত্ত্বা জানব যখন
সারোৎসার কার্য সম্পন্ন তখন
সুরেশ্বরীর দয়া হলে
মা একটা ব্যবস্থা নিবে ॥

এ সব আলাপ কেউ শুন না
ধর্মের দোহাই আর দেব না
ধর্ম যায় রসাতলে
প্রতিনিধিগণ ঝগড়া করে ॥

সকাল সাঁঝে আল্লা আল্লা
ক্বলব্ জারী রেখ বান্দা
আহাদ স্বত্ত্বা জানবে ভবে
নিশ্চুপ হবে ভুবন মাঝে ॥

এখলাস হলো এককের বয়ান
ভুলেও কেহ তাঁলাশ করে না
মহিয়ান, গরিয়ান, সুপ্রভ তিনি
দেলোয়ারের বিফল স্বয়ম সায়ন্তম ॥

বি:দ্র:- আরবিতে ওয়াহেদ অর্থ - এক, আহাদ অর্থ - একক ।

মুমুক্ষা

হইলনা মোর স্বভাব সুন্দর
স্বভাবেতে মন বেজার
কম পড়েছে সাধন সিদ্ধি
বুদ্ধি জ্ঞান লোপ পেয়েছে।
আগা কেটে মুসলীম হওয়া
নারীর বিধান ঢেকে রেখেছে ॥

ধর্ম কর্ম সব করতে
চালু দিলাম আমল কষে
সবাই তখন ভাল বলে
মেলে না মোর হৃদয় পটে
শিখায় যারা দেখায় তারা
বিধান খুঁজলে উল্টা লাগে ॥

ছাড়লাম ভবে দেখানো প্রথা
খুঁজব এবার কালাম কথা
বাঁধ সাধে সকল ব্যাটা
আমার জ্বালা বোঝে না কেউ ?
খুঁজতে গিয়ে পীরের পায়ে
সে বলে অটল নীতি দুর্বল প্রেমে ॥

সাধন সিদ্ধ প্রেমের গীতি
ধৈর্য হারা হইলাম তবে
পাঠশালা নাই নর নারী
মিলন করতে প্রেমের জুড়ি
সাধুর দ্বারে দ্বারে অমর বানী
চুপ থাক আধ্যাত্মিকে ॥

ভিতর আলা পাঠায় কালাম
উপযুক্ততা প্রমাণ করে
তাঁরই মুখে ধর্মের বানী
পূর্ণতা পাবে কোরআন খানি
ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করি
অজ্ঞতা ঘেরা আঁধারী ॥

মর তুমি আত্মশুদ্ধিতে
তাতেও তোমার তৃপ্তি থাকে
মন ব্যাটা বোঝে নারে
স্বভাবেতে দোষ পড়ে
কলেমাতে সব রয়েছে
থিসিস কর নিপুণভাবে ॥

পূর্ণ কলেমা চব্বিশ হরফ
বারটিতে মূলের ধারা
বারটিতে বদল করা
ইহাতে নাই কোন ফোটা
ইহাই হলো প্রেমের ধারা
অমর প্রেম একেই বলে ॥

কলেমার তাহ্‌কিক দেখায় রসূল
আহ্‌লুস সুফফা তাঁরই নিদর্শণ
চাঁদের কিরণে, ফুলের সুবাসে
মলয়ের প্রহসনে নদীর কল্লোলে
সাগরের কলরবে, বনের মর্মরে
পাহাড়ের কঙ্করে এমন কি
মৃত্যুর অন্তরালেও লুকিয়ে থাকে প্রেম ॥

বাস্তবতা

ভেদ না জেনে গোল বাঁধিয়ে কি লাভ মাওলানা
পরপারে নিকাশ দিতে তোমায় কিন্তু ছাড়বে না
মওলার না হয়ে হয়েছো তুমি মাওলানা এহেন
কার্য তোমার হলে জগত ডুবেব আঁধারে ॥

মওলা পেতে ওকিলা কোরআন বলে ভূল না
তাইতো মোদের জীর্ণ আর শীর্ণ কর কোরআন বানী দুরে রেখে
চালাও তোমার চাটুকারীতা আল্লাহ্ রসূল ভূলে
এইতো মোদের ধর্ম শিক্ষা দিয়ে চলেছে সবখানে ॥

মর্ম কথা বলবো কি আর ধর্ম পেতে গুরু ভজ
এই রহস্য জানতে পাবে মওলা তোমায় সাথে নিলে
শরার বচন দমিয়ে রাখ মূল কার্য আঁকড়ে ধর
গুরুর দয়ায় পাবে স্নিগ্ধ ভূবন মাঝে প্রকাশ হবে ॥

লেবাস দিয়ে ধর্ম চলে সত্য কিন্তু বলে নারে
হাজী সেজে মক্কা থেকে ডিগ্রী আনে তাম্বরী নিয়ে
এহেন ধর্ম তোমার সম্পদ মওলার বিধান কৈ থাকে
ভ্রান্তির মাঝে ফেলেছে মোদের উদ্ধারিতে বিপত্তি কষে ॥

অছিলা ছাড়া বিধান কি আর মিলবে তবে দেহ মাঝে
আত্মার মুক্তি গুরু শিক্ষা মূল বিধান জাহাঙ্গীর বলে
তকদীর ব্যাটা বাঁধ সেজেছে গুরু কার্য দূরে হটাতে
মিথ্যার কাছে পরাভূত দেলোয়ার পাগলার সম্বল হলো ॥ ঐ

মারফতি

তন্ময় তনু গোকুলে বাড়া
গোড়ামীতে তন্ত্র ছাড়া
গোধুলি আসিয়া জমিছে রণে
খনজন্মার একি হাল রণে ॥

রমণ ঠেলিয়া কহিছে স্বত্ত্বা
মণন পায় কভূ ধুত
ধরণী আচানক মন্ত্রে গিয়া
মদন রণিছে আবলীলা ॥

শিখা দাঁড়িয়েছে নিরঞ্জনে
শিষ্য শিষ্টতা রেখেছে ভবে
আব আতশ খাক বাদ
শিখা অনির্বাণ নিরূপণ ॥

শুল্ক সে তো রমণ তলে
বার নারী একই কারে
কার্যসিদ্ধ পূর্ণ করে
হাতিয়ে নেয় শ্রুতি মাধুর্যে ॥

ঢং টং টং বং গং নাই
কাইদা শুধু মন অতলে
খেলছে খেলা ভিতর আলা
সবার মাঝে একই প্রকারে ॥

মহরম

(১)

বছর ঘুরে এলরে ঐ মহরম, সাধু সন্যাস অলী যত
নিশ্চুপ শোকের মাতম হৃদয় পটে করে আলিঙ্গন
বলতে পারে না তারা জাতের মূল ধারা ॥

বিস্তারিত সব মতবাদ বলতে হবে নিপাত যাক
মহিনীর ছোবল এসে ঢেঁকে দিয়েছে সত্য টাকে
এর থেকে উৎগীরণ কবে করবে জ্ঞানীগণ ॥

মহিয়ান গোরীয়ান যিনি দেখিয়েছে কারবালায় তিনি
হারানোর ভয় দুরে ঠেলে সত্য মিথ্যার তফাৎটা দেখিয়েছে
এ এক করুণ আজব রীতি সদা জাগ্রত বিশ্ব বিধাত্রী ॥

কি দিয়ে বোঝাব মোরে কানা কি নয়ন মেলে
গুণী জনের বারিধারা দেখে মন উতালা
বুঝিনা কভূ কিছু বোঝাই তোদের মিছে ॥

নাম না জানিয়ে --- দুধের শিশু হাহাকারে ফোকাল
তীর বিধীল তাঁহার গায়ে রক্তের উৎগীরণ মরুতে
আকাশ বাতাস প্রকম্পিত দমিয়ে রাখলে আর্ত গোপনে ॥

অবশেষে বলা বলিতে জানিয়ে দিলে তফাৎটাতে
মস্তক ছেদন সম্মতিদানে ইহা কি সবাই বুঝিবে?
স’বেরীন নিশানাটাতে জানাওনি হোসাইন তুমি কে?

সৃষ্টির সকল মানব-মানবীর পা দুটো মাথায় নিয়ে

এত ক্ষুদ্রের জবাব হয় না তবুও অন্বেষণ করি
জবানে বলি ইয়া হুসায়েন, ইয়া হুসায়েন, ইয়া হুসায়েন (আঃ) ॥

(২)

এল মহরম সবাইকে জানাতে
পঠিত জ্ঞানদ্বারা ধর্মের মূল ধারা রবেনা
গুপ্ত ভেদের জনক যারা কালে কালে দেখায় তারা
প্রাণ স্বত্বা হারানোর ভয় কভূ করেনি তারা ॥

কেহ দেখে ভূলে যায় কেহ রাখে হৃদয় পটে
সভ্যতাকে জাগাবে বটে অনুকম্পা সদয় লুটে
ভাবিনির গতি ধারা মূল আদর্শ নেওয়া ছাড়া
হইবে না তোর জাতের ধারা বেহুঁশ হলে জগত পটে ॥

মস্তক ছেদন কে করিল জানলে কেহ বলে না কভূ
মূলের ধারা তাঁরই খেলা হচ্ছে হবে মানুষ মাঝে
এইতো মোদের অজ্ঞ স্বভাব দূর হয় না তারই নামা
দেখিয়ে যায় পূর্ণ করে মানুষ মাঝে সর্বকালে ॥

পাক পাঞ্জাতন মূল ধারা বাইরে নাই কেহ তাঁরা
বিনোদ কালা রাখেন ঢেকে দীনের পর্দা আবরণে
অজ্ঞ যারা হারায় তারা মূল তখন যায় চলে
হুসায়েনের বাণী স্মরণ করে মহরমে শিক্ষা নিবে ॥

আইছ একা যাবে একা কি করলে সময়টাতে
ভিতর মাঝে তাঁরই উদয় করতে হবে নিপুণ ভাবে
দেহের কার্য পূর্ণ করে দেখায় বাবা হুসায়েন
মহরম মহরম শুনলে ধ্বনি হুসায়েন হুসায়েন বলবে তুমি ॥

কয়েকটি গান

গান বিষয়ে ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী যে দলিল ও যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন তা মারফতের বাণী নামক পুস্তক খানি পড়লে আন্দাজ করতে পারবেন। আমি কোন কিছু বাড়িয়ে বলেছি কিনা। তাছাড়া আমার মোর্শেদ কেবলা-কাবার লিখিত “গান বাজনার দলিল” কিতাবটি পাঠক বাবা-মায়েদের পড়বার জন্য অনুরোধ রাইল।

গান

(১)

পীর চিনিয়া মুরিদ হও, আত্মার মুক্তির খবর লও
পথে ঘাটে দেশে দেশে, ঘুরিসনা আর মিছে মিছে
নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা, অন্যরে বুঝাই সদাই ॥
পীর.........ঐ
কাম আর লালসা দিয়ে, খুঁজে বেড়াই মিছে মিছে
আমার ভাগ্য দশা এমন, ‘আসলকে' নকল বলা যেমন ॥
পীর .... ঐ
ছয় রিপুর মোহনায় মিশে, পোশাকী ভদ্রতা ভালবেসে
ভবের নেশায় কাটল বেলা, চোখ থাকিতে সাজলাম কানা ॥
পীর .... ঐ
বাবা জাহাঙ্গীর ডেকে বলে, দেলোয়ার পাগলা বুঝলি নারে
খেলাফত দেখে মুরিদ হও, মোরাকাবাতে প্রমাণ লও ॥
পীর .... ঐ

(২)

প্রভু তোমার এ কোন খেলা, আসলকে নকল জানা
ভবের কাবা নিজের কাছে, দুর দুরান্তে খুঁজে ফেরে
এই তো প্রমাণ দেহ তত্ত্বে, মিছে খুঁজিস দালান ঘরে।
প্রভু .... ঐ

মেজাজী আর হাকিকী, দুই জ্ঞানের বর্ণনা শুনি
সত্য বলিতে মন উৎগ্রিব, জ্ঞানের বিচারে বলার আদেশ।
ফকির বলে সবই পাবে, নিজ দেহের ভিতরে
মোল্লা মুফতি এক সাথে, মিশায়ে বানায় গো চেনা।
প্রভু .... ঐ

বাবা জাহাঙ্গীর ভেবে বলে, স্বরূপ সাধন বিনে পাবিনে তারে
(আসফালুস সাফেলিন) ছাড়ও কঠোর ভাবে সাধনা করো
দেলোয়ার পাগলার কপাল পোড়া, সাধন করতে খায় তারা
মিছা মিছি ভং দেখাল, চুল আর মুচের বাহাদুরী করল।
প্রভু .... ঐ

(৩)

নিজকে যদি চিনিতে চাও, মোর্শেদ বাবার স্কুলে যাও ॥
সঠিক গুরু হইলে তোমার, প্রমাণ মিলবে দ্রুততায়।
দেশ বিদেশে বেলায়েতের রাজা, সুরেশ্বরীর দরবার খানা,
নিজকে............. ঐ
মন আমার বেজায় পাঁজি, নিষ্ঠা কর্মে থাকে না রাজি,
কালে যৌবন ভাবিতে গেল, মহাকাল এসে পারোয়ারি দিল ॥
নিজকে .... ঐ
তোমরা কেহ ভুল করনা, নিজকে চিনতে দেরী কর না
বাবা জাহাঙ্গীরকে শিক্ষক মান, ফর্মূলা জেনে মোরাকাবা কর।
নিজকে... ঐ
আরবা আতা আশু রিহিন, কিছু না পেলে গালি দিন,
দেলোয়ার পাগলার কপাল মন্দ, করে বাবার সুনাম ক্ষুণ্ন ॥
নিজকে .... ঐ

(৪)

কি খেলা খেলছেন সাঁই বরজোখ লীলে,
এ এক অপার মহিমা গুরু কৃপা বলে।
যদি তাঁর দয়া মিলে গো ঘাটে তরী পাবে বটে
সদাই থাকে আনন্দে বেহুঁশ লোকালয়ে ॥

বরজখ খেলার এমনই ধারা, জীবন থাকতে যায় রে মারা
সদা নিরিখ নিরূপণ হইলে, মজা পাইবে সাধনার বলে
মর্ম যদি বুঝা যায় মাকাম ঘাটের দ্বার খুলতে লাগে না কোন উপায় ॥ ঐ

দেহের চেতন হইলে তোমার, ঘাটে ঘাটে আনন্দের শয্যা ফোটে
ভিতর মাঝে রহস্য রাখছে সাঁইজি আমার মাহমুদা মাকামে
এ খেলা জানতে চাইলে ধর চেপে রূপ নিহার নছিরাতে ॥ ঐ

বাবা জাহাঙ্গীর ডেকে বলে, পাগলা তুই আর বলিসনে
ধ্যানে থাক 'কুলুপ' এঁটে, দেখে নাও তাঁর খেলা কিসে
মানুষ ছাড়া নাইরে খেলা প্রকাশ হলে, কাফের শালা ॥ ঐ

ভবের মায়ায় ডুবে রইলাম, রঙ্গ রসে কাল কাটাইলাম
গুরু ভক্তি আঁকড়ে ধরলে, হুঁশ থাকে না পাগল বলে
দেলোয়ার পাগলার মিছা মিছিতে কাল গেল ফুরায়ে ॥
.... ঐ

শাহ্ সুফি মজিদ আল-সুরেশ্বরীর রচনাবলী

(৫), (৬), (৭), (৮), নং

(৫)

সাধন ভজন করেছেন সৃজন,
করেছেন মোহাম্মদ উম্মতের কারণে
নবী করেছেন মোনাজাত।

মা ফাতেমা চোখের মণি হাসান কলিজার
হুসাইয়েন ধ্যানের ছবি আলী জাতের জাত।
উম্মতের কারণে দেলোয়ার করেছেন মোনাজাত।

চিনলো তাঁরে বনের পশু চিনলো হনুমান,
মানুষ হয়ে চিনলাম না রে, না করলাম এতরাম।
পাহাড় পর্বত আসমান জমিন তাঁর করিতিয়াছে ধ্যীয়ান।

সাধন ভজন করেছেন সৃজন,
করেছেন মোহাম্মদ উম্মতের কারণে
বাবা করেছেন মোনাজাত।

(৬)

মনে মনে অম্বেষণে বেঁধে রাখো আইন কোনে,
দেখতে পাবে সুদৃশ্য জ্ঞানে আল্লাহ্ রসূল একজনায়
যে কারণে করেছেন সৃষ্টি করেছেন দয়াময়।
সদয় তাঁরে রইলাম ভুলে ছয় রিপুর এই তাড়নায়

না করিলাম সাধন-ভজন ভুলে রইলাম আদি নয়ন,

না দেখিয়া হয় কি স্মরণ মিছে মায়ার ছলনায়
যে কারণে করেছেন সৃষ্টি করেছেন দয়াময়।
সদায় তাঁরে রইলাম ভুলে ছয় রিপুর এই তাড়নায়।

আমার হলো এ কোন দশা মনে বড় চঞ্চলতা
দিনে দিনে গেল বৃথা নাহি চলে সুচালনায়,
যে কারণে করেছেন সৃষ্টি করেছেন দয়াময়।
সদায় তাঁরে রইলাম ভুলে ছয় রিপুর এই তাড়নায়।

মুর্শিদ যাহার হইয়াছে আপন সেই পাইয়াছে সুদৃষ্টি নয়ন,
নাহি তাঁর জন্ম-মরণ বলেছেন সাঁই বাবা জাহাঙ্গীর শাহ্।
যে কারণে করেছেন সৃষ্টি করেছেন দয়াময়।
সদায় তাঁরে রইলাম ভুলে ছয় রিপুর এই তাড়নায়।

(৭)

আজও আমার হলো না, হলো না আত্ম জ্ঞান
জ্ঞানের ঘর রয়েছে ঘেরা, ছয় অচারে কর্ম সাড়া
সদয় করে দিশেহারা, আমায় কর না মেহেরবান।

ও মন না করিলি আত্মতত্ত্ব
শয়তানের কর্মে রইলি লিপ্ত
ভবে এসে হইলি ব্যর্থ বিঘারিতে গেল যে বিধান
আজও আমার হলো না, হলো না আত্ম জ্ঞান।

বিঘাড়িতে বিবাদি চলন, হইল না মন উর্ধ্বে গমন
কাল-নাগিনীর বিষের ছবল, ছলনা যে মরিতে।
আজও আমার হলো না, হলো না আত্ম জ্ঞান

জ্ঞানী যে জন সেইতো জানে, মজিদ কী তার মর্ম জানে
দয়াল চান্দ নাই মোর স্মরণে
বাবা জাহাঙ্গীর শাহ্ জ্ঞানের মহিয়ান
আজও আমার হলো না, হলো না আত্ম জ্ঞান।

(৮)

কার করিস তুই সাধন-ভজন
আগে চিনো তাঁহারে।।

সাধনার স্বাদ থাকে যদি
তাঁলাশ করো দ্বীনে নবী
হায়াতে আছে যে নবী
কোরআনে প্রামাণ তাহা।।
ঐ.........

তুমি মুর্শিদ পদে দাখিল হলে
তোমায় আল্লাহ্-রসূল চিনায়ে দিবে
আল্লাহ্-আদম-নবী যে জন
এক জায়গায় বসত করে।।
ঐ.........

আমি আল্লাহ্-রসূল খুঁজতে গিয়ে
কলঙ্ক নিয়েছি গলে
বাবা দেলোয়ার পাগলা রূপ দেখিয়া
হয়ে যায় আত্মহারা।।

মোঃ ওবায়দুল-এর একটি রচনা

(৯)

জান শরীফ মওলানা তুমি বাবা দেলোয়ার
নিদান কালে ত্বরায়িও আমি গুণাহগার
আমি গুণাহ'র বোঝা মাথায় লয়ে
এসেছি তোঁমার দুয়াড়ে
তুমি বাবা পারের কান্ডার আমি গুণাহগার।

ফকিরকূলের শিরমণি
খিজির রূপ ধরলেন তিঁনি
আমি পাপী কি গাহিব তোঁমার মহিমা।।
ঐ.........

কত আশেক-ভক্তজনে
তুঁমি পার করিলে নিজ গুণে
আমি অধম পড়ে রইলাম জ্ঞান বিহনে।।
ঐ.........

আমি পাপপুণ্য যতই করি
কেবল ভরসা তোঁমারই করি
আমি পাপী পড়ে রইলাম
তোঁমারে নামে ।।
ঐ.........

মোঃ আনিসুজ্জামান (আনিস)—এর একটি রচনা

(১০)

মওলা জীলানী. জান শরীফ, তুমি মুশকিল কুশা,
তোমার প্রেমে মজে পেলাম মুক্তির দিশা,।।

তুমি মানব সুরতে হয়ে উদয়
দিলে পরম প্রেমের সন্ধান এই ধরামায়,।।
তোমায় ইয়া জুল-জালালি ওয়াল ইকরাম বলে,।।
ভক্ত আশেকানে হৃদয়ে বাঁধলো বাসা।
ঐ.......

তোমার নামের জিকিরের কলতানে
কত পাপী-তাপি মনে শান্তি আনে,।।
তুমি সত্য পাবার তরে ধ্যান সাধনায়।।
দিলে আত্মদর্শনের এক নতুন আশা।
ঐ.......

ইয়া জীলানী. জান বলে যখন বিনয় করে,
ডাকে ভক্তগণে বসে একলা ঘরে।।
তোমার নূরের রওশনীতে হয়ে মাতাল ।।
তখন হারিয়ে ফেলি সব প্রেমের ভাষা।

ওগো মওলা জীলানী. জান শরীফ, তুমি মুশকিল কুশা,
তোমার প্রেমে মজে পেলাম মুক্তির দিশা,।।

আরাফাত শাহ্ –এর রচনাবলী

(বি. দ্র. হুবহু তুলে দেওয়ার কারণে কোন সংশোধন করা হয় নাই।)

আরাফাত শাহ্ (Faceb00k Post: 22 May. 2020)

গুপ্ত অবস্থায় তুমি নিরাকার (আঁধার) কালো ছিলে।
প্রকাশ্য অবস্থায় তুমি আকারে (আলো)
দৃশ্যমান ছিলে কিন্তু -- কে চিনতো তোমাকে ?
আমরাই তোমাকে প্রকাশ করেছি নতুবা,
কে চিনতো তোমাকে ?
তোমার অন্ধকার কালো অংশটুকু আমরাই শরিয়ে দিয়েছি!! তাই তো তুমি আলোক উজ্জ্বল হয়ে আছো ধরাধামে ----কে ডাকতো তোমাকে ?
তুমি যদি সবই করতে পারো তবে,
আমাকে সবকিছু করতে হয় কেনো ? তুমি যদি পারো তবে, তুমি (আমার) হয়ে দেখাও (তোমার) নিজ গুণে!!!
জানি তুমি পারবেনা ---- কারণ,
আমিই (মানুষ) তোমার আঁধার ? তাইনা আমরাই
তোমার পরিচয় করিয়ে দিই!!! আমরাই তোমার আলো- আঁধারের খেলা। আমিই তোমার প্রকাশ ? তাইনা ;
তোমার যা কিছু প্রকাশ সবই আমরাই করেছি --- তবে আমাদের উপরে এতো জুলুম অত্যাচার কেনো ? সকল যন্ত্রনা সইতে হয় তো আমাদেরকেই ---
আমার কর্মফল তো আমিই ভোগ করি!!
তুমি তো তা করোনা!!! তবে,---- তুমি প্রেমোময়ি হতে পারোনা --- মায়াবিনী হতে পারোনা --- তুমি শুধু (আমার) (প্রেমিকের) প্রেমের দাস মাত্র।।

আরাফাত শাহ্ (Faceb00k Post: 17 Nov. 2020)

কুরাআন কেতাব পড়ে যদি হও গাফেল
খোদার জান্নাত হুর হবেনা তোমার দাখিল।।

★

কণ্ঠে ধরিওনা আয়াত কালামের সুর বাণী
ধরিও তার চরিত্র আপন সুরতে মাখি।।

★

কালেমা সালাত সিয়াম জাকাত হজ্ব
একই স্থানে সকল সাধন সুদ্ধি কাজ।।

★

জানবে যদি খোদার পরিচয় খানি
হক্ব মূর্শীদ ভজো এক নিরিকি।।

★

গোপনের গোপন বাড়ি বহু দূরে
তাহাক্কিক ছাড়া তার মরতবা কে বুঝিবে।।

★

আওয়াল আখের জাহের বাতেন
কালরুপে নূরে খোদা অনন্ত অসীম।।

★

কালে কালে দেখো এই ভবসংসার
কাল রুপেই আছে দেখো ভুবনেশ্বরে।।

★

চাঁদ বাকা নদী বাকা বা তে যুক্ত হওয়া
তাতেই আছে সুদ্ধ রুপে ফানা।।

★

কালেমা পড়িও বুঝে মন-প্রাণ দিয়ে
বুঝিয়া নিও তার ভাব খলিল্লুহ্ হয়ে।।

★

কালেমা তৈয়বা হও জীবন থাকিতে
খলিফার নূরী সন্তান তুমি ধরাধেম।।

★

যদি না বুঝিতে পারো নূরী কুরাআন খানি
মানব জীবন বৃথা যাবে এই সংসারি।।

মোঃ আঃ গাফ্‌ফার বিশ্বাস-এর একটি ভূমিকা

"আধ্যাত্মিক বিধান" পুস্তক হতে

আধ্যাত্মিক বিধান নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তক জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল সুরেশ্বরীর দ্বিতীয় প্রকাশনা। ইতি পূর্বে আধ্যাত্মিক বিধান নামক আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছিল, যার প্রসঙ্গ ছিল ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনা এবং বর্তমান ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সাধকের অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সহজ ভাষায় আলোকপাত। উক্ত পুস্তক ক্ষুদ্র হলেও পাঠককূলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যা সাধকের জন্য ছিল আরও কিছু অবদান রাখার প্রেরণার উৎস। সেই প্রেরণা এবং মুক্তচিন্তাশীল ও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল সুরেশ্বরী সম্মানিত পাঠকগণের ক্রমাগত তাগিদের ফলশ্রুতিতে সাধকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস দ্বিতীয় প্রকাশনা।

সাধকের দ্বিতীয় প্রকাশনার প্রসঙ্গ হলো, কোরআনের দুটি আয়াতের উপর গবেষণা, এবং অতি সংক্ষিপ্ত আকারে অথচ প্রাণবন্ত ও সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত আলোচনা করা এবং ইসলাম ধর্মের কলেমার বিভাজনকৃত স্তরগুলি পর্যালোচনা ও সালাতের গুরুত্ব, প্রকারভেদে সালাত এবং আসমানী কিতাব সম্পর্কীয় বিষয়াদি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা। যা চিন্তাশীল পাঠকের চিন্তার খোরাক হিসেবেই বিবেচিত হবে। অবশ্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সার্থক হয়েছে এমনটাও আশা করছিনা। তবে আমরা এতটুকু সান্ত্বনা পেতে পারি যে, এই পুস্তক একটি ব্যাতিক্রমধর্মী প্রকাশনা হিসেবেই পাঠককূল গ্রহণ করবেন। ব্যতিক্রমধর্মী বলছি এই জন্য যে, আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাদিস ও সুন্নার ধ্যান-ধারণা থেকে আমাদের এই পুস্তকের আলোচনা কিছুটা ভিন্নতর। আমাদের ধ্যান ধারণা এবং সমাজের ধ্যান-ধারণার বৈপরিত্ব থেকে সমালোচনার ঝড় উঠবে সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল আছি। আমরা আশা করছি এমনটিই ঘটুক। কারণ অন্ধ বিশ্বাস আর ভ্রান্ত ধারণায় ভরপুর এই তথাকথিত মুসলিম সমাজে সামান্যতম কল্যাণের বিনিময়ে হলেও যে কোন বিরূপ সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রুপকে আমরা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। আমরা চাই সমাজের প্রতিটি মানুষ তার স্বীয় বুদ্ধির বিকাশ সাধন করুক। নিজের মুক্ত বুদ্ধি দিয়ে ধর্মীয় বিধান বুঝতে শিখুক যে, ধর্মের ঠিকাদার মোল্লা-মৌলভী সাহেবদের সব কথাই অভ্রান্ত নয়। অথচ তারা মন গড়া কথার মালা সাজিয়ে ইসলামের নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অধর্মের পথে সমাজকে নিয়ে গেছে। যুগের এই চরম সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রয়াস অব্যহত থাকবে। আমরা সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থী। আল্লাহ্-হাফেজ।

বিঃ দ্রঃ প্রথম প্রকাশনার সাথে দ্বিতীয় প্রকাশনার বর্ধিত প্রসঙ্গগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

হাদিস

❖ "যে ব্যাক্তি দুনিয়া তলব করে সে হিজরা অর্থাৎ (পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়),
যে ব্যাক্তি জান্নাত তলব করে সে আওরত,
যে ব্যাক্তি খোদাকে তলব করে সেই প্রকৃত পুরুষ"।

❖ "যে নিজেকে চিনেছে সে রবকে চিনেছে"।

❖ "মারেফত না জানিলে আল্লাহ্ তা'লা এবাদত বন্দেগী (তপজপ) কবুল করিবেন না। যদি কেহ হাজার বছর এবদত বা সাধনা করে তবুও বাতেনী এবাদত (গুপ্ত সাধন) ব্যতীত কবুল হইবে না"।

❖ "সে আমার উম্মত নহে, যে আপন শিশুদের স্নেহ করে না, প্রবীনতার খ্যাতিকে সম্মান করে না আর সেও আমার উম্মত নহে, যে সু-কর্মের নির্দেশ দেয় না ও মন্দ কর্ম নিষেধ করে না"।

- আল হাদিস

হাদিসে কুদসী

রসূল (সাঃ) (আঃ) বলিয়াছেন, কাল্বে আছে ফুয়াদ (অনুভূতি-গতিপ্রবাহ), ফুয়াদে আছে রুহ অর্থাৎ ফুয়াদকে ঠিকভাবে পরিচালনা করিলে উহার রুহ প্রাপ্তি ঘটে। রুহের মধ্যে আছে সের (সের অর্থ রহস্য) সেরের মধ্যে আছে নূর(নূরে মোহাম্মদী), নূরের মধ্যে আছে আনা (আনা অর্থ আমি), আল্লাহ্ বলেন নূরের মধ্যে শুধুই আমি আছি।

বাণী চিরন্তনী

মওলা আলী (আঃ)

❖ "নিজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে,
তুমি অন্যের জন্য যা অপছন্দ করবে
তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে"।

❖ "সবচাইতে নিকৃষ্ট সহচর সে,
যার জন্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়"।

❖ "আহলুল বাইত কে যারা ভালবাসে
তাদেরকে অনেক দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা,
উৎপীড়ন-যন্ত্রণা পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে"।

❖ "জ্ঞানের বিষয়ে নীরব থাকার কোন সুফল নেই,
যেমন নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে কথা বলে কোন কল্যাণ হয় না"।

❖ "দৃঢ় ঈমানে ঘুমানো,
সংশয়পূর্ণ এবাদত থেকে অধিকতর ভালো"।

❖ "অকৃতজ্ঞতা বশত ছোট খাট আনুকল্যকেও ঠেলে ফেলে দিও না"।

❖ "জীবনকে প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো আশার মধ্যে নয়,
কারণ প্রয়োজন ফকিরেরও পূর্ণ হয়, কিন্তু আশা বাদশারও পূর্ণ হয় না"।

❖ “কখন বুঝবে একটি দেশ ও সমাজ নষ্ট হয়েগেছে,
যখন দরিদ্ররা ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছে,
ধনীরা কৃপন হয়ে গেছে, মুর্খরা মঞ্চে বসে আছে,
জ্ঞানীরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং শাসকরা মিথ্যা কথা বলছে”।

❖ “বিচার দিনে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি অনুতপ্ত হবে,
যে অন্যায় পথ অবলম্বন করে সম্পদ উপার্জন করেছে।
সম্পদের উত্তরাধিকারী যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পথে
তা ব্যয় করে তবে সে (উত্তরাধিকারী) বেহেস্তবাসী হবে।
কিন্তু প্রথম উপার্জনকারী তার অপরাধের জন্য দোযখবাসী হবে”।

❖ “আস্তাগফিরুল্লাহ্‌ বলতে গেলে ৬টি ভিত্তির প্রয়োজন”
(১) অতীত বিষয়ে অনুতাপ (২) সে দিকে আর প্রত্যাবর্তন না করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (৩) মানুষের সকল অধিকার পূরণ করা যাতে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারে কোন জবাবদিহি না করতে হয় (৪) সকল দায়িত্ব পালন করা যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় (৫) হারাম রোজগার দ্বারা যে মাংস শরীরে হয়েছে, অনুতাপে তা গলিয়ে দেওয়া যেন চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে যায় এবং আবার নতুন মাংস গজায় (৬) আল্লাহ্‌র অনুগত্যের বেদনা সহ করার জন্য দেহকে গড়ে তোলা। এমন অবস্থায় “আস্তাগফিরুল্লাহ্‌” বলতে পার।

❖ “এমন অনেক কথা আছে
যা আক্রমণ থেকেও বেশি কার্যকর”।

❖ “যাতে তৃপ্তি পাওয়া যায়
তা ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট”।

❖ “পাপে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকা
এক প্রকার সততা”।

❖ "হৃদয় হলো চোখের গ্রন্থ"।

❖ "বন্ধুকে একটা সীমা অবধি ভালবাসো,
কারণ সে যে কোন সময় শত্রু হয়ে যেতে পারে।
আবার শত্রুকে একটা সীমা অবধি ঘৃণা কর,
কারণ সে যে কোন সময় তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে"।

❖ "সবকিছু বিচার করে বলা যায় নারী মন্দ,
কিন্তু এর নিকৃষ্টতম অবস্থা হলো
কেউ তাকে ছাড়া চলতে পারে না"।

❖ "সম্ভব্যতার উপর নির্ভর করে রায় দিলে
তাতে ন্যায় বিচার হয় না"।

জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (আঃ)

❖ "মোর্শেদ হাসরের গতি খলিফা নবী
শত নবীর সাথী নহে, কিন্তু নিজ পীর"।

❖ "ঘোর নূরে চোর জন্ম ডাকু রাহাজান
ধীর নূরে মুণি জন্ম আর মহাজন,
যে জন এসব গুণ করিবে সাধন
নিজ গুণে গুণী সেই করো নিরূপন"।

❖ "কেতাবেতে আসিয়াছে যার পীর না
শয়তান তাহার পীর নিশ্চিত বালাই,
যে জন পীরের ভাব চাহে বুঝিবারে
আহম্মদী ভাব বিনা পাইবে না তারে"।

❖ “তুমি যদি খোদা বলে ডাকিবে হাজার
না শুনিবে খোদা তাহা হাদিসে প্রচার
পারো যদি পীর মুখে ডাক দাও তায়,
ডাকে ডাকে ডাক পাবে যাবে না বৃথায়
না বলো খোদার নাম না বলো রসুল
এক চিত্তে পীর মুখে বোলাও কেবল”।

❖ “নূরে হক্কে হক্ক আছে হক্ক চিন আগে
এবাদত করো যদি পারো শেষভাগে,
না চিনিয়া এবাদত করিবে কাহার
ভূতের বন্দেগী হবে হবে না খোদার”।

❖ “ওস্তাদে শিখায় বিদ্যা নিরখিয়া দেখ
মোর্শেদ কহেন বাপু চক্ষু মুদে থেক,
চক্ষু বন্ধ বিদ্যা এই খুলিবে কি হবে
খোলা জন এই ভেদ কভু নাহি পাবে”।

কালান্দার ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী (আঃ)

❖ “আপন পবিত্র নফ্সের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসটিকে পরীক্ষা করার জন্য যে দেওয়া হয়েছে, উহাকে তথা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দাও অথবা মুসলমান বানিয়ে দাও। ইহাই ইসলামের মূল দর্শন”।

❖ “সুফিবাদের উপর যখন খনকারি, কবিরাজি, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুম্বা, জ্বিন তাড়ানোর ভড়ং-চড়ং, মাটি বাবা, জুতা বাবা, গাছ বাবা, পানি বাবা, ইত্যাদি বিষয়গুলো আরোপিত হয় তখন সুফিবাদও কলুষিত হয়ে যায়, কলঙ্কিত হয়ে যায়, দূষিত হয়ে যায়, পাপপূর্ণ হয়ে যায়”।

❖ "মানুষ ছোট হতে কবরে যাবার আগে পর্যন্ত আসল বিষয় ফেলে গল্প শুনতে বড়ই ভালবাসে এবং ইহাকেও একটি সুন্দর তকদির বলতে চাই"।

❖ "মৃত্যু নামক কেয়ামতে সগিরা ঘটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে একটি মানুষকে তার আপন পরিচয় এবং স্বরূপটি দেখিয়ে দেওয়া হয় তথা পূর্বজন্মের কর্মফলটি ভোগ করতে হবে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়"।

❖ "খান্নাসমুক্ত জীবন এই সংঘাতযুক্ত দুনিয়ার মাঝেও আপন ভাবের মধ্যে ডুবে থেকে আপন জান্নাত নামক বাগান বা উদ্যানে অবস্থান করে"।

বাবা শামসেত্তাব্রীজ (আঃ)

❖ "তুমি সবকিছুই হতে পারবে
কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন
একজন ভাল মানুষ হওয়া"।

❖ "আমি হিন্দ নই, বৌদ্ধ নই, খ্রিষ্টান নই
এমন কি আমি মুসলিমও নই"।

❖ "যখন সবাই কিছু একটা হতে চাইছে
তখন তুমি বরং কিছু হতে যেও না,
শূন্যতার সীমানায় নিজেকে মেলে দাও।
মানুষের উচিৎ একটা পাত্রের মতন হওয়া
একটি পাত্রের মধ্যকার শূন্যতা যেমন তাকে ধরে রাখে,
তেমনি একজন মানুষকে ধরে থাকে তার নিজের
কিছুই না হয়ে থাকার সচেতনতা"।

❖ "তুমি কি ভবিষ্যৎ এর দিকে চেয়ে আছো জান্নাত/জাহান্নাম দেখতে ?
অথচ তোমার বর্তমানের মাঝেই রয়েছে সেগুলো।
যখন তুমি কোন চুক্তি, যুক্তি আর প্রত্যাশা ছাড়াই ভালবাসতে পারবে,
তখন তুমি জান্নাত খুঁজে পাবে।
যখন তুমি ঘৃণা আর মারামারিতে জড়িয়ে থাকবে,
তুমি খুঁজে পাবে জাহান্নাম"।

আরও কিছু অমীয় বাণী

❖ সততাই সম্মান, মিথ্যা হলো অক্ষমতা, সাহায্য হলো বন্ধুত্ব, কর্ম হলো অভিজ্ঞতা, সৎব্যবহার হলো এবাদত, নির্বাক থাকাই সৌন্দর্য, নম্রতাই বুদ্ধিমত্তা, কার্পণ্যে দারিদ্র, দানশীল তাই প্রাচুর্য।

- ইমাম হুসায়েন (আঃ)

❖ "ইসলামে রোহবানিয়াত নাই"- হাদিসের এই কথাটির ভুল অর্থ করা হইয়া থাকে। যথা ইসালামে বৈরাগ্য নাই অথচ ইসলাম হইল বৈরাগ্যের ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। লিখিত কোরআনের প্রতিটি পাতা পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব বহন করিতেছে।

গৃহ ছাড়িলেই বৈরাগ্য হয় না, আমিত্ব ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত বৈরাগ্য"। "অমাই ইউকা সুহ্হান নাফসিহি ফাউলাইকা হুমুল মুফলেহুন"। (আল-কোরআন)। অর্থ:- "এবং যে ব্যক্তি তাহার নফ্সকে লোভ মুক্ত করিয়াছে" পূর্ণ বৈরাগ্যই ইসলামের ব্যবস্থা"।

সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ)

❖ "একটি লক্ষ্য ঠিক কর আর সেই লক্ষ্যকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলো - চিন্তা কর, স্বপ্ন দেখো। তোমার মস্তিষ্ক, পেশী, রক্তনালী পুরো শরীরে সেই লক্ষ্যকে ছড়িয়ে দাও আর বাকি সবকিছুকে ভুলে যাও। এটাই সাফল্যের পথ"।

- স্বামী বিবেকানন্দ

❖ "মানুষ ফকিরের যোগ্য তখনই হয়,
যখন তাহার মধ্যে অস্থায়ী জগতের
কোন কিছু স্থায়ী থাকে না"।

- খাজা বাবা

❖ "আরাম উস দিলকো মিলা, জিস দিলকো কাভি আরাম নেহি মিলা।
ঐ ব্যক্তি সব চাইতে আরামে আছে, যিনি জীবনেও আরাম পায় নি"।

- খাজা বাবা

❖ "মনের গুণে মহাজন ব্যাপারী।"

- (লালন সাঁইজী)

❖ "নিরিখ রেখ ঈশাণ কোণে
চালাও তরী সচেতনে
গালি খেলে মরবি প্রাণে
জানা যাবে মাঝিগিরী"।

- (লালন বাণী)

❖ "প্রত্যেক জাতি বিশ্ব মানবের অঙ্গ,
বিশ্ব মানবকে দান করিবার সহায়তা করিবার সামগ্রীকী উদ্ভাবন করিতেছে।
ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতী প্রতিষ্ঠা লাভ করে"।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❖ "জন্তুরা পেয়েছে বাসা মানুষ পেয়েছে পথ,
মানুষের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠতারা পথ নির্মাতা বা পথ প্রদর্শক"।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❖ "প্রেমই প্রভূ, জ্ঞান ভৃত্য"।

- গেটেও

❖ "যারা রক্ষণশীল তারা শুধু সমাজের অগ্রগতিকেই ব্যহত করে না,
তারা সমাজকে জগতচক্রকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়"।

- টমাস আলফেড

❖ "পূর্ব ঋষি যারা, একই আদর্শ ভিন্ন ধারা"।

- শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র

❖ "মানুষই পরম গুরু
বাঞ্ছাপূর্ণ কল্পতরু,
মানুষ ভজিতে ভীরু
হয়োনা কখন"।

- দুদ্দু শাহ্

❖ "মিথ্যা জ্ঞান হতে সাবধান
এটা অজ্ঞতার চেয়েও বিপদজনক"

- জর্জ বার্নড শো

❖ "স্কুলে অধ্যায়ন করে নয়
কিতাবের পাতা পড়ে নয়
প্রকৃত মানুষ তৈরী হয়
বুযুর্গদের একটিমাত্র নজরে"।

- আল্লামা ইকবাল (আঃ)

❖ "ভালবাসা হলো,
তুমি দাঁড়িয়ে আছো তোমার প্রেমাস্পদের সামনে,
যখন খুলে ফেলেছ তোমার সমস্ত বিশেষণ,
তখন তাঁর বিশেষণ হয়ে উঠে তোমার গুণাবলীতে"

- বাবা মুনসুর হাল্লাজ (আঃ)

❖ "সন্তানের সাফল্য চাইলে তাকে মাছ খেতে
দেওয়ার বদলে মাছ ধরতে শেখাও"।

- মাও সেতুং

❖ “অসত্যের পথে সফল হবার চেয়ে
সত্যের পথে ব্যর্থ হওয়া অনেক ভাল”।
- হারমান মেলভি

❖ “যদি তোমার সমালোচনা করার মত কেউ না থাকে,
তবে তোমার সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে”।
ম্যালকম এক্স

❖ “ব্যর্থতার ছাই থেকে সাফল্যের প্রাসাদ গড়ো,
হতাশা আর ব্যর্থতা হলো সাফল্যের প্রাসাদের দুই মূল ভিত্তি”।
- ডেল কার্নেগী

❖ “সাফল্যের মূল হলো হাতের কাজের প্রতি ভালবাসা আর কঠোর পরিশ্রম,
সেই সাথে জয় পরাজয় ভুলে নিজের পুরো সমর্থন বিলিয়ে দেওয়া”।
- ভিন্স লম্বারডি

❖ “জীবনে সফল হতে চাইলে
দু’টি জিনিস প্রয়োজন,
জিদ আর আত্মবিশ্বাস”।
- মার্ক টোয়েন

জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

❖ “কেয়ামতের দিন যে বস্তু
মানুষকে বেহেস্তে নিয়ে যাবে,
তাহা হইল যোহদ এলম নহে”।

❖ “সর্বপ্রথম যে বিষয়টি
মানুষের উপর ফরজ করা হইয়াছে
তাহা হইল মারেফত”।

❖ “ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক
যার অন্তর ইহকাল ও পরকালের
সকল আশা ত্যাগ করিয়া
একমাত্র মাহবুবের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে”।

❖ “ক্ষেত্র বিশেষে ভাল সাজা সহজ
কিন্তু সর্ব অবয়বে ভাল হওয়া কঠিন”।

❖ “যারা সত্যকে গোপন করে
মিথ্যার উপর পরিচালিত হয়
এরা পশুর চাইতেও অধম।
দুনিয়াতে এদের দৃষ্টান্ত থাকবে,
পরকাল হারাবে”।

❖ “তুমি যা জাননা সে বিষয়ে
পরামর্শ দানে চুপ থাকা শ্রেয়”।

❖ “কারো কাছে কিছু শিখলে
জ্ঞান দ্বারা তা নিরীক্ষা অন্তে গ্রহণ করিও।
ইহা সচেতন নাগরিকের বা মানবের বৈশিষ্ট্য”।

❖ “বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো সততা
আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই
তোমার একমাত্র কার্য”।

❖ “যাদের বিবেক মৃত
তাদেরকে পরিহার করে চলাই শ্রেয়,
সত্য সুন্দরকে কুলষিত করতে
এরা পিছুপা হয় না”।

❖ “নিরিখ, বরযোখ, তাসাববুরে শায়েখ
পীরে লীন হওয়াটাই ফকিরি”।

❖ “চন্দ্রকর হয়েছে যাহার
মধুচন্দ্রিমা দীপ্তি তাহার,
দয়াবানের দয়াতে
গুরুবাদী সূত্রতে”।

❖ “মাপে কম দিও না, মাপে পা ফেল,
ওজনে কম দিও না, ওজন বুঝে কথা বলো”।

❖ “জানা সহজ, মানা কঠিন”।

❖ "জ্ঞান অর্জনের পূর্ণতা হলো
এখনও পূর্ণতা পাইনি,
প্রেম অর্জনের পূর্ণতা বলে কিছু নাই"।

❖ "কোরআন হাদিস ব্যবহার করে
যারা ফায়দা হাসিল করে তারা দানব"।

❖ "সৃষ্টির মূল একেরই প্রকাশ ও বিকাশ"।

❖ "বেদনা যেখানে গভীর,
যাতনা সেখানে তীব্র
কামনা সেখানে স্বচ্ছল,
নির্মল এবং দীর্ঘ"।

❖ "দ্রুত সাফল্য ভাগ্যের ব্যাপার,
যারা সফল হয় তাদের ভুল থাকে।
কিন্তু যারা ভুলের কারণে থেমে যায় না
এভাবেই ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায়"।

❖ "অন্যের বিজয় বা পূর্ণতা দেখে ছুটাছুটি ছেড়ে
তার ভুল থেকে শিখতে চেষ্টা কর, ব্যর্থতা কমবে"।

❖ "ভালবাসা, শ্রম সাধনা, এবং স্বপ্ন (মূল লক্ষ্য) -
ব্যর্থতার পরেও কাজ করে যেতে হবে তবেই সাফল্য"।

❖ "প্রেম হাসায়, প্রেম কাঁদায়,
'প্রেম স্বর্গীয়, প্রেম মূলকে পাইয়ে দেয়"।

❖ "একেরই প্রকাশ, একেরই বিকাশ,
একেরই ছুটে চলাবহুগুণের বিকাশ,
বহুগুণের সমষ্টির সূচনা গুরু"।

❖ "সত্যবাদীতা এবং পবিত্রটা লাভ হলে,
স্বর্গীয় সুখের সত্ত্বাতে উপন্বিত হয়"।

❖ "জ্ঞাণীদের নিরবতা মঙ্গল নয় বরং
মঙ্গল হলো মূল বিষয় উপস্থাপন করা"।

❖ "মানুষ যখন উদারতার কথা ভূলে যাবে
তখন মন্দ লোক ধার্মিকদের হেয় পতিপন্ন করবে,
অসহায়দের সকল কিছু কিনে নিয়ে তারা
উপরের সিঁড়িতে অবস্থান করবে, যা লোক দেখানো"।

❖ "সাধকদের নিয়ে হাসি তামাশায় লিপ্ত হলে
তার প্রজ্ঞা কমে যাবে,
ধীরে ধীরে যাতনায় ভূগতে থাকবে,
এমন কর্ম থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়"।

-ঃ বইটি পাঠকদের হাতে তুলে ধরতে যারা সহযোগীতা করেছেন ঃ-

(১) মোঃ সাইদুল - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২) মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস - দোগাছী, পাবনা।
(৩) মোঃ হান্নান শেখ - চকদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(৪) মোঃ আঃ সামাদ - মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৫) মোঃ সোহেল - মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৬) মোঃ হাসনাত বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৭) শাহ সুফি শরীফ আল-সুরেশ্বরী - মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৮) শাহ সুফি মজিদ আল-সুরেশ্বরী - মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৯) মোঃ আক্তারুজ্জামান (বাবু) - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১০) মোঃ আনিসুজ্জামান (আনিস) - খয়েরসুতী, দোগাছী, পাবনা।
(১১) মোঃ জুয়েল - চরবলরামপুর, দোগাছী, পাবনা।
(১২) মোঃ জহুরুল ইসলাম - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৩) মোঃ মিলন - বাবুলচড়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৪) মোঃ তুষার বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৫) মোছাঃ হাসিনা খাতুন - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(১৬) মোছাঃ সাবিনা খাতুন - বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(১৭) মোছাঃ নাজমা বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(১৮) মোঃ কুতব উদ্দিন বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(১৯) মোঃ আকরাম হোসেন (লেবু) - পোড়াডাঙ্গা, সুজানগর, পাবনা।
(২০) মোছাঃ সেলিনা বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২১) মোঃ হোসেন বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২২) মোঃ ওহিদুল ইসলাম - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।